প্রভুপাদ

# বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

১৩৩০ বঙ্গাব্দ

মূল্য ২॥০

## প্রাপ্তিস্থান—

কদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।    কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

এবং

গ্রন্থকারের নিকট— ১।১ মহামায়া লেন, কালীঘাট, কলিকাতা।

রঙ্গল প্রিণ্টার্স লিমিটেড্ হইতে—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কভার ও ছবি—ইউ, রায় এণ্ড সন্স্, গড়পার রোড্ হইতে মুদ্রিত।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১।১ মহামায়া লেন, কালীঘাট হইতে প্রকাশিত।

# দ্বিতীয়সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আরাধ্যতম শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপাদের জীবনবৃত্তান্ত দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল। এবারে গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে সাধ্যমত যত্ন করা হইয়াছে। পুস্তকের ভাষায় যে সকল দোষ ছিল, যত্নপূর্ব্বক তাহা সংশোধিত করা হইয়াছে। এবারে বহু নূতন ঘটনা সংযোজিত হওয়াতে গ্রন্থকলেবর প্রায় দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রথমসংস্করণের স্থলবিশেষ পাঠ করিয়া কাহারও কাহারও মনে ক্লেশ হইয়াছিল। এবারে সেই সকল স্থান সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণে পুস্তকখানি আমূল সংস্কৃত হইয়া সম্পূর্ণ অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। গ্রন্থ বিবৃত প্রভুপাদের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি জানিয়া লইবার এবং স্মরণে রাখিবার পক্ষে সাহায্য হইবে বলিয়া ক্রম অনুসারে একটী "বিষয় সূচী" এবং একটী "স্থান ও কালপঞ্জী" পুস্তকের শেষভাগে প্রদত্ত হইল। গ্রন্থের আকার বড় হওয়াতে পূর্ব্বসংস্করণ হইতে মূল্য কিছু অধিক করিতে হইল।

আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাজরা ভায়ার যত্নেই গ্রন্থখানি এত শীঘ্র প্রকাশিত হইল। এজন্য ভায়ার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। শ্রীমান্ মোহিনীমোহন হালদার প্রুফ্ দেখা কার্য্যে আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। অলমিতি বিস্তরেণ

১।১ মহামায়া লেন, কালীঘাট।
১লা শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল।

গ্রন্থকার।

# শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর জন্মকুণ্ডলী

(সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর ওঝা মহাশয় কর্ত্তৃক গণিত)

১২৪৮ সালের (১৭৬৩ সকে) ১৯ শে শ্রাবণ, সোমবার প্রাতে ১দণ্ড ১৯ পলের সময় জন্ম।

সন্ধি ভাবে শুক্র একাদশে আছেন।

মাতৃকুলে জন্ম হয়। কারণ ষষ্ঠাধিপতি বৃহস্পতি লগ্নকে পূর্ণ খিতেছেন। মাতৃবংশের বিচার ষষ্ঠ স্থান হইতে হয়। অতএব ই মহাপুরুষের মাতৃবংশে জন্ম হইয়াছে।

লগ্নপতি চন্দ্র পাপ (রাহু) যুক্ত থাকার জন্য বিষ তুল্য বস্তু ভক্ষণ মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু লগ্নেশ চন্দ্রের লগ্নের উপর পূ দৃষ্টি থাকায়, এবং বৃহস্পতির লগ্নের প্রতি দৃষ্টি জন্য এবং ব্যয়েশ বুধ লগ্নে

অবস্থান জন্য দীর্ঘায়ুযোগ হইয়াছে। তজ্জন্য মৃত্যু হয় নাই। ষষ্ঠেশ বৃহস্পতি লগ্নের উপর দৃষ্টি জন্য বিশেষ পরাক্রমী এবং সদ্ বিচারক ও শ্রেষ্ঠ যোগী হইয়াছেন।

শুক্র ও বৃহস্পতির সমসপ্তম দৃষ্টিজন্য সংসারী হইয়া যোগী হইয়াছেন। তাহার কারণ পঞ্চমেশ মঙ্গলের শুক্রের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি আছে। যেহেতু শুক্র সুখেশ।

কর্কট লগ্ন ভিন্ন অন্য লগ্ন হইতে পারে না। গুলিক বিচারেও ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ইতি—

শ্রী জগদীশ্বর ওঝা।
প্রধান জ্যোতিষী, বৰ্দ্ধমান রাজ
২৬ শে আষাঢ়, ১৩৩০ সাল

# গ্রন্থকারের নিবেদন

আরাধ্যতম শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপাদের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল। মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে মহাপুরুষের অলোকসামান্য পবিত্র জীবনচরিত লিখিবার প্রয়াস নিতান্তই ধৃষ্টতা। পৃথিবীর ধূলিমাখা পঙ্কিল হস্তে নন্দনের পবিত্র কুসুম চয়ন করিতে যাওয়া যে অতিসাহসের কার্য্য, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তবে এ প্রয়াস কেন? বামনের চন্দ্র ধরিবার সাধ কেন? উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি। মহতের গুণকীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত যেরূপ নির্ম্মল হয়, অন্য কিছুতেই সে প্রকার হয় না। গোস্বামিপাদের পবিত্রজীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া আত্মজীবন পবিত্র করিবার লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়াই ক্ষুদ্র ও অযোগ্য আমি তাঁহার জীবনী লিখিতে ব্রতী হইয়াছিলাম। সেই মহৎ ব্রত মৎকর্ত্তৃক কি ভাবে উদ্‌যাপিত হইল, সহৃদয় পাঠকগণ তাহা বিচার করিবেন।

আর এক কথা, গোস্বামিমহাশয় একাদশ বৎসর এ মর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। পৃথিবীতে তিনি যে সকল পবিত্র কার্য্য সম্পাদন করিয়া ধরিত্রী দেবীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার সাক্ষিস্বরূপ যাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন, সেই সকল ভাগ্যবান্ নরনারীও ক্রমশঃ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামের যাত্রী হইতেছেন। কিছু দিন পরে তাঁহারা সকলেই মর্ত্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া যাইবেন। তখন আর গোস্বামিমহাশয়ের পবিত্র কার্য্যাবলী অবগত হইবার কোন উপায়ই থাকিবে না।

অতএব এখন তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা অতিশয় আবশ্যক বোধ করিয়া আমি আপনাকে নিতান্ত অক্ষম জানিয়াও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই পুস্তক যে তাঁহার উপযুক্ত জীবন-চরিত হয় নাই, তাহা আমি নিঃসংশয়রূপে অবগত আছি। তবে ভবিষ্যতে কোন যোগ্যতর ব্যক্তি যদি এই পবিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আমার সংগ্রহ দ্বারা তাঁহার কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারিবে মনে করিয়া বৈষ্ণব কড়চাকর্ত্তাদিগের ন্যায় ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে আমি বহু দিন তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী যাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, প্রধানতঃ তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এবং সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাদি হইতেও অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। অপর তিনি তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা তিনখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই পুস্তকত্রয় হইতেও অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। (১)

মহাপুরুষদিগের জীবন অপার অতলস্পর্শ মহাসমুদ্র। লোকোত্তর অসংখ্য ঘটনারূপ রত্নরাজিতে তাহা পরিপূর্ণ। মহাভাব ও ভগবৎ-প্রেমের অনন্ত লহরীমালা তাহাতে নিরন্তর ক্রীড়া করে। সেই অতলস্পর্শ মহাসাগরের সমগ্র রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

---

(১) 'ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়,' 'আশাবতীর উপাখ্যান' ও 'যোগসাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর'। এই তিন খানি গ্রন্থ।

ভগবৎকৃপাপবনে সেই প্রশান্ত সমুদ্রবক্ষে ভাব ও প্রেমের যে অসংখ্য লহরীমালা নিরন্তর প্রকাশিত হইয়া তাহাকে অপার্থিব দিব্য লাবণ্যে বিভূষিত করে, তাহা চিত্রিত করা মানবের ক্ষুদ্রশক্তির অসাধ্য। সিন্ধু কৃপা করিয়া যতটুকু প্রকাশ করেন, ততটুকুই জ্ঞাত হইয়া প্রচার করিতে পারা যায়। গোস্বামিপাদও তাঁহার লোকোত্তর জীবনের অসংখ্য ঘটনাবলি ভাবকদম্ব ও লীলারসের যতটুকু প্রকাশ করিয়াছেন, ততটুকুই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার জীবনের ঘটনা ও ভাবাবলীর অতিঅল্প অংশই ইহাতে বর্ণিত হইল; অধিকাংশই অজ্ঞাত থাকাতে অপ্রকাশিত রহিয়া গেল।

"প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
জীব হঞা কে বা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥"

অপার গৌরাঙ্গলীলার্ণবের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া ভক্তিভাজন কবিরাজ গোস্বামী বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে ভক্তিতে গদ গদ হইয়া এই বাক্যগুলি বলিয়াছেন। আরাধ্যতম প্রভুপাদের অতলস্পর্শ জীবন-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই গ্রন্থকারও সেই মহাজন-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছে।

গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে অনেক অপ্রিয় সত্য বাক্য লিখিতে হইয়াছে। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের কুৎসা রটনার প্রবৃত্তিতে

আমি এ কার্য্য করি নাই। কেবল সত্যপ্রকাশের জন্যই বাধ্য হইয়া আমাকে এই অপ্রীতিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কাহারও জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জীবনের যথার্থ ঘটনাবলি গোপন রাখা বা পরিহার করা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমার লেখা দ্বারা যদি কাহারও মনে ক্লেশ উৎপাদিত হইয়া থাকে, আমি করজোড়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

এই গ্রন্থপ্রণয়নে ও মুদ্রণকার্য্যে আমি যাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ভবানীপুর<br>
১৩১৮ বঙ্গাব্দ

বিনয়াবনত<br>
গ্রন্থকার।

# অবতরণিকা।

অবতার ও মহাজনগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাঁহাদিগের জীবনে দুইটি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। একটি লৌকিক ভাব, অপরটি অলৌকিক ভাব। ভগবান্ রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বুদ্ধদেব, আচার্য্য শঙ্কর, মহাত্মা যিশু, প্রেরিত পুরুষ হজরত মহম্মদ, গুরু নানক প্রভৃতি লৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন, আবার সেই সঙ্গে সমুদ্রবন্ধন, গোবর্দ্ধনধারণ, মৃতব্যক্তির জীবনদান, অপরের দেহে প্রবেশ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান প্রভৃতি বিবিধ অলৌকিক কার্য্যও সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের জন্মগ্রহণপ্রণালীও সাধারণ মানবগণের জন্মগ্রহণপ্রণালী হইতে স্বতন্ত্র প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সাধারণ মানবগণ যে ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকেন, অবতার ও মহাজনদিগের সম্বন্ধে সে ভাবের অন্যথা লক্ষিত হয়। রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবান্ রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভু, মহাত্মা যিশু প্রভৃতির উৎপত্তিবিবরণ সাধারণ মনুষ্যগণের উৎপত্তি হইতে পৃথগ্বিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের কেহই সাধারণ মানবগণের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহাপুরুষদিগের জীবনের অলৌকিক কীর্ত্তি ও অলোকসামান্য কার্য্যসমূহ ইদানীন্তন পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা ঐসকল ঘটনা ও কার্য্যকে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন, এবং উপহাসের

চক্ষুতে নিরীক্ষণ করেন। ইহার মূলে বিন্দুমাত্রও সত্য বিদ্যমান আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। এই প্রকার মনে করিবার কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষাজন্য অবিশ্বাস ও বহির্ম্মুখতা। তাঁহারা যে প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহারা জড় ব্যতীত অধ্যাত্ম জগতের কোন সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারেন না। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান জড়জগৎ ব্যতীত অধ্যাত্মরাজ্যের সমাচার কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। তপস্যা ও ভগবৎকৃপা ব্যতীত অধ্যাত্মজগতের কোন তত্ত্বই অবগত হইতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে তপস্যা নাই। আমাদিগের ত্রিকালজ্ঞ পূজ্যপাদ ঋষি ও মহাজনগণ তপস্যালব্ধ দিব্য-জ্ঞানদ্বারা অধ্যাত্ম-জগতের যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তপস্যার অভাবে সে সমস্ত বুঝিতে না পারিয়া কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অবতার ও মহাপুরুষদিগের অলৌকিক কার্য্যসমূহও তাঁহারা এই কারণে অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন না বলিয়াই যে এই সকলের মূলে কোন সত্য নাই, এ প্রকার সিদ্ধান্ত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তুমি যাহা বুঝিতে পারিলে না, ধারণা করিতে সমর্থ হইলে না, তাহাই যে নাই, হইতে পারে না, এরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। জগতে এমন অসংখ্য বিষয়, অগণ্য তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা ক্ষুদ্রশক্তি মানবগণের অবগত হইতে যুগযুগান্তর অতীত হইয়া যাইবে। সমস্ত তত্ত্ব কতকালে জ্ঞাত হইতে পারিবে, তাহা বলা যায় না। অবতার ও মহাজনদিগের অলোকসামান্য কার্য্যসমূহ তুমি আমি বুঝিতে পারি না, ধারণা করিতে সমর্থ হই না বলিয়া, তাহাতে অবিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অলৌকিক যাহা কিছু পাঠ করা যায়, সে সমস্তই সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত। ভগবৎকৃপায় মহতের অনুগ্রহে, যাঁহারা অধ্যাত্ম-জগতের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারাই আমার বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং অবতার ও মহাপুরুষদিগের অলোকসামান্য কার্য্যসকল যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন।

আর এক কথা, অবতার ও মহাপুরুষদিগের লোকোত্তর কার্য্য-পরম্পরাসম্বন্ধে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তৃগণই যে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সত্য পরিত্যাগ করিয়া ভিত্তিহীন অসার কাল্পনিক উপন্যাসের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা মনে করা সর্ব্বথা অনুচিত। যদি দুই চারিখানি গ্রন্থে এই প্রকার অলৌকিক ঘটনা ও কার্য্য বর্ণিত হইত, অথবা এক দেশের কিম্বা এক সময়ের মহাপুরুষদিগের কার্য্যসমূহ অলৌকিকতাতে পরিপূর্ণ থাকিত এবং অন্য দেশে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার অন্যথা পরিলক্ষিত হইত, তাহা হইলে এ কথা বলা চলিত। কিন্তু যখন সকল সময়ের সকল দেশের অবতার ও মহাজনদিগের জীবনে অলৌকিক কার্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহা নিশ্চয়ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা সত্য তাহাই সার্ব্বভৌমিক ও চিরস্থায়ী হয়। মিথ্যা কল্পনা কদাচ বিশ্বজনীন ও শাশ্বত হয় না। কাল অসত্য পদার্থকে অচিরে জগৎ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। অতএব অবতার ও মহাজনদিগের অলৌকিক কার্য্যসকলে বিশ্বাসস্থাপন না করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

দ্বিতীয় কথা, অলৌকিক বলিয়া আজ কাল যাহা অবিশ্বাস করা হয়, সেই সকল ব্যাপার তোমার আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রশক্তি মানবের নিকট অলৌকিক বটে; কিন্তু ভগবান্ ও মহাজনদিগের নিকট অলৌকিক নহে। যাঁহারা অবতার তাঁহারা ত সর্ব্বশক্তিমান্

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের নিকট কোন্ কার্য্যই অলৌকিক নহে। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার 'পর মহাপুরুষগণ,—ইহাঁরাও সাধারণ মানবমণ্ডলী হইতে সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ও সমধিক শক্তিসম্পন্ন; কাজেই অলৌকিক কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

পৃথিবীতে তিন প্রকার মনুষ্য পরিদৃষ্ট হয়। অবতার, মহাপুরুষ ও সাধারণ মানবগণ। অবতারগণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় মহাপুরুষগণ, ইহাঁরা নিত্যমুক্ত। তৃতীয় সাধারণ মানবমণ্ডলী, ইহাঁরা নিত্যবদ্ধ। বদ্ধজীব অপেক্ষা নিত্যমুক্ত মহাপুরুষগণ সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। মহাপুরুষদিগের জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই বদ্ধমানুষ হইতে অনেক অধিক। অবতারগণ যেমন সময়ে সময়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, মহাপুরুষগণও সেইরূপ সময়ে সময়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বদ্ধ মানবদিগকে প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বদ্ধ মানবগণ কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত তাঁহারা মহাপুরুষদিগের কৃপালাভ করিতে সমর্থ না হয়, ততদিন তাহাদিগের কর্ম্মভোগের নিবৃত্তি হয় না, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। নিত্যমুক্ত মহাপুরুষগণ বদ্ধ মানবদিগের ন্যায় কর্ম্মের অধীন হইয়া পৃথিবীতে আগমন করেন না। জগতের পাপভার হ্রাস করিবার জন্য, অজ্ঞান মানবদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবার নিমিত্ত, ধর্ম্মরাজ্যের পথভ্রান্ত পান্থদিগকে ধর্ম্মের প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দিবার জন্য, তাঁহারা ভগবানের আদেশে ধরাধামে আগমন করিয়া থাকেন এবং কার্য্য শেষ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। অতএব মহাপুরুষদিগের জন্ম যে বদ্ধ মানবগণ

হইতে ভিন্ন প্রকার হইবে, তাঁহাদিগের কার্য্যাবলি যে সাধারণ মানব-গণ অপেক্ষা লোকোত্তর হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অবতার ও মহাপুরুষদিগের চরিতাখ্যায়কগণ এই সমস্ত অবগত হইয়া সম্পূর্ণ সত্য বিবরণসকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অবতার ও মহাজনদিগের জীবনের অলৌকিক কার্য্যসকলই তাঁহাদিগের অসাধারণত্বের পরিচায়ক। তাঁহাদিগের জীবনী হইতে লোকোত্তর কার্য্যাবলী নিষ্কাষিত করিলে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র অসাধারণত্ব থাকে না। তাহা সাধারণ মানবগণের জীবনের ন্যায় অতিশয় অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে।

মহাজনগণ ইহলোক ও পরলোকের সেতু। ইহকাল ও পরকালের মধ্যে যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য পরিখা বিদ্যমান থাকিয়া পরস্পরকে পৃথক করিয়াছে, মহাপুরুষগণ সেই পরিখার সেতু হইয়া উভয় লোকের পার্থক্য দূর করিয়া থাকেন। মুমুক্ষু নরনারীগণ সেই সেতু অবলম্বন করিয়া অক্লেশে ইহ সংসার হইতে পরলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। যে দুর্ভেদ্য যবনিকা ইহকাল ও পরকালের মধ্যস্থলে বর্ত্তমান থাকিয়া পর জগতের সমস্ত ব্যাপার মর্ত্ত্যবাসীদিগের নিকট চিরকাল নিবিড় অন্ধকারাবৃত করিয়া রাখিয়াছে, মহাজনদিগের সম্মুখে সে যবনিকা থাকে না। তাঁহারা ইহলোকে অবস্থিত থাকিয়াই পরজগতের সমস্ত ব্যাপার করতলগত বদরীফলের ন্যায় দর্শন করেন। সূক্ষ্মদেহে সেই সকল লোকে গমন করিয়া সমস্তই অবগত হইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা ধর্ম্মপথের যাত্রিগণকে অনায়াসে সংসারের পরপারে লইয়া যাইতে পারেন। অদৃশ্য জগৎ যাহা সাধারণের নিকট ঘোর প্রহেলিকাময়, তাহার সমস্ত তত্ত্ব জানাইতে পারেন। এই স্থানেই তাঁহাদের বিশেষত্ব। সাধারণ মানবমণ্ডলী হইতে এই স্থানেই

তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব। এই জন্যই তাঁহাদের জীবন অলৌকিকতাতে পরিপূর্ণ। সাধারণ নরনারীর ইহা বুঝিবার শক্তি নাই। তাঁহারা ইহাতে কিছুতেই বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই কার্য্যে কেবল তাঁহাদের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ কোন্ শ্রেণীভুক্ত? তিনি যে বদ্ধজীবশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহেন, একথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অবশিষ্ট অবতার ও মহাজনদিগের শ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে তিনি কোন্ শ্রেণীভুক্ত? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। "কৃষ্ণ কেমন, যার মন যেমন", এই প্রচলিত বাক্যই ইহার যথার্থ উত্তর বলিয়া বোধ. হয়। বস্তুতঃও বিভিন্ন অধিকারের নরনারীগণ তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবগত হইয়াছেন। শিষ্যগণের নিকট তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, কেন না শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,

> "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
> গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"
> "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
> ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

"আমাকেই গুরু বলিয়া জানিবে। তাঁহাকে কদাচ অপমান করিও না। মানুষ মনে করিয়া তাঁহার উপর অসূয়া প্রকাশ করিও না; কেন না গুরু সর্ব্বদেবময়।"

কেহ কেহ তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কোন

কোন মানবের নিকট তিনি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। সাধুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে অবতার বলিতেন।

কোনস্থানে অগ্নি প্রজ্জলিত হইলে তাহা যেমন গোপন থাকে না, সেইরূপ গোস্বামিমহাশয়ের অসাধারণত্ব অপ্রকাশিত ছিল না।

* বিদেহমুক্ত যুক্তযোগী অর্জ্জুনদাস (খেপাচাঁদ) গোস্বামিপাদকে রামচন্দ্র ও মহাপ্রভুর অবতার বলিতেন। ৺পুরীধামের জগন্নাথবল্লভ মঠের মহান্ত অতি প্রাচীন সাধু ভূতানন্দ স্বামী তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিতেন। ভাগবতেও আছে—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

ক্ষয়শূন্য জলাশয় হইতে যেমন সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের নিধিস্বরূপ ভগবানের অসংখ্য অবতার।

অবতারের লক্ষণ সকলও তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। অবতার যখন পৃথিবীতে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি ব্যতীত আর কেহই মুক্তি দিতে পারেন না। প্রভুপাদের পৃথিবীতে থাকা সময়ে মুক্তি দিবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই ছিল। তিনি যখন পুরীতে ছিলেন, তখন পরলোকবাসী পিতাপুত্রের মুখে এ কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। পরলোকবাসী আত্মাদ্বয় স্বর্গগত পূজ্যপাদ ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট এই কথা জানিয়া গোস্বামিপাদের নিকট আগমন করেন এবং পরমহংসদেব যাহা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হন। এই বিবরণ পুরীগমন ও লীলাসংবরণ নামক পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অপর ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ অবতারদিগের আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। গোস্বামিমহাশয়ের অনুজ্ঞাও দেবগণকে মানিয়া চলিতে হইত। তাঁহার তিরোভাবের কয়েক বৎসর পরে একবার আশ্বিন মাসে পূর্ব্ববঙ্গে অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। গোস্বামিপাদ সেই ঝড় হইতে তাঁহার অকিঞ্চন দরিদ্র শিষ্য বাবু আনন্দচন্দ্র মজুমদারকে যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, আনন্দবাবুর স্বহস্তলিখিত সেই বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যাঁহারা একবার তাঁহাকে বিনীতহৃদয়ে দর্শন করিয়াছেন এবং কিছু-কাল তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবনতমস্তকে ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছেন, মহাপুরুষজ্ঞানে তাঁহার পবিত্র পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আশ্বিন মাসে কোজাগর লক্ষ্মীপূজার পূর্ব্বদিন পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বিভাগে প্রচণ্ড ঝড় হয়। রাত্রি অনুমান ২টার সময় ঝড় আরম্ভ হইয়াছিল। সে সময়ে আমরা সকলেই নিদ্রিত ছিলাম। ঝড়ের শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমার স্ত্রী আলো জ্বালিয়া শিশু সন্তানগুলিকে আগুলিয়া বসিলেন। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য আমরা কেবল ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। আমার বাড়ীর সমস্ত ঘরগুলিতেই বাঁশের খুঁটি। বাহিরের চাটাইএর বেড়াগুলি দুই বৎসরের পুরাতন; তাহাও আবার ঘুই পোকায় খাইয়া একবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। বেতের বাঁধন গুলির একটিও ছিল না। সামান্য বাতাস বা বৃষ্টি হইলেই যে বেড়াগুলি একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে, ইহা জানিয়াও অর্থাভাবে পূজার বন্ধের সময় তাহা মেরামত করিতে পারিলাম না। বড় দিনের সময় যেরূপেই হউক মেরামত করিব, মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত আছি, এমন সময়ে পর্জ্জন্য ও পবন দেবের তাণ্ডব লীলা আরম্ভ হইল। প্রচণ্ড ঝড়ের সহিত মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আমার বাড়ীর দুইটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়া ধরাশায়ী হইল। বৃক্ষপতনের শব্দ শুনিয়া আমাদের মনে হইল, রান্না ঘর কিংবা দক্ষিণের পোতার ঘর খানি বুঝি পড়িয়া গেল। বৃক্ষপতনের সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের বেগ এত বৃদ্ধি পাইল যে তাহার ভীষণ শব্দে শিশুগুলি অত্যন্ত ভীত হইয়া "ওমা, মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের জননীর মুখে কথা নাই। ভয়ে তিনি একেবারে অবসন্ন ও কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। আমার খেয়াল কিন্তু সেদিকে নাই। আমার চিন্তা কেবল বেড়াগুলির দিকে। জীর্ণ বেড়াগুলি এই ঝড় বৃষ্টিতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, আমার মনে কেবল এই ভাবনা। বেড়াগুলি নষ্ট হইলে কাল কি করিব? কাল বাঁশ বেত কিনিয়া ঘরামী আনিয়া এক দিনের মধ্যে বেড়া মেরামত করিয়া স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। কেননা ইহাতে যে

করিয়াছেন। পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিজনগণের সহিত একত্র বাস করিলেও তাঁহাদের কাহারও প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা করিতেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য প্রভৃতি

২০ কি ২৫ টাকা ব্যয় হইবে, তাহা ত আমার নাই। একথা মনে মনে চিন্তা করিয়া আমি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলাম এবং কাতর ভাবে ঠাকুরকে বলিতে লাগিলাম, গোঁসাই! আমি গরিব, আমার বেড়া রক্ষা করিও। পয়সার অভাবে মেরামৎ করিতে পারি নাই। মেরামৎ করা দূরে থাক, বেত কিনিবার পয়সাও আমার নাই। বেড়া গুলি পড়িয়া গেলে আমি বড়ই বিপন্ন হইব। দোহাই তোমার, আমার বেড়া গুলি ফেলিও না। কাতর ভাবে ঠাকুরের কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ঝড়ের বেগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনে যেন কান ফাটিয়া যায়। ছেলেগুলি অত্যন্ত ভয় পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্তানদের এই অবস্থা দেখিয়া আমার পত্নীর মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে আমাকে বলিলেন, "ওগো. এখন কি করিব? ঘর যেরূপ দুলিতেছে, মট্‌মট্ শব্দ করিতেছে, ইহা এখনই পড়িয়া যাইবে। এখন উপায় কি?" আমি বলিলাম, "আমাকে বলিয়া কি হইবে? গোঁসাইকে বল। তিনি ভিন্ন কে রক্ষা করিবে?" বাহিরের বেড়াগুলি বোধ হয় নাই। এই কথা বলিবার পরই একটা প্রচণ্ড ঝটিকা আসিয়া ঘরের পূর্ব্ব কোণের বেড়ার বাঁধন ছুটাইয়া দিল। হু হু শব্দে ঘরের ভিতরে প্রবল বাত্যা প্রবেশ করিতে লাগিল। মড়্ মড়্ শব্দে চালখানি খুঁটি হইতে আল্‌গা হইয়া গেল। ইহা দেখিবা মাত্র আমি 'বিজয়' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়াই একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম। স্ত্রীপুত্রের আর্ত্তনাদ ঝড়ের ভীষণ গর্জ্জন কিছুই আমার শ্রুতিগোচর হইল না। আমি সেই অবস্থায় দেখিলাম, গরিবের পিতামাতা আর্ত্তিহারী গুরুদেব আমার দক্ষিণ মুখ ঠাকুরঘরের পশ্চিমের চালের কাছে দাঁড়াইয়া আরক্ত নেত্রে বায়ুকোণের দিকে চাহিয়া অতিতীব্রস্বরে একবারমাত্র বলিলেন, "এখানে প্রচণ্ড বায়ুর দরকার নাই; অন্যত্র যাও।" দয়াল-ঠাকুর তাঁহার গরিব পুত্রের জীর্ণ বেড়াগুলি রক্ষা করিবার জন্য বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন, সুন্দরজটা ভিজিয়া তাহা হইতে জলের ধারা পড়িতেছে। কাষায়বস্ত্রের লাল আল-

সর্ব্বভূতে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিয়া সকলকে সমানভাবে প্রীতি করিতেন। কেহ তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় ছিল না। পরম শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতেন।

থাল্লাটি একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। ঝড় ও বৃষ্টির দেবতাকে এইরূপ আদেশ করিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। আদেশের সঙ্গেসঙ্গেই আমার বাড়ীর ঝড়বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অন্যস্থানে প্রবল ঝড়ে ঘর বেড়া বৃক্ষ ইত্যাদি ভূমিসাৎ হইতে লাগিল, কিন্তু আমার বাড়ীতে মোটেই ঝড় নাই।

সকাল হইবামাত্র আমরা তাড়াতাড়ি বেড়ার কাছে যাইয়া দেখিলাম, আমার রুইয়ে খাওয়া জীর্ণ বেড়াগুলি যেমন ছিল ঠিক সেইরূপই আছে। তাহা কিছুই নষ্ট হয় নাই। রসময়বাবু আমার একজন সতীর্থ, আমার দুরবস্থা জানিতেন। তিনি ভোরেই আমার সংবাদ লইতে আসিয়া যখন আমার মুখে ঠাকুরের কৃপার কথা শুনিলেন, তখন তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। পরে বলিলেন, গোঁসাই নিজে বেড়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাকে "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" বলিয়া একাধিকবার নমস্কার করিয়াছিলেন।

পদ্মানদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহার কন্যাদ্বয়কে দর্শন দিয়াছিলেন। এ বৃত্তান্তও এই পুস্তকের স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

গোস্বামিপাদের বৃন্দাবনে অবস্থানসময়ে কয়েকজন মহাত্মা তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে গাত্রবস্ত্র উন্মুক্ত করিতে বলেন। তাঁহাদের কথায় প্রভুপাদ পার্শ্বের কাপড় খুলিলে মহাত্মাগণ তাঁহার আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিলেন এবং পরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মহাত্মাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি দেখিলেন?" মহাত্মারা বলিলেন, "ইনি অবতার, ইঁহার দেহে সমস্ত ভগবৎ লক্ষণ বর্ত্তমান, তাহাই দেখিলাম।"

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" (১)

গীতার এই মহাবাক্য তাঁহার জীবনে সর্ব্বদাই উজ্জ্বলরূপে পরিদৃষ্ট হইত। অর্থাদি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত ছিলেন। তাঁহার আশ্রমে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র আসক্ত ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতেন। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট আয় ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন। তিনি বলিতেন, ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন, যে প্রকার ব্যবস্থা করেন, সন্তুষ্টচিত্তে ও অবনতমস্তকে তাহার অনুগামী হইয়া চলিতে হইবে। এসম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা একটি হিন্দি কবিতা আবৃত্তি করিতেন, "কভি ঘি ঘনা, কভি মুঠিভর চানা, কভি চানা ভি মানা।"

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" (২)

ভগবদ্গীতার এই মহাবাক্যের প্রমাণ তাঁহার জীবনে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইত।"

ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি যথার্থ মীমাংসাবাক্য বলিয়া দিতেন। তাঁহার উত্তর শুনিলে মনে হইত যে জগতের কোন তত্ত্বই যেন তাঁহার অপরিজ্ঞাত নাই। বস্তুতঃও কোন

---

(১) বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সমদর্শী হন।

(২) অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি আমার উপাসনা করেন; সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তির যোগক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি।

তত্ত্বই তাঁহার দিব্যজ্ঞানের অগোচর ছিল না। কাকিনার রাজা স্বর্গীয় মহিমারঞ্জন রায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি নাকি সকল দেশের এবং সমস্ত প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারেন?" তাহাতে গোস্বামিপাদ বলিয়াছিলেন, "হাঁ পারি।" ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণ পুরুষ। সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের পূর্ণ জ্ঞানের সহিত যাঁহার জ্ঞান সংযুক্ত হয়, তিনি সমস্তই বুঝিতে ও জানিতে পারেন। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতালাভ হয়। কোন বিষয় বা তত্ত্ব জানিতে বা বুঝিতে তাঁহার বাকি থাকে না।

আমি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করি, তিনি আমার সহিত কথা বলেন, আমোদ-প্রমোদ, হাস্য-পরিহাস, ক্রীড়া-কৌতুক করেন, এক সঙ্গে পান ভোজন করেন, একথা কেবল গোস্বামিপাদকেই বলিতে শুনিয়াছি। তিনি নিদ্রাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়াছিলেন। দিবারাত্রি আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। পীড়িত হইলেও শয়ন করিতেন না। দেহের রোগযন্ত্রণা তাঁহার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। উপবিষ্ট হইয়া কথা বলিতে বলিতে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহাকবি ভবভূতি উত্তর রামচরিত নাটকে ভগবান্ রামচন্দ্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।"

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের প্রকৃতিতেও এই ভাব অতি পরিস্ফুটভাবে পরিদৃষ্ট হইত। তিনি কখনও বজ্র অপেক্ষা কঠিন এবং কখনও কুসুমোপম কোমল ছিলেন। কখনও বালকের ন্যায় হাস্যপরিহাস আমোদপ্রমোদ, মিষ্টালাপ করিতেন, কখনও এমন গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন যে, তাঁহার নিকটে যাইতে ভয় হইত। কাহাকে শাসন করিবার সময়ে তিনি বাস্তবিকই বজ্রাদপি কঠোর হইতেন। শান্তি-

দানের পর আবার তাঁহার প্রতি এমন কোমল ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতেন যে তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কোন দোষ করিলে তিনি তাহাকে শাসনরূপ তীব্র আগুনে পোড়াইয়া খাঁটি করিয়া লইয়া পরে বাৎসল্যের সুস্নিগ্ধ সলিলে ডুবাইয়া শীতল করিয়া দিতেন।

তিনি সর্ব্বভূতকৃপালু ছিলেন। জীবের প্রতি তাঁহার সমবেদনা ও সহানুভূতি অসীম ও বিশ্বজনীন ছিল। জীবজগতের কোন একটি প্রাণীর ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহা তাঁহার ভিতরে সংক্রামিত হইয়া যন্ত্রণাপ্রাপ্ত প্রাণীর ন্যায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিত। যাঁহাদের আত্মা বিশ্ব-বাসী সমস্ত জীবের আত্মার সহিত আধ্যাত্মিকযোগে সংযুক্ত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমুদায় প্রাণীর সুখদুঃখের সহিত যাঁহাদের সুখদুঃখ মিশ্রিত হইয়া অদ্বয়ত্ব লাভ করে, তাঁহারা অপরের সুখদুঃখ নিজের সুখদুঃখের ন্যায় অনুভব করিয়া থাকেন এবং নিজের সুখ-দুঃখও অন্যের ভিতর সঞ্চারিত করিতে পারেন। এইরূপে বিশ্ববাসী প্রাণীবৃন্দের সুখদুঃখের সহিত নিত্যযুক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের সুখদুঃখের আদানপ্রদান হইয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারত ও ভাগবতোক্ত ধ্রুবের তপস্যা, দুর্ব্বাসা-পারণ, শুকদেবের সিদ্ধিলাভ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভক্ত-চূড়ামণি ধ্রুব যখন আপনার প্রাণ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার নিরোধপূর্ব্বক আপনার সহিত অভেদ ভাবে বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানে চিত্ত সমাহিত করিলেন, তখন চরাচর প্রাণীশরীরে প্রাণরোধ উপস্থিত হইয়াছিল।

ভগবান্ দেবকীনন্দন অরণ্যচারিণী দ্রুপদনন্দিনীপ্রদত্ত কণামাত্র শাকান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক উদ্গার তুলিলেন। তাঁহার সেই ভোজনজনিত তৃপ্তি সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষির ভিতরে সংক্রামিত হইয়া

তাঁহাদিগকে তৃপ্তিপ্রদান করিয়াছিল। যোগীবর শুকদেব যখন সিদ্ধিলাভ করেন, তখন তিনি পিতার সান্ত্বনার জন্য বিশ্ববাসী প্রাণীপুঞ্জের আত্মার সহিত তাঁহার নিজের আত্মাকে আধ্যাত্মিকযোগে যুক্ত করিয়াছিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস পুত্রশোকে কাতর হইয়া যখন শুকদেবকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত পদার্থ তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিয়াছিল।

গোস্বামিমহাশয়ের মধ্যেও এই ভাব অতি পরিস্ফুটভাবে পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহার আশ্রমে কেহ কাহাকে প্রহার করিলে তাঁহার শরীরে ব্যথা লাগিত, এ কথা তিনি অনেক বার বলিয়াছেন। এমন কি আশ্রমের প্রাচীরগাত্রে প্রেক বিদ্ধ করিলেও তিনি বলিতেন, "তোমরা আর প্রাচীরে প্রেক পুঁতিও না। প্রাচীরে প্রেক বিদ্ধ করিলে

---

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং<br>
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব ॥<br>
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু<br>
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥

ভাগবত, ১, ২, ২।

অনন্তসঙ্গী সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী পুত্র (শুকদেব) সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে মহর্ষি দ্বৈপায়ন তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া 'হে পুত্র!' বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার আহ্বান শ্রবণ করিয়া শুকদেবের সহিত তন্ময়তাপ্রাপ্ত বৃক্ষসকল তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই সর্ব্বভূতহৃদয় মুনি শুকদেবকে নমস্কার করি।

"মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের উর্দ্ধপ্রয়াণবার্ত্তা সবিশেষ অবগত হইয়া 'হা বৎস! হা বৎস!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতঃ ত্রিলোক অনুনাদিত করিলেন। তখন সর্ব্বভাবপ্রাপ্ত ধর্ম্মাত্মা শুকদেব সর্ব্বগামী হওয়ায় পার্ব্বত্যাদি সকল পদার্থ হইতে 'ভো' এই একাক্ষর শব্দ সমুচ্চারিত হইল। শান্তিপর্ব্ব, ৩৩৪ অ।

আমার শরীরে ব্যথা লাগে।" অপরে শীতে কষ্ট পাইলে তিনি শীতার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় ক্লেশ অনুভব করিতেন। ঢাকা, কাকিনা, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে এরূপ ব্যাপার অনেকবার দেখা গিয়াছে। ঐ সকল স্থানে শীতবস্ত্রের অভাবে কয়েকজন লোককে অনাবৃত দেহে কাঁপিতে দেখিয়া তাঁহার গায়ে যথেষ্ট শীতবস্ত্র থাকাসত্ত্বেও তাঁহার শরীরে কম্প উপস্থিত হইয়াছিল। পরে শীতবস্ত্র দ্বারা তাহাদের গাত্র আবৃত করিয়া দিলে তাঁহার দেহের কম্পের নিবৃত্তি হয়।

তিনি যখন হেরিসন রোডে ছিলেন, তখন স্বর্গীয় মোহিনীমোহন রায় প্রভৃতি কয়েক জন রাত্রিতে তাঁহার সেবা করিতেন। কেহ পা টিপিয়া দিতেন, কেহ জটা পরিষ্কার করিয়া দিতেন ইত্যাদি। এক দিন মোহিনীবাবু জটায় হাত দিতে গেলে গোস্বামিপাদ বলিলেন, "আজ আমার মাথায় হাত দিও না। মাথায় বড় ব্যথা হইয়াছে।" মোহিনী-বাবু ব্যথার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "দেবপ্রসাদের পিতা আজ পাদুকাদ্বারা তাহার মাথায় ভয়ানক আঘাত করিয়াছে। সেই আঘাতে আমার মাথায় ঘা হইয়াছে।" এ কথা শুনিয়া মোহিনীবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছে?" প্রভুপাদ বলিলেন, "কানপুরে"। প্রভুপাদের কথা শুনিয়া মোহিনীবাবু অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, "আশ্চর্য্য হইও না, এইরূপই হয়। তোমাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট আমাকে আসিয়া লাগে। তোমাদিগকে কেহ আঘাত করিলে, আমার দেহ আহত হয়। দেখ শিষ্যের জন্য গুরুকে কত সহিতে হয়। ইহা বুঝিতে পারিবে না। অবস্থা না হইলে বুঝা যায় না।"

(১) দেবপ্রসাদ গোস্বামিপাদের জনৈক শিষ্য, ইনি পুরীতে সমুদ্রে ডুবিয়া মারা যান। পরে ইহার বিবরণ বিবৃত হইবে।

শ্রীমৎতুলসীদাসকৃত রামায়ণে আছে যে, রাবণকর্তৃক সীতাহরণের পর রামচন্দ্র যখন সীতার শোকে কাতর হইয়া বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সতী ও শিব শূন্যপথে সেইস্থান দিয়া কৈলাসে যাইতেছিলেন। ভগবান্ ভব আপনার ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া 'ব্রহ্মণে পরমাত্মনে নমঃ' বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ইহাতে দাক্ষায়ণীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি মহাদেবকে বলিলেন, "তুমি কাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রণাম করিলে?" শংকর বলিলেন, "আমার ইষ্টদেবতাকে।" সতী বলিলেন, "কে তোমার ইষ্ট দেবতা?" শিব বলিলেন, "অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র।" সতী বলিলেন, "ইনিই ব্রহ্ম? ইনি ত পত্নীর শোকে কাতর হইয়া চারিদিকে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইনি ব্রহ্ম হইলে কি পত্নীহরণ বৃত্তান্ত জানিতে পারিতেন না? ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, ইনি ত দেখিতেছি অজ্ঞ মানব।" সতীর কথা শুনিয়া মহাদেব অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ইনি পূর্ণব্রহ্ম কি না, যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি ইঁহার কাছে যাও। ইনিই তোমার সন্দেহ ভাঙ্গিয়া দিবেন।" মহাদেবের কথায় সতী সীতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাম তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "মা, তুমি একাকিনী এ গভীর অরণ্যে আসিয়াছ কেন? আশুতোষ কোথায়?" রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া সতী অতিশয় লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ রামচন্দ্র সতীর অবস্থা জানিয়া তাঁহার নিকট নিজের বিশ্বরূপ প্রকাশ করিলেন। তখন সতী সমস্তই রামসীতাময় দেখিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র এইরূপে সতীর সন্দেহভঞ্জন করিলে দাক্ষায়ণী পতির নিকটে চলিয়া গেলেন। এই স্থানে আমরা রামচন্দ্রের ভিতরে দুইটি ভাব

দেখিতে পাই। একটি লৌকিক, আর একটি অলৌকিক। সীতার শোকে কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করা, তাঁহার লৌকিক ভাব। আর, সতীর, অন্তর জানিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করা তাঁহার অলৌকিক ভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভিতরেও এইরূপ দ্বিবিধ ভাব দেখা যাইত। তিনি কখনও বিষ্ণুর আসনে বসিয়া 'মুই সেই,' বলিতেন এবং রাম কৃষ্ণ নৃসিংহ বরাহ প্রভৃতি রূপ ভক্তগণকে দেখাইতেন; আবার কখনও আপনাকে হীন মনে করিয়া ভক্তগণের পরিধেয় বস্ত্র বহন করিতেন। এইরূপে কখনও অলৌকিক কখনও লৌকিক ভাব তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত।

গোস্বামিপাদ বিজয়কৃষ্ণের মধ্যেও এইরূপ দুই ভাব ছিল। তিনি বলিতেন, "আমি দুই অবস্থায় থাকি। কোন সময়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসে, জগতের সমস্ত তত্ত্ব আমার জ্ঞানগোচর হয়। আবার কোন সময়ে আমার আসনের নীচে কি আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না।" যখন তিনি ব্রহ্মভাবে থাকিতেন, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী, আবার যখন নরভাবে থাকিতেন, তখন তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায়। অবতারগণের সকলের মধ্যেই এই দ্বিভাব দেখা যায়।

নারীজাতিকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। সমস্ত রমণীর মধ্যে জগদম্বার প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাদিগকে তিনি মাতৃভাবে দর্শন করিতেন। স্বীয় পত্নীর মুখে জগন্মাতার প্রকাশ দেখিয়া তিনি তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতেন। অনেক সময় তিনি বলিতেন, "যে জাতি স্ত্রীজাতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, সে জাতির প্রতি লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসন্ন হন। সে জাতির উপরে হরপার্ব্বতীর আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়। তাহারা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া মহৎ হয়। নারীজাতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা করাতেই ইংরাজ জাতির এত উন্নতি হইয়াছে। মানুষের মন

উন্নত ও মহৎ না হইলে মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে পারে না।' যাহারা নারীজাতিকে অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহারা 'অতিশয়' নীচ। 'কোন কালে তাহারা উন্নত ও মহৎ হইতে পারে না।"

বাল্মীকি রামায়ণ অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সীতা-হরণের পর ভগবান্ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের সহিত পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন বানররাজ সুগ্রীব তাঁহাদিগের সম্মুখে সীতাপরিত্যক্ত বস্ত্রালঙ্কারগুলি উপস্থিত করিলেন। রামচন্দ্র প্রিয়তমার বসনভূষণ দর্শন করিয়া বাষ্পপূর্ণ নেত্রে তাঁহার প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দেখাইলেন। লক্ষ্মণ সেই সকল অলঙ্কার দেখিয়া অগ্রজকে বলিলেন, "নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে। নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ॥"—"আমি আর্য্যার কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনি না; প্রতিদিন তাঁহার চরণবন্দনা করিতাম, এই জন্য কেবল এই নূপুরদ্বয় চিনিতে পারিতেছি।" প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর একত্র বাস করিয়াও সংযমিশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ জানকীর চরণদ্বয় ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গ দর্শন করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্যের এইরূপ উচ্চ আদর্শ কুত্রাপি পরি-দৃষ্ট হয় কি? সমস্ত দেশের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ কর, কোথাও সংযমের এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে না।

আমরা গোস্বামিপাদের জীবনে এই আদর্শ দেখিতে পাই। তিনিও আত্মসংযমের এই প্রকার অলৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনিও সমস্ত জীবনে পত্নীব্যতীত অন্য রমণীর মুখদর্শন করেন নাই। একবার শান্তিপুরে তাঁহার এক জন ভ্রাতৃজায়া তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। ইহাতে উক্ত মহিলা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কি, তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না? আশ্চর্য্য কথা!" এই বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান

করিলেন। তখন গোস্বামিপাদ শান্তস্বরে হাসিয়া বলিলেন, "আপনি দুঃখিত হইবেন না। আমি কখনও আপনার মুখ দেখি নাই। আমি কখনও কোন রমণীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। এই জন্যই আপনাকে চিনিতে পারি নাই।" তাঁহার কথা শুনিয়া উক্ত রমণী ও উপস্থিত সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ইহার বহুদিন পরে আর একবার গোস্বামিমহাশয়ের একজন শিষ্যা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। ঐ রমণীকেও তিনি চিনিতে না পারিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী পত্নীকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীর বাক্য শুনিয়া জননী যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, "কি, তুমি সতীশের মাকেও কি চেন না?" তদুত্তরে গোস্বামিপাদ বলিলেন, "কেন, তুমি কি জান না যে আমি কখনও কোন রমণীর মুখের দিকে চাই না।" এই রমণী গেণ্ডারিয়াবাসী পরলোকগত সতীশচন্দ্র গুহের জননী। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের অসাধারণ তপস্যার প্রভাব শরীরে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহার কলেবরকে অপ্রাকৃত দিব্য সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার দেহ হইতে নিয়ত এক অপার্থিব পবিত্র লাবণ্য বিচ্ছুরিত হইয়া সকলকে ভক্তিরসে আপ্লুত করিত। তাঁহার দেহ দেবদেহে পরিণত হইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, এমন বহু লোক তাঁহার প্রতিকৃতি (ফটো) দেখিয়া বলিয়াছেন, ইহা মহাদেবের মূর্ত্তি। পরে যখন জানিতে পারিয়াছেন, ইহা ভগবান্ শংকরের মূর্ত্তি নহে, তখন তাঁহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিয়াছেন, মনুষ্যের মূর্ত্তি এরূপ হইতে পারে, ইহা আমাদের জানা ছিল না। আমরা কোথাও মানুষে এমন মূর্ত্তি দেখি নাই। ইনি মানবদেহধারী হইলেও মনুষ্য নহেন, ইনি দেবতা; সাক্ষাৎ ভগবান্।

গোস্বামিমহাশয় বলিতেন, মানবজীবনের পাঁচটি অবস্থা। নীতি, ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও লীলা, এই পঞ্চবিধ অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষকে যাইতে হয়। প্রথমে তাঁহাকে নীতির শাসন মানিয়া চলিতে হয়। নীতি মানিয়া চলিতে চলিতে তাঁহার ধর্ম্মে মতি হয়; ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে। এই সময়ে তিনি যাগযজ্ঞ দেবপূজা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। অতঃপর তাঁহার মনে মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। এই অবস্থায় তিনি শাস্ত্র-শাসনের অনুগত হইয়া তদুক্ত উপাসনাপ্রণালী গ্রহণ করেন এবং গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইয়া সাধনভজনে প্রবৃত্ত হন। ভজন করিতে করিতে তাঁহার সর্ব্ববিধ অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়। অতঃপর তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এই অবস্থায় সাধকের সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্য তাঁহার নিকট বাস্তব সত্যে পরিণত হয়। তখন তিনি ব্রহ্মসত্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া অনুপম ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিয়া ধন্য হন। অতঃপর যোগ; এই অবস্থায় তিনি স্বীয় আত্মার ভিতরে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। পরিশেষে ভগবৎলীলা দর্শন। এই অবস্থায় ভগবান্ ভক্তের নিকটে তাঁহার স্বকীয়রূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত অনন্তভাবে লীলা করেন, খেলা করেন। ভক্ত নিয়ত সেই লীলাসাগরে নিমগ্ন হইয়া বিমল প্রেমানন্দ সম্ভোগপূর্ব্বক পূর্ণকাম হইয়া যান। তখন তাঁহার প্রাপ্তির আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এ সম্বন্ধে গোস্বামিমহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন, "ঋষিগণ বলিয়াছেন, প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বভূতে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব। দ্বিতীয় অবস্থা যোগ। আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ লাভ। তৃতীয় ভগবৎসম্বন্ধ; পূজা অর্চ্চনা। এই অবস্থায় তাঁহার রূপ দর্শন হয়। সেইরূপ সৎ, চিৎ,

আনন্দ। সেইরূপ পাঞ্চভৌতিক নহে। রূপ বলা হয় এ জন্য যে অন্য ভাষা নাই।”

“সাধনের সময়ে তিনটী ভাব প্রকাশ হয়। প্রথম ব্রহ্মভাব, সাধক দেখেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময়। ইহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। দ্বিতীয় অবস্থা যোগ। ইহা হঠযোগ নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ। সাধক দেখেন তাঁহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির অধীন। সেই শক্তি নড়িতেছে চড়িতেছে। তাহার স্পর্শ ঘ্রাণ অনুভূত হইতেছে। কিন্তু এ স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ অব্যক্ত। চিনি ঘি খাইয়া কে ব্যক্তরূপে বর্ণনা করিতে পারে। গর্ভবতী নারী যেমন গর্ভস্থ সন্তান অনুভব করেন, সেইরূপ। তৃতীয়, ভগবদ্‌ভাব অর্থাৎ লীলা। তখন সাধকের নিকট অনন্ত রূপেদেখা দেন। কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ এ সমস্ত রূপ, ইহা ভিন্ন অসংখ্য রূপ। এই জগতে মনুষ্য যেমন ব্রহ্মের লীলার পরিচয় পান, সেইরূপ অন্যান্য জগতে যত-ভাবে যতরূপে ব্রহ্ম লীলা করেন, সমস্ত সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ, কলিযুগে শাক্যসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ সমস্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধক এইরূপ ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ এই ত্রিবিধ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মরূপ অনন্ত সাগরে ঝম্পপ্রদান করেন। তখন একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দসাগরে আপনাকে ভুলিয়া, তাহাতে কখনও সাঁতার দেন, কখনও নিমগ্ন হন।”

উপনিষদেও এই ত্রিতত্ত্বের কথা আছে। ব্রহ্ম সৃষ্টির অন্তর্য্যামিরূপে, আত্মার অন্তর্য্যামিরূপে এবং স্বয়ংরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যিনি সৃষ্টির অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান, তিনি বিরাটব্রহ্ম নামে কথিত। গীতাতে ইহাঁকে বিশ্বরূপ বলা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ

দেখাইয়াছিলেন। আত্মার অন্তর্য্যামী যিনি তিনিই পরমাত্মা। উপনিষদ্ যাঁহাকে স্বয়ংরূপ বলিয়াছেন, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলে।

"ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধ্বানন্দীভবতি নান্যথা॥" (উপনিষৎ)

ব্রহ্মবিৎ পরমপদ লাভ করেন। আত্মবিৎ শোক হইতে মুক্ত হন। রসস্বরূপ ব্রহ্মের রস লাভ করিয়া আনন্দিত হন। অন্য উপায়ে আনন্দ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও ভগবত্তত্ত্ব এই তিন প্রকার সাধন ইহার অভ্যন্তরে।

এই ত্রিতত্ত্বের কথাই ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বলিয়াছেন:—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ভাগবত ১।২।১১।

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন।

গোস্বামিপাদ তাঁহার নিজের জীবনে এই পঞ্চভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার সংকীর্ত্তনে নৃত্য এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! 'গোস্বামিগ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের নৃত্যবিবরণ যাহা পাঠ করা যায়, তাঁহার নৃত্য ঠিক্ তদনুরূপ।' তিনি যখন ভগবৎপ্রেমে বিভোর ও মহাভাবে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন সেই স্থান আর মর্ত্ত্যভূমি বলিয়া বোধ হইত না। তখন সে স্থান দেবভূমিতে পরিণত হইত। তথায় ভক্তি ও প্রেমের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইত। দেবতা ও ঋষিগণ সেই স্থলে আগমন করিয়া সেই নৃত্যে যোগদান করিতেন। নৃত্যসময়ে তাঁহার ভিতরে বিবিধ অপূর্ব্বভাবের প্রকাশ দেখা যাইত। কখনও ভাবে আত্মহারা হইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, "আমি বৃন্দাবনের চৌকিদার"; বৃন্দাবনের

চৌকিদারগণ যেমন 'রাধে রাধে' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকে, তিনিও সেইরূপ করিতেন। কখনও রাধার ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তনস্থলে বলরামকে * দেখিয়া বহির্ব্বাসে অবগুণ্ঠিত হইয়া নৃত্য করিতেন। কখনও ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তিভাবে জটাদ্বারা তাঁহাকে আরতি করিতেন। তাঁহার সেই সকল ভাব দর্শন করিলে পাষাণও গলিয়া যাইত। ঘোর পাষণ্ডের মনেও ভক্তির উদয় হইত। আর সময়ে সময়ে তাঁহার দেহের যে কি অপূর্ব্ব ভাব ও শোভা হইত, তাহা বর্ণনাতীত। ভক্তিরসে আপ্লুত ব্রাহ্মীশ্রীতে উদ্ভাসিত অপ্রাকৃত দিব্যলাবণ্যে মণ্ডিত তাঁহার সেই মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিলে চিত্ত ভক্তিরসে গলিয়া যাইত। মনে হইত স্বর্গ আর কোথায়? এই ত অপ্রাকৃত ত্রিদিব ধাম।

কেহ ধর্ম্মের বা ভাবের অমর্য্যাদা করিলে তিনি তাহা একেবারেই সহিতে পারিতেন না। কেহ কপট ভাব দেখাইয়া কীর্ত্তনে নাচিলে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইতেন। সেই সকল ভণ্ডকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তিনি ধর্ম্ম ও ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। ঢাকাতে ও কলিকাতায় সংকীর্ত্তনে তিনি ভাবে আত্মহারা হইয়া যখন নৃত্য করিতেন, সেই সময়ে অনেকে কপটভাব দেখাইয়া তাঁহার সঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিত। ইহাতে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া "কি ভাবের ঘরে চুরী" এই বলিয়া ঘুঁসি মারিয়া সেই সকল ভণ্ডকে কীর্ত্তন হইতে বাহির করিয়া দিতেন।

তাঁহার আসনের উপরে এবং দেহে ভগবানের নাম, নানা প্রকার দেবমন্দির ও বিবিধ দেব দেবীর ছাপ অঙ্কিত হইত। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

* কীর্ত্তনস্থানে ইহাঁদিগের আগমন ও নৃত্যে যোগদানের কথা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

প্রেমভক্তিপ্রদাতারং আনন্দানন্দবর্দ্ধনম্।
স্বর্ণময়ীসুতং বন্দে যোগমায়ামনোহরম্॥
বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্দ্ধিনীম্।
সদানন্দময়ীং সাধ্বীং যোগমায়াং নমাম্যহম্॥

# প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

## পূর্ব্বভাগ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

## আগমনের প্রয়োজন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ॥ ভাঃ ৯,২৪,২৬।*

মানবজাতির অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সময়ে সময়ে জনসমাজের ধর্ম্মভাব অতিশয় ম্লান হইয়া যায় এবং অধর্ম্মের প্রাবল্য হইয়া থাকে। সত্য, সদাচার, আর্জ্জব, সংযম আস্তিক্য প্রভৃতি ধর্ম্মভাবগুলি নিতান্ত হীনপ্রভ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অসত্য, ভ্রষ্টাচার, কপটতা, ইন্দ্রিয়পরতা, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা, নাস্তিকতা প্রভৃতি অতিশয় প্রবল হয়। জনসমাজের যখন এই প্রকার শোচ-

---

* যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষয় ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, সেই সময়ে ভগবান্ হরি আপনাকে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ অবতীর্ণ হন শ্রীভগবান্ গীতাতেও এই কথাই বলিয়াছেন।

নীয় দুরবস্থা চরম সীমায় উপনীত হয়, সেই সময়ে ভগবান্ স্বয়ং অথবা তাঁহার আবেশ কোন মহাপুরুষ পৃথিবীতে আগমন করিয়া অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। ভগবান্ রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মহাত্মা যিশু, প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, গুরু নানক প্রভৃতি সকলেই জনসমাজের ঈদৃশ সংকটাপন্ন সময়ে পৃথিবীতে আগমন করিয়া ধর্ম্মপিপাসু নরনারীদিগকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যের পথিকদিগকে পথভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের গন্তব্য স্থানে লইয়া গিয়াছেন। সেই সকল অবতার ও মহাপুরুষদের আগমন সময়ের ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সামাজিক অবস্থা অবগত হইতে না পারিলে তাহাদের ধরাধামে আবির্ভাবের আবশ্যকতা সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না। অবতার ও মহাজনগণ পৃথিবীতে কেন আসেন, তাহার যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সেই সময়কার সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তদানীন্তন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে তৎকালীন সমাজের নীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থা এরূপ হীন হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার পরিবর্ত্তন না হইলে সমাজ কিছুতেই রক্ষা পায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে যখন সমাজের এইরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, তখনই ভগবান্ জনসমাজের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হন, অথবা মহাজনদিগকে প্রেরণ করেন।

যদুকুলপ্রদীপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার প্রাক্কালে ভারতবর্ষে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়া ইহাকে ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিল। ধর্ম্মদ্বেষী সজ্জনপীড়ক অসুরপ্রকৃতি নৃপতিগণ ভারতভূমিকে নিষ্পেষিত করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের দারুণ অত্যাচারে ধর্ম্মের বিমলজ্যোতিঃ দিন দিন হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছিল।

সাধুসজ্জনগণ তাহাদিগের দ্বারা নিয়ত উপদ্রুত হইতেছিলেন। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি মহীপালবৃন্দের নিষ্ঠুর অত্যাচার কাহিনী ভাগবত, হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

এতদ্ব্যতীত সে সময়ে ভারতবর্ষে কর্ম্মকাণ্ডের অত্যন্ত প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। ভারতবাসীগণ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত হইয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতিতে অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ত্রিগুণাত্মক সকাম কর্ম্মকেই সার জ্ঞান করিয়া তদনুষ্ঠানেই অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা সুখসম্ভোগ ব্যতীত যে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, একথা তাঁহারা একরূপ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কর্ম্মকাণ্ডরূপ সোপান অবলম্বনপূর্ব্বক পরিণামে উপনিষদোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে হইবে, অচ্যুতপদ লাভ করিয়া জন্মমরণের হাত এড়াইতে হইবে, ইহা তাঁহারা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ত্রিতাপহারী ব্রহ্মজ্ঞান কেবল পূজ্যপাদ ঋষিদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানবর্গণ তাহার বড় একটা সন্ধান রাখিতেন না। গৃহস্থদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের তাদৃশ সমাদর ছিল না। ভারতভূমির এই প্রকার সংকট সময়ে কংসের কারাগারে দেবকীগর্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্ভব হইল। তিনি ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকার আপদ হইতে মুক্ত করিলেন। একদিকে অসুরপ্রকৃতি দুর্ব্বৃত্ত ভূপতিবৃন্দের নিপাতসাধন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার সমর্পণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অন্যদিকে, প্রিয়সখা ভক্তশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়কে উপলক্ষ করিয়া জগৎ সমক্ষে বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিলেন "ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ, বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"—হে অর্জ্জুন!

বেদসকল ত্রিগুণাত্মক ; কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ত্রিগুণের অতীত হইতে পারা যায় না, ত্রিতাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পরাশান্তি লাভ করিতে পারা যায় না। অতএব তুমি উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিয়া গুণাতীত হও।

বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোরতর অবনতি ও দুর্দ্দশার সময়েই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সে সময়কার বিবরণ পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে নাস্তিকতা ও দুর্নীতির স্রোতে বৌদ্ধসমাজ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেবের অমূল্য উপদেশাবলীর প্রতি অবহেলাপ্রদর্শন করিয়া বৌদ্ধগণ স্বেচ্ছাচারের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। দুর্নীতি ও নাস্তিকতার তীক্ষ্ণবিষে বৌদ্ধসমাজের জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপে বৌদ্ধগণ যখন দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, সেই সময়েই শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্কর অবতীর্ণ হইয়া বেদান্তধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের দুরবস্থা দূর করিলেন।

তান্ত্রিকধর্ম্মের অপব্যবহারে বঙ্গভূমি যখন দুর্গতির অতলজলে নিমজ্জিত, সেই সময়েই গোরাচাঁদের প্রকাশ হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণ শিববাক্যের দোহাই দিয়া কেবল পঞ্চ মকারের সেবা করিতেন। ভগবান্ শূলপাণি জীবের মঙ্গলের জন্য, আগমশাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। প্রবৃত্তিমার্গের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে নিবৃত্তিতে উপনীত হইতে হইবে, তন্ত্রের ইহাই অভিপ্রায় ; প্রথমে গুরুর উপদেশ ও আদেশমত মকার ব্যবহার করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবৃত্তিপন্থার পথিক হইতে হইবে, তান্ত্রিকগণ যখন জগৎগুরু মহাদেবের এই মঙ্গলময় উপদেশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া জীবহিংসা মদ্যপান ও ব্যভিচারের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন।

এবং মায়াবাদের প্রচণ্ড উত্তাপে দেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়েই শচীগর্ভসিন্ধুমাঝে গোরাচাঁদের উদয় হইল। তিনি ভক্তির বিমল ও সুস্নিগ্ধ ধারায় সকলের উত্তপ্ত প্রাণ সুশীতল করিলেন। দেশ ধন্য হইল।

ভারত ব্যতীত অন্যত্রও আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। য়িহুদি-জাতি যখন কতকগুলি জীবনহীন অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, যাজকগণ যখন লোক ভুলাইবার জন্য প্রকাশ্যস্থানে আড়ম্বরপূর্ণ দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া ধার্ম্মিকতার পরিচয় প্রদান করিতেন, সেই সময়ে, য়িহুদীজাতির সেই ঘোরতর অধঃপতনের সময়েই মেরী-নন্দন মহাত্মা ঈশার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি য়িহুদীজাতির মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃতপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্মপিপাসু নরনারীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আরবদেশ যখন কাল্পনিক দেবদেবীর পূজায় নিরত, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের জ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নর-হত্যা, সুরাপান, ব্যভিচারের স্রোতে দেশ যখন নিমজ্জমান, সেই সময়েই পূজ্যপাদ পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ মরুদেশ আলোকিত করিয়া প্রকটিত হইলেন এবং একেশ্বরবাদের বিমল আলোকে সমগ্রদেশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন। পরে সেই জ্যোতিঃ নানাদেশে বিকীর্ণ হইয়া তত্তৎ স্থানের ভ্রম ও কুসংস্কারের নিবিড় কুজ্ঝটিকা বিনষ্ট করিয়াছে।

গোস্বামিমহাশয় যখন জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা জানিতে না পারিলে তাঁহার আগমনের সার্থকতা ও আবশ্যকতা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না। অতএব সংক্ষেপে তদানীন্তন সমাজের অবস্থা বিবৃত করিলাম।

মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে দেশের অতিশয় নৈতিক দুর্গতি ঘটিয়াছিল। সে সময়কার কলিকাতা-বাসী বিষয়ী লোকদিগের নৈতিক জীবন তত উন্নত ছিল না। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচগ্রহণ, জাল প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করা সে সময়ে কেহই দোষাবহ মনে করিতেন না। অনেকে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এই প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধনসঞ্চয় করা কিছুমাত্র লজ্জাজনক ছিল না। এই উপায়ে যাঁহারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, সমাজে তাঁহারা বুদ্ধিমান ও কৃতী বলিয়া প্রশংসিত হইতেন। সকলেই তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার সুখ্যাতি করিত। ধনবান্‌গণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, দোল দুর্গোৎসবাদি ব্যাপারে, পুত্র-কন্যার বিবাহে, তাঁহাদিগের অসদুপার্জ্জিত ধন প্রভূত পরিমাণে ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। যে ধনী পূজার সময়ে প্রতিমা সাজাইতে এবং সাহেবদিগকে সমারোহপূর্ব্বক ভোজ দিতে যত অধিক অর্থ ব্যয় করিতেন, সমাজে তাঁহার তত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইত। সে সময়কার লোকেরা সুরাপান করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে গাঁজার প্রচলন যথেষ্ট ছিল। তবে সে সময়কার ধনীগণ বদান্য ছিলেন। এক্ষণকার পত্নী ও কাঞ্চন-সর্ব্বস্ব বাবুগণ অপেক্ষা ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহারা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্র ও সদাচারের অনুগামী হইয়া চলিতেন। এখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বাবুরা যেরূপ ধর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীন, আহারসম্বন্ধে যেমন সর্ব্বভুক্, তাঁহারা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহারা আধুনিক লোকদিগের ন্যায় আত্মসুখী ও আত্মম্ভরী ছিলেন না। সৎকার্য্যে তাঁহাদের অনুরাগ ছিল। লোকের উপকারের জন্য তাঁহারা জলাশয়খনন, রাজপথনির্ম্মাণ প্রভৃতি পূর্ত্তকার্য্য করিতেন।

সাধুসন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগকে তাঁহারা যথেষ্ট দান করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। তাঁহারা অতিথিপরায়ণ ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহাদের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল।

মফঃস্বলবাসীদিগের নৈতিক অবস্থা কলিকাতাবাসীদিগেরই অনুরূপ ছিল। তাঁহারাও উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করা দূষ্যজ্ঞান করিতেন না। তখন অতি অল্প বেতনের কর্ম্ম করিয়া লোকে অসদুপায়ে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিত। কোন লোকের চাকরী হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত যে উপরি পাওনা কিরূপ আছে। সে সময়ে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা ছিল না। যাঁহারা বিদেশে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এক একটি অবিদ্যাপোষণ করিতেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ করিবার জন্য গণিকালয়ে গমন করিতেন। যাঁহারা বিদেশে কর্ম্ম করিতেন না, বাড়িতেই বাস করিতেন, জীবনযাত্রার সুলভতাপ্রযুক্ত তাঁহারা কবি, পাঁচালি, কথকতা প্রভৃতি শ্রবণ এবং ক্রীড়াকৌতুক ও দলাদলির ঘোঁট করিয়া কালযাপন করিতেন। কিন্তু স্বধর্ম্মে সকলেরই নিষ্ঠা ছিল।

বঙ্গদেশের আচারব্যবহার, রীতিনীতি ও শিক্ষার যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে দেশের প্রধান প্রধান লোক ও দুই জন সদাশয় ইংরাজের প্রযত্নে মহাবিদ্যালয় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিরোজিও নামে কলেজের এক জন পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী শিক্ষক ছাত্রগণকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বাৎসল্যে ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সঙ্গ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি সুকবি ও প্রিয়ংবদ ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনা ও কথাবার্ত্তার এমনই আকর্ষণ ছিল যে

তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতার অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া এবং গুরুজনদের নিষেধবাক্য না মানিয়া তাঁহার বাড়ীতে আগমন করিতেন। যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রচলিত কোন ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষা ও সঙ্গের প্রভাবে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে একেবারে বিশ্বাস ও আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন। ডিরোজিও সাহেবের সংসর্গে পড়িয়া তাঁহারা সুরাপান ও হিন্দুর অখাদ্যভোজনে অভ্যস্ত হইলেন। পাশ্চাত্যশিক্ষা এবং ডিরোজিও সাহেবের ধর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষা ও সঙ্গগুণে তাঁহারা একেবারে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। হিন্দুধর্ম্মে, দেশীয় রীতিনীতি আচারব্যবহারে তাঁহারা অতিশয় অনাস্থা দেখাইতে লাগিলেন। দেশের যাহা কিছু সে সমস্তই মন্দ এবং পাশ্চাত্য যাহা কিছু সে সমস্তই ভাল ইহাই তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল। উপনয়নের সময় তাঁহারা পৈতাগ্রহণ করিতে চাহিতেন না। উপনয়নের পর সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন না। প্রকাশ্যভাবে পাঁওরুটি ও হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস ভোজন করিতেন। ডিরোজিও সাহেবের ধর্ম্মহীন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মসম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িলেন। উহার মধ্যে যাঁহাদিগের মন স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ ছিল, তাঁহারা কুসংস্কারপূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুসভ্য জাতির ধর্ম্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি কৃতবিদ্য যুবক ডফ সাহেবের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

মেকলে সাহেবের লেখাদ্বারাও যুবকগণের হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবার যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন

যে সমগ্র সংস্কৃত ও আরবীশাস্ত্র ও সাহিত্য এক আলমারি পাশ্চাত্য গ্রন্থের সমকক্ষ নহে। "A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia." যুবকগণও মেকলে সাহেবের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিলেন যে হিন্দুশাস্ত্র অতি অসার; জানিবার বা শিখিবার উহাতে কিছুই নাই।

এই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর-গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তন্ত্রে বীরাচারে সাধন করিবার সময়ে মকার ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। রাজাও মকার ব্যবহার করিতেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তন্ত্রের ব্যবস্থামত 'কারণ' সেবন করিতেন। তাঁহার কাছে কলিকাতার অনেক পদস্থ লোক আগমন করিতেন। রাজার দেখাদেখি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সুরাপান করিতে আরম্ভ করেন[১]।

রাজা যখন কলিকাতায় আগমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন, তখন এদেশের লোক কেবল কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই ব্যস্ত ছিল। গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের সংবাদ তাঁহাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। দেশবাসীগণ ঐহিক সুখ ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝিতেন না। তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহা কিছু

(১) ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত দ্রষ্টব্য।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ একদিন পুরীতে বলিলেন, রাজা রামমোহন রায় নিত্য মহাজনদের শ্রেণীভুক্ত। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজস্বামী, গুরু নানক প্রভৃতি যেমন প্রতিযুগে পৃথিবীতে আগমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন, রাজাও প্রতি কলিযুগে আসিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করেন। তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে সত্যলোকে গমন করেন।

করিতেন সমস্তই সকাম ; সকলই ঐহিক বা পারত্রিক সুখের জন্য। সকাম ভিন্ন তাঁহারা অন্য কিছু জানিতেন না। সকাম উপাসনারূপ সোপান দ্বারা যে নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা আদৌ অবগত ছিলেন না। পণ্ডিতগণও ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন না। ঋষিদিগের ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় এইরূপ সকাম উপাসনা-প্লাবিত দেশে ব্রহ্মজ্ঞানের মঙ্গলময় বার্ত্তা প্রচার করিলেন। তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞান বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম ছিল না। তাঁহার ধর্ম্মের নাম তিনি "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম" রাখিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার ব্রাহ্মধর্ম্ম নামকরণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে তিনি এক খানি পুস্তকও সংকলন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এবং মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বর্ত্তমান শাস্ত্র ও ও সদাচারমুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহাদ্বারা দেশের নৈতিক উন্নতি প্রভূত পরিমাণে সাধিত হইল। যে দুর্নীতির বিষাক্ত বায়ুতে দেশ জর জর হইতেছিল, ইহাঁদের প্রাণগত চেষ্টায় তাহা বহু পরিমাণে অপনীত হইল। দেশবাসীগণ নীতিবিষয়ে ইহাঁদের দ্বারা যথেষ্ট উপকারলাভ করিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে বিশেষ উপকৃত হইলেন না। ব্রাহ্মনেতাদ্বয় যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহা সমীচীন না হওয়াতে তাঁহারা সেই প্রণালীতে সাধন করিয়া নিজেরাও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না এবং যাঁহারা তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাঁহাদের আশাও সফল হইল না। যে পন্থা, যে প্রণালী অবলম্বন করিলে ব্রহ্মলাভ ঘটে, ব্রাহ্ম-

নেতৃদ্বয় সে পথ না ধরিয়া ইহসর্ব্বস্ব বহির্ম্মুখ পাশ্চাত্যপ্রণালী অবলম্বন করিলেন, তাহাও সম্পূর্ণভাবে নহে; তাঁহারা তাহার অনেক অংশ বাদ দিয়া প্রণালীটিকে সহজ করিয়া লইলেন। কাজেই ভগবৎপ্রাপ্তিবিষয়ে চিরদিনই তাঁহাদের আশা অপূর্ণ রহিল। আমাদের দেশের পূজ্যপাদ ঋষিগণ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া কঠোর সাধন করিতেন, তবে ত তাঁহাদের ধর্ম্মলাভ, ভগবৎপ্রাপ্তি হইত। নানক, কবীর প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারকগণও গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া কঠোরসাধন করিবার পর তবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শাস্ত্রের অনুগত হইয়া না চলিলে, সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষপ্রাপ্ত না হইলে, কিছুতেই ব্রহ্মলাভ হয় না। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ব্রহ্মপ্রাপ্তির অব্যর্থ নিয়ম। এ নিয়ম না মানিলে কিছুতেই ভগবানকে পাওয়া যায় না। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন সঃ সিদ্ধিং অবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি না মানিয়া যথেচ্ছভাবে চলে, তাহার চিত্তশুদ্ধি, ঐহিক ও পারত্রিক সুখ এবং মোক্ষলাভ

শাস্ত্রবহির্ভূত সাধনপ্রণালী গ্রহণ করাতে ব্রাহ্মনেতৃদ্বয় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান নিজে লাভ করিতে বা অপরকে দিতে সমর্থ হইলেন না।

বৈষ্ণবসমাজেরও অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছিল। বৈষ্ণবগণের দুর্গতির দুই কারণ। প্রথম চরিত্রহীনতা, দ্বিতীয় বিজাতীয় সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি। কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অল্প লোকই তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন, চৈতন্যদেবের উচ্চধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে

চলেন, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক নহে। আমরা গোস্বামিমহাশয়কে অনেক বার বলিতে শুনিয়াছি যে ঠিক মহাপ্রভুর পন্থায় চলেন, এরূপ বৈষ্ণব বেশী নাই। বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই সংযোগী। অধিকাংশ বৈষ্ণবই যোষিৎসঙ্গ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবী রাখা তাঁহাদিগের মধ্যে একরূপ প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবদিগের অধিকাংশ আখড়াতেই বৈষ্ণবী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবনে প্রতি কুঞ্জেই বৈষ্ণবী আছে। ইহা কিন্তু মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। বৈষ্ণবদিগকে যোষিৎসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে তিনি বার বার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনও নিজে রমনীদর্শন করিতেন না। পুরুষোত্তম ধামে অবস্থান সময়ে এক দিন জনৈক দেবদাসী অতি মধুরস্বরে গীতগোবিন্দের পদ গাইতেছিল। তিনি সেই সুমিষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ভাবে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন তিনি ভাবাবেশে উন্মত্তের ন্যায় সঙ্গীতকারিণীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সেবক গোবিন্দ সঙ্গে ছিলেন। তিনি ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, সঙ্গীতকারিণী রমণী, পুরুষ নহে। "রমণী" এই কথা শ্রবণমাত্র মহাপ্রভুর বাহ্য হইল। তিনি গোবিন্দকে বলিলেন, "প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন। স্ত্রীপরশ হইলে আমার হইত মরণ ॥"

হরিদাস নামে তাঁহার এক জন ভক্ত এক দিন পরমা সাধ্বী বৃদ্ধা বৈষ্ণবী মাধবীদাসীর নিকট হইতে তণ্ডুলভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন, এজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করেন। স্বরূপদামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই। হরিদাস এক বৎসরকাল তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া

অপেক্ষা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই মহাপ্রভুর প্রসন্নতালাভ করিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না। তখন হরিদাসের মনে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি নিদারুণ মনঃকষ্টে প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণীসলিলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। বৈষ্ণবগণ হরিদাসের এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুবৃত্তান্ত মহাপ্রভুর গোচর করিলে তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন, "শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত। প্রকৃতি দর্শন কৈল এই প্রায়শ্চিত্ত॥"

কি কঠোর শাসন! পবিত্রতার কি উচ্চ আদর্শ! শ্রীচৈতন্য লোক-শিক্ষার কি সুন্দর, কি পবিত্র, কি মহান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। বৈষ্ণবগণ কিন্তু সে উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহাপ্রভুর এই কঠোর শাসন ও পবিত্র শিক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ব্যভিচারের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। পূত বৈরাগ্যবস্ত্র কৌপীন ধারণ করিয়া প্রকৃতিসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ আবার এমন নির্লজ্জ ও পাষণ্ড যে আপনাদিগের দুষ্কৃতি সমর্থন করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবগণ, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অতিশয় ঘৃণা করেন। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীগণকে তাঁহারা অস্পৃশ্য ও পতিত মনে করিয়া থাকেন। যাঁহাদের শিখা, মালা ও তিলক নাই, তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত হইলেও তাঁহাদের অশ্রদ্ধার পাত্র। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা অত্যন্ত উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ইষ্টদেবতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ[১] যে ব্রাহ্মণজাতির

(১) ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের পা ধোওয়াইয়া দিবার ভার লইয়াছিলেন।

পূজা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেন না। আরও দুঃখের কথা, যে হরিহর অভিন্ন এক বিগ্রহ, বৈষ্ণবগণ সেই জগদ্‌গুরু মহাদেবকেও অবহেলা করিতে ভীত হন না। আদ্যাশক্তি ভগবতী জগদম্বাও তাঁহাদের ভক্তির পাত্রী নহেন।

শাক্তদিগের অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তান্ত্রিকপন্থা অনুসারে যাঁহারা চলিতেন, তাঁহারা শিববাক্যের দোহাই দিয়া কেবল মদ্যমাংসের সেবা করিতেন। শৈব বিবাহের নাম করিয়া পরদারে রত হইতেন। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, সর্ব্ববিদ্যা, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণ তন্ত্রমতে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। এখন আর সেরূপ উচ্চ সাধক অনেক দেখিতে পাওয়া যায় না। তন্ত্রমার্গে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এরূপ সাধকের সংখ্যা অল্প হইলেও মকার-সেবীর সংখ্যা দেশে কম ছিল না। দেশের যখন এই প্রকার সংকটা-বস্থা সেই সময়েই সদ্‌গুরু অবতীর্ণ হইলেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণই সেই সদ্‌গুরু। তিনি মুমুক্ষু নরনারীগণকে মুক্তি দিবার জন্য ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রকৃত পন্থা দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইলেন।

আর এক কথা—ভগবদ্‌বিধানে এমন একটি সময়, সময়ে সময়ে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়, যখন বহু লোক ভগবান্ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সদ্‌গুরু লাভের অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেই সকল ভাগ্যবান্ লোকদের উদ্ধারের জন্য ভগবান্‌ও সদ্‌গুরুরূপে সেই সময়ে ধরাধামে আগমন করিয়া থাকেন। এই সময়ে অনেকগুলি লোক সদ্‌গুরু লাভের অধিকার লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাই গোস্বামী-পাদ সদ্‌গুরুরূপে আসিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। সদ্‌গুরু-

লাভের জন্য যাঁহারা মনোনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের প্রভুপাদের নিকট আসিয়া সাধন পাইবার পথে দুর্লংঘ্য বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ বাধাই তাঁহাদের সাধনপ্রাপ্তির বিঘ্ন জন্মাইতে পারে নাই। প্রবল গুরুশক্তির নিকট সমস্ত বাধাকেই পরাজয় মানিতে হইয়াছে। সদ্গুরু দুর্জ্জয় বাধা হইতে নিজের লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। সদ্গুরুরূপে, মনোনীত নরনারীবৃন্দকে সাধন দিয়া উদ্ধার করাই তাঁহার অবতরণের মুখ্য প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া দেশে সুনীতি প্রচার করা গৌণ। (১)

এই সময়ে অন্য দুই জন প্রাতঃস্মরণীয় মহাজন আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব পশ্চিম বাঙ্গালায় প্রাদুর্ভূত হন। পূর্ব্ববঙ্গে পূজনীয় শ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারী অবস্থান করিতেন। পশ্চিম বঙ্গের

(১) অনেকে বলেন, গোস্বামিপাদের ব্রাহ্মসমাজে গমন করা ঠিক হয় নাই। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা সময়ের গতি বুঝিতে পারেন নাই। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে তখন দেশের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, লোকের মতিগতি যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল বলিয়াই ভগবান্ রামমোহন রায়ের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ভাবী সদ্গুরু ব্রাহ্মসমাজে গিয়া ইহার বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। দেশে সুনীতি ও ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিয়া লোকদিগকে সর্ব্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইহা বুঝেন না, তাঁহারাই বলেন, গোস্বামিপাদের ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া অন্যায় হইয়াছে, তিনি এক্ষেত্রে ভুল করিয়াছেন। তাঁহারা যদি স্থিরচিত্তে এ বিষয়টি চিন্তা করিতেন, বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, প্রভুপাদ ভুল করেন নাই, তাঁহারাই ভুল করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ দেশের কল্যাণহেতু ভগবদ্বিধান। সদ্গুরু সেই বিধানের সাহায্য ও পোষণকারী।

বহু লোক পরমহংসদেবের কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ও পূর্ব্ববঙ্গের বহু লোককে কৃপা করিয়া ধন্য করিয়াছেন। এই দুই মহাপুরুষের প্রভাবে ধর্ম্মের বিমল স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়া গিয়াছিল। লোকের মুখ সংসারের দিক্ হইতে ধর্ম্মের দিকে, ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া গিয়াছিল। বহু লোকের মনে ধর্ম্মলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল। পশ্চিম প্রদেশেও এ সময়ে অনেকগুলি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। শিবকল্প ত্রৈলঙ্গস্বামী, পূজ্যপাদ ভাস্করানন্দ স্বামী, গম্ভীরানাথ স্বামী, কাঠিয়া রামদাস বাবা, নরসিংহদাস বাবা (পোহাড়ী বাবা), ভোলানন্দগিরি প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় মহাপুরুষ হইলেও বঙ্গদেশে ইহাঁদের প্রভাব অল্প নহে। ইহাঁদের দ্বারাও বাঙ্গালীজাতি কম উপকৃত হন নাই। ইহাঁদের মধ্যে কাঠিয়ারামদাস বাবা, নরসিংহদাস বাবা, গম্ভীরানাথ বাবা ও ভোলানন্দ গিরিজীর নিকট বঙ্গদেশের বহু নর নারী দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## পিতামাতা।

অবতার ও মহাজনদিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে হইলে তাঁহাদিগের জনকজননীর কথাও জানা আবশ্যক। তাঁহারা সাধারণ পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহারা নিজে যেমন অসাধারণ, তাঁহাদিগের জনকজননীও সেইরূপ অসামান্য হইয়া থাকেন। লোকোত্তর-গুণসম্পন্ন পিতামাতার গৃহেই তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। গোস্বামিপাদও সেইরূপ জনকজননীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পিতা। তাঁহার পিতা পূজ্যপাদ আনন্দচন্দ্র গোস্বামী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। (১) শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অতিশয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। ভগবানে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের সেবাকার্য্য তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন। অপরে শ্যামসুন্দরের সেবাপূজা করিলে তাঁহার মনঃপূত হইত না। এমন কি শ্যামসুন্দরের ভোগরন্ধনকার্য্যের ভারও তিনি অপরের হস্তে দিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। তিনি একান্ত নিষ্ঠার সহিত শুদ্ধভাবে ইষ্টদেব শ্যামসুন্দরের ভোগরন্ধন করিতেন। ভোগরন্ধনে যে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত, তিনি তাহা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইতেন। এজন্য শান্তিপুরের লোক তাঁহাকে "খড়ি ধোয়া" * গোসাঁই

---

(১) আর আর জীবনী লেখকগণ আনন্দচন্দ্রকে আনন্দকিশোর করিয়াছেন। আমার নিকট গোস্বামিমহাশয়ের হস্ত লিখিত যে বংশতালিকা আছে, তাহাতে তিনি তাঁহার পিতার নাম আনন্দচন্দ্র লিখিয়াছেন। পুত্র কখন ও পিতার নাম লিখিতে ভুল করেন নাই।

বলিয়া ডাকিত। তিনি কণ্ঠদেশে নিয়ত দামোদর নামক শালগ্রাম ধারণ করিতেন। শিষ্যব্যবসা ও ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র পাঠ-দ্বারা তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। ঐকান্তিক ভক্তির সহিত যখন তিনি ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন তিনি ভক্তিরসে গলিয়া যাইতেন। তাঁহার পবিত্র দেহে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি ভাব-সকলের উদয় হইত। প্রতি লোমকূপ হইতে শোণিতোদ্‌গম হইয়া তাঁহার শরীরস্থ উত্তরীয় বস্ত্র রঞ্জিত করিত।

অল্প পরিমাণ খাদ্যবস্তু দ্বারা তিনি অনেক লোককে পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করাইতে পারিতেন। বহুস্থানে তাঁহার এই ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অসাধারণ দয়ালু ও মুক্তহস্ত ছিলেন। শিষ্যদিগের নিকট হইতে এবং শাস্ত্রপাঠ করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ পাইতেন। সেই সকল অর্থ তিনি মুক্তহস্তে সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। কপর্দ্দকমাত্র সঞ্চয় রাখিতেন না। তিনি দীনদুঃখী অন্ধআতুরকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন। শিষ্যগণও তাঁহার উদার দয়া হইতে বঞ্চিত হইত না। বিপন্ন ও দরিদ্র শিষ্যদিগকে তিনি বিস্তর অর্থ দান করিতেন। তিনি শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনি বহু দিন দারপরিগ্রহ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জেষ্ঠতাত ভ্রাতা স্বর্গীয় গোপীমাধব গোস্বামীর আদেশে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে হয়। ৺ গোপীমাধব গোস্বামীর মৃত্যুর সময়ে তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করা হইয়াছিল। গঙ্গাতীরে উপনীত হইলে যেন তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। তখন তিনি কনিষ্ঠ আনন্দচন্দ্রকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি দারপরিগ্রহ করিও। তুমি বিবাহ করিলে তোমার দুইটি পুত্র হইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের দ্বারা তোমার বংশ রক্ষা

হইবে। কনিষ্ঠ পুত্রটি আমার পত্নীকে দত্তক দিও।” আনন্দচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর ৺ গোপীমাধব গোস্বামী ৺ গঙ্গালাভ করিলেন। শিকারপুরনিবাসী ৺গৌরীকান্ত যোয়ার্দ্দারের কন্যা স্বর্ণময়ী দেবীকে ভ্রাতৃ আদেশে আনন্দ-চন্দ্র বিবাহ করিলেন। যথাসময়ে তাঁহার দুইটি পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ ব্রজগোপাল, কনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ। আনন্দচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শেষ আদেশ প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। জমিদার ৺ মতিলাল রায় এবং ৺ কানাইলাল গোস্বামী প্রভৃতি গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগের সাক্ষাতে তিনি বিজয়কৃষ্ণকে ৺গোপীমাধব গোস্বামীর বিধবা পত্নীকে দত্তক প্রদান করিলেন।

রংপুরের অন্তর্গত আমলাগাছি গ্রামে ৺ মুকুন্দনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ীতে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ভাগবত পাঠ করিবার সময়, তাঁহার সমাধি হয়। সে সমাধি আর ভাঙ্গিল না। সেই সমাধিই মহাসমাধিতে পরিণত হইল।

মাতা। গোস্বামী মহাশয়ের জননী পূজনীয়া স্বর্ণময়ী দেবীও অসামান্যা রমণী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় দয়াবতী নারী সচরাচর দেখা যায় না। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরে তাঁহার গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল। জাহ্নবীর নির্ম্মল বারিধারার ন্যায় তাঁহার দয়ার সুবিমল ধারায় দীন-দুঃখী অন্ধআতুর প্রভৃতি আর্ত্তজনবৃন্দ সুশীতল হইত।

একবার তাঁহাদিগের জ্বালানি কাঠ কাটিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহারা মজুরী লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের সহিত দরদস্তুর করিতে লাগিল। তাহারা যাহা চাহিতেছিল, গোস্বামী মহাশয় তদপেক্ষা কম দিতে চাহিতেছিলেন। তাহারা তাহাতে কার্য্য করিতে সম্মত হইতেছিল না। তাহারা গোস্বামীপাদের সহিত

কিছুকাল দরদস্তুর করিয়া বলিল, দাদা গোঁসাই! আপনার সহিত আমাদিগের দর চুকিবে না। আপনি মা গোঁসাইকে ডাকুন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিলেন। জননী আসিলে গোস্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, ইহারা মজুরী লইয়া বড় গোলযোগ করিতেছে। অনেক বেশী চায়।

মাতা। উহারা কত চায়?

পুত্র। দশ আনা চায়।

মাতা। তুই কত বলেছিস্?

পুত্র। আমি ছয় আনা বলিয়াছি।

পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা বলিলেন, গরিব লোকের দুই চারি আনা মারিয়া কি তুই বড়লোক হইবি? উহাদিগের সহিত গোল করিস্ না। উহারা যাহা চায় তাহাই দে। আহা! উহারা গরিবলোক। উহাদিগকে কিছু বেশীই দিতে হয়, নতুবা উহাদের স্ত্রীপুত্রেরা কি খাইয়া বাঁচিবে?

জননীর এই কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বিস্মিত ও মোহিত হইয়া গেলেন। তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যে সকল দরিদ্রলোক শান্তিপুরের বাজারে শাকশব্জি তরিতরকারী প্রভৃতি সামান্য সামান্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিত, তিনি তাহাদিগকে বাড়িতে আনিয়া অতিশয় যত্নের সহিত স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। এই সকল দীনদুঃখী লোকদিগকে আহার করাইয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন। দরিদ্র লোকদিগকে আহার করাইতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি দুঃখিনী রমণীদের রুক্ষ মস্তকে স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া দিতেন। কাহারও কোন অভাবের কথা জানিতে পারিলে, তিনি যথাসাধ্য তাহা দূর

করিবার চেষ্টা করিতেন। কাহারও ক্লেশদর্শন করিলে, তাঁহার প্রাণ অতিশয় কাতর হইত। ক্লিষ্ট ব্যক্তির ক্লেশ দূর করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। সে সময়ে তাঁহার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। যত ক্ষণ তাহার ক্লেশমোচন করিতে না পারিতেন, তত ক্ষণ তিনি কিছুতেই স্থির হ'তে পারিতেন না। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। আগামী কল্য কি হইবে, তাহা চিন্তা না করিয়া তিনি শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দান করিতেন।

হরিদ্বারের কুম্ভ হইতে প্রত্যাগত হইয়া গোস্বামিপাদ যখন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জননী পীড়িত হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বাস করেন। ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সে সময়ে (ইনি পুরীতে কলেবর ত্যাগ করেন) ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, বড়দিনের ছুটিতে তিনি গেণ্ডারিয়া আসিয়া পূজনীয়া স্বর্ণময়ী দেবীকে প্রণাম করিলে তিনি হাসিমুখে সতীশের দিকে চাহিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আমি আনুনে প্রণাম নিই না। টাকা নাই পয়সা নাই, শুধু শুধু প্রণাম। আমার পায়ের ধূলার দাম নাই ?" এই কথা শুনিয়া সতীশ তাহার সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই ঠাকুরমায়ের চরণে দিয়া আবার প্রণাম করিল। ঠাকুরমা টাকা কয়েকটি নিজের কাছে রাখিলেন। ইহার ২।১ দিন পরে এক জন তরকারীবিক্রেতা ৫।৬টি ফুলকপি এবং ৩।৪টি স্যালাস্ নামক বিলাতী শাক লইয়া আশ্রমে আসিল। দেবী স্বর্ণময়ী তাহাকে কপির বাজরা নামাইতে বলিলে সে নামাইল। স্বর্ণময়ী দেবী সমস্তগুলি কপি ও শাক বাজরা হইতে নামাইয়া লইয়া সতীশপ্রাপ্ত ৫।৬ টাকা, যাহা তাঁহার কাছে ছিল, তাহা সমস্তই তরকারীবিক্রেতাকে দিলেন। বিক্রেতা আশাতীত মূল্য পাইয়া প্রফুল্লমনে প্রস্থান করিল। কপিবিক্রেতা চলিয়া

গেলে ঠাকুর মা কপি ও শাকগুলির একটি মাত্র নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি বিলাইয়া দিলেন।

একবার রাসযাত্রার সময়ে কতকগুলি বিদেশী লোক অনেকগুলি স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাসহ রাস দেখিতে আসিয়া বাসার অভাবে বড়ই বিপন্ন হয়। তাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও কোথাও বাসা না পাইয়া শেষে স্বর্ণময়ী দেবীকে তাহাদের বিপদের কথা বলে। তাহাদের কষ্টের কথা শুনিয়া স্বর্ণময়ীর কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। বাড়ীর অন্য কোথাও স্থান না থাকাতে তিনি তাহাদিগকে তাঁহাদের রান্না ঘরে বাসা দিলেন। ইহাতে গোস্বামী মহাশয় আপত্তি করিয়া বলিলেন, মা, তুমি ইহা-দিগকে পাকের ঘরে থাকিতে দিলে। ইহাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে, তাহারা রাত্রে প্রস্রাব করিয়া যে ঘর অপবিষ্কার করিবে। পুত্রের কথা শুনিয়া জননী বলিলেন, অন্য ঘরে ত স্থান নাই। সকল ঘরই লোকে পরিপূর্ণ। এই ঘর খানি খালি ছিল, কাজেই এই ঘরে ইহাদিগকে স্থান দিতে হইল। দেখ্‌ছিস্ না, ইহারা স্থান না পাইয়া ছেলে পুলে লইয়া কিরূপ বিপন্ন হইয়াছে। বিদেশে আশ্রয় না পাইলে যে কি বিপদ হয়, তা তুই জানিস্ না। আমি প্রবাসে যাই, আমি তাহা জানি। আশ্রয় দিলে তাহাদের সমস্তই সহ্য করিতে হয়। কচি ছেলেরা কি আর সব সময় বাহিরে গিয়া রাত্রে প্রস্রাব করিতে পারে? তাহারা ঘরেই রাত্রে প্রস্রাব করিবে তাহা জানিয়াই উহাদিগকে স্থান দিয়াছি। উহারা চলিয়া গেলে ঘর পরিষ্কার করিয়া লইলেই চলিবে। জননীর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ আর কিছুই বলিলেন না। মাতার পরদুঃখকাতরতায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেবী স্বর্ণময়ী একবার পৌত্র স্বর্গীয় জগবন্ধু গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া

কালীদর্শন করিবার জন্য কালীঘাটে গিয়াছিলেন। কালীদর্শন করিয়া ফিরিবার সময়ে একটি ভিক্ষুক তাঁহার নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিল। ভিক্ষুকের শীর্ণদেহ ও ছিন্নবস্ত্র দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ দয়ায় গলিয়া গেল। সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই তিনি ভিক্ষুকের হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে রেলের টিকিট ক্রয় করিবার জন্য পৌত্র জগদ্বন্ধু পিতামহীর নিকট টাকা চাহিলেন। পৌত্রের কথা শুনিয়া স্বর্ণময়ী বলিলেন, আমার কাছে টাকা নাই। পৌত্র বলিলেন, টাকা কি করিলে? পিতামহী বলিলেন, আমি তাহা ভিখারীকে দিয়াছি। পৌত্র—সমস্ত টাকা? পিতামহী—হাঁ। পিতামহীর কথা শুনিয়া পৌত্র অবাক্ হইয়া কিছু কাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, তুমি পথখরচের টাকা দিয়া দিলে, এখন শান্তিপুরে যাইবার কি হইবে? স্বর্ণময়ী চুপ করিয়া রহিলেন। পৌত্র অন্যস্থান হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া পিতামহীকে লইয়া শান্তিপুরে গেলেন।

এক দিন শীতঋতুর সায়ংকালে কলিকাতার রাজপথ দিয়া যাইবার সময়ে তিনি এক খানি খোলার ঘরের সম্মুখে রাস্তায় এক জন বারাঙ্গনা-কে দেখিয়া যান। প্রত্যাগমন সময়েও দেখিলেন যে উক্ত রমণী রাজপথে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতিকষ্টে দুরন্ত শীত ও হিমভোগ করিতেছে। তাহার এই কষ্ট দেখিয়া তাঁহার মন গলিয়া গেল। সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই তাহাকে দিয়া সস্নেহ বচনে বলিলেন, বাছা! আর শীতে কষ্ট ভোগ করিও না। এখন ঘরে গিয়া শয়ন কর।

তাঁহার আকাশবৎ সুপ্রশস্ত অন্তঃকরণের নিকট আত্মপরবোধ ছিল না। নিজের সন্তান ও অন্যের সন্তানের মধ্যে তিনি কিছুমাত্র তারতম্য করিতেন না এবং তাহাদিগকে ভিন্নচক্ষে দেখিতেন না।

শান্তিপুরে তাঁহাদিগের পরিচারিকার একটি পুত্র ছিল। আহারের সময় তিনি আপনার পুত্রদিগকে যেমন আসন, থালা, গেলাস, বাটী ইত্যাদি প্রদান করিতেন, পরিচারিকার পুত্রকেও সেইরূপ দিতেন। আহারসম্বন্ধেও কোন প্রকার ইতরবিশেষ করিতেন না। কেহ দাসী-পুত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতেন, যাহাদিগের মন অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাহারাই নিজের সন্তানের সহিত অপরের সন্তানের ইতরবিশেষ করিয়া থাকে। এ প্রকার তারতম্য করা মহাপাপ; আমি এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণা করি।'

কৃপণ লোককে তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহাদের কথা উঠিলে বলিতেন, ইহাদিগের ন্যায় ভাগ্যহীন লোক ত্রিভুবনে নাই। ইহারা নিজের মহাপ্রাণীকে প্রাণ ভরিয়া আহার দিতে পারে না। সেই সকল কৃপণ লোককে তিনি অধিক যত্ন করিয়া আহার করাইতেন।

তিনি অতিশয় মিষ্টভাষিণী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় মধুর ছিল। কিছু কাল তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার স্নেহমাখা মিষ্ট কথা শুনিলে প্রাণ জুড়াইয়া যাইত।

ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করিও না, এই ভাব তাঁহার মধ্যে সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হইত। যত ক্ষণ আছে, সকলকে লইয়া মনের সুখে খাও দাও ও আনন্দ কর। আগামী কল্য ভগবান্ যাহা বিধান করিবেন, তাহাই হইবে। সেজন্য চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। মানুষের নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আগামী কল্য ত বহু দূরের কথা।

তিনি সদানন্দময়ী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিত। তিনি সর্ব্ব ক্ষণ আনন্দ করিয়া কালক্ষেপ করিতেন। তাঁহার বদনে কখনও বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হইত না। নিরানন্দ হইয়া কাল-যাপন করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি সকলের সহিত আমোদ-

প্রমোদ, হাস্যপরিহাস করিয়া কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার নিকট অতি অল্প সময় যাপন করিলেও নিরানন্দ প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হইত।

তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল। অন্যের মনের ভাব তিনি জানিতে পারি-তেন। ইন্দ্রিয়াতীত অনেক ঘটনা ও তত্ত্ব তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইত। পরলোকগত আত্মা ও দেবতাদিগকে তিনি দেখিতে পাইতেন। তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। তাঁহার ইষ্টদেবতা ৺শ্যামসুন্দরকে তিনি প্রত্যক্ষ করিতেন। গোস্বামী মহাশয় ৺পুরুষোত্তম ধামে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, ইহা তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল। সেইজন্যই তাঁহাকে পুরী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বিদেশে গোস্বামী মহাশয়ের কোনরূপ ক্লেশ হইলে তিনি তাহা জানিতে পারিতেন। এসম্বন্ধে প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে "আমি বিদেশে যদি কোন আঘাত পাইতাম, রোগযন্ত্রণায় কাতর হইতাম, অথবা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িয়া সভয়চিত্তে মাকে ডাকিতাম, বাটী আসিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী এক এক দিনের ঘটনা উল্লেখ করিতেন। পাহাড়ে হুঁছট খাইয়া মাকে ডাকিয়াছিলাম। তাহাও উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে সেদিন আমার পায়ে যেন পাথর পড়িল। অত্যন্ত কষ্ট পাইলাম। ঘরে বসে আছি, পাথর কোথায়? তখন তোর ডাক আমার কাণে বাজিল। এরূপ অনেক ঘটনা তিনি উল্লেখ করিতেন।"

তাঁহার মনে হিংসা ছিল না। যাঁহার অন্তর হিংসাশূন্য, কোন হিংস্রজন্তু তাঁহার হিংসা করে না। একবার তিনি বাঘের পিঠে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিলেন। ব্যাঘ্র তাঁহাকে হিংসা করে নাই। এমন কি যতক্ষণ তিনি তাহার পৃষ্ঠে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, ততক্ষণ সে একবারও নড়ে নাই। ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিতেছি।

জনৈক পরলোকবাসী সিদ্ধ ফকির সময়ে সময়ে তাঁহার দেহে আবিষ্ট হইতেন। ফকিরের আবেশ হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ থাকিতেন না। তাঁহার আচার ব্যবহার কার্য্য সমস্তই উন্মত্তবৎ হইত। সে সময়ে লোকে তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিত। একবার এই অবস্থায় তিনি গৃহপরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। গোস্বামী মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সন্ধান পান নাই। অবশেষে কতকগুলি পথিকের নিকট তিনি শুনিতে পাইলেন যে বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে একজন উন্মাদিনী বাঘের পিঠে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। গোস্বামী মহাশয় অরণ্যসমীপে যাইয়া মাকে দেখিতে পাইলেন। জননীও পুত্রকে দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন মাতাকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামিপাদ শান্তিপুরে আগমন করিলেন।

এইরূপ মাতাপিতার ঘরে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে বলিতেন মাএর ভিতরে যে অসাধারণ দয়া দেখিয়াছি, তাহার এক বিন্দু পাইলেও আমি ধন্য হইয়া যাইতাম। আমার যেটুকু দয়া আছে, তাহা আমি মাএর নিকট হইতে পাইয়াছি। আমার ভিতরকার দয়া সেই সিন্ধুরই একটি ক্ষুদ্রবিন্দু।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## জন্ম।

সর্ব্বসুমঙ্গল পূর্ণিমা তিথি হিন্দুর নিকট বড়ই পবিত্র, বড়ই আদরের বস্তু। এই পবিত্র তিথিতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত হোলি, ঝুলন ক্রীড়া এবং রাসলীলা করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যরূপিণী জগন্মাতা লক্ষ্মীদেবী এই তিথিতেই অর্চ্চিতা হইয়া থাকেন। নদিয়া-বিহারী গোরাচাঁদের জন্ম ও সন্ন্যাস এই তিথিতেই হইয়াছিল। এই তিথিতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইয়া থাকে। এই জন্যই পূর্ণিমা এত পবিত্র, হিন্দুর এত আদরের তিথি। এই পূর্ণিমা তিথিতেই বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

১২৪৮ সালের শ্রাবণ মাস। সুধাকর ষোলকলায় উদিত হইয়া স্নিগ্ধ রশ্মিতে জগৎ সুশীতল করিতেছেন। চারিদিকে ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। নরনারীর চিত্ত ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। এই পরমপবিত্র, মঙ্গলভূয়িষ্ঠ সর্ব্বগুণোপেত সময়ে পূর্ব্বদিক্ যেমন পূর্ণচন্দ্রকে প্রকাশ করেন, দেবী স্বর্ণময়ী সেই প্রকার বিজয়কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন।

ঝুলন পূর্ণিমা তিথি নিশি উজিয়ারা।
উথলিছে সুখসিন্ধু পুলকিত ধরা॥
হাসত গগনে শশী দিশি নিরমল।
গাওত ভকতগণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥
সুবর্ণ মন্দির মাহে যুগলকিশোরা।
রতন হিন্দোলে দোলে আনন্দে বিভোরা॥
এহেন সময়ে পঁহু ভেল্ল পরকাশ।
স্বর্ণময়ী মন মাহে পরম উলাস॥

কিবা অপরূপ শিশু জননীর কোরে।
অনিমিখে স্বর্ণমাতা তনয়ে নেহারে॥
গৌরীকান্ত গৃহে আজু আনন্দের ধ্বনি।
অকিঞ্চন মাগে রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

—— ——

আওল ধরা মাঝে বিজয়চন্দ।
চৌদিকে উথলল আনন্দ কন্দ॥
পুলকে কিন্নরী করে গান।
ঋষির বীণায় আজু সুমধুর তান॥
নাচে যত বিদ্যাধরী গণ।
সুরনর আনন্দে মগন॥
স্বর্ণময়ী হরষে বিভোর।
আনন্দের আনন্দ ওর॥
হুলুধ্বনি করে কুলবধূ।
হরষে বরষে সুধা বিধু॥
কলির অন্তরে ভেল ত্রাস।
পূর্ণকাম অকিঞ্চন দাস॥

বালক বিজয়কৃষ্ণ যে পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেশের আবালবৃদ্ধ সকলেরই নিকট সে বংশ সুপরিচিত। জগৎপূজ্য অদ্বৈত প্রভুর নাম জানেন না, এরূপ লোক বঙ্গদেশে অতি বিরল। শান্তিপুরের গোস্বামীগণ এই অদ্বৈত প্রভুর বংশসম্ভূত। গোস্বামী মহাশয়ও এই বিশুদ্ধ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ আনন্দচন্দ্রের পুরী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়।

আমরা তাঁহার জননীর নিকটে তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য

কথা শুনিয়াছি। তিনি স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়াছেন যে "বিজয় আমার অন্য ছেলের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে নাই। সে যখন আমার গর্ভস্থ হয়, তখন তাঁহার পিতা আমাতে বীর্য্যাধান করেন নাই। তিনি কেবল ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে আমার গর্ভসঞ্চার হউক। তাঁহার এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই আমি গর্ভধারণ করিয়াছিলাম।" ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণিত আছে। মহাত্মা যিশুর জন্মবিবরণও অনেকাংশে ইহার অনুরূপ। তিনি আরও বলিয়াছেন—বিজয় যখন আমার গর্ভে ছিল, তখন সর্ব্বদা আমার ভগবদ্দর্শন হইত। সূর্য্যের প্রতি রশ্মিতে আমি রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিতাম। (১)

---

(১) ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ আছে—ততো জগন্মঙ্গলং অচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। দধার সর্ব্বাত্মকং আত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ। ভাঃ, ১০।২।১৮।

শ্লোকের অন্বয়—ততঃ (তাহার পর) যথা (যেরূপ) কাষ্ঠা (পূর্ব্বদিক্) আনন্দকরং (চন্দ্রকে) (ধারণ করে) তথা (সেইরূপ) দেবী (দেবকী দেবী) শূরসুতেন (শূরের পুত্র বসুদেব কর্ত্তৃক) সমাহিতং ধ্যানেনার্পিতং (ধ্যানের দ্বারা অর্পিত) জগন্মঙ্গলং (জগতের মূর্ত্তিমান্ মঙ্গল) সর্ব্বাত্মকং (সকলের আত্মাস্বরূপ) আত্মভূতং—পরমাত্মরূপং (আত্মারূপ) অচ্যুতাংশং (বিষ্ণুর চ্যুতিরহিত অংশকে) মনস্তঃ (মনের দ্বারা) দধার (ধারণ করিলেন।)

দেবকী দেবী পতি বসুদেবের নিকট প্রাপ্ত আত্মারূপ ভগবদংশ মনের দ্বারা ধারণ করিলেন। ভাগবতকারের এই কথাতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম ব্যাপারে শরীরের সম্বন্ধ থাকে নাই। সাধারণ মানুষ যেরূপ শুক্রশোণিতযোগে উৎপন্ন হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপে উৎপন্ন হন নাই। ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার।

চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মসম্বন্ধে আছে—জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন দেখিল। জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥ আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে। হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে"। চরিতামৃত, আদি, ৩ প। শচীদেবীপ্রতি মিশ্রবাক্য। এখানেও শারীরিকসম্বন্ধের কথা নাই। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের জন্মও এইরূপই হইয়াছিল। তাহাতেও জনকজননীর দৈহিকসম্বন্ধ ছিল না। বাইবেলে মহাত্মা যিশুর জন্মবিবরণও ইহারই অনুরূপ।

শাক্যকুলরবি বুদ্ধ সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হন নাই। তিনি বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মেরীনন্দন মহাত্মা যিশু গোশালায় প্রসূত হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ও সূতিকাগৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাটির বাহিরে কচুবনে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জননীর অতিশয় আমাশয়ের পীড়া হইয়াছিল। ঝুলনরজনীর প্রথম ভাগে স্বর্ণময়ী দেবীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল। তখনও তাঁহার পীড়া আরোগ্য হয় নাই। তিনি মলত্যাগ করিবার জন্য বাটির বাহিরে কচুবনে গিয়াছিলেন। সেই স্থানেই বিজয়কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন। প্রসবের পর প্রসূতি ও শিশু সূতিকাগৃহে আনীত হইলেন। কচুবনে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া গোস্বামী মহাশয়ের মাতা অনেক সময় তামাসা করিয়া বলিতেন, তুই ত আমার কচুবনের ছেলে। জননীর এই কথায় গোস্বামী মহাশয় হাস্য করিতেন।

গোস্বামিপাদের অন্যতম জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রভুপাদের জন্মবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া এক উৎকট কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্রভুপাদজননী বলিতেছেন "দেখ, এই শিশু আমার পেটে জন্মায় নাই। আকাশ হইতে একটি দিব্যদেহধারী পুরুষ ইহাকে আমার ক্রোড়ে স্থাপন-পূর্ব্বক, সমধিক যত্নসহকারে ইহার লালন পালন করিতে করজোড়ে অনুনয়বিনয় করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার গর্ভলক্ষণ তিরোহিত হইল।" গোস্বামিপাদের জন্মসম্বন্ধে তিনি এই যাহা লিখিয়াছেন, তাহার আগাগোড়াই কাল্পনিক। প্রভুপাদের জননীর নিকট গোস্বামিপাদের জন্মকাহিনী যাহা শুনিয়াছি, তাহার সহিত অমৃতবাবুর লিখিত বৃত্তান্ত কিছুই মিলে না। আমি অনেকবার স্বর্ণময়ী দেবীর মুখে গোস্বামিপাদের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াছি, তিনি যাহা বলিয়াছেন, ঠিক সেই কথাই যথাযথভাবে এই গ্রন্থে লেখা হইয়াছে। আর গোস্বামী মহাশয়ও তাঁহার জননীর নিকট তাঁহার জন্মকথা এইরূপই শুনিয়াছেন, ইহা তাঁহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি।

গোস্বামী মহাশয় পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান।' তাঁহার আর একটি জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম ব্রজগোপাল গোস্বামী। এই দুই পুত্র ব্যতীত স্বর্ণময়ী দেবীর আর সন্তান হয় নাই।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার মাতুলালয় শীকারপুরে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার জন্মসংবাদ শান্তিপুরে উপস্থিত হইলে ৺গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয়ের পত্নী স্বর্গীয়া রুক্মণী দেবী সমারোহ পূর্ব্বক উৎসব করেন। এই উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণভোজন, দান ও দেবসেবা করিয়াছিলেন। ইহার

অমৃতবাবু গোস্বামিপাদের জননীকে দেখেন নাই। তাঁহার দীক্ষা পাইবার বহু পূর্ব্বে পূজনীয়া স্বর্ণময়ী দেবী পরলোকগতা হন। আমার বোধ হয় অমৃতবাবু তাঁহার কল্পনা-প্রিয় বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে এই কাল্পনিক উপন্যাসটি সংগ্রহ করিয়াছেন। আর তিনিও কল্পনাকে কম ভালবাসেন না। দুই কল্পনা মিলিত হইয়া এই বিচিত্র রূপকথার সৃষ্টি হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের মাতৃদেবী অনেকবার বলিয়াছেন, বিজয় সাধারণ ছেলের মত আমার গর্ভস্থ হয় নাই। তাঁহার এই বাক্যের সাক্ষ্য অদ্য আমরা ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণে, চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে শ্রীমান্ মহাপ্রভুর জন্মবৃত্তান্তে এবং বাইবেলে প্রভু যিশুর জন্মকথায় দেখিতে পাই। অমৃত বাবু যাহা লিখিয়াছেন, সেরূপ কথা কোন অবতার বা মহাজনের জন্মবিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় না। গোস্বামিপাদ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন এ কথা তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর মুখে আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। দেবী স্বর্ণময়ী যখন ঢাকায় পুত্রের নিকট ছিলেন, তখন তিনি নিজের উদর পুত্রকে দেখাইয়া বলিতেন। দেখ্ বিজয়, তুই আমার এই পেটে ছিলি এবং এই পেট হইতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিস্। মাতার কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ শিশুর ন্যায় মাতার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, হাঁ, মা, আমি ঐ পেটেই ত ছিলাম এবং ঐ স্থান হইতেই ত ভূমিষ্ঠ হইয়াছি। একবার নয় অনেক বার এইরূপ ঘটনা আমাদের সাক্ষাতে ঘটিয়াছে। অনেক বার আরাধ্যা স্বর্ণময়ী দেবী পুত্রের কাছে এই কথা বলিয়াছেন। মহাজন দিগের জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া সত্যের অপলাপ ক। যেমন দোষ, কল্পনা ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লওয়াও সেইরূপ অন্যায়

কিছুদিন পরে মাতা ও পুত্রকে শান্তিপুরে আনা হয়।

ছয়মাস বয়ক্রমের সময় মহাসমারোহের সহিত গোস্বামিপাদের অন্নপ্রাশন হইল,এবং তাঁহার নাম হইল শ্রীবিজয়কৃষ্ণ। অতঃপর ৺গোপী মাধব গোস্বামী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী যথাশাস্ত্র তাঁহাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন। পিতা পূজ্যপাদ আনন্দচন্দ্র গঙ্গাতীরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক দিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইলেন! বালক বিজয়কৃষ্ণ জননীকে "ভুতুমা" এবং দত্তক-গ্রহণকারিণীকে "মা জননী" বলিয়া ডাকিতেন।

সূতিকা গৃহে বালক বিজয়কৃষ্ণের অত্যন্ত সর্দ্দি হইয়াছিল। কবিরাজ তাঁহাকে মুসব্বর খাওয়াইতে বলিয়াছিলেন। জননী অহিফেন খাওয়াইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণসংশয় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় অতিকষ্টে তিনি রক্ষা পাইলেন। বমি হইয়া আফিং বাহির হইয়া গেল। ভবিষ্যতে এই শিশুর দ্বারা অতি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এজন্য ভগবান্ তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিলেন।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## বাল্যলীলা।

মহাপুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে বাল্য জীবনেই তাঁহাদের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতার এবং অন্যান্য মহাজনদিগের বাল্যজীবনেই এই প্রকার অসাধারণত্বের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণেরও বিশেষত্ব তাঁহার শৈশবাবস্থাতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার এই বিশেষত্ব দেখিয়া অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কালে এই বালক এক জন মহাপুরুষ হইবেন। যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণ মনুষ্যগণকে মহাজনদিগের বরণীয় পদে অভিষিক্ত করে, বালক বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সাধারণ বালকগণ হইতে সর্ব্ববিষয়েই তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বাল্যবয়সেই তিনি সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। শৈশবেই তাঁহার ভিতরে সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইত। তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি ফুলের মত কোমল ছিল। দয়ার সুস্নিগ্ধ পূত ধারা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বদা প্রবাহিত হইত। তিনি কাহারও ক্লেশ দেখিতে পারিতেন না। লোকের কষ্ট দেখিলে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, নির্ভীক, স্বাধীনচেতা ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি অত্যন্ত সাহসের সহিত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তীব্রভাবে অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেন এবং বীরের ন্যায় সেই দৌরাত্ম্যের প্রতিবিধান করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন। অন্যায় কাজ করিয়া কাপুরুষের ন্যায়

তাহা গোপন করিবার জন্য তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। তিনি অকুতোভয়ে সত্য কথা বলিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিতেন। তিনি অন্যায়ের যম ছিলেন। তাঁহার সাক্ষাতে অন্যায় করিয়া কেহ পার পাইতে পারিত না। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া প্রয়োজন হইলে তখনই তাহার প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইতেন এবং সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিকার করিতেন। সমবয়স্ক সহচর বালকগণকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহারাও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতেন। তাঁহার চরিত্র-গৌরব ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সকলেই তাহাকে ভয় করিত ও ভালবাসিত। অন্যায় কার্য্য করিলে বিজয় বিরক্ত হইবে এই ভয়ে কোন বালকই মন্দকার্য্য করিতে সাহস পাইত না। বালক বিজয়কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ হইয়াও চরিত্রের প্রভাবে সকলকে পরিচালিত করিতেন। তিনি সকলের নেতা ছিলেন।

ঈদৃশ গুণযুক্ত বালকদিগকে প্রায়ই চঞ্চল ও দুরন্ত হইতে দেখা যায়। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণও বাল্যকালে অতিশয় চঞ্চল ও দুরন্ত ছিলেন। নন্দলাল শ্রীকৃষ্ণের এবং শচীর দুলাল শ্রীগৌরাঙ্গের চঞ্চলতায় ও উপদ্রবে ব্রজধাম ও নবদ্বীপ যেমন উত্তপ্ত ও উপদ্রুত হইয়াছিল, বালক বিজয়কৃষ্ণের অত্যাচারে শান্তিপুর তদপেক্ষা বড় কম উৎপীড়িত হয় নাই। এরূপ হইবার কারণ কি? মহাপুরুষগণ বাল্যকালে এত দুরন্ত হন কেন? ইহার উত্তরে গোস্বামিপাদগণ বলিয়াছেন যে মহাজনদিগের সমস্ত বৃত্তি সাধারণ মানবগণ হইতে সমধিক প্রবল ও শক্তিশালী। এজন্য তাঁহারা যখন যাহা করেন, তাহাই অত্যন্ত বেশী রকম হয়। তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই সাধারণ মনুষ্যগণের কার্য্যকে ছাপাইয়া উঠে। বালক বিজয়কৃষ্ণও কালে

মহাজনপদবীলাভ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারও সমস্ত কার্য্যই সাধারণ মনুষ্যগণের কার্য্য হইতে বেশী রকম হইয়াছিল। অন্যান্য বালকগণ হইতে তাঁহাতে চাঞ্চল্য, ঔদ্ধত্য অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছিল।

জননীর আদরযত্নে শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় বিজয়কৃষ্ণ বাড়িতে লাগিলেন। তিনি পিতামাতার প্রাণ ছিলেন। শান্তিপুরের লোক তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার লাবণ্যমাখা মুখখানি যে একবার দেখিত; সেই মুগ্ধ হইত ; সেই একদৃষ্টে সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া থাকিত ; সেই ভাল না বাসিয়া, আদর না করিয়া পারিত না। সেই একবার তাঁহাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিত। পূজ্যপাদ বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গসুন্দরের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'যেদিকে চাহিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর। আনন্দে পূর্ণিত হয় তাঁর কলেবর॥' বিজয়সুন্দরের সম্বন্ধেও একথা সম্পূর্ণ খাটে। তিনিও হাসির লহর তুলিয়া যাঁহার দিকে চাহিতেন, তাঁহার কলেবর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত ; তিনি, আনন্দের সাগরে ডুবিয়া যাইতেন।

জনকজননী তাঁহাদের প্রাণের বিজয়কৃষ্ণকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের মাথায় জটা ছিল। জটাতে তাঁহাকে অতিশয় সুন্দর দেখাইত। রমণীগণ আদর করিয়া তাঁহাকে বলিতেন, বাবা বিজয়! একবার তেঁতুল ঝুলাও ত। তাঁহাদের কথায় স্বর্ণময়ীনন্দন যখন মাথা নাড়িতেন, ঝটুপটু করিয়া যখন জটার শব্দ হইত, তখন নারীগণের আনন্দের অবধি থাকিত না।

অল্পবয়সেই বালক বিজয়কৃষ্ণকে দুইবার বিষম বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। এক দিন এক জন চোর বালকের গায়ের গহনার লোভে

তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে কোন নির্জন স্থানে যাইয়া বালকের প্রাণবধ করিয়া অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিবে। কিন্তু তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। ভগবান্ চোরের মতিভ্রম জন্মাইয়া দিয়া নির্দ্দোষী বালকের প্রাণরক্ষা করিলেন। চোর পথ ভুলিয়া বিজয়কৃষ্ণকে কোলে লইয়া তাঁহাদেরই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে বালকের পিতা ও আত্মীয়গণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বালক চোরের কোল হইতে নামিয়া পড়িল এবং ছুটিয়া গিয়া পিতার কোলে উঠিল। চোর বেগতিক দেখিয়া দ্রুত পলায়ন করিল। অপরিচিত লোকের কোলে বালককে দেখিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা বিজয়! ও কে? তুমি উহার কোলে চড়িয়া কোথায় গিয়াছিলে? বিজয় বলিলেন, বাবা, আমি উহাকে চিনি না। ও আমাকে মিষ্টকথায় ভুলাইয়া কোলে লইয়া অনেক পথ ঘুরিয়া এখানে লইয়া আসিল। বালকের কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিলেন যে অলঙ্কারের জন্য চোরে বালককে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন, তাই বালক প্রাণে বাঁচিল। তিনি পথ ভুলাইয়া চোরকে এখানে লইয়া আসিয়াছেন। বালকের আজ পুনর্জন্ম হইল, মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল। এই ঘটনায় সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন। পুত্রের কল্যাণের জন্য জনকজননী গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের ভোগরাগ ভাল করিয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিলেন।

আর একবার বিজয়কৃষ্ণ জননীর সহিত এক কুটুম্ব বাড়ীতে বিবাহে গিয়াছিলেন। এক দিন রাত্রিতে তিনি একাকী এক ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এক দল দস্যু কালীপূজার আয়োজন করিয়া দেবীর কাছে নরবলি দিবার জন্য চারিদিকে লোক

খুঁজিতে খুঁজিতে বালককে নিদ্রিত দেখিতে পাইল। ইহাতে তাহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা নিদ্রিত শিশুকে হরণ করিল এবং যথাসময়ে স্নানাদি করাইয়া বলি দিবার নিমিত্ত কালীর কাছে লইয়া গেল। এক জন পাগল দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং বলি দিবার খাঁড়া কাড়িয়া লইয়া দস্যু দিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে দস্যুগণ ভীত হইয়া পলাইয়া গেল। অতঃপর পাগল শান্ত হইয়া বালককে কোলে লইয়া বাড়িতে রাখিয়া গেল।

একবার বিজয়কৃষ্ণ জননীর সহিত নৌকাতে শীকারপুর হইতে শান্তিপুরে আসিতেছিলেন। অনেক পথ আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, নদীর খানিকটা জায়গায় জল নাই, একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহারা 'মহাভাবনায়' পড়িলেন। এ স্থান হইতে শান্তিপুর অতিনিকট, দুই তিন ঘণ্টার পথ। কিন্তু ঘুরিয়া যাইতে হইলে প্রায় তিন দিন লাগে। তাঁহারা কি করিবেন বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে এক বিরাট পুরুষ সেই স্থানে হঠাৎ আসিয়া শুষ্ক ভূমির উপর দিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া চলিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে জলে ভাসাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বালক বিজয়কৃষ্ণ সেই বিরাট মনুষ্যকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে তিনি আমাদের কাছে অনেকবার এই গল্প করিয়া ভয়ে কেমন করিয়া কাঁপিয়াছিলেন, অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহা দেখাইতেন।

শান্তিপুরে শ্যামচাঁদ ঠাকুরের এক বড় মন্দির আছে। এই মন্দিরে সময়ে সময়ে অনেক সাধুসন্ন্যাসী আসিয়া থাকিতেন। বিজয়কৃষ্ণ অনেক সময়ে সাধু দেখিতে তথায় যাইতেন। এক দিন সায়ংকালে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্যামচাঁদের মন্দিরে চলিয়া

যান এবং সমস্তরাত্রি সন্ন্যাসীদের কাছে থাকেন। একজন সন্ন্যাসী বালকের ভাবী মহত্ত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে কোলে বসাইয়া আদরের সহিত নানাপ্রকার সুস্বাদু মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া নিজের আসনে শোয়াইয়া রাখেন। বালক সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়াতে বাড়ীতে আসিতে পারেন নাই। এদিকে পুত্রকে না পাইয়া বাড়ীর সকলে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। মাতা পাগলের মত চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণও নানাস্থানে অনুসন্ধান করিলেন। বহু অনুসন্ধানেও যখন শিশুকে পাওয়া গেল না, তখন সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন। তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। বালক জীবিত আছে কি না, এ সন্দেহও তাঁহাদের মনে উদিত হইল। বৎসহারা গাভীর মত জননী কাঁদিয়া সারারাত্রি চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন। পর দিন প্রাতে খোঁজ করিতে করিতে শ্যামচাঁদের মন্দিরে যখন বালককে পাওয়া গেল, তখন সকলের দেহে প্রাণ আসিল। জননী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকের ধনকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং বুকে চাপিয়া ধরিয়া বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হইল।

এইরূপ যখন তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি যেখানে সেখানে এমন কি অনেক দূরেও চলিয়া যাইতেন। এজন্য জননী তাঁহাকে অনেক শাসন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। বালকের পাড়াবেড়ান রোগ কিছুতেই গেল না। তখন জননী নিরুপায় হইয়া পুত্রকে বাঁধিয়া রাখিলেন। এইরূপে বন্ধন করিলে বালক অতিশয় কুপিত হইতেন। কোনরূপে একবার বন্ধন খুলিতে পারিলে এমন নিরুদ্দেশ হইয়া পলায়ন করিতেন যে, বহু

অনুসন্ধানেও তাঁহাকে পাওয়া যাইত না। ইহাতে জননী ভীত হইয়া বাঁধিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন।

এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে বিজয়কৃষ্ণ জননীর নিকট আসিয়া বলিলেন, মা! আমাকে একটা কালনার বিড়াল দাও। জননী তখন শ্যামসুন্দরের ভোগ রান্না করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, কালনার বিড়াল কোথায় পাইব? বিজয়কৃষ্ণ সে কথা শুনিলেন না। ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাতা অনেক বুঝাইলেন, শান্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফলই হইল না। বালক কিছুতেই তাঁহার জেদ ছাড়িলেন না। অনেক চেষ্টা করিয়া একটী বিড়াল ধরিয়া আনা হইল, তিনি তাহা লইলেন না। বলিলেন, এ ত শান্তিপুরের বিড়াল, এ বিড়াল আমি লইব না। চীৎকার করিয়া তিনি বাড়ী ফাটাইতে লাগিলেন। কিছুতেই যখন কালনার বিড়াল পাইলেন না, তখন ক্রোধে তাঁহার দুইচক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। নিকটে একটি গরুর মাথা পড়িয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া তাহা আনিলেন এবং জননী যেস্থানে রন্ধন করিতেছিলেন, সেই স্থানে ফেলিয়া দিতে গেলেন। মাতা তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিলেন। রান্নাঘরে মাথা ফেলিতে না পারিয়া বালক অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া অদূরবর্ত্তী কূপে সেই গোমুণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। পরে মাতা কোলে লইয়া অনেক করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন এবং স্নান করাইয়া ভাত খাওয়াইলেন। পরে কূপ হইতে গোমুণ্ড নিঃসারিত করিয়া পঞ্চগব্যদ্বারা কূপের জল শোধন করিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার চপলতা ও উপদ্রব বাড়িতে লাগিল। তাঁহার অত্যাচারে বাড়ীর সকলে এবং প্রতিবেশীগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি গাছে চড়িয়া লোকের মাথায় প্রস্রাব করিয়া দিতেন।

গঙ্গাস্নানে গিয়া সকলের গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেন। অন্য বালকগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপাঝাঁপি করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের পায়ের জল অন্য লোকের গায়ে লাগিত। এরূপ করিতে নিষেধ করিলে তাঁহারা সে কথা ত শুনিতেনই না, অধিকন্তু যাঁহারা নিষেধ করিতেন, তাঁহাদের গায়ে বেশী করিয়া জল ছিটাইয়া দিতেন। ডুব দিয়া লোকের পা ধরিয়া অধিক জলে টানিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপ করিলে যাহারা সাঁতার জানিত না, তাহারা ভয়ে চীৎকার করিত। আর যাহারা সাঁতার জানিত, তাহারা তাঁহাদিগকে ধরিতে যাইত। কিন্তু কাহাকে ধরিবে? তাহাদের আকার দেখিয়াই তাঁহারা তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিয়া দূরে পলাইয়া যাইতেন। কদাচিৎ ধরা পড়িলে হাতে পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতেন, আজ ছাড়িয়া দাও, আর কখনও এমন কাজ করিব না। বিজয়কৃষ্ণের আকৃতিতে কি একটা জিনিষ ছিল, যাহা দেখিয়া লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার লাবণ্যমাখা মুখখানির দিকে একবার চাহিলেই লোকের মনে বাৎসল্য-রসের উদয় হইত। তখন তাঁহারা তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিধাতা তাঁহার মুখে প্রাণজুড়ান বস্তু দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার মুখ দেখিলে লোকের প্রাণ জুড়াইয়া যাইত, মন স্নিগ্ধ হইত। তাঁহারি দারুণ উপদ্রবে উপদ্রুত ও বিরক্ত হইয়া কখনও কখনও তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য কেহ কেহ আসিতেন, কিন্তু বালকের মুখ দেখিয়া আর দণ্ড দিতে পারিতেন না, তাঁহাদের হাত উঠিত না। তাঁহারা কাছে যাইয়া যাই তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেন, অমনি তাঁহাদের ক্রোধ একেবারে জল হইয়া যাইত। স্নেহের সুস্নিগ্ধরসে তাঁহাদের মন একেবারে গলিয়া যাইত। তখন তাঁহারা বাৎসল্যে অবশ হইয়া বালককে তুলিয়া লইতেন এবং বুকে চাপিয়া ধরিয়া বারংবার তাঁহার

মুখচুম্বন করিতেন। এইরূপে বিজয়কৃষ্ণ বিষম উপদ্রব করিয়াও লোকের তাড়না হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেন।

পায়রা পুষিতে তিনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার অনেকগুলি পায়রা ছিল। তিনি তাহাদিগকে খাওয়াইয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিতেন। প্রতিদিন ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া জননীর নিষেধসত্ত্বেও কাঠা পূরিয়া ছোলা মটর আনিয়া আঙ্গিনায় ছড়াইয়া দিতেন। পায়রাগণ খাবার খাইয়া যখন 'বক্ বকম্'শব্দ করিতে করিতে আনন্দে নৃত্য করিত,তখন তিনি আহ্লাদে পুলকিত হইয়া একদৃষ্টিতে তাহা দেখিতেন। পায়রার প্রতি তাঁহার এতই অনুরাগ ছিল যে, তাহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার আশা মিটিত না। নিজের অনেক পায়রা থাকিলেও অপরের বাড়ীতে পায়রা দেখিবামাত্র তিনি তাহা লইয়া আসিতেন। তিনি প্রথমে চাহিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন। চাহিয়া না পাইলে তক্কে তক্কে থাকিয়া সুযোগমত চুরি করিয়া আনিতেন। যাহার পায়রা সে চাহিতে আসিলে বলিতেন, আমি কি পায়রা ফিরাইয়া দিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া আনিলাম। পাড়িবার সময় যদি পড়িয়া যাইতাম, তাহা হইলে আমিই ত ব্যথা পাইতাম। এই বলিয়া পায়রা লুকাইয়া রাখিতেন, কিছুতেই দিতেন না। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে জননীর নিকট হইতে পয়সা লইয়া পায়রার মূল্য দিতে যাইতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কেহই মূল্য লইত না। এই পায়রা প্রতিপালনের ভিতর দিয়া তাঁহার দয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

একবার মুসলমান পাড়ায় বেড়াইতে গিয়া এক বাড়ীতে একটি পড়া পাখী দেখিতে পান। পাখীটি নানা বুলি বলিত। দেখিয়াই বিজয়কৃষ্ণের উহার উপর লোভ হইল। তিনি সুযোগমত পাখীটি চুরি করিয়া গুপ্তস্থানে গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন। পাখীর মালিক কোন

রূপে সন্ধান পাইয়া পাখী লইতে আসিল। পাখীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিজয়কৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। হাঁ না কোন উত্তর দিলেন না। পাখী পালকের স্বর শুনিয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে 'চাচা' বলিয়া ডাকিল। তখন মালিক পাখী লইয়া গেল।

বিজয়কৃষ্ণের অত্যাচারে ঘরে খাদ্যবস্তু রাখা যাইত না। সমস্ত খাবার জিনিষ তিনি খাইয়া ফেলিতেন। গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিলেও তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়া খাইতেন। খাদ্যদ্রব্য উচ্চস্থানে থাকিলে কলসী বা গামলায় চড়িয়া পাড়িয়া লইতেন। একবার উচ্চস্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য পাড়িতে গিয়া এমন পড়িয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার চিবুক ভয়ানক কাটিয়া গিয়াছিল।

ছোট ছেলেকে কোলে লইয়া দুধ খাওয়াতে দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের সাধ হইল যে তিনি শ্যামসুন্দর ঠাকুরকে কোলে বসাইয়া সেই ভাবে দুধ খাওয়াইবেন। জননীকে তিনি এ কথা বলিলেন। ছেলের আজগুবি কথা শুনিয়া মাতা হাসিয়া ফেলিলেন। পরে বলিলেন, পাগল ছেলে, শ্যামসুন্দর কি মানুষের মত খায়? বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, কেন খাইবেন না। আমি তাঁহাকে খাওয়াইব। আমি দিলে নিশ্চয়ই খাইবেন। জননী বালককে অনেক বুঝাইলেন, বালক কিছুতেই বুঝিলেন না। কিছুতেই নিজের জেদ ছাড়িলেন না। মাতা ধমক দিলেন, তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না। তখন মাতা বেগতিক দেখিয়া ভুলাইবার জন্য বলিলেন, যদি তোর শ্যামসুন্দরকে একান্তই দুধ খাওয়াইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে ত জন্মাষ্টমীর পর খাওয়াইস্। জন্মাষ্টমীর দিন শ্যামসুন্দরের জন্ম হইবে, তখন তিনি কচি ছেলে হইবেন। সেই সময়ে ঝিনুকে করিয়া তাঁহার মুখে দুধ দিস্, তিনি খাইবেন। এখন ত তিনি ভাত খান। জননীর কথায় বিজয়কৃষ্ণ সম্মত হইয়া জন্মাষ্টমীর

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জন্মাষ্টমী হইয়া গেলে, তিনি এক দিন বাটীতে করিয়া দুধ ও ঝিনুক লইয়া শ্যামসুন্দরের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসন হইতে ঠাকুর নামাইয়া কচি খোকার ন্যায় কোলে শোয়াইলেন। তারপর ঝিনুকে করিয়া দুধ তুলিয়া তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। মাতা অনেকক্ষণ পুত্রকে না দেখিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন। অনেক জায়গায় পুত্রের অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও পাইলেন না। পরে ঠাকুর বাড়ীতে যাইয়া দেখেন যে শ্যাম-সুন্দরের মন্দির খোলা রহিয়াছে। তখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে পুত্র ঠাকুরকে দুধ খাওয়াইতেছে। বালকের অদ্ভুতকাণ্ড দেখিয়া মাতা প্রথমে খুব হাসিলেন। পরে সকলকে ডাকিয়া এই ব্যাপার দেখাইলেন। সক-লেই এই ঘটনা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণ সকলকে দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া ঠাকুর সিংহাসনে রাখিলেন। তখন জননী পুত্রকে কোলে করিয়া লইয়া আসিলেন। পর দিন ঠাকুরকে অভিষিক্ত করা হইল।

অল্প বয়সেই বিজয়কৃষ্ণ পিতৃহীন হন। পিতার মৃত্যুর কিছু দিন পরে তিনি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এক দিন পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদ দেখিতে দেখিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়েন। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি জননীকে বলিলেন, মা আজ আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি স্বপ্ন দেখিয়াছিস্? বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, বাবা আমাকে কোলে করিয়া চাঁদের দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সেখানে কত সুন্দর নদী পাহাড় পর্ব্বত, বৃক্ষলতা আরও কত ভাল ভাল জিনিষ দেখাইয়া বলিলেন, আমার বংশে এক জন সাধু হইবে। তুই হইতে পারিবি। আমি বলিলাম, তুমি আশীর্ব্বাদ

করিলে পারিব না কেন ? আমার কথা শুনিয়া বাবা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে আবার কোলে করিয়া এখানে রাখিয়া গেলেন। পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া মাতার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। পরলোকগত লোকের সহিত এইরূপ মিলন শুভজনক নহে মনে করিয়া তিনি পুত্রের গলায় রক্ষাকবচ বাঁধিয়া দিলেন এবং শংখের জলে স্নান করাইয়া শ্যামসুন্দরের চরণামৃত খাওয়াইলেন।

বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই সে সময়ে নীলের চাষ হইত। একবার নীলের চাষ লইয়া শান্তিপুরের দুই জমিদারের মধ্যে বিষম দাঙ্গা হইয়াছিল। এক পক্ষে শান্তিপুরের দুর্দ্দান্ত জমিদার মতিবাবুর লোক, অপর পক্ষে চট্টোপাধ্যায়দিগের লোক। দুই পক্ষের লাঠিয়ালগণ ভয়ানক মারামারি করিয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ ও তাঁহার সহচর বালকগণ এই দাঙ্গা দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে দাঙ্গা খেলিতেন। সমবয়স্ক বালকগণকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া তিনি তাহাদের নেতা হইতেন এবং লাঠি ছুরী প্রভৃতি লইয়া কৃত্রিম লড়াই করিতেন। এক দিন এইরূপ দাঙ্গা খেলিতে খেলিতে বিজয়কৃষ্ণের ছুরীর আঘাতে একটি কাঁসারী বালক আহত হয়। আঘাত একটু গুরুতর হইয়াছিল। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আহত বালক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। এই ঘটনায় আর সকল বালক ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। বিজয়কৃষ্ণ পলাইলেন না। সঙ্গীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় কাতর হইলেন। তাঁহার কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে বালকের সেবা করিতে লাগিলেন। পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া তাঁহার চক্ষে মুখে জল দিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপ সেবা করিবার পর বালকের সংজ্ঞা হইল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তাহাকে

চাহিতে দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের ভয় দূর হইল। তিনি তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং নিজের গায়ে হেলান দিয়া বসাইয়া মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা ও ভরসা দিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অন্যায় কার্য্যের জন্য তাহার নিকট কাতর ভাবে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণের এই প্রকার কাতরতা দেখিয়া বালক বলিল, ভাই তোমার দোষ কি? তুমি মারিবে বলিয়া ত আমাকে আঘাত কর নাই। দৈবাৎ লাগিয়া গিয়াছে। তুমি ভীত হইও না; শীঘ্র ঘা সারিয়া যাইবে। আমার বেশী লাগে নাই। এদিকে পলায়িত বালকগণ যাইয়া আহত বালকের পিতামাতাকে বলিল যে গোঁসাইদের ছেলে বিজয় তোমার ছেলেকে ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। ঐ সংবাদ শুনিয়া বালকের জনক-জননী কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের মত ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগকে দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ অতিশয় ভয় পাইলেন। তিনি আহত বন্ধুকে বলিলেন, ভাই তোমার মা বাবা আসিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাকে প্রহার করিবেন। বিজয়ের কথা শুনিয়া বালক বলিল, ভাই, তোমার কোন ভয় নাই। আমি মা বাবাকে বলিব যে বিজয় আমাকে ইচ্ছা করিয়া আঘাত করে নাই। খেলিতে খেলিতে হঠাৎ লাগিয়া গিয়াছে। বিজয়ের কোন দোষ নাই। পিতামাতা উপস্থিত হইলে আহত বালক তাহাই বলিল। বিজয়কৃষ্ণও কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের দোষস্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া এবং বিজয়-কৃষ্ণের কাতরতা দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। কেবল পুত্রকে কোলে লইয়া চলিয়া গেলেন। এই আঘাতে বালককে কয়েক দিন ভুগিতে হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ সর্ব্বদা আহত বন্ধুর শয্যা পাশে উপস্থিত থাকিয়া তাহার সেবা করিতেন। নানাপ্রকার

ভাল ভাল, গল্প বলিয়া বন্ধুর মনোরঞ্জন করিতেন। জননীর নিকট হইতে পয়সা লইয়া ভাল ভাল খাদ্য কিনিয়া বন্ধুকে খাওয়াইতেন। কখনও কখনও শ্যামসুন্দরের প্রসাদ লইয়া তাহাকে খাইতে দিতেন। বালক যত দিন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিয়াছিল, তত দিন তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

যাত্রাগান শুনিতে বিজয়কৃষ্ণ অতিশয় ভাল বাসিতেন। যেখানে গান হইত, তিনি সেই স্থানেই গান শুনিতে যাইতেন। এক দিন তিনি এক জায়গায় যাত্রা শুনিতে গিয়া দেখিলেন, গান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বাড়ী ফিরিলেন। পথে একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটি খড়ম পায়ে দিয়া যাইতেছিল। সে প্রভুপাদকে দেখিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার জননীর নিকট পৌছাইয়া দিয়া তাঁহার সমক্ষেই একটি তাল গাছের কিছু দূর চড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া গোস্বামিপাদ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করাতে জননী বলিলেন, এ যে আমাদের পুরন্দর পূজারি। ঠাকুর সেবার দ্রব্য ঠাকুরকে না দিয়া বৈষ্ণবীকে দিত, ঠাকুরের ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া না দিয়াই ভোজন করিত, এই অপরাধে ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছে। মাতার কথা শুনিয়া গোঁসাই বলিলেন, ও আমাকে অনেক দিন সাহায্য করিয়াছে। আমি এক দিন আমাদের এক দল বিরুদ্ধ ছেলের মধ্যে পড়িয়াছিলাম, তাহারা আমাকে লাঠি লইয়া মারিতে আসিল। তখন এই পুরন্দর সেই স্থানে আসিয়া তাহদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া তাহাদিগকে কাণা করিয়া ফেলিল। পরে খড়মপায়ে চট চট করিতে করিতে আমার সঙ্গে আসিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দিল।

বিজয়কৃষ্ণের উদ্যোগে শান্তিপুরে একটি সখের যাত্রার দল হইয়াছিল।

তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট এবং বয়স অল্প ছিল। এজন্য তাঁহাকে ছোকরা সাজিয়া গান করিতে হইত। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ বাদক অটলবিহারী গোস্বামী ও রাজকৃষ্ণ চৌধুরী এই দলে ঢোলোক ও তবলা বাজাইতেন। তাঁহারা যাঁহাদের বাড়ীতে গান করিতে যাইতেন, তাহাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। শেষে অত্যাচারের ভয়ে কেহ তাঁহাদিগকে ডাকিত না। না ডাকিলেও তাঁহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না। তাঁহারা ডাকের অপেক্ষা না করিয়া যে দিন যে বাড়ীতে গান করিবার ইচ্ছা হইত, আলো ও বিছানা লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন এবং আপনারাই বিছানা পাতিয়া আলো জ্বালিয়া গান আরম্ভ করিতেন। এইরূপে গৃহস্বামীর অনভিমতে বাড়ী বাড়ী যাইয়া যাত্রা করিতেন। গৃহস্বামী নিষেধ করিলে তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না। তাঁহাদের এই অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া গৃহস্থগণ সন্ধ্যা হইলেই বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতেন! ইহাতেও তাঁহাদের নিস্তার ছিল না। যাত্রাকারিগণ প্রাচীর টপকাইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেন এবং গৃহস্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতেন।

সে সময়ে ঝুলনযাত্রায় কালনাতে অতিশয় সমারোহ হইত। বিজয়-কৃষ্ণ প্রতিদিন সমবয়স্ক বালকদের সহিত একত্র হইয়া জেলেদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের নৌকা লইয়া ঝুলন দেখিতে কালনায় যাইতেন। সমস্ত রাত্রি গান শুনিয়া ভোরে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন নৌকা লইয়া কালনায় যাইবার পর দুর্যোগ আরম্ভ হইল। প্রবল বাতাসের সহিত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই দুর্যোগের মধ্যে তাঁহারা গঙ্গাদিয়া নৌকাতে আসিতে সাহস পাইলেন না। তাঁহারা যে নৌকা লইয়া গিয়াছিলেন তাহা কালনায় রাখিয়া হাঁটিয়া শান্তিপুরে আসিলেন।

আসিবার সময় পথে বিজয়কৃষ্ণের মনে হইল, আহা! গরিবদের নৌকা খানি পড়িয়া রহিল, যদি হারাইয়া যায় ত তাহাদের বড়ই ক্ষতি হইবে। তিনি বাড়ীতে আসিয়াই এ কথা মাতাকে বলিলেন। সকাল বেলা জেলেরা নৌকা না পাইয়া অতিশয় ব্যস্তভাবে খুঁজিতে লাগিল। অনেক অনুসন্ধানেও যখন তাহারা নৌকা পাইল না, তখন তাহারা 'হায় হায়, করিতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণ একথা শুনিলেন। শুনিবামাত্র তাঁহার মন গরিবদের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাঁদকাঁদস্বরে জননীকে বলিলেন, মা, জেলেরা নৌকা না পাইয়া কাঁদিতেছে। আমি যাই, নৌকার সন্ধান বলিয়া দেইগে। পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা বলিলেন, না বলিয়া তোরা উহাদের নৌকা লইয়া গিয়াছিস্ এবং কালনায় ফেলিয়া আসিয়াছিস্, একথা শুনিলে উহারা অতিশয় রুষ্ট হইবে। উহারা গোঁয়ার লোক, হয়ত তোকে মারিবে। তোর যাইয়া কাজ নাই। মাতার এই কথা শুনিয়াও বিজয়কৃষ্ণ সুস্থির হইতে পারিলেন না। বলিলেন, তুমি আমাকে কিছু পয়সা দাও, পয়সা পাইলে উহারা খুসি হইবে, তখন আর আমাকে কিছু বলিবে না। পুত্রের ভাব দেখিয়া কোমলহৃদয়া স্বর্ণময়ীর মন গলিয়া গেল। তিনি পুত্রকে পয়সা দিয়া গমনের অনুমতি দিলেন। পয়সা পাইবামাত্র বালক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন এবং সত্বর জেলেদের বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের নৌকার সন্ধান বলিয়া দিলেন, আমাদের দ্বারা তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ, এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে পয়সা দিলেন। পয়সা পাইয়া জেলেরা আর ক্রোধ করিল না। তখন বিজয়কৃষ্ণ প্রফুল্লমনে গৃহে আসিলেন। জেলেরা কালনা হইতে নৌকা আনয়ন করিল।

সে সময়ে শান্তিপুরে অনেক স্ত্রীলোক ছানা ফেরি করিয়া বেচিত।

বিজয়কৃষ্ণ সমবয়স্ক বালকগণের সহিত যুটিয়া তাহাদের ছানা লুট করিতেন। যে পথে ছানাওলীগণ ছানার হাঁড়ি মাথায় করিয়া যাইত, তাঁহারা সেইপথে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার উপর পাটের কাঠি রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতেন। ছানাওলীরা জানিতে না পারিয়া যেমন তাহাতে পা দিত অমনি তাহারা পড়িয়া যাইত। মাথার ছানার হাঁড়িও ভূমিতে লুটাইত। তখন বিজয়কৃষ্ণপ্রমুখ বালকগণ গুপ্তস্থান হইতে ছুটিয়া আসিয়া ছানা লইয়া পলায়ন করিতেন। ছানাওলীরা দুঃখী লোক, ছানা বিক্রয়ের পয়সাদ্বারাই তাহাদের সংসার চলিত। তাহাদের সেই জীবনোপায় এইরূপে নষ্ট হওয়াতে তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলিত। তাহাদের কান্না দেখিয়া অন্যান্য বালকগণ দূরে দাঁড়াইয়া হাসিত,কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের হাসি আসিত না। রমণীগণের করুণ বিলাপ শুনিয়া এবং তাহাদের অশ্রুমাখা কাতরমুখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ গলিয়া যাইত। তিনিও কাঁদিয়া ফেলিতেন। পরে মাতার নিকট হইতে পয়সা লইয়া তাহাদিগকে দিতেন এবং বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া শ্যামসুন্দরের প্রসাদ খাওয়াইতেন। এইরূপে তাহাদিগকে শান্ত করিয়া বিদায় দিতেন। যাইবার সময় তাহারা তাঁহার শুভকামনা করিয়া প্রসন্নমনে গৃহে গমন করিত।

তাঁহারা লোকের ঘোড়া ধরিয়া তাহাতে চড়িতেন। ভাল ঘোড়া পাইলে তাহা লুকাইয়া রাখিতেন। একবার তাঁহারা মালীপোতার অম্বিকা বাবুর একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব অনেক দিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। অনেক খোঁজ করিয়াও অম্বিকা বাবু যখন ঘোড়াটি পাইলেন না, তখন বালকগণের প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই ঘোড়ার কথা অস্বীকার করিল। বিজয়কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিলেন না। তিনি নির্ভয়ে অম্বিকা বাবুকে

সমস্ত কথা বলিয়া ঘোড়া দেখাইয়া দিলেন। অল্পবয়স্ক বালকের এই রূপ সত্যনিষ্ঠা,সরলতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া অম্বিকা বাবুর মনে অতিশয় আনন্দ হইল। তিনি বিজয়কৃষ্ণের উপর এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি অশ্বটি তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

সে সময়ে শান্তিপুরে মহকুমা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কলেক্‌টর ছিলেন। তাঁহার একটি সুন্দর অশ্ব ছিল। একদিন বিজয়কৃষ্ণ সহচর বালকগণের সহিত আস্তাবল হইতে ঘোড়া খুলিয়া মাঠে লইয়া যান। ঘরে ঘোড়া না দেখিয়া সহিস অনুসন্ধানে বাহির হইল। অনেক জায়গায় খুঁজিবার পর সে বালকদিগকে দেখিতে পাইল। বালকগণ দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখিয়া সকলেই পলাইয়া গেল; পলাইলেন না কেবল বিজয়কৃষ্ণ। অশ্বরক্ষক ঘোড়া ও বিজয়কৃষ্ণকে লইয়া গিয়া ডেপুটি বাবুর নিকট, সমস্ত বলিয়া দিল। ঈশ্বর বাবু রুষ্টস্বরে বালককে বলিলেন, তোমরা আস্তাবল হইতে আমার ঘোড়া লইয়া গিয়াছিলে? নির্ভীক সরল বালক সত্যকথা বলিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। ঈশ্বর বাবু বলিলেন, কেন লইয়াছিলে? বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, ঘোড়াটি ভাল, তাই চড়িতে ইচ্ছা হইয়াছিল। ঈশ্বর বাবু বলিলেন, হাকিমের ঘোড়া লইতে তোমাদের ভয় হইল না? বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, ভয় হইবে কেন? বালকের এই-রূপ নির্ভীকতা দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে সত্যকথা শুনিয়া ঈশ্বর বাবু একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন তিনি বিজয়কৃষ্ণকে কাছে ডাকিয়া পিট চাপড়াইয়া আদরপূর্ব্বক, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশ্বর বাবুর কথা শুনিয়া বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, আমি গোঁসাইদের ছেলে আমার নাম বিজয়। তখন ঈশ্বর বাবু বলিলেন, গোঁসাই, তোমরা যে ভাবে ঘোড়ায় চড়িয়াছিলে, তেমন করিয়া কি চড়ে? চড়িতে

হইলে জিন লাগাম দিয়া চড়িতে হয়। তোমার যখন ঘোড়ায় চড়িতে ইচ্ছা হইবে, তখন আমাকে আসিয়া বলিও। আমি ঘোড়া সাজাইয়া দিব, তুমি চড়িও। পরে তাহাই হইত। ঘোড়ায় চড়িবার ইচ্ছা হইলে তাঁহারা ঈশ্বর বাবুকে যাইয়া বলিতেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া ঘোষল মহাশয় ঘোড়া সাজাইয়া দিতেন, তাঁহারা পরমানন্দে চড়িতেন এইরূপ বালচপলতার মধ্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার পরদুঃখকাতরতা, তেজস্বিতা, সরলতা এবং সত্যপ্রিয়তা প্রকাশ পাইত। যে বড় হয়, বাল্যকালেই তাহার জীবনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুসুলভ চঞ্চলতা ও দুরন্তপণার ভিতরও ভাবী মহত্ত্বের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁহার মহত্ত্বসূচক আর একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি। সে সময়ে শান্তিপুরে অসুরপ্রকৃতি প্রজাপীড়ক এক জন জমিদার ছিলেন। লোকের উপর তিনি অতিশয় উৎপীড়ন করিতেন। এক দিন বিজয়কৃষ্ণ সমবয়স্ক বালকগণের সহিত খেলিতে খেলিতে জমিদার বাবুর কাছারিবাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হন। তখন সেখানে একটি নিষ্ঠুর ব্যাপার চলিতেছিল। জমিদার বাবু টাকা আদায় করিবার জন্য একজন প্রজার উপরে পীড়ন করিতেছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার কয়েকজন অনুচর লোকটাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর একটা বাঁশ রাখিয়া দুই দিক্ হইতে চাপিতেছিল, আর লোকটার নাক মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতেছিল। যাতনায় সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। বালকগণ দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিল। কেবল বিজয়কৃষ্ণ পলাইলেন না। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি জ্ঞানহারা হইয়া গেলেন, ক্রোধে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া জমিদার বাবুকে বলিলেন, তুমি মানুষ নও 'রাক্ষস ডাকাত'। লোকটা যে মরিয়া গেল। ভাল

চাও ত উহাকে এখনই ছাড়িয়া দাও। বিজয়কৃষ্ণ যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। শরীরের প্রত্যেক রোমকূপ হইতে রৌদ্রের ন্যায় জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল। এই কথা বলিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বালকের মুখ হইতে যে কথা বাহির হইল, তাহাতেই পাপীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। অত্যাচারীকে শাসন করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণের মুখদিয়া যেন ঈশ্বর তাঁহার বজ্রবাণী প্রকটিত করিলেন। পাপীষ্ঠগণ তখনই লোকটাকে ছাড়িয়া দিল। কিছুকাল পরে বিজয়কৃষ্ণের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া জমিদার বাবু বলিলেন, ওহে বালক, তোমার ত খুব সাহস। আমার নামে সমস্ত লোক কম্পিত হয়, আর তুমি কিনা আমাকে ধমক দিয়া কথা বলিলে! 'রাক্ষস ডাকাত' বলিয়া গাল দিলে! তোমার ভয় হইল না? বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, কিসের ভয়? তুমি ত সত্য সত্যই ডাকাতের মত কার্য্য করিয়াছ। ডাকাতকে ডাকাত বলিতে ভয় কি? আমি গোঁসাইদের ছেলে, আমি কাহাকেও ভয় করি না। অত্যন্ত তেজের সহিত এই কথা বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। জমিদার বাবু অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বাহিরে আসিলে তাঁহার সহচর বালকগণ তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, ভাই তোর কি সাহস। তুই আজ দুর্দ্দান্ত জমিদার বাবুকে ধমকাইয়া আইলি। বিজয়কৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, কিসের ভয়?

ইহার কিছুদিন পরে জমিদার বাবু একটি অনাথা ব্রাহ্মণ বিধবার প্রতি অত্যাচার করিয়া অভিশাপগ্রস্ত হন। বিধবা দ্বাদশীর দিন রান্না চড়াইয়াছেন, এমন সময়ে খাজানার জন্য জমিদার বাবু লোক দিয়া তাঁহাকে অতিশয় অপমান করেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার লোক

লাথি মারিয়া উনানের উপর হইতে বিধবার বগুনা ফেলিয়া দেয়। এই-রূপে উপক্রুতা হইয়া সেই অসহায়া বিধবা অশ্রুপূর্ণনেত্রে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুর তুমিই ইহার বিচার করিও। আমি অনাথা; তুমিভিন্ন আমার আর কে আছে? এই বলিয়া সেই রমণী সেদিনও অনাহারে রহিলেন। বিধবার মর্ম্মান্তিক কাতরবাক্য ভগবানের নিকট পৌঁছিল। তিনি শীঘ্রই এই অত্যাচারী জমিদারের কঠোর শাস্তি বিধান করিলেন। একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়িয়া জমিদার-বাবু কারাবদ্ধ হইলেন। সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দেনার দায়ে তাঁহার জমিদারী নিলাম হইয়া গেল। তাঁহার বিধবা পত্নীকে শেষে বড়ই কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল।

বিজয়কৃষ্ণের বয়স যখন আট নয় বৎসর, সেই সময়ে শ্যামসুন্দ-রের কোন যাত্রা উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। একটি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বে আসিয়া ভিক্ষা চান। গৃহস্বামী বাবাজিকে বলিলেন, একটু অপেক্ষা কর, ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গেলে ভিক্ষা পাইবে। বাবাজী অপেক্ষা করিলেন না। ভিক্ষা না লইয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। বালক বিজয়কৃষ্ণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত্ত আহার না পাইয়া চলিয়া গেল, ইহা তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি বাবাজির পশ্চাতে ছুটিলেন। কিছু দূরে গিয়া বাবাজিকে ধরিয়া তাঁহার বাসস্থানের ঠিকানা জানিয়া আসিলেন। পরে ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইলে এক জনের পরিমাণ খাদ্যবস্তু লইয়া গিয়া বাবাজির আশ্রমে দিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি মধ্যে মধ্যে বাবাজির আশ্রমে খাবার দিয়া আসিতেন।

তাঁহার এক জন বাল্যসখা বলেন, "আমাদের দলস্থ শতাধিক বালকের মধ্যে বিজয় সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিল। বয়সে

ছোট হইলেও সেই আমাদিগকে পরিচালিত করিত। সেই আমাদের দলের নেতা ছিল। তাহার এমন মোহিনী শক্তি ও প্রভাব ছিল, যাহাদ্বারা সে আমাদের সকলকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার অসাধারণ চরিত্রগৌরবের প্রভাবে সকলেই তাহার বাধ্য হইয়া পড়িত। তাহার লাবণ্যমাখা সুকুমার বদনমণ্ডলের যে কি এক আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, যাহাদ্বারা সে সকলের প্রাণ কাড়িয়া লইত। তাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় মিষ্ট ছিল। লোকের মনোরঞ্জন করিবার তাহার অসাধারণ শক্তি ছিল। সমবয়স্ক বন্ধুগণের প্রতি সে অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করিত। তাহার সহৃদয়তার নিকটে আমাদিগকে আত্মবিক্রয় করিতে হইয়াছিল। তাহার ন্যায় পরদুঃখকাতর করুণহৃদয় বালক আমাদের দলে আর একটিও ছিল না। কাহারও দুঃখ দেখিলে তাহার প্রাণ গলিয়া যাইত। তাহার হৃদয় কুসুমের ন্যায় কোমল ছিল। অপরের ক্লেশ সে একেবারেই সহ্য করিতে পারিত না। কাহারও কষ্ট দেখিলে সে কাঁদিয়া ফেলিত। আর্ত্তজনের দুঃখমোচনের জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিত।

বিজয় সত্যের সজীব মূর্ত্তি ছিল। তাহার সত্যনিষ্ঠা দেখিলে মনে হইত, সত্যই যেন বিজয়ের মূর্ত্তিধারণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। সে মিথ্যাকথা বলিতে জানিত না। মিথ্যা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। আমি কখনও তাহাকে মিথ্যা বলিতে শুনি নাই। অন্যায় কার্য্য করিলে আমরা সকলেই সত্যগোপন করিতাম, কিন্তু সে কখনও অসত্য কথা বলিত না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সত্যকথা বলিয়া দিত। এজন্য আমরা তাহাকে কত বকিয়াছি, কত তিরস্কার করিয়াছি, কিন্তু সে তাহার স্বভাবসিদ্ধ সত্যনিষ্ঠা কিছুতেই পরিত্যাগ করে নাই। সে দৌরাত্ম্য যথেষ্টই

করিত, তাহাদ্বারা লোক বিলক্ষণ উপদ্রুত হইত, কিন্তু সেকথা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহা অস্বীকার করিতে পারিত না।

আর একটি ব্যাপার দেখিয়াছি। কেহ তাহাকে শাসন করিতে পারিত না। লোকে তাহাদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া রোষে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে শাস্তি দিতে আসিয়া যাই তাহার লাবণ্যঢলঢল মুখখানি দেখিত, অমনি তাহাদের সমস্ত ক্রোধ জল হইয়া যাইত, আর তাহারা তাহাকে একটি শক্ত কথাও বলিতে পারিত না। বিজয়ের মুখ দেখিয়া লোকে এইরূপে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি যাহাদের উপর উপদ্রব করিতেন, যাঁহারা তাহাদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইত, তাঁহারা তাহার সাক্ষাতে একবার দুঃখপ্রকাশ করিবামাত্র সে একেবারে গলিয়া যাইত। যেমন করিয়া হউক সে তাঁহাদিগের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিত।

বিজয় কলিকালের মানুষ ছিল না। সে সত্যযুগের লোক ছিল। পার্থিব উপাদানে তাহার শরীর নির্ম্মিত ছিল না। বিধাতা তাহাকে স্বর্গীয়বস্তুদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন দেবতা শাপগ্রস্ত হইয়া বা পথ ভুলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছিল।”

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## পাঠশালায় অধ্যয়ন

পাঠশালাতেই বিজয়কৃষ্ণের লেখাপড়া আরম্ভ হয়। হাতেখড়ির পর তাঁহাকে পাঠশালায় দেওয়া হইল। বিজয়কৃষ্ণ জননীর সহিত অধিকাংশ সময় মাতুলালয়ে বাস করিতেন, এজন্য শীকারপুরের পাঠশালাতেই তাঁহার প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। চঞ্চল বালক হইলেও লেখাপড়ায় তিনি অনাবিষ্ট ছিলেন না। মনোযোগের সহিত তিনি লেখাপড়া করিতেন। পাঠশালায় যখন যে শ্রেণীতে তিনি অধ্যয়ন করিতেন, তখন সেই শ্রেণীতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে পরিগণিত হইতেন। এজন্য গুরুমহাশয় তাঁহাকে সকল বালক হইতে অধিক ভাল বাসিতেন। সকল বালক অপেক্ষা তিনি গুরুমহাশয়ের অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। [illegible] সময়ে পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ বালকদিগকে অতিশয় কঠিন শাস্তিপ্রদান করিতেন। নির্ম্মম হইয়া তাঁহারা ছাত্রসকলকে নিদারুণ প্রহার করিতেন। তাঁহাদের নির্দ্দয় প্রহারে অনেক বালক সময়ে সময়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলিত। কিন্তু গোস্বামিপাদকে কখনও শাস্তিভোগ করিতে হয় নাই। জননীর নিকট হইতে পয়সা লইয়া

গুরুমহাশয়কে দিতেন এবং নিমন্ত্রণ করিয়া শ্যামসুন্দরের প্রসাদ খাওয়াইতেন, এজন্য গুরুমহাশয় তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রভুপাদ মাতার সহিত কখন শীকারপুরে, কখন শান্তিপুরে অবস্থান করিতেন। যখন যেস্থানে থাকিতেন, তখন সেই স্থানের পাঠশালাতে তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে হইত। সে সময়ে শান্তিপুরে যে গুরুমহাশয় ছিলেন, তিনি একজন উচ্চসাধক ছিলেন। উচ্চসাধক হইলেও তিনি বালকদিগকে শাস্তি দিতে কসুর করিতেন না। অন্যান্য গুরুমহাশয়-দের ন্যায় তিনিও বালকগণকে নিদারুণ প্রহার করিতেন। তাঁহার নাম ছিল. ভগবান্ সরকার। সরকার মহাশয়ের ৺গঙ্গাপ্রাপ্তির বিবরণ অতি অদ্ভুত। সে সম্বন্ধে গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন--

"শান্তিপুরে ভগবান্ গুরুমহাশয়। তখন শান্তিপুরে ইংরাজী স্কুল ছিল না। গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ও টোল। এই গুরু মহাশয় বড় মারিতেন। বড় রাগিলে "গাতা মাতা" এই শব্দ করিতেন।

একদিন বলিলেন, ওরে ছোঁড়ারা! কাল সকালে আসিস্, এক সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাব। সেখানে আমি দেহত্যাগ করিব। রাত্রিতে এই সংবাদ শান্তিপুরময় ব্যাপ্ত হইল। পর দিন প্রভাতে পাঠশালা স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধলোকে পরিপূর্ণ। গুরুমহাশয় সকলকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাযাত্রা করিলেন। গঙ্গায় গিয়া প্রথমে স্নানাহ্নিক করিয়া গঙ্গার জলে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। চারি দিকে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে হাজার হাজার লোক গঙ্গার ঘাটে পরিপূর্ণ হইল। জয়ধ্বনিতে যেন গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল। এইরূপে জপ শেষ করিয়া গুরুমহাশয় বলিলেন, ছেলে সব! আমি কায়স্থ, তোমরা অনেকে ব্রাহ্মণ। আমি কত তাড়না করিয়াছি। এখন বাপুসকল! আমার মাথায় তোমাদের পা দাও। আর

দেরী নাই। ঐ দেখ আমার রথ এল। ইহা বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রাণ দেহকে ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠের দিকে ধাবিত হইল। আশ্চর্য্য যে মৃতদেহ পড়িয়া গেল না। সমস্ত ব্রাহ্মণছাত্র যেমন পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হয়, তদ্রূপ কার্য্য করিলেন।" (১)

পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের এক ক্রোশ উত্তরপূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বানকের পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে হেজেল সাহেবের স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

গোস্বামীমহাশয়ের বয়ঃক্রম যখন আড়াই বৎসর সেই সময়ে তিনি পিতৃহীন হন। যিনি তাঁহাকে দত্তকগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার শৈশবাবস্থাতেই পরলোকগমন করেন।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ উপনয়নযোগ্য বয়সে পদার্পণ করিলে দত্তক-গ্রহিত্রী স্বর্গীয়া কৃষ্ণমণি দেবী তাঁহার উপনয়নোপযোগী অর্থসংগ্রহের জন্য শিষ্যালয়ে গমন করিলেন। বালক বিজয়কৃষ্ণ জননী স্বর্ণময়ীর নিকট রহিলেন। কিছুদিন পরে স্বর্ণময়ী দেবীর শিষ্যভবনে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হওয়াতে তিনি পুত্রকে পিতৃগৃহে তাঁহার ভগিনীর নিকট রাখিয়া প্রবাসে গেলেন। ইহার কিছুপরে কৃষ্ণমণি অর্থ সংগ্রহ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপনয়নের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্রের পৈতা দিয়া আনন্দসম্ভোগ করা বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লেখেন নাই। অকস্মাৎ বিসূচিকা রোগে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে শৈশবে পিতা ও দত্তকগ্রহণ-কারিণী পরলোকগত হওয়াতে বিজয়কৃষ্ণের লালনপালন ও ভরণ-

---

(১) যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহাদের বাল্যজীবনেই মহত্বলাভের যোগাযোগ ঘটিয়া থাকে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ বাল্যকালেই এমন একজন শিক্ষাগুরু পাইয়াছিলেন, যাঁহার সঙ্গ ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাঁহার ধর্মজীবন লাভের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল।

পোষণের ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার গর্ভধারিণীর উপর পতিত হইল।

সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অর্থচেষ্টায় জননী স্বর্ণময়ীকে অনেক সময় শিষ্যবাড়ীতে ঘুরিতে হইত। রংপুর জেলার আমালগাছির জমিদারগণ তাঁহাদের শিষ্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন সেখানে তাঁহাদের কিছু ভূসম্পত্তি থাকাতে মাতাকে পুত্রদ্বয়সহ অনেক সময় সেই গ্রামে বাস করিতে হইত। আমালগাছি অতিশয় গণ্ডগ্রাম। সে সময়ে সেখানে স্কুলাদি কিছুই ছিল না। এজন্য ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণ মাতার সহিত যখন আমলাগাছিতে থাকিতেন, তখন তাঁহাদের লেখাপড়া শিখিবার কোন সুবিধাই হইত না। বাল্যকালে এই প্রকার অসুবিধার জন্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। পড়াশুনা করিবার সুযোগ পাইলে অল্পবয়সেই তিনি যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিতেন। কেন না তাঁহার প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### টোলে অধ্যয়ন

পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ টোলে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময়ে শান্তিপুরে ৺গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক টোল ছিল। বিজয়কৃষ্ণ সেই টোলে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল। তিনি তাহার প্রভাবে এক বৎসরের মধ্যে দুরূহ মুগ্ধবোধব্যাকরণ শেষ করিলেন। অনন্তর তিনি সাহিত্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক দিন তাঁহারা টোলে বসিয়া পড়িতেছেন, এমন সময়ে এক জন ব্রাহ্মণ সেখানে আসিলেন। তাঁহার যোগিনীসিদ্ধি ছিল। একথা সকলেই জানিতেন। টোলের ছাত্রেরা ইহাঁর কাছে কিছু খাদ্যদ্রব্য চাহিলেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে তাঁহাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন; পরে বালকদের হাত এড়াইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি খাইবে? ছাত্রগণ বলিলেন, আমরা গরম ক্ষীর, রসগোল্লা ও পাকা কাঁঠাল খাইব। বালকগণের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ উত্তরীয় বস্ত্র গায়ে দিয়া কিছু কাল জপ করিলেন। পরে কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষীর, রসগোল্লা ও পাকা কাঁঠাল বাহির করিয়া দিলেন। ছাত্রগণ সানন্দে তাহা ভোজন করিয়া মুখশুদ্ধি চাহিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, কি মুখশুদ্ধি চাও? ছাত্রগণ বলিলেন, পত্র সহিত ছোট এলাচি। ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ কিছুকাল জপ করিয়া

বস্ত্রের ভিতর হইতে পত্রসহিত এলাচি বাহির করিয়া দিলেন। সকলে মুখশুদ্ধি করিলেন। (১)

এই সময়ে গোস্বামিমহাশয়ের উপনয়ন হয়। উপনীত হইয়া তিনি তাঁহার জননীর নিকট কুলপ্রথা অনুসারে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। প্রতিদিন অতিশয় নিষ্ঠার সহিত তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন এবং বংশের প্রথানুসারে শিষ্যদিগকে দীক্ষা দিতেন। তাঁহার সেই সময়কার ধর্ম্মজীবনের অবস্থা তিনি এই প্রকার লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশেষ আস্থা ছিল। সে ভক্তির অবস্থা স্মরণ করিতেও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। হিন্দুধর্ম্মে পূর্ণবিশ্বাসী ব্যক্তির যে যে লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা সমস্তই আমাতে বর্ত্তমান ছিল। দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই আমাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতেন।"

বিজয়কৃষ্ণ চিরদিনই সুনীতিপরায়ণ ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। দুর্নীতিকে তিনি অতিশয় ঘৃণা করিতেন। অন্যের ক্লেশ দেখিলেও তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। পরের দুঃখ দেখিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রাণপণে দুঃখীর দুঃখবিমোচনের জন্য চেষ্টা করিতেন। শরীর দিয়া হউক, অর্থের দ্বারা হউক, যেমন করিয়া পারিতেন, তিনি অপরের ক্লেশ দূর করিতেন। নীচে তাঁহার সুনীতিপ্রিয়তা ও পরদুঃখকাতরতার দুইটি কার্য্য বিবৃত করিতেছি। তাঁহার সমবয়স্ক একজন বন্ধু কুসঙ্গে পড়িয়া কোন দুর্নীতির কার্য্য করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অতিশয় তিরস্কার করেন। এই লোকটি প্রভুপাদকে

(১) ভগবান্ যাঁহাকে বড় করেন, প্রথম হইতেই তাঁহাকে এমন সকল ঘটনার মধ্য দিয়া লইয়া যান, যাহাদ্বারা তাঁহার মহত্ত্বলাভের বিশেষ সুবিধা হয়।

যেমন ভালবাসিতেন, তেমনি তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করিতেন। বিজয়কৃষ্ণের তিরস্কারবাক্যে তাঁহার মনে অতিশয় আঘাত লাগিল। মনের দুঃখে তিনি দেশত্যাগী হইলেন। আমারই ভর্ৎসনায় বন্ধু দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, এই কথা মনে করিয়া বিজয়কৃষ্ণের কোমলপ্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও বন্ধুর খোঁজ পাইলেন না। ইহার অনেক বৎসর পর হঠাৎ সেই নিরুদ্দেশ বন্ধু সন্ন্যাসীবেশে বিজয়কৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিনের পর প্রিয়সুহৃদ্‌কে দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ লাফাইয়া উঠিলেন এবং প্রেমবাহুবিস্তার করিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ভাই! তুমি আমার উপর রাগ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলে, আমি তোমার প্রাণে দারুণ ক্লেশ দিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার নিরুদ্দেশ হইবার সংবাদ শুনিয়া আমার মনে যে কি ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব? আমি বহু স্থানে তোমার সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই। আজি তোমাকে পাইয়া আমার সকল ক্লেশ দূর হইল। এই বলিয়া তিনি বন্ধুর কাঁধে মাথা রাখিয়া অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। বিজয়কৃষ্ণের এই ভাব দেখিয়া তাঁহারও প্রাণ বিগলিত হইল। তাঁহারও চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। পরে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, ভাই বিজয়, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব কি তুমিই আমাকে ক্ষমা কর। তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতে এবং কৃতজ্ঞতা জানাইতেই আমি এখানে আসিয়াছি। তুমিই আমার যথার্থ হিতকারী বন্ধু। তুমিই আমাকে পাপের গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছ। নরকের পিচ্ছিল পথ হইতে রক্ষা করিয়াছ। তুমি যদি সেই সময়ে ঐ ভাবে তিরস্কার না

করিতে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উৎসন্ন যাইতাম। তুমি যে আমার কি উপকার করিয়াছ, তাহা বলিতে পারি না। এই বলিয়া বারংবার ক্ষমা চাহিলেন। কিছুদিন শান্তিপুরে থাকিয়া তিনি পুনরায় তীর্থপর্য্যটনের জন্য বাহির হইলেন।

রংপুর অঞ্চলে তাঁহাদের কতকগুলি গোয়ালাশিষ্য ছিল। তাহাদিগের এক জন কোন গর্হিতকার্য্য করাতে বিজয়কৃষ্ণের অপর সরিকগণ তাহার তিনশত টাকা অর্থদণ্ড করেন। সে ব্যক্তি দরিদ্র। টাকা কোথায় পাইবে? কাজেই দিতে পারিল না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গোস্বামীপ্রভুগণ তাহাকে সমাজচ্যুত করিলেন। অন্যান্য গোপগণ গুরুর আদেশে তাঁহার সহিত আহারাদি ত্যাগ করিল। তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ হইল। লোকটি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে বিজয়কৃষ্ণ সেই গ্রামে গেলেন। তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়া সকলেই তাহার কাছে আসিল। আসিল না কেবল সেই লোকটি। লজ্জায় অপমানে জীবন্মৃত হইয়া সে সংকল্প করিয়াছিল যে এ মুখ আর কাহাকেও দেখাইবে না। তাহাকে না দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সকলে বলিল, প্রভুগণ কোন অপরাধের জন্য তাহাকে তিন শত টাকা দণ্ড করিয়াছেন? সে গরিব, টাকা কোথায় পাইবে? দিতে পারে নাই। সে জন্য তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইয়াছে। প্রভুদের আদেশে তাহার সহিত আমাদিগকে আহারাদি বন্ধ করিতে হইয়াছে। তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ। সে বড়ই বিপদে পড়িয়াছে, বড়ই কষ্ট পাইতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র বিজয়কৃষ্ণের চক্ষু ছল ছল হইয়া উঠিল। তিনি কিছুকাল কথা বলিতে পারিলেন না। পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি তাহার বাড়ীতে যাইব। তোমরা

পথ দেখাইয়া দাও। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে তাঁহাকে লইয়া সেই লোকটির বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে বিজয়-কৃষ্ণের সহিত আত্মীয়গণকে আসিতে দেখিয়া সে লজ্জায় ঘরের ভিতরে লুকাইল। বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু ভয়ে ও লজ্জাতে সে তাহার কাছে আসিতে সাহসী হইল না। পরে অতিশয় পীড়াপীড়িতে সে ধীরে ধীরে আসিয়া বিজকৃষ্ণের পাদমূলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের চক্ষু হইতেও অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। তিনি তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং মিষ্টবাক্যে অভয় দিয়া বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই। তোমাকে এক পয়সাও দণ্ড দিতে হইবে না। এখনই তোমাকে সমাজে তুলিয়া লওয়া হইবে। এই বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে বলিলেন। ইহাকে সমাজে তুলিয়া লইতে, ইহার সহিত আহারাদি করিতে তোমাদের আপত্তি আছে কি? তাহারা বলিল, কিছুমাত্র নাই। প্রভুদের আদেশ লংঘন করিতে না পারিয়া ইহাকে সমাজচ্যুত করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। এইরূপ করিয়া আমরা সুখী হই নাই। আপনি আদেশ করিলে আজই আমরা উহাকে সমাজে তুলিয়া লইব। তাহাদের কথা শুনিয়া বিজয়কৃষ্ণ অতিশয় তুষ্ট হইলেন। তখনই নাপিত আনাইয়া তাহার ক্ষৌরকার্য্য করান হইল। সে স্নান করিয়া আসিয়া বিজয়কৃষ্ণকে প্রণাম করিল। স্বজাতিগণ তাহাকে লইয়া আহার করিল। বিজয়কৃষ্ণের এই সক-রুণ ব্যবহারে সরলহৃদয় গোপগণ এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাকে পাঁচশত টাকা প্রণামী দিল। বিজয়কৃষ্ণ বাড়ীতে আসিয়া সেই টাকা অন্য সরিকগণকে দিয়া বলিলেন, অর্থের জন্য আপনারা যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যোচিত হয় নাই। গুরুর

কি শিষ্যের প্রতি এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করা উচিত? আপনারা কদাচ আর এরূপ অন্যায় কার্য্য করিবেন না। বিজয়কৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহারা অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

নারীজাতিকে বিজয়কৃষ্ণ অতিশয় সম্মান করিতেন। তাঁহাদের উপর কেহ অত্যাচার করিলে, অন্যায় ব্যবহার করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন দুর্বৃত্ত লোক রমণীগণের উপর দুর্ব্যবহার করিলে তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন। যেমন করিয়া হউক, তিনি সেই দুরাচারের শাসন করিতেন। রাসের সময়ে শান্তিপুরে বহুলোকসমাগম হয়। রাস দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে বহু লোক আইসে। এই সময়ে দুষ্টলোকেরা সুযোগপাইলেই যুবতী রমণীগণের উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিত। কোন কোন স্থলে এই প্রকার অত্যাচার হইতও। বিজয়কৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া সমবয়স্ক বন্ধুগণকে লইয়া একটি দল বাঁধিলেন। তাঁহারা অনেক দলে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বদা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কোন স্থানে দুর্বৃত্তগণকে রমণীদের উপর অত্যাচার করিতে দেখিলে তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া অসহায় অবলাগণকে রক্ষা করিতেন। পাষণ্ডগণ তাঁহাদের হাতে এমন শিক্ষা পাইত যে আর উপদ্রব করিতে সাহসী হইত না। এইরূপে তাঁহারা শান্তিপুরে পাপীষ্ঠদের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে যে ধর্ম্মের মধুময় কল্পলতা উৎপন্ন হইয়াছিল, জীবনের প্রথমভাগেই তাহার অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল।

টোলে সাহিত্য পড়িবার পর তাঁহার বেদান্ত পড়িবার ইচ্ছা হইল। তখন বাঙ্গলাদেশে বেদান্ত জানা ভাল পণ্ডিত পাওয়া যাইত না। বেদান্ত পড়িতে হইলে কাশী যাইতে হইত। বেদবেদান্তের চর্চ্চা

কাশীতেই ছিল। এখনও কাশীতে যেমন বেদবেদান্তের আলোচনা হয়, ভারতবর্ষের অন্য কোথায় সেরূপ হয় না। বিজয়কৃষ্ণ এই কারণে কাশীতে যাইয়া বেদান্ত পড়িবার সংকল্প করিলেন। তিনি জননীকে এ কথা বলিলেন। মাতা অঞ্চলের ধনকে অত দূরদেশে পাঠাইতে ভীত হইলেন। বিজয়কৃষ্ণ অনেক সাহস, অনেক ভরসা দিয়া জননীকে সম্মত করিলেন। তখন তিনি একশত টাকা সঙ্গে লইয়া পদব্রজে কাশী যাত্রা করিলেন। এখন যেমন রেলে চড়িয়া এক দিনেই অতি আরামে কাশী যাওয়া যায়, সে সময় এ সুবিধা ছিল না। তখন রেল হয় নাই। সে সময়ে কাশী বা অন্য তীর্থে যাইতে হইলে নানা বিপদ্ আপদ্ মাথায় করিয়া হাঁটা পথে যাইতে হইত। নিরাপদে পাটনা পঁহুছিবার পর এক বিপদের সহিত বিজয়কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করিতে হইল। এক দিন সন্ধ্যাকালে তিনি এক দেবালয়ে অতিথি হইলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলের এক জন ব্রাহ্মণ সেই দেবালয়ে পূজারির কার্য্য করিতেন। এ লোকটী দেবপূজার সহিত দস্যুবৃত্তিও চালাইতেন। কোন পথিক আশ্রয়ের জন্য দেবালয়ে আসিলে পূজারি যত্নের সহিত তাহাকে আহারাদি দিতেন। পরে নিদ্রিত হইলে তাহার প্রাণবধ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণকে অতিথিরূপে পাইয়া এবং তাঁহার সহিত আলাপে তিনি রিক্তহস্ত নহেন, ইহা জানিয়া পূজারির আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সে ব্যক্তি বিজয়কৃষ্ণকে অধিক আপ্যায়িত করিবার জন্য তাঁহার নামধাম ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যখন তিনি বিজয়কৃষ্ণের পিতার নাম শুনিলেন, তখন শিহরিয়া উঠিলেন। সে সময়ে সে ভাব গোপন করিয়া বিজয়কৃষ্ণকে অতিশয় আদর করিয়া ভোজন করাইলেন। পরে বিজয়কৃষ্ণকে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া কাঁদিতে কাদিতে

বলিলেন, প্রভো! আমি অতিশয় পাপীষ্ঠ। আপনি আমাকে দেবালয়ের সেবকরূপে দেখিতেছেন, আমি কেবল দেবতার সেবা পূজাই করি না, দেবসেবার সঙ্গে দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকি। যে সকল নিরাশ্রয় পথিক অতিথিরূপে সায়ংকালে আসিয়া দেবালয়ে উপস্থিত হয়, গভীর রাত্রিতে আমি তাহাদের প্রাণবধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করি। কিন্তু আপনার পরিচয় পাইয়া জানিলাম যে আপনি আমার গুরুপুত্র। না জানিয়া আপনাকে বধ করিলে আমার সর্ব্বনাশ হইত। গুরুহত্যার পাপে পাপী হইয়া অনন্ত কাল নরক ভোগ করিতাম। ভগবান্ আমাকে এপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত যে পাপ করিয়াছি, বহু নরহত্যা করিয়া যে নরকের পথ পরিষ্কার করিয়াছি, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় কি? আপনাকে দেখিয়া, আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমার ভিতরে পাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে আগুনে আমার প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। প্রভো! আমার উপায় কি? আমার গতি কি হইবে? পূজারির কথা শুনিয়া বিজয়কৃষ্ণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। পরে লোকটির কাতরতা দেখিয়া তিনি নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন, তোমার মধ্যে যখন পাপবোধের উদয় হইয়াছে, পাপের জন্য অনুতাপ আসিয়াছে, তখন আর চিন্তা কি? অনুতাপই পাপের শাস্তি। অনুতাপের আগুনে সমস্ত পাপ পুড়িয়া একবারে ভস্ম হইয়া যায়। তুমি আর পাপ করিও না। সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তা ধর্ম্মচর্চ্চা ও ঈশ্বরের আরাধনা কর, তাহা হইলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। বিজয়কৃষ্ণের কথা শুনিয়া পূজারি বলিল, প্রভু আর না, আর পাপ করিব না। আপনি যাহা বলিলেন, আমি প্রাণপণে সেই ভাবে চলিবার চেষ্টা করিব। প্রভো আপনাকে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। আপনি

এভাবে কাশী যাইবেন না। দেশে ফিরিয়া যান। পথে আমার ন্যায় অনেক দস্যু আছে। তাহারা আপনার অনিষ্ট করিতে পারে। আপনার প্রাণ যাওয়াও অসম্ভব নহে। তাই আপনাকে দেশে ফিরিবার জন্য আমি সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। পূজারির কথায় বিজয়কৃষ্ণের ভয় হইল। কাশী যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া পর দিনই তিনি দেশে ফিরিলেন। বাড়ীতে আসিয়া তিনি জননীকে পথের কথা বলিলেন। মাতা পূজারির বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। শ্যামসুন্দরই আমার বাছাকে রক্ষা করিয়াছেন, মনে করিয়া তিনি পরমান্ন ইত্যাদি বিবিধ উপচারে ঠাকুরের ভোগ দিলেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন
## ও
## ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন

অতঃপর গোস্বামিপাদ, অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত সংস্কৃত-কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তিনি সাঁতরাগাছি গ্রামে থাকিতেন। সেখান হইতে পদব্রজে তাঁহাকে কলেজে যাতায়াত করিতে হইত। ইহাতে যে তাঁহার অতিশয় ক্লেশ হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তিনি এ কষ্ট কষ্ট বলিয়াই মনে করিতেন না। সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সুবিধা হইয়াছে, এই আনন্দে তিনি এ ক্লেশে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। এখানেও তিনি স্বশ্রেণীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইয়া সকলকে পরিচালিত করিতেন।

এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। তদীয় মাতামহালয় শীকারপুরের পার্শ্ববর্ত্তী দহকুলা গ্রামবাসী পূজ্যপাদ স্বর্গীয় রামচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা যোগমায়া দেবীর সহিত তিনি উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। বিবাহের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম আঠার এবং যোগমায়ার বয়স ছয় বৎসর ছিল।

পূজনীয়া যোগমায়া দেবী গোস্বামিমহাশয়ের যোগ্যা পত্নী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে গুণবতী রমণী সচরাচর নয়নগোচর হয় না। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। ভগবানে তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ও গভীর নিষ্ঠা ছিল। তিনি আদর্শসতী ও পতিব্রতায়

শিরোমণি ছিলেন। সুখেদুঃখে, রোগেশোকে, সম্পদেবিপদে তিনি ছায়ার ন্যায় পতির পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। কখনও ভর্ত্তার অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিতেন না। মিষ্টবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহার মনে নির্ম্মল আনন্দ ঢালিয়া দিতেন। শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা পতিসেবা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। আমরণ তিনি এই পবিত্র ব্রতপালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পতির ভিতরে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন,—ডুবাইয়া দিয়াছিলেন,—নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া পতির সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কখনও পতিআজ্ঞার ন্যায়অন্যায় বিচার করিতেন না। নির্ব্বিকারচিত্তে পতির সর্ব্বপ্রকার আদেশ অবিচারে প্রতিপালন করিতেন।

পতিসেবাদ্বারাই তিনি তাঁহার অভীষ্ট অবস্থালাভ করিয়াছিলেন। গোস্বামিপাদ বলিতেন, "আমি বহু তপস্যাদ্বারা যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি (যোগমায়া দেবী) কেবল আমার সেবা করিয়াই এ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।" নারায়ণজ্ঞানে স্বামিসেবা করিতে পারিলে রমণীগণ কেবল তাহাদ্বারাই ভগবানকে পাইতে পারেন। যে রমণী পতিকে মনুষ্যবুদ্ধিতে ভক্তি করেন, তাঁহার এ অবস্থা লাভ হয় না। তিনি পতিলোকে গমন করেন। শাস্ত্রে পতিব্রতার মহিমা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সতী অপেক্ষাও পতিব্রতাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যিনি পতিকে নারায়ণজ্ঞান করিয়া ভক্তি করেন এবং অবিচারে পতিআজ্ঞা পালন করেন, তিনিই পতিব্রতা বলিয়া কথিত হন।

তিনি অতিশয় মিষ্টভাষিণী ছিলেন। অধিক কথা বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও বসুন্ধরার ন্যায় ধীর

ছিলেন। কোন প্রকার দুঃখ ও কষ্টে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। চিরদিন দরিদ্রতার মধ্যে বাস করিয়া তাঁহাকে বিবিধ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু কখনও তাঁহার বদন-মণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। কোন প্রকার বিপদ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না। অনেক সময়ে তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হইত, সে অবস্থাতেও তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতার হ্রাস হইত না। তিনি যে অনাহারে রহিয়াছেন, তাহা অপরে জানিতে পারিত না।

তিনি অতিশয় দয়াবতী ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে দয়ার নির্ম্মল উৎস নিয়ত উৎসারিত হইয়া দীন দুঃখী আতুর প্রভৃতি আর্ত্ত জনবৃন্দকে সুশীতল করিত। তাঁহার আত্মপরবোধ ছিল না। গোস্বামি-মহাশয়ের আশ্রমে সর্ব্বদাই বহুলোক বাস করিত। তিনি জননীর ন্যায় সকলকে প্রতিপালন করিতেন। আপনার গর্ভজাত সন্তানগণের প্রতি তিনি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, আশ্রিত জনগণের প্রতিও তদনুরূপ করিতেন। আহারাদি সম্বন্ধেও তিনি কোন প্রকার ইতর-বিশেষ করিতেন না। অর্থের অনাটননিবন্ধন তাঁহারা অধিক দুগ্ধ ক্রয় করিতে পারিতেন না। অল্প যাহা ক্রয় করিতেন, তাহাই সকলকে সমান ভাগ করিয়া দিতেন। একমাত্র পুত্র যোগজীবনও আর সকলের সহিত সমান অংশ পাইতেন। অর্থীদিগকে তিনি বিমুখ করিতে জানিতেন না। অর্থে তাঁহার বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না। একবার গোস্বামিমহাশয়ের জনৈক শিষ্য তাঁহাদিগের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু অর্থপ্রদানে উদ্যত হইলে তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন, এখন টাকা আছে; এই বলিয়া টাকা ফিরাইয়া দিলেন।

তিনি সদানন্দময়ী ছিলেন। তাঁহার অধরপ্রান্তে নিয়ত মৃদু

হাস্যরেখা অঙ্কিত থাকিত। ক্ষণকাল তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলে প্রাণ স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি সাতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডলে স্নেহপূর্ণ পবিত্র মাতৃভাব সর্ব্বদা বিরাজ করিত।

১২৫৯ সালের ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীতে যোগমায়ার জন্ম হয়। তাঁহার আর একটি কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। তাঁহার নাম নবকুমারী। নবদ্বীপের পরপারবর্ত্তী উস্বুদপুরের ক্ষেত্রনাথ বাগছি মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যোগমায়ার পিতার সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তিনি নীলকুঠিতে অল্পবেতনের একটি চাকরি করিতেন। সেই সামান্য আয়দ্বারা সাধারণ ভাবে তাঁহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। যোগমায়া যখন অত্যন্ত বালিকা, সেই সময়ে নবকুমারীকে কোলে করিয়া তাঁহার জননী পূজনীয়া মুক্তকেশী দেবী বিধবা হন। পতির অকালমৃত্যুতে কন্যাদুইটিকে লইয়া তিনি অকূল পাথারে ভাসিলেন। চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। অতি কষ্টে কন্যাদুইটিকে বুকে করিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। যোগমায়া জন্মাবধিই অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। নিজের খাওয়া পরার জন্য তিনি কখনও জননীকে বিরক্ত করেন নাই। মাতা যাহা করিতে বলিতেন, তিনি তাহাই করিতেন। যাহা খাইতে দিতেন, সন্তুষ্টমনে তাহাই খাইতেন। কখনও জননীর কথার অবাধ্য হইতেন না এবং ভালদ্রব্য চাহিয়া মাকে বিরক্ত করিতেন না। অতঃপর যোগমায়া ছয়বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে গোস্বামিপাদের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। দেবী স্বর্ণময়ী নিজেই কন্যা দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির করেন। কথা হয় যে বিবাহের পর মুক্তকেশী দেবী দহকুলার বাস উঠাইয়া দিয়া মেয়ের সঙ্গে থাকিবেন। এই বন্দোবস্তে প্রভুপাদের বিবাহ হইয়া গেল।

মুক্তকেশী দেবী কন্যার সংসারে আসিলেন। এই স্থানে ভগবতী যোগমায়ার কয়েকটি মধুমাখা বাল্যলীলা বর্ণন করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ছয়বৎসরের বালিকাকে বধূ সাজিয়া শ্বশুর বাড়ীতে আসিতে হইয়াছে। শ্বশুর ভাসুর প্রভৃতি গুরুজনদিগকে দেখিয়া তাঁহাকে মাথায় কাপড় দিতে হয়। ছয়বৎসরের বালিকার পক্ষে এ কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করা একেবারেই অসম্ভব। অনেক সময়েই তিনি খোলা মাথায় আদুল গায়ে যেথানেসেথানে বসিয়া খেলা করিতেন। একদিন এইভাবে খেলা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভাসুর ব্রজগোপাল গোস্বামিমহাশয় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বর্ণময়ী দেবী কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বড় ছেলেকে আসিতে দেখিয়া যোগমায়া দেবীকে বলিলেন, ঝোট বউ তোর ভাসুর আসিতেছে, মাথায় কাপড় দে। যোগমায়া তাড়াতাড়ি উলঙ্গ হইয়া মাথায় কাপড় দিলেন। বালিকার এই লাবণ্যমাখা ব্যবহার দেখিয়া মাতা পুত্র হাসিতে লাগিলেন। যোগমায়া শাশুড়ীর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। শাশুড়ী ও ভাসুর কেন হাসিতেছেন, তিনি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অতঃপর ভাসুর ব্রজগোপাল হাসিতে হাসিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। মাতা পুত্রবধূকে কোলে লইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া আদর করিলেন এবং ভাল করিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন।

গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বদা পড়া শুনা করেন, দেবী যোগমায়ার ইহা ভাল লাগিত না। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি তাঁহার সহিত খেলা করেন। যোগমায়া এক এক দিন গোস্বামিপাদের পড়িবার যায়গায় উপস্থিত হইয়া বলিতেন, তুমি দিনরাত অত পড় কেন? অত পড়িয়া কি হইবে? অত পড়িও না। বই বন্ধ কর। আমার সঙ্গে খেলিবে চল,

প্রভুপাদ অবশ্য পত্নীর কথা আমলে আনিতেন না। যোগমায়াও নাছোড়বান্দা; তিনি যখন দেখিতেন, স্বামী কিছুতেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না, তখন তিনি তাঁহার পুঁথির উপর শুইয়া পড়িতেন এবং পতির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, এখন কি করে পড়্বে? প্রভুপাদ পত্নীর এই বাল্যলীলায় হাস্য করিতেন। পরে জননীকে ডাকিয়া বলিতেন, মা দেখ, এই পুন্‌কে শত্রুর জ্বালায় আমি লেখাপড়া করিতে পারিতেছি না। পুত্রের কথা শুনিয়া জননী তথায় আসিয়া পুত্রবধূর বাল্যলীলা দেখিয়া হাসিতেন এবং তাঁহাকে আদর করিয়া লইয়া যাইতেন। এক এক দিন যোগমায়া দেবী ধীরে ধীরে গোস্বামিপাদের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া সুকোমল হাত দুইখানি দিয়া পতির চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিয়া বলিতেন, বল দেখিনি আমি কে? গোস্বামিমহাশয় পত্নীর এই বাল্যভাব দেখিয়া হাস্য করিতেন। যোগমায়া দেবী একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ সকলকেই ত একটা কিছু বলিয়া ডাকি। তোমাকে কি বলিয়া ডাকিতে হয়, তাহা ত জানি না। তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব, বলিয়া দাও। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, তুমি আমাকে আর্য্যপুত্র বলিয়া ডাকিও। সেই হইতে যোগমায়া পতিকে আর্য্যপুত্র বলিয়া ডাকিতেন। অধিক বয়সে তিনি আর্য্যপুত্র বলিয়া ডাকা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময়ে গোস্বামিপাদের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হয়। শংকরাচার্য্যের ভাষ্যসহিত বেদান্তদর্শন পাঠ করিয়া তিনি ঘোর মায়াবাদী হইয়া পড়েন। শংকরস্বামী বেদব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ভাষ্যে তিনি একান্তাদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা শংকরভাষ্য সহিত বেদান্ত পাঠ করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই

অদ্বৈতবাদী ও মায়াবাদী হইয়া পড়েন। শংকর বলেন, এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই প্রত্যক্ষ জড়জগৎ যাহা আমরা দেখিতেছি, ইহা মায়া। ইহার কিছুমাত্র সত্তা নাই। রজ্জুতে সর্প, মরীচিকায় বারিভ্রমের ন্যায় সত্যরূপ ব্রহ্মে জড়জগতের ভ্রম দর্শন হইতেছে। আর জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ। মায়াবদ্ধ হওয়াতে জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতেছেন। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটের অন্তর্গত আকাশ যেমন মহাকাশে লীন হইয়া যায়, মায়া ছুটিয়া গেলে মুক্তাবস্থায় জীব সেইরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে। মায়াবাদিগণ ভগবানের স্বরূপ মানেন না। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের বিগ্রহ স্বীকার করেন না। অদ্বৈতবাদিগণ অহংব্রহ্ম (আমিই ব্রহ্ম) মনে করিয়া ভগবানের পূজা উপাসনা আরাধনা সমস্তই উড়াইয়া দেন। (১)

(১) এই মত আচার্য্য শংকরের। তিনি একান্তাদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, একমাত্র ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নাই। এই যে দৃশ্যমান জগৎ ইহা কিছুই নহে। স্বপ্নের যেমন কোন অস্তিত্ব নাই, ইহারও সেইরূপ কোন অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেতে জগৎ ভ্রম হইতেছে। আর জীব ও ব্রহ্ম এক। জীব অবিদ্যায় বদ্ধ হইয়া পড়াতে তিনি নিজেকে বদ্ধ, সুখদুঃখের অধীন, পাপপুণ্যের অধীন বোধ করেন। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে যখন তাঁহার অবিদ্যাবন্ধন নষ্ট হইয়া যায়, তখন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান। তাহার দৃষ্টান্ত ঘটাকাশ। নিম্বার্কস্বামী রামানুজস্বামী ও বোধায়ণ ঋষি প্রভৃতি শঙ্করের এ মত অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলে। মহাপ্রভুও এই মতই অনুমোদন করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।" গোস্বামিপাদও শেষ জীবনে এই কথাই বলিতেন। তিনি বলিতেন তত্ত্বজ্ঞান হইলে জীবের কাঁচা আমি (অহং) চলিয়া যায়; কিন্তু পাকা আমি, দাস আমি থাকে। ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত বাদ বলিয়া কথিত। ভগবান্ ব্যাসদেবের ইহাই মত এবং ব্রহ্মসূত্রে তিনি এই মতই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের দুইটি সূত্রে তাঁহার এইমত পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। একটি সূত্রে বলিয়াছেন মুক্তজীবের কখনই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিবার ক্ষমতা হয় না; তাহা কেবল ব্রহ্মেরই আছে। আর একটি সূত্রে বলিয়াছেন, কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত জীবের সমতা হয়, শক্তিবিষয়ে কখনও সমতা হয় না। মুক্তজীব ব্রহ্মের সহিত সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকেন।

গোস্বামিপাদ তাঁহার সেই সময়কার মনের অবস্থা এইরূপ লিখিয়াছেন,—"হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম। তখন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্ম এই সত্য বিশ্বাস করিতাম। উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না।"

গোস্বামিমহাশয় মায়াবাদী হইয়া পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যাগ করিলেন। বৈদান্তিক মত তাঁহার জীবনের ঘোরতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহার অন্তর হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইল। নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি, ঘন মেঘমালা যেমন জগৎপ্রাণ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আবৃত করে, মায়াবাদ তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসকে সেইরূপ আবৃত করিল। তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে ভক্তির যে সুনির্ম্মল স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া তাঁহার দেহ প্রাণ স্নিগ্ধ করিত, মায়াবাদের উত্তাপে তাহা শুষ্কপ্রায় হইল। পৈতৃক ধর্ম্মে তাঁহার যে গভীর বিশ্বাস, একান্ত নিষ্ঠা ও অবিচলিত ভক্তি ছিল, তাহার অন্যথা হইল। ইহাতে তাঁহার মনে শান্তির অত্যন্ত অভাব হইল। এইরূপে তিনি জীবনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শংকরভাষ্য ভিন্ন রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি প্রণীত আরও কয়েকখানি বেদান্তভাষ্য আছে। তাহাতে শংকরের একান্তাদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে জীব ব্রহ্মের শক্তি। ব্রহ্ম বৃহৎ অগ্নি, জীব তাহার স্ফুলিঙ্গ। মুক্তির পরও ব্রহ্মের সহিত জীবের দ্বৈতভাব থাকে। শেষ বয়সে এই অদ্বৈতবাদসম্বন্ধে প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"অদ্বৈতবাদ মত নহে। আত্মার এক প্রকার অবস্থা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইলে তখন আত্মা আপনাকে ভুলিয়া যান। যাহা দেখেন, ব্রহ্মসত্তাই দেখেন। অনন্ত সাগরে একটি জলকণা প্রবেশ করিলে সে চারিদিকে সমুদ্রের হিল্লোল কল্লোল দেখে, কখনও ডোবে, কখনও ভাসে। আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইহা না হইলে ঋষিগণ, মুনিগণ এত পরিশ্রম করিয়া সাধন করিবেন কেন? ইহাই পরমগতি—পরম সম্পদ।"

কিন্তু তিনি ত এই প্রকার ভক্তি ও বিশ্বাসশূন্য, উপাসনাহীন শুষ্কজীবন যাপন করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন নাই। মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য গুরুতর কর্ত্তব্যভার লইয়া তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার এই ভাবে চলিলে চলিবে কেন? ভগবান্ তাঁহাকে এই ভাবে চলিতে দিলেন না। একটি ঘটনায় তিনি তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার ভাবী কর্ত্তব্যের দিকে আকর্ষণ করিলেন; নিজের দিকে টানিয়া লইলেন।

মহাজনদিগের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা যে মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন, সংসার তাঁহাদিগকে তাহা হইতে দূরে রাখিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। তাঁহাদিগের জীবনের সেই উচ্চতর ব্রত ভুলাইয়া দিবার জন্য বিবিধ মায়াজাল বিস্তার করে। কিন্তু সংসারের সেই চেষ্টা কিছুতেই সফল হয় না। ভগবান্ তাহা সিদ্ধ হইতে দেন না। তিনি মহাপুরুষদিগের জীবনে এমন এক একটি ঘটনা উপস্থিত করেন, যাহাতে তাঁহাদিগের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়; তাঁহারা যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে আসিয়াছেন, তাহার দিকে তাঁহাদিগের মুখ ফিরিয়া যায়। ভগবান্ বুদ্ধের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংসার তাঁহাকে পার্থিব সুখে নিমগ্ন করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিল; কিন্তু তাহা সফল হইল না। সংসারের সমস্ত চেষ্টা, সকল আয়োজন বিফল হইয়া গেল। একবারমাত্র বৃদ্ধ, রোগক্লিষ্ট, ও মৃত মনুষ্য দর্শন করিয়া তাঁহার মনে প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি সুসমৃদ্ধ রাজ্য, বিপুল ঐশ্বর্য্য, দেববাঞ্ছিত রাজভোগ, পতিপ্রাণা

সাধ্বী প্রণয়িনী, প্রাণাধিক সুকুমার পুত্র তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যমার্গে প্রবেশ করিলেন। যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ভূমণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যে শরীর মন নিয়োগ করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে নির্ব্বাণের সুসমাচার প্রচার করিলেন। সংসারের লোক অহরহঃ বৃদ্ধ, রুগ্ন ও মৃত মনুষ্য দর্শন করিতেছে, কৈ কাহারও মনে ত বৈরাগ্যের উদয় হয় না। কেহই ত সংসার ত্যাগ করে না। মৃত্যুর কথা কয়জনের মনে হয়। তাহাদের কার্য্য দেখিয়া, ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন ভগবানের নিকট হইতে তাহারা মৌরস পাট্টা লইয়া সংসারে আসিয়াছে। তাহাদের উপরে যেন যমরাজের কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই। সংসারের এই অবস্থা দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দুঃখের আবেগে বলিয়াছেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

যে ঘটনা নিরন্তর দর্শন করিয়াও লোকের কিছুমাত্র চৈতন্য হয় না, একবারমাত্র সেই ব্যাপার দেখিয়া কপিলবস্তুর রাজকুমারের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

আবহমান কাল হইতেই পিতৃলোকের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য অসংখ্য লোক গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম দর্শন করিতেছে, কিন্তু কখনও কাহার মনে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের কথা শুনা যায় নাই। কিন্তু নদীয়াবিহারী গোরাচাঁদ যাই বিষ্ণুমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ দর্শন করিলেন, অমনি তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে ভক্তির প্রবল ফোয়ারা খুলিয়া গেল, প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। সেই স্রোতের টানে আকৃষ্ট হইয়া স্নেহময়ী জননীর, প্রেমময়ী পতিব্রতার দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসার

পরিত্যাগ করিলেন এবং হরিনাম প্রচার করিয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট নর-নারীকে শীতল ও ধন্য করিলেন।

বেলা অপরাহ্ণ দেখিয়া কন্যা আসিয়া পিতাকে বলিল, বাবা বেলা গিয়াছে, স্নানাহার করিবেন না? পিতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, বেলা যে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে কন্যার মুখে "বেলা গিয়াছে" শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল যথার্থই ত বেলা গিয়াছে। মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী। এখনও বিষয়গর্ত্তে মগ্ন রহিয়াছি। পরকালের সম্বল কিছুই ত সংগ্রহ করা হয় নাই। এখন উপায়! তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন এবং অবিলম্বে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইলেন। ইনিই লালা বাবু।

গোস্বামিমহাশয়ও এতদিন তাঁহার জীবনের উচ্চ লক্ষ্য, মহত্তর কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে জীবনপথে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। কিন্তু একটি ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি যে মহত্তর কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য ধরাধামে আগমন করিয়াছেন, তাহার দিকে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল।

রংপুর জেলার অন্তঃপাতী আমলগাছি গ্রামে তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল। একবার তিনি তথায় গমন করিলে তাঁহার একজন শিষ্যা স্বর্গীয়া গোবিন্দময়ী দাসী তাঁহার চরণ পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, প্রভো! আমি ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। শিষ্যার এই কাতরবাক্য শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, আমি নিজে মায়াবদ্ধ হইয়া ইহাঁকে কিরূপে উদ্ধার করিব? আমার উদ্ধার কে করে তাহার ঠিক নাই, আমি কি না অপরের পরিত্রাণের ভার লইতে যাইতেছি। হায় হায়! আমার

ন্যায় নির্ব্বোধ ত দ্বিতীয় নাই। আমি কি করিতেছি? আর ইহাতে ত আমার অপরাধ হইতেছে। আমি আর একার্য্য করিব না। সেই হইতে তিনি গুরুগিরি ছাড়িয়া দিলেন। কুলগুরুগণ চিরকাল গুরুগিরি করিয়া দীক্ষা দিয়া আসিতেছেন, চিরদিন শিষ্যালয়ে গমন করেন এবং শিষ্যগণও তাঁহাদিগের চরণপূজা করিয়া উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, কিন্তু কাহারও মনে কি একথা উদিত হইয়াছে যে আমি নিজে বদ্ধ ও মায়ার অধীন হইয়া অপরকে কিরূপে মুক্তি প্রদান করিব? কিন্তু এই সামান্য ঘটনায় গোস্বামিমহাশয়ের মনে কি ঘোরতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল? তিনি শিষ্যব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন।

ইহার কিছু পূর্ব্বে উক্ত রংপুর জেলায় তিনি কোন শিষ্যবাড়ীতে গমন করিতেছিলেন। পথে এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। কে একজন অদৃশ্য ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, "পরলোক চিন্তা কর।" চারিদিকে তিনি বক্তার সন্ধান করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে অতিশয় ভয় হইল। এসম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন—"ইহার পূর্ব্বে আর একটি ঘটনা হয়। আমাকে কে ডাকিয়া বলিল, পরলোক চিন্তা কর। কে বলিল, লোক দেখিলাম না। ভয়ে জ্বর হইল।" এই ঘটনায় তাঁহার মনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। তাঁহার বৈদান্তিক মতের ভিত্তি টলিয়া গেল।

---

মধ্যভাগ

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গোস্বামিপাদ বগুড়ায় যান। সেই স্থানে শিববাটীনিবাসী ৺কিশোরীলাল রায় ৺ হারাধন বর্ম্মন্ ও ৺ গোবিন্দচন্দ্র পাড়ে নামক তিন জন ব্রাহ্মের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তাঁহারা তিন জনই অতিশয় সাধুস্বভাব ও ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া, আলাপ করিয়া প্রভুপাদ বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলেন। তাঁহাদের বিশুদ্ধচরিত্র ও সাধুজীবন দেখিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গ তাঁহার বড়ই আরামদায়ক বোধ হইল। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে অনেক আলাপ করিলেন। তাঁহাদের ভক্তি ও ঈশ্বরে গাঢ় অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার মন ফিরিয়া গেল। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ব্রাহ্মত্রয় জানিতে পারিলেন যে, তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী পূজা অর্চ্চনা ইত্যাদি কিছুই মানেন না। তখন তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং নানা উপায়ে তাঁহার এই মত দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অশরীরী বাণী শুনিয়া পূর্ব্বেই গোস্বামিমহাশয়ের অদ্বৈতবাদের মূল নড়িয়া গিয়াছিল, এক্ষণে এই তিনটি ধার্ম্মিক লোকের সঙ্গ ও উপদেশে তাহা একেবারেই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। অদ্বৈতবাদী হইয়া তিনি মনের শান্তি হারাইয়া ছিলেন। পূর্ব্বে যখন তিনি পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি করিতেন, তখন তাঁহার মন শান্তিপূর্ণ ছিল। অদ্বৈতবাদে

তাঁহার সেই শান্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বশান্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্ত তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে এই তিনটি লোক যখন তাঁহাকে বলিলেন যে ঈশ্বর উপাসনা, ভগবৎ আরাধনা ভিন্ন কিছুতেই শান্তি হয় না, ভক্তি ভিন্ন কিছুতেই ত্রিতাপের জালা জুড়ায় না, তখন তাঁহার নিকট তাহা ঠিক বলিয়াই বোধ হইল। এইরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার অদ্বৈতমতের পরিবর্ত্তন হইল। গোস্বামিপাদের এইপ্রকার মনের অবস্থা জানিয়া ব্রাহ্মত্রয় তাঁহাকে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজে যাইতে বলিলেন। তাঁহাদের মনে হইল যে ব্রাহ্মসমাজে গিয়া যদি ইনি কিছুদিন দেবেন্দ্রবাবুর (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) উপদেশ শুনেন ও তাঁহার সঙ্গ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাঁর ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হইবে। এই মনে করিয়া তাঁহারা প্রভুপাদকে ব্রাহ্মসমাজে যাইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন। গোস্বামিপাদের ব্রাহ্মসমাজের উপর ভাল ভাব ছিল না। তিনি মনে করিতেন, কলিকাতায় ব্রহ্মজ্ঞানী নামে এক দল জাতিনাশা লোক আছে, তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া সকলে একত্র বসিয়া মদ্যপান ও হিন্দুর অভক্ষ্য মাংসাদি ভোজন করে। ব্রহ্মজ্ঞানীদের নাম শুনিলেই তাঁহার মনে দারুণ ঘৃণার উদয় হইত। ইহাঁদের কাছে ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিয়া তাঁহার সে ভাব চলিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে গোস্বামিমহাশয় কলিকাতায় গমন করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার এক বন্ধুর দুর্ব্যবহারে অতিশয় দুরবস্থায় পতিত হন। সুহৃদ্বর তাঁহার বাক্স হইতে টাকা লইয়া জুয়া খেলিয়া সমস্ত অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলেন। জুয়ারিরা সমস্ত অর্থই ঠকাইয়া লয়। তিনি লজ্জায় গাঢাকা দিয়া

রহিলেন। এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গোস্বামিপাদ অতিশয় দুর্দ্দশায় পড়িলেন। হাতে একটী পয়সা নাই, অথচ সংস্কৃত কলেজে পড়িবার প্রবল ইচ্ছা। কলিকাতায় থাকিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক জন দয়ালু ধনবান্ লোকের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি সাহায্য করিলেন না। তিনি কতকগুলি ভদ্রসন্তানকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত অসদ্ব্যবহার করাতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আর কাহাকেও বাটীতে রাখিবেন না, অথবা সাহায্য দিবেন না। এই স্থানে নিরাশ হইয়া সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় গোস্বামিপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট যাইয়া একখানি লিখিত আবেদনপত্র তাঁহার হাতে দেন। দেবেন্দ্রবাবু আবেদনপত্রখানি পাঠ না করিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার এইরূপ রুক্ষব্যবহারে গোস্বামিমহাশয় কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। বগুড়ার ব্রাহ্মদিগের নিকট তিনি তাঁহার অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কথায় দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছিল, এই ঘটনায় তাহা কিছুমাত্র কমিল না। তিনি মনে করিলেন, অনেক লোক সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়া ইঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে, সেইজন্যই ইনি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। সেই সকল লোকের অন্যায় ব্যবহারে ইনি আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। সকলকেই প্রতারক মনে করিতেছেন। লোকের নিকট প্রতারিত হওয়াতে ইনি আমার সত্য-বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না। এই সময়ে গোস্বামি-মহাশয় দুরবস্থার শেষসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিন চারি দিন তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। বিশাল কলিকাতা নগরে তাঁহার মাথা রাখিবার স্থান ছিল না। রজনীযোগে কখনও তাঁহাকে

কলেজের বারান্দায় কখনও গোলদিঘির বেঞ্চিতে শয়ন করিতে হইয়াছিল। কলিকাতায় তাঁহার অনেক আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন। বিপৎকালে তাঁহাদিগের নিকট গেলে পাছে তাঁহারা বিরক্ত হন, এইজন্য তিনি কাহারও কাছে যান নাই।*

* পৃথিবীর অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল মহাপুরুষ মহত্তর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বরণীয় হইয়াছেন, এই মর জগতে অমর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল পুণ্যশ্লোক মহাত্মগণের ভাগ্যে সুখভোগ অতি অল্পই ঘটিয়াছে। তাঁহাদিগকে সংসারের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম বর্ত্মে ক্ষতবিক্ষত-চরণে অগ্রসর হইয়া কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে। বিধাতা তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার অগ্নিপরীক্ষার ভিতরে ফেলিয়া তাঁহাদিগের বিশুদ্ধিসম্পাদন করিয়াছেন। সুখস্বচ্ছন্দতার সুকুমার কোলে যাঁহারা প্রতিপালিত হন, বিলাসিতার সুকোমল শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া যাঁহাদের দেহ পরিপুষ্ট হয়, তাঁহারা কখনও মহৎ হইতে পারেন না। মহত্ত্ব দারিদ্র্যের সহচর। দরিদ্রতার সাহায্য ভিন্ন মহত্ত্বের মুখ দেখা যায় না। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি, যাহা তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে, দুঃখ ও দরিদ্রতার অগ্নিপরীক্ষার দিনেই তাহা অর্জ্জিত হইয়াছিল। কপিলাবস্তুর রাজকুমার যতদিন রাজভোগে কালযাপন করিয়াছেন, ততদিন তাঁহাকে কে চিনিত? দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর পরীক্ষার সহিত যুদ্ধ করিয়া যখন তিনি বুদ্ধত্বলাভ করিলেন, তখনই তিনি জগৎপূজ্য হইলেন। এখনও পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ লোক তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগের রত্নখচিত রাজমুকুট যাঁহার পাদপীঠে সংলগ্ন হইতেছে, সেই মেরীর হৃদয়নিধির মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না, কল্যকার আহারের সংস্থান ছিল না। এই স্থানেই কি শেষ? না, শেষে তাঁহাকে ক্রুশে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। আমাদের প্রাণের নিমাই বাঙ্গালীর হৃদয়নিধি পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে কেবল এইরূপ ঘটনাই দৃষ্টিতে পড়ে।

মহাজনগণের মহৎ জীবনের এই সকল ঘটনা দুর্ব্বল নরনারীর কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে বিশেষ সাহায্য করে। কঠোর পরীক্ষার দিনে মানুষ যখন অবসন্ন হইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন ইহা মৃতসঞ্জীবনীর কার্য্য করে। অবসাদগ্রস্ত মনে আশা ও বল আনিয়া দেয়। সমুদ্রগামী নাবিকগণ যেমন ধ্রুবতারার সাহায্যে সাগরের কূলপ্রাপ্ত হয়, সংসারসমুদ্রে পতিত জনগণও সেইরূপ মহাজনগণের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া ভবজলধির পরপারে যাইতে সমর্থ হয়

একদিন অপরাহ্নে একটি ভদ্রলোক তাঁহার উপবাসক্লিষ্ট শুষ্ক মুখ দেখিয়া তাঁহার আহার হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে দিন তাঁহার কিছুই খাওয়া হয় নাই। ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, না মহাশয়, সমস্ত দিন আমি কিছুই খাই নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া বাবুটি তাঁহার হস্তে একটি সিকি দিয়া সস্নেহবাক্যে বলিলেন, যাও বাবা, দোকানে গিয়া কিছু খাও। গোস্বামিমহাশয় সিকিটী লইয়া দোকানে যাইতেছেন, এমন সময়ে পথে সেই অর্থঅপহরণকারী বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বন্ধু ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিয়া বিরস বদনে বলিলেন, ভাই, আমি তোমার অর্থ হরণ করিয়া যেমন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, ভগবান আমাকে তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন। জুয়া খেলিতে গিয়া আমার যথা-সর্ব্বস্ব গিয়াছে। একটি পয়সাও নাই। সমস্ত দিন কিছুই খাওয়া হয় নাই, অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। বন্ধুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় সস্নেহবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, ভাই, সে কথা ছাড়িয়া দাও। তাহা মনে করিয়া আর কষ্ট করিও না, যাহা হইবার হইয়াছে। আমার কাছে একটি সিকি আছে, চল দোকানে যাইয়া কিছু খাই। এই বলিয়া দুই বন্ধুতে নিকটবর্ত্তী দোকানে যাইয়া আহার করিলেন। অতঃপর তাঁহার আর্থিক কষ্ট দূর হইলে তিনি বেচুচাটুয্যের বাড়ীর কিয়দংশ ভাড়া করিয়া উক্ত বন্ধুর সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

---

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণও এই সকল মহাপুরুষদের অন্যতম। তিনিও মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকেও পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অন্য মহাজনগণ যেমন সমস্ত বিঘ্নের, সমুদায় বাধার মস্তকে পদস্থাপন করিয়া শেষে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণও শেষে সেইরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিখ্যাত মাতাল ছিলেন। তাঁহার বাড়ী সুরাপানের একটি প্রকাণ্ড আড্ডা ছিল। অনেক লোক তথায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একত্র হইয়া মদ্যপান করিতেন। চাটুয্যে মহাশয় গোস্বামিপাদকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি গোস্বামিমহাশয়ের নিকট যখন এই ঘৃণিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন প্রভুপাদ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তেজের সহিত তাঁহার মুখের উপর বলিলেন, কি, জগৎপূজ্য অদ্বৈত প্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি মদ খাইব? তাহা কখনও হইবে না। এই ঘৃণিত কার্য্য আমি কখনও করিব না। এই বলিয়া তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। ইহার পর আর চাটুয্যে মহাশয় গোস্বামিপাদকে মদ খাওয়ার কথা বলিতে সাহসী হন নাই। গোস্বামিমহাশয়ের প্রভাবে তাঁহাদের এতদূর ভয় হইয়াছিল যে, তাঁহারা আর তাঁহার সাক্ষাতে মদ খাইতেন না।

বগুড়ায় ব্রাহ্মদের নিকট ব্রাহ্মসমাজে যাইবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন সে কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি পরবর্ত্তী বুধবারে যোড়াসাঁকোস্থ ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন। তথাকার তানলয়বিশুদ্ধ মধুর সঙ্গীত ও ভক্তিপূর্ণ স্তোত্রপাঠ শ্রবণ এবং বহুলোককে একসঙ্গে উপাসনা করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল। ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার একেবারে চলিয়া গেল। দেবেন্দ্রবাবু সেদিন "পাপীর দুরবস্থা ও ঈশ্বরের অসীম দয়া" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। এই উপদেশ তাঁহার নিকট অতিশয় মিষ্ট লাগিল। তাঁহার পূর্ব্বজীবনের ভক্তিভাব আজ স্মৃতিপথারূঢ় হইল। এতদিন

যে তিনি ইষ্টদেবতার আরাধনা করেন নাই, সেই কথা মনে উদিত হওয়াতে তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত ও নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার ও শূন্য বোধ করিয়া ব্যাকুল অন্তরে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিলেন, "হে দয়াময় ঈশ্বর! প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস নাই। প্রচলিত কোন ধর্ম্মে আমি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছি না। আমার ন্যায় হতভাগ্য পৃথিবীতে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। তুমি অনাথের নাথ, আমি তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমাকে কৃপা কর। তোমাকে আমি আর কখনও পরিত্যাগ করিব না।" এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার প্রাণের সমস্ত অশান্তি, সমুদায় জ্বালা চলিয়া গেল। এইরূপ হওয়াতে তাঁহার মনে হইল, আহা! শান্তিলাভের এমন সহজ উপায় থাকিতে আমি এতদিন কত অশান্তি ভোগ করিয়াছি। আমাকে শান্তি দিবার জন্যই ভগবান্ আজি আমাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছিলেন। তিনি আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই দেবেন্দ্রবাবুর ভিতর দিয়া এই মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রেরণ করিয়াছেন।

গোস্বামিমহাশয় সেই দিনই দেবেন্দ্রবাবুকে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের নেতা ও গুরুপদে বরণ করিলেন। এই হইতে তিনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা হইলে তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। প্রার্থনা করিবামাত্র তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি জানিতে পারিতেন। প্রার্থনা করিয়া তিনি যাহা জ্ঞাত হইতেন, তাহা লিখিয়া রাখিতেন। পরে সেইগুলি "ধর্ম্মশিক্ষা" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ধর্ম্মশিক্ষার মতসকল হয়ত ব্রাহ্মধর্ম্মানু-

মোদিত হইবে না। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যখন পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া মতপ্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইল।

অতঃপর তিনি বগুড়ায় যান। বগুড়ার ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজে গমন এবং ধর্ম্মবিষয়ে মতপরিবর্ত্তনের কথা অবগত হইয়া অতি-শয় আনন্দিত হইলেন।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন
## ও
## উপবীত পরিত্যাগ

শিষ্যব্যবসাদ্বারাই অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামিদের জীবিকানির্ব্বাহ হইত। প্রভুপাদ যখন সে ব্যবসা ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহাকে সংসারনির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায় দেখিতে হইল। অনেক ভাবিয়া মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করাই তিনি সমীচীন মনে করিলেন। এ সম্বন্ধে জননীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি বগুড়া হইতে শান্তিপুরে আসিলেন এবং মাতাকে সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহার সম্মতি চাহিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া স্বর্ণময়ী দেবী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং শিষ্যব্যবসা ত্যাগ করিবার সংকল্প ছাড়িবার জন্য, পুত্রকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা জননীকে পুত্রের কথায় সম্মতি দিতে হইল। গোস্বামিপাদের মেডিকেল কলেজে পড়াই স্থির হইল। কিন্তু তখন কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময় নহে, এজন্য তাঁহাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইল। এই সময়টা তিনি অন্য কোথাও না গিয়া শান্তিপুরেই রহিলেন। একদিন তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া আলোচনা করিতেছিলেন যে, মনুষ্যমাত্রই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির তিনিই পিতামাতা। কাজেই সমুদায় নরনারীর মধ্যে ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধ। আমরা যে জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া কাহাকেও

পূজ্য ও পবিত্র বোধ করি, কাহাকেও আবার অশুচি অস্পৃশ্য মনে করিয়া ঘৃণা করি, স্পর্শ করিতে চাহি না, ইহা অত্যন্ত অন্যায়। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত মনুষ্যই সমান। এগার বৎসর বয়সের একটি বালক সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল, গোস্বামিপাদের এই কথা শুনিয়া সে বলিল, জাতিভেদই যদি মানেন না, তবে পৈতা রাখিয়াছেন কেন? মুখে বলিব জাতিভেদ কিছু না, উহা মানিনা, উহা মানা অন্যায়, আর গলায় পৈতা ঝুলাইয়া বামনাই দেখাব? ইহা কি কপটতা ও ভণ্ডামি নহে? বালকের কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ চমকিয়া উঠিলেন। এত বড় কথাটা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, এই ভাবিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি অতি সত্য কথাই বলিয়াছ। পৈতা রাখিলে বস্তুতঃই জাতিভেদ মানা হয়। উপবীত জাতিভেদেরই চিহ্ন। আমি আর ইহা রাখিব না। এই বলিয়া তিনি পৈতা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে উপবীতত্যাগ করিতে দেখিয়া বালকটী তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাতাকে গিয়া একথা বলিয়া দিল। বালকের মুখে পুত্রের উপবীতত্যাগের সংবাদ পাইয়া জননী ছুটিয়া আসিলেন এবং পুত্রকে পৈতা পরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গোস্বামিপাদ সম্মত হইলেন না। ইহাতে মাতা আত্মহত্যা করিতে গেলেন। তখন ভয় পাইয়া গোস্বামিপাদ পৈতাগ্রহণ করিলেন। পুত্রকে পৈতা পরিতে দেখিয়া মাতা শান্ত হইলেন।

অতঃপর গোস্বামিমহাশয় কলিকাতায় আসিয়া মেডিকেল কলেজের বাঙ্গলা বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন। সে সময়ে ইংরাজী ও বাঙ্গলা বিভাগ এক বাড়ীতেই ছিল। পটলডাঙ্গায় কলেজবাড়ীতে তখন দুই বিভাগের পড়াশুনা হইত। গোস্বামিমহাশয় কলেজে প্রবেশ

করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আর কখনও ভুলিতেন না। এজন্য তাঁহাকে কখনও অধ্যাপকগণের বক্তৃতা লিখিয়া লইতে হয় নাই। তাঁহাদিগের কথা তিনি শুনিয়াই মনে রাখিতেন। তিনি শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। কেবল কি লেখা পড়ায় শ্রেষ্ঠ? সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইত। তাঁহার চরিত্রের প্রভাব এখানেও বিস্তৃত হইয়াছিল। যে সকল বালক তাঁহার সহিত পড়িত, তাঁহার উন্নত চরিত্র দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভাল বাসিত, তাঁহার অনুগত হইয়া চলিত। এখানেও তিনি সকলের নেতা হইয়া সকলকে পরিচালিত করিতেন। সকলেই তাঁহার কথা শুনিয়া চলিত।

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নসময়েই তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি ও তাঁহার বাল্যসখা ৺ অঘোরনাথ গুপ্ত এবং ৺গুরুচরণ মহলানবীশ এক সঙ্গে ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর উপবীত ধারণ করা তাঁহার নিকট আবার অনুচিত ও অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। তিনি একদিন মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! উপবীতধারণ ও আমিষভোজন উচিত কি না? মহর্ষি বলিলেন, উপবীত ধারণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পৈতা পরিত্যাগ করিলে সমাজের অনিষ্ট করা হয়। এই দেখ, আমি পৈতা রাখিয়াছি। মৎস্য মাংস আহার না করিলে শরীররক্ষা হয় না। মশা ছারপোকা যখন বধ করা হয়, তখন অন্য প্রাণিবধে দোষ কি? তাঁহার দুই কথাই গোস্বামিমহাশয়ের মনঃপূত হইল না। কিন্তু তাঁহাকে কিছু বলি-

লেন না ; কেন না দেবেন্দ্রবাবুকে তিনি গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার কথায় বাদপ্রতিবাদ করিতেন না।

মেডিকেল কলেজে প্রায় তিন বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর শেষ পরীক্ষা হইবার কিছু পূর্ব্বে কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্স সাহেবের সহিত বাঙ্গালাবিভাগের ছাত্রগণের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। চিবার্স সাহেব বাঙ্গলাবিভাগের একটি ছাত্রকে ঔষধ চুরীর অপবাদ দিয়া পুলিশের হাতে দেন। ইহাতে বাঙ্গলাবিভাগের সমস্ত ছাত্র আপনাদিগকে অতিশয় অবমানিত বোধ করিয়া একযোগে কলেজ পরিত্যাগ করে। এই কার্য্যে গোস্বামিপাদই সকলের নেতা ছিলেন। তিনি গোলদীঘিতে সভা করিয়া বক্তৃতাদ্বারা সকল ছাত্রকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কলেজের ছাত্রগণ প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বিদ্যাসাগর ছাত্রগণের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে অধ্যক্ষ ছাত্রগণের প্রতি অতিশয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি ছাত্রগণের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ছোটলাট বিডন্ সাহেবকে সমস্ত জানাইয়া গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন। লাটসাহেবের আদেশে কলেজের অধ্যক্ষ বিনাদণ্ডে ছাত্রদিগকে কলেজে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ছাত্রগণের প্রতি তিনি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে দুঃখপ্রকাশ করিতে হইয়াছিল। দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের দয়ার উৎস এ ক্ষেত্রেও পূর্ণভাবে উৎসারিত হইয়াছিল। অনেক ছাত্র কলেজে বৃত্তি পাইত। বৃত্তিভোগী ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র ছিল ; বৃত্তির টাকা কয়েকটি সম্বল করিয়া তাহারা পড়ার খরচ চালাইত। কলেজ পরিত্যাগ করাতে তাহাদিগের বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল ; কাজেই তাহাদিগের সমূহ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা জানিতে পারিয়া ছাত্রদিগকে কলেজে অনুপস্থিত সময়ের বৃত্তিদান করিয়া তাহাদিগের অর্থকষ্ট মোচন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই উপলক্ষে ছাত্রদিগের যাহা কিছু ব্যয় হইয়াছিল, সে সমস্তও তিনিই নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। গোলযোগ মিটিয়া গেলে গোস্বামিমহাশয় সমস্ত ছাত্রের সহিত কলেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী মেডিকেল কলেজের কতগুলি ছাত্রের সহিত একত্রিত হইয়া তিনি "হিতসঞ্চারিণী" নামে এক সভাস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সভায় এক দিন আলোচনা হইল যে আমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, প্রাণপণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ আলোচনার পর তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। সকলে তাঁহার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, কই, দেবেন্দ্রবাবু ত পৈতা ফেলেন নাই, তবে তুমি কেন ফেলিলে? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, পৈতা জাতিভেদের চিহ্ন, আমি যখন জাতিভেদ মানি না, তখন পৈতা রাখিব কেন? পৈতা রাখিলে ত জাতিভেদ স্বীকার করাই হইল। তোমরা যে যাহাই বল, পৈতা রাখা আমার নিকট সম্পূর্ণ অবৈধ বলিয়া বোধ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ-সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উপবীতত্যাগবিষয়ে গোস্বামিপাদকে অতিশয় উৎসাহিত করিয়াছিলেন। (১)

(১) সেই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই আবার নিজের ভাগিনেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পৈতাত্যাগ করিলে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে সঙ্গতসভা নামে এক ধর্ম্মালোচনাসভা স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার বয়স্যগণ এই সভাতে সপ্তাহে একবার সমবেত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনের অবস্থা ও তাহার উন্নতির উপায়সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। কেশববাবুর কলুটোলার বাড়ীতে ইহার অধিবেশন হইত। পঞ্জাবের শিখদিগের সঙ্গতসভার অনুকরণে মহর্ষি ইহার সঙ্গতসভা নাম রাখিয়াছিলেন। যুবক ব্রাহ্মগণ এখানে একত্র হইয়া অসংকোচে ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্ববিধ প্রশ্নের আলোচনা করিতেন। এই সভাতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন। গোস্বামিমহাশয় প্রথমে এই সভার সহিত পরিচিত ছিলেন না। ইহার সাংবৎসরিক উৎসবের সময় তিনি প্রথমে এই সভায় গমন করেন। তথায় অনুষ্ঠাননামে একখানি পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। তাহাতে লিখিত ছিল যে, উপনয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করিবে না। ইহা পাঠ করিয়া তিনি সঙ্গতসভায় নিয়মিত ভাবে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। এই স্থানেই কেশববাবু ও অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি শান্তিপুরে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার উপবীত পরিত্যাগ ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। শান্তিপুরের সমস্ত লোক তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রতি ভয়ানক নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। পথে বাহির হইলে কেহ তাঁহাকে গালাগালি দিত, কেহ গায়ে ধূলি ও লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত, কেহ কেহ প্রহার করিতেও উদ্যত হইত। যাহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিতেন। সকলেই তাঁহাকে অপমান ও

নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জননী পৈতা লইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিতে গেলেন, তিনি কিছুতেই পরিলেন না। তাহাতে তাঁহার মাতা তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মাতাকে কাতরভাবে রোদন করিতে দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে চৈতন্যলাভ করিয়া তিনি মাতাকে বলিলেন, "যদি আমাকে পৈতা পরিতে হয়, তাহা হইলে আমি প্রাণ-ত্যাগ করিব।" মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আর তোকে পৈতা পরিতে বলিব না। আমি মনে করিব, তোর উপবীত হয় নাই। তুই পৈতা না লইয়া বাঁচিয়া থাক।" মাতাঠাকুরাণীর এই আদেশবাণী শুনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। জননী ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা হিন্দুসমাজদ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রকাশ্য সভাতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি কেবল তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে উপদ্রুত করিতে লাগিলেন। ভ্রাতাকে পৈতৃকসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই।

অতঃপর শান্তিপুরস্থ গোস্বামিবংশের নেতাগণ তাঁহাকে অবিলম্বে শান্তিপুর পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, তুমি সত্বর এই স্থান পরিত্যাগ না করিলে তোমার অসদ্দৃষ্টান্তে অনেকের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে। হয়ত অনেকে তোমার অনুসরণ করিবে। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, আমাকে কিছুদিন শান্তিপুরে থাকিয়া ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহার জন্য আমি প্রাণপণে যত্ন করিব। আমার বিশ্বাস এই শ্যামসুন্দরের মন্দির কালে

ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত হইবে। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিলেন। গোস্বামিমহাশয়ের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টায় সেইবারেই শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি তাঁহার শাশুড়ী ও পত্নীর সহিত কলিকাতায় আগমন করিলেন। উপবীতত্যাগ করিলে (১) সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার ভগিনীপতি ৺কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয় তাঁহাকে ছাড়েন নাই। মৈত্রমহাশয়ও ব্রাহ্ম হইয়া সপরিবারে তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন।

একদিন সঙ্গতসভায় গিয়া তিনি শুনিলেন যে, যশোহর জেলার বাগআঁচড়া গ্রামে অনেকগুলি লোক ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু সেখানে পাঠাইবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছে না। গোস্বামিপাদ বাগআঁচড়ায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে "কলেজের শেষ পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, এ সময়ে পরীক্ষা না দিয়া কলেজ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এখন কলেজ ত্যাগ করিলে ক্ষতি হইবে। অর্থাগমের কথাও ত ভাবা উচিত। আত্মীয়-গণের কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন "যিনি মরুভূমিতে তৃণগুল্মাদি রক্ষা করিতেছেন, অগাধ সমুদ্রগর্ভে প্রাণীদিগের আহার যোগাইতেছেন, তিনি যে আমাকে অনাহারে মারিয়া ফেলিবেন, এ বিশ্বাস আমার নাই। তিনি অবশ্যই আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার-গ্রহণ করিবেন।" এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারব্রতে জীবন সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কেশববাবু তাঁহাকে বলিলেন, প্রচারক

(১) উপবীতপরিত্যাগ করিয়াও তিনি গায়ত্রীভ্রষ্ট হন নাই। তিনি আজীবন প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত গায়ত্রী জপ করিয়াছেন।

হইতে হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে। গোস্বামিমহাশয় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া প্রচারক হইলেন।

১৭৮৫ শকের ভাদ্র মাসে তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহাকে প্রচারকপদে নিযুক্ত করিবার সময় মহর্ষি তাঁহাকে বলেন যে, "প্রচারের জন্য আমি তোমাকে যে স্থানে যাইতে বলিব, তোমাকে সেই স্থানে যাইতে হইবে।" গোস্বামিমহাশয় মহর্ষির এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি ভগবানের আদেশ ও ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিব। মনুষ্যের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিব না।" তাঁহার তেজস্বিতা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখিয়া মহর্ষি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "তুমি স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম প্রচার কর।" গোস্বামিপাদ তাঁহার প্রচার ব্রতসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমি এই গুরুভার প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ইহা সাধন করিতে সক্ষম হইব, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। যখন স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন হতাশ হইয়া পড়ি। যখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তখন অতুল সাহসে পূর্ণ হইয়া উঠি। আমি এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া স্থিরনিশ্চয় করিলাম যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করাই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের একমাত্র উপায়। আমি এই প্রকৃত উপায়টি অবলম্বন করিয়া উক্ত মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওতঃ প্রথম কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজগুলিতে গমনাগমন করিতে লাগিলাম।" (১)

---

(১) তাঁহার প্রচারব্রতগ্রহণসম্বন্ধে তিনি "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"আমি নামের বা গৌরবের জন্য প্রচারব্রত গ্রহণ করি নাই। আমার আত্মার গভীর স্থানে কি একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে। এ শক্তি আমার নহে; ইহা আমার যত্ন-সাপেক্ষ নহে। ইহার উপর আমার কোন প্রভুত্ব নাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গে ও

কলেজত্যাগ করিয়া প্রচারক হইবার পর একদিন রাস্তায় তাঁহাদিগের কলেজের অন্যতম শিক্ষক স্বর্গীয় তামেজ খাঁর সহিত তাঁহার দেখা হয়। খাঁ সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, গোঁসাই, তুমি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বড় ভাল করিয়াছ। কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্স সাহেব কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের সহিত পরামর্শ

---

ইহার সঙ্গে প্রায় কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই শক্তি আমাকে অন্ধের ন্যায় পরিচালনা করে এবং ভবিষ্যতে কোথায় পরিচালনা করিবে, বলিতে পারি না। ইহা আমার প্রবৃত্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে আদেশ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছানুমত কার্য্যসম্পর্কে ইহাই আমাকে উত্তেজনা করে এবং নিজ আত্মার মহোন্নতি সাধন করিতেও ব্যাকুল করে। ইহার আদেশ এরূপ পরিষ্কার ও বোধগম্য যে, আমি কখনও ইহা বিস্মৃত হইতে ও অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

ইহাই আমাকে প্রচারকনাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি সর্ব্বদা মনকে বুঝাই; বলি, হৃদয়, তুমি কি জানিতেছ না যে তুমি অত্যন্ত মলিন ও অধম। তুমি কি সাহসে প্রচারকার্য্যের গুরুভার আপনার মস্তকে লইতে সাহসী হইলে? কিন্তু পরক্ষণেই উপরিলিখিত শক্তি আমার অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং বলে, তুমি অগ্রসর হও। আমার বিশ্বাস এই শক্তির আদেশ ঈশ্বরের বাক্য। ইহা প্রচারকের জীবন, ইহাই ভয়বিপদের সম্বল, নিরাশার ঔষধ, প্রার্থনার ইন্ধন। ইহাব্যতীত আমি অন্ধ অপেক্ষাও অসহায় হইয়া যাই, মুমুর্ষু অপেক্ষাও নির্জীব হইয়া পড়ি।

আমি সততই এই শক্তির আদেশ গ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করি। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, তাহা প্রতিপালন করি এবং যখনই প্রতিপালন করিতে সাহসী হই, তখনই সফলতা লাভ করি। তখন আমার আত্মাতে আলোক আসে। আমি যাহা বলি, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। আমি যাহা বলি, যাহা করি, তাহাতে আমার অণুমাত্রও গৌরব নাই। কারণ আমি নিঃসন্দেহ জানিতে পারি যে, ইহা আমার শক্তি হইতে নহে। যদি আমার শক্তি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে লোকের নিকট এরূপ হাস্যাস্পদ ও বিফল হই যে তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অক্ষম। কার্য্যের সময় আপনার প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, ইহা মনে হইলে, যথার্থ বলিতেছি,

করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি তোমাকে কোন সূত্রে ফৌজদারীতে সোপর্দ করিবেন। তুমি গোলযোগের নেতা ছিলে বলিয়া তোমার উপর তাঁহার ভারি আক্রোশ। আমিও সভায় উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু তাঁহাদিগের মতের অনুমোদন করিনাই।

---

আমার শরীর কম্পিত হয়। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্ভবে না এবং কোন কার্য্যের গৌরবেই আমার অধিকার নাই। পাপে-পুণ্যে, সুখেঅসুখে, সম্পদেদারিদ্র্যে আমি এই অদ্ভুত শক্তির আদেশ শুনিতে পাই। নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ দেখিয়া হৃদয় যখন উচ্চ ও প্রশস্ত হয়, তখন ইহা আমাকে বলে, তুমি এমত সুন্দর জগতের এক স্থানে বসিয়া কি করিবে? যখন সুমন্দ সুমিষ্ট মরুত আমার তাবৎ শরীরকে সুখী করে, তখন ইহা বলে, তুমি কি সুখে গৃহে বসিয়া আছ? এই অনিলহিল্লোল কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, বিবেচনা কর এবং তুমিও সেইরূপ সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ কর। অমনি আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং যেখানে তাঁহার কার্য্য সেইখানেই যাইতে ব্যস্ত হয়। "অগ্রসর হও" এই প্রকার উক্তির আদেশ শুনিলে আমার হৃৎকম্প হয়, ভয়ে, দুঃখে, বিশ্বাসে, বিস্ময়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয়। আমি কোন ক্রমেই ঐ আদেশ না শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহা আমার গৌরব নহে, কিন্তু মনের কথা এবং কেনই যে এ কথা লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমার সকল অবস্থাতেই আমি ইহার বশবর্ত্তী হইয়াছি এবং সকল অবস্থাতেই হইব। ইহার বশবর্ত্তী হইয়া আমি আশার অধিক ফললাভ করিয়াছি। অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও নিরাশা ইহারই জন্য আমাকে গতাসু করিতে পারে না।"

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## কলিকাতা বা আদি ব্রাহ্মসমাজে অবস্থান

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকপদে অভিষিক্ত হইয়া কোন্নগর, শ্রীরামপুর, সাঁতরাগাছি, লেবুতলা, পটলডাঙ্গা প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজে প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই সকল স্থানে পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি অনেক সময় গোলদীঘিতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতাদ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক লোক জমা হইত।

১৭৮৫ শকের ১১ই পৌষ তিনি বাগআঁচড়া গ্রামে যাইয়া নয় দিবসে তেইশটি পরিবারকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আনয়ন করেন। বাগআঁচড়ার লোকেরা নিঃস্ব ও অজ্ঞ, কিন্তু তাঁহারা সকলেই অতিশয় সরলপ্রকৃতি ও ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। তাঁহারা গোস্বামিমহাশয়কে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তাঁহার শিক্ষা ও সঙ্গপ্রভাবে তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পূর্ব্বে তাঁহারা সত্য মিথ্যার ধার ধারিতেন না। এক্ষণে সম্পূর্ণ সত্যবাদী হইলেন। পূর্ব্বে মিথ্যা মোকদ্দমা করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, এক্ষণে মিথ্যার ভয়ে মোকদ্দমা হইতে বিরত হইলেন। ব্যবসাক্ষেত্রে একদামে ক্রয়বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। প্রভুপাদ অতঃপর কুমারখালী, সিলাইদহ, পাবনা প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য গমন করেন। ঐ অঞ্চলে কিছুদিন প্রচার করিয়া ১৭৮৬ শকের বৈশাখ মাসে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

একবার বাগআঁচড়া যাইবার পথে গোস্বামিপাদের সহিত স্কুল ইনেস্‌পেক্টর্ উড্রো সাহেবের দেখা হয়। সাহেব স্কুল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। পথশ্রমে শ্রান্ত হইয়া সাহেব চাপানের জন্ত ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সে স্থানে চাপানের কোন সুবিধাই তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইহা জানিতে পারিয়া গোস্বামিপাদ গ্রামে যাইয়া সাহেবের জন্ত চা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিলেন। চাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া সাহেব গোস্বামিমহাশয়ের নিকট বারংবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিলেন।

এই সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। তাঁহাদের দুই জনেরই উপবীত ছিল। এক দিন বাগআঁচড়ার ৺ প্রাণনাথ মল্লিক গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, কলিকাতা সমাজে উপবীতধারী আচার্য্যগণ উপাসনা করেন, ইহা অতিশয় অন্যায়। কলিকাতা-সমাজ সকলের আদর্শ। তাহাতে এরূপ অবৈধকার্য্য হওয়া উচিত নহে। প্রাণনাথ মল্লিকের কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয়ের মনে এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাঁহার নিকটও এ কার্য্য অবৈধ বোধ হইল। তখন তিনি কেশববাবুকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, কলিকাতাসমাজে উপবীতধারী আচার্য্যগণ উপাসনার কার্য্য করিলে আমি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্রব রাখিব না। কেশববাবু এই পত্র মহর্ষিকে দেখাইলেন। দেবেন্দ্রবাবু ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে কেশব বাবুপ্রণীত অনুষ্ঠাননামক পুস্তিকা পাঠ করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গোস্বামিপাদের পত্র পড়িয়া তাহা অনুমোদন-পূর্ব্বক বলিলেন যে, বেচারাম বাবু ও বেদান্তবাগীশ কিছুতেই উপবীত-ত্যাগ করিতে সম্মত হইবেন না। দুই জন উপবীতত্যাগী আচার্য্য

পাইলেই আমি তাঁহাদিগকে বেদীর কার্য্যে নিযুক্ত করিব। কেশববাবু দেবেন্দ্রবাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় ও অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিলেন। গোস্বামিপাদ প্রথমে কেশববাবুর প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি নিজেকে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। দেবেন্দ্রবাবু গোস্বামিমহাশয় ও অন্নদাবাবুকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৮৬ শকের ৬ই ভাদ্র তাঁহারা আচার্য্যপদে নিযুক্ত হন। বেদান্তবাগীশ ও বেচারামবাবুকে অতিক্রম ও পদচ্যুত করিয়া উপবীতত্যাগী, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক লোককে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করাতে প্রাচীন ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা দেবেন্দ্রবাবুকে বলিতে লাগিলেন যে, বেদান্তবাগীশ ও বেচারামবাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে বিচ্যুত করা আপনার নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইয়াছে। কেশববাবু যে ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি যে প্রকার হিন্দুসমাজবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রাখিতে পারিব না। অচিরে ব্রাহ্মসমাজ লোকশূন্য হইবে। দেবেন্দ্রবাবু বরাবরই রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ও সমাজবিপ্লবজনক সংস্কারকার্য্যের বিরোধী ছিলেন। যুবক ব্রাহ্মদিগের সকল কাজের সহিত তিনি সম্বন্ধ রাখিতে পারিতেন না। আর তাঁহাকে কেহ কিছু বলিলে, তিনি সহজেই তাহা বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের কথায় কেশববাবুর কার্য্যে তাঁহার মনে আশঙ্কার উদয় হইল। এই সময়ে কেশববাবু ও তাঁহার সহচরদিগের চেষ্টা ও উদ্যোগে দুইটি সংকর বিবাহ হয়। নব্য ব্রাহ্মদিগের এই কার্য্যে

দেবেন্দ্রবাবু অত্যন্ত ভীত হইলেন। তখন তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা যুবক ব্রাহ্মদিগের হস্তে ছিল। তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই বিবাহের সংবাদ প্রচার করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু ইহা পাঠ করিয়া যুবকদলকে সমাজসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্ব হইতে দূরে রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে যখন এই প্রকার আন্দোলনস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময়ে ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে ব্রাহ্মসমাজের বাটী ভগ্ন হইয়া গেল। ঝড়ের দিন কলিকাতার রাজপথে একগলা জল হইয়াছিল। গোস্বামিমহাশয় এই জলের ভিতর দিয়া একাকী পদব্রজে ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। সমাজে তিনি ভিন্ন আর কেহই উপস্থিত হন নাই। উপাসনান্তে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি কেশববাবুকে পাল্কী করিয়া সমাজে যাইতে দেখিলেন। কেশববাবু গোস্বামিপাদকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সমাজে গেলেন এবং দুই জনে উপাসনা করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রবল ঝড়ে ব্রাহ্মসমাজের বাটী ভগ্ন হইয়া গেলে তাহার সংস্কারের প্রয়োজন হইল। দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মসমাজ কিছুদিনের জন্য আপনার বাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে যে দিন প্রথম উপাসনা হইল, সেই দিন উপবীতত্যাগী আচার্য্যদ্বয় উপাসনা করিতে গিয়া দেখেন যে তাঁহাদিগের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ভূতপূর্ব্ব উপবীতধারী আচার্য্যদ্বয় উপাসনাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা যুবক ব্রাহ্মদের নিকট অসহ্যবোধ হইল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উপাসনাস্থানে গেলেন না। রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সত্যও ন্যায়ের সজীব মূর্ত্তি বিজয়কৃষ্ণও দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াইয়া দুই বাহু বিস্তার পূর্ব্বক দ্বাররোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওখানে কেহ যাইবেন

না। ওখানে উপবীতধারী আচার্য্যগণ বেদীতে বসিয়া উপাসনার কার্য্য করিতেছেন। কেশব বাবু কিছুক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে উপাসনাস্থানে গেলেন এবং উপাসনায় যোগ দিলেন। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া দ্বারে অনেক লোকের ভিড় হইল। গোস্বামিমহাশয় তাঁহাদের কাছে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। পরে প্রভুপাদের সহিত অন্যস্থানে যাইয়া উপাসনা করিলেন। পরে কেশববাবুও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহারা দেবেন্দ্রবাবুকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিলেন, তাহা যুবক ব্রাহ্মগণের মনঃ-পূত হইল না। দেবেন্দ্র বাবুর উত্তরে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না। অধিকন্তু তাঁহারা তাঁহার অযথা কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। বুধবার ভিন্ন অন্য এক দিনে তাঁহারা সমাজঘরে উপাসনা করিতে চাহিলেন, দেবেন্দ্র বাবু তাহাতেও সম্মত হইলেন না। তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হওয়া ভিন্ন আর তাঁহাদের গত্যন্তর রহিল না। একসঙ্গে থাকিবার জন্য যুবক ব্রাহ্মগণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্র বাবুর প্রতিবন্ধকতায় তাঁহাদের সমস্ত যত্নই বিফল হইল। তিনি যুবকদলকে ব্রাহ্ম-সমাজে কোন অধিকার দিতে সম্মত হইলেন না। কাজেই তাঁহা-দিগকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইল। ১৮৬৬খৃঃ অব্দে তাঁহারা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন। যুবকব্রাহ্মগণ কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ পরিত্যাগ করিবার সময় দেবেন্দ্র বাবুকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র বাবুও অভিনন্দন পত্রের এক উত্তর প্রদান

করিয়াছিলেন। যুবক ব্রাহ্মগণের নিকট হইতে মহর্ষি-সম্ভাষণ-প্রাপ্তির প্রতিদানস্বরূপ তিনি কেশব বাবুকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম ভিন্ন রাখা হইল। মহর্ষি তাহার আদি ব্রাহ্মসমাজ নাম রাখিলেন। এই সকল গোলযোগে গোস্বামিমহাশয়ের মনে অতিশয় শুষ্কতা ও অশান্তি উপস্থিত হইল। তিনি ব্রাহ্মসমাজকে স্বর্গ ও ব্রাহ্মগণকে দেবতা মনে করিতেন; বিশেষতঃ দেবেন্দ্র বাবুকে তিনি আদর্শ ও গুরু বলিয়া জানিতেন। তাঁহার এইরূপ অযথা ব্যবহারে প্রভুপাদের মনে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হইল। কলিকাতা তাঁহার নিকট অশান্তির আলয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিছুতেই সেখানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তিনি শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। শান্তিপুরের উপকণ্ঠস্থ গঙ্গাতীরের প্রশস্ত চড়া প্রকৃতির রম্যনিকেতন। নিসর্গসুন্দরী প্রিয়সখী শান্তিদেবীর সহিত মিলিত হইয়া এই মনোরম স্থানে নিয়ত নর্ম্মক্রীড়া করিয়া থাকেন। স্থানে স্থানে স্বভাবজাত বিবিধ বৃক্ষরাজিরচিত সুন্দর নিকুঞ্জকাননে কিছুকাল উপবিষ্ট হইলে অশান্ত মনে শান্তরসের আবির্ভাব হয়, হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তির বিমল স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে স্নিগ্ধরশ্মি সুধাকরের, রজতশুভ্র রশ্মিমালা অঙ্গে মাখিয়া জহ্নুনন্দিনী চঞ্চল লহরী তুলিয়া নাচিতে নাচিতে যখন সাগরাভিমুখে ধাবিতা হন, তখন তাঁহার সেই অনুপম লাবণ্য দেখিলে কাহার চিত্ত না মোহিত হয়? গোস্বামিপাদ গঙ্গাতীরের এইরূপ মনোজ্ঞ শোভা দর্শন করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। আন্দোলনের উত্তপ্ত বায়ুতে তাঁহার শুষ্কমনে আবার ভক্তির বিমল ধারা প্রবাহিত হইল। তিনি এই স্থানে বসিয়া ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিয়া স্নিগ্ধ হইলেন। শান্তিদেবীর

কোমলকরপল্লবস্পর্শে তাঁহার প্রাণের সমস্ত অশান্তি তিরোহিত হইয়া গেল।

হরিমোহন প্রামাণিক নামে একজন ভক্ত বৈষ্ণব সেই সময়ে শান্তিপুরে বাস করিতেন। তিনি প্রভুপাদের মনের শুষ্কতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে বলেন। প্রামাণিক মহাশয়ের কথামত ঐ গ্রন্থ পড়িয়া তিনি অত্যন্ত উপকার পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বিনয়, ভক্তি, ব্যাকুলতা, ঈশ্বরে অনুরাগ প্রভৃতি যাহা চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া প্রভুপাদ তাঁহাকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিলেন।

গোস্বামিপাদ নিজে লিখিয়াছেন "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ চরিতামৃতের এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অহৈতুকী ভক্তিলাভের জন্য আমার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। আমার মনে হইল, কোন প্রকার হেতু হইতে যাহার উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ যাহার উৎপত্তিতে নিজের কোন প্রকার সাধুকার্য্য কিছুমাত্র সাহায্য করে না, তাহাকে অহৈতুকী ভক্তি বলে। দয়াময় ঈশ্বর এই ভক্তি প্রদান করেন। আমি ভক্তির জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিলে দয়াময় পিতা কখনও নিরাশ করিবেন না।" (১)

(১) এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার আসনের নিকট চরিতামৃতপাঠের ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বে তিনি নিজেই ইহা পাঠ করিতেন। পরে পূর্ব্বাহ্নে অপরলোকে ইহা তাঁহার কাছে পাঠ করিত। সারাজীবন তিনি এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে একবার তিনি তাঁহার বন্ধু ৺নীলকমল দের সহিত নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তথায় সিদ্ধচৈতন্যদাস বাবাজি বাস করিতেন। প্রভুপাদ তাঁহার নিকট যাইয়া "ভক্তি কিসে হয়" এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। 'ভক্তি' শব্দ শ্রবণমাত্র বাবাজি মহাশয়ের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত ও মস্তকের শিখা খাড়া হইয়া উঠিল। দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে হুংকার করিয়া বলিলেন, কি বল্লে গোঁসাই? তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়? তোমার মুখে এই কথা? ভক্তি ত তোমাদেরই ঘরের জিনিস, আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারের ধন। অকিঞ্চন না হইলে ভক্তি হয় না। ভক্তি পাইতে হইলে দীনহীন কাঙ্গাল হইতে হয়। অভিমান অহংকারের নামগন্ধ থাকিতেও ভক্তিদেবীর কৃপা হয় না। এই কথা বলিয়া সেই দিব্যদর্শী মহাপুরুষ গোস্বামিপাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, প্রভো! আমি আপনার ললাটে তিলক ও গলায় মালা দেখিতে পাইতেছি। কালে আপনাকে তিলকমালা ধারণ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি প্রভুপাদকে সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন করিলেন।

আর একবার গোঁসাইজী কালনায় ভগবান্‌দাস বাবাজিকে দেখিতে গিয়াছিলেন। বাবাজি তাঁহার পরিচয় পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গোস্বামিমহাশয়ের অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছিল। তিনি বাবাজীর নিকট জল চাহিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় নিজের করঙ্গ পরিষ্কাররূপে মাজিয়া শীতলজলে পূর্ণ করিয়া গোস্বামিপাদের নিকট উপস্থিত করিলেন। সেই সঙ্গে জলযোগের জন্য কিছু মিষ্টান্নও প্রদত্ত হইল। প্রভুপাদ বাবাজির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমাকে আপনার কমণ্ডলু দিবেন না। আমি যার তার

ভাত খাই। বাবাজি হাতজোড় করিয়া বলিলেন, প্রভো! জাতিবুদ্ধি থাকিতে কি ধর্ম্মলাভ হয়? ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ করা যায়? আর আপনি যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিলেন, তাহাই ত ভক্তিলাভের মূল। ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কখনই ভক্তিবস্তু পাওয়া যায় না। আপনি আমাকে পরীক্ষা করিবেন না, কৃপা করিয়া জল পান করুন। গোস্বামিপাদ জলপান করিয়া করঙ্গটি রাখিবামাত্র বাবাজি তাহা তুলিয়া লইলেন এবং মাথায় ঠেকাইয়া প্রভুপাদের পীতাবশিষ্ট সমস্ত জল পান করিলেন। এক জন লোক বাবাজিকে বলিল, ইনি পৈতা ফেলিয়া দিয়াছেন। তাহাতে বাবাজি বলিলেন, জান, আমার অদ্বৈতেরও পৈতা থাকিত না। দেখ দেখি আমার অদ্বৈতের সন্তান ব্রাহ্মসমাজে গিয়াও আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। বাবাজির এই কথায় সেই লোকটি বিদ্রূপ করিয়া বলিল, কেমন আচার্য্য দেখিতে পাইতেছেন ত, জামা জুতা পরা আচার্য্য। এই কথা শুনিয়া বাবাজি কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, প্রভুকে সুন্দর করিয়া সাজান ত আমাদেরই উচিত। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে তাহা ত পারিলামই না, যদি বা উনি নিজের প্রয়োজন মত দ্রব্য নিজে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন, তাহা দেখিয়া যে একটু আনন্দ করিব, সে সৌভাগ্যও আমাদের নাই। বাবাজির কথা শুনিয়া লোকটি লজ্জায় মরিয়া গেল।

একবার গোস্বামিপাদের অগ্রজ ৬ব্রজগোপাল গোস্বামী কলিকাতায় কনিষ্ঠের নিকট আগমন করিয়া "কানু পরশমণি" এই সংকীর্ত্তন করেন। (১) কীর্ত্তন শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন প্রচলন করিতে গোস্বামি-

(১) কানু পরশমণি আমার। কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ, নয়নের ভূষণ আমার সেরূপ দরশন, বদনের ভূষণ আমার সেই নাম গান, হস্তের ভূষণ আমার সেপদ সেবন। (ভূষণের কি আর বাকি আছে, আমি কৃষ্ণচন্দ্র হার পরেছি গলে)।

মহাশয়ের অত্যন্ত সাধ হয়। তিনি কেশববাবুর নিকট মনের কথা প্রকাশ করিলেন। কেশব বাবু তাঁহার কথায় সায় দিলেন এবং উল্টাডিঙ্গির মনোহর দাস বাবাজিকে আনিয়া তাহার নিকট কীর্ত্তন শুনিলেন। "প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন বিলাইছেন প্রেমসুধা দেখি দীন হীন রে।" মনোহর দাস এই গানটি গাহিয়াছিলেন। গানটি গোস্বামিপাদ ও কেশব বাবুর অত্যন্ত মিষ্ট লাগিল। তখন দুই বন্ধুতে মন্ত্রণা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে কীর্ত্তন প্রচলিত করিবার সংকল্প করিলেন। অনেকে ইহার বিরোধী হইলেন। ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিশেষ ভাবে আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু কীর্ত্তনপ্রচলন বন্ধ হইল না। খোল করতালযোগে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কেশববাবু গোস্বামিমহাশয়কে গান রচনা করিতে বলিলেন। প্রভুপাদ নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিলেন,—

"পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই,
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়া লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকতবৎসল,
উদ্ধারেন পাপীজনে দেখি অসহায় রে।
প্রেমের সাগর তিনি সংসার পাথারে,
পতিত দেখিয়া দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর ভুলিয়া মায়ায়,
ত্বরিতে লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে॥"

"পতিত পাবন শ্রীশচীনন্দন অধমতারণ বলরে নিতাই।" এই গানের সুরে তিনি নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিলেন।

"পতিতপাবন ভকতজীবন
অখিলতারণ বলরে সবাই।
যারে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে,
যারে ডাকলে পাপী তরে যাবে,
ওরে এমন নাম আর পাবি নারে॥"

ইহার পর ১৭৮৭ শকে গোস্বামিপাদ ঢাকা নগরে প্রচারক্ষেত্র স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া বরিশাল, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রচারকার্য্যের সহিত এখানেও তিনি চিকিৎসাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা বিখ্যাত ডাক্তার ৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এস্থানেও স্বপ্নযোগে তাঁহাকে ঔষধের ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য পাওয়াতে চিকিৎসাকার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত সুনাম ও পসার হইল। দুশ্চিকিৎস্য কঠিন পীড়াগ্রস্ত বহু রোগী তাঁহার চিকিৎসানৈপুণ্যে অচিরে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল। চিকিৎসা কার্য্যেই অধিক সময় অতিবাহিত হওয়াতে তিনি ভাল করিয়া প্রচার করিতে পারিতেন না। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে এক দিন রাত্রিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "গোঁসাই! কেবল শারীরিক পীড়া আরোগ্য করিলে চলিবে না; যাহাতে লোকের ভবরোগের শান্তি হয়, তাহার জন্য যত্ন কর।" প্রচারকার্য্যের বিঘ্ন হওয়াতে তিনি পূর্ব্বেই চিকিৎসাকার্য্য পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি চিকিৎসাব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রচারকার্য্যে আপনাকে ঢালিয়া দিলেন।

এই উপলক্ষে তিনি স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র * মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম, –"চিকিৎসাদ্বারা ধনী ও মান্য হওয়া আমার কিছুমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কোনরূপে কষ্টে পরিবার ভরণপোষণপূর্ব্বক প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য।" ১৭৮৭ শক ৩০ সে ভাদ্র।

চিকিৎসাকার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন "আমি ভিখারীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, ব্যবসা করা আমার কার্য্য নহে। আমি পুনর্ব্বার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলাম। ব্রাহ্মভ্রাতারা আমাকে সাহায্য করেন ভালই, না করেন তাহাও ভাল, ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিয়াছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর আমাকে স্নেহের সহিত সাহায্য করিবেন।" চিকিৎসাকার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাচার প্রচার করিতে করিলেন। তাঁহার অগ্নিময় বক্তৃতা, জ্বলন্ত উৎসাহ, অকপট ধর্ম্মবিশ্বাস, গভীর ঈশ্বরানুরাগ, অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তি, আদর্শ পবিত্রজীবন, তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনেক লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি কখনও পদব্রজে, কখনও নৌকাযোগে এই সকল স্থানে ভ্রমণ করিতেন। এই সকল স্থানে পর্য্যটনসময়ে তাঁহাকে অনেক সময় অভুক্ত ও অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। একবার আসাম অঞ্চলে প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে অনাহারে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে

* স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় এক জন ডিপুটি কলেক্টর ছিলেন। তিনি গোস্বামিমহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। গোস্বামিমহাশয়ও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতেন। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় ছিল। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হইয়াছিল। যে সামান্য অর্থ তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহা শেষ হইয়া যাওয়াতে তাঁহাকে কর্দ্দমাক্ত সলিল পান করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে হইয়াছিল।

সময়ে সময়ে তাঁহাকে জীবনসংশয় বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। একবার নৌকাপথে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাকমারি অঞ্চলে যাইবার সময়ে তিনি পদ্মায় জলমগ্ন হন। প্রবল ঝড়ে তাঁহার নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল। তিনি নৌকার মাস্তুল ধরিয়া অনেক দূর ভাসিয়া যান। শেষে নৌকাব মাস্তুলও জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে দয়াময় ঈশ্বব! তুমিই জীবেব একমাত্র আশ্রয়। আমি দারুণ বিপদে পতিত হইয়া তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি রক্ষা না কবিলে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায়ান্তর নাই! এই ঘোর বিপদে তুমিই আমার এক মাত্র পবিত্রাণকর্ত্তা। দয়া করিয়া তুমি আমাকে উদ্ধার কর।" প্রার্থনা করিবামাত্র তাঁহাদিগের নৌকা এক মগ্নচড়ায় সংলগ্ন হইল। এইরূপে ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য, তিনি যে কিরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট-স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা কবিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারই জ্বলন্ত উপদেশদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সহস্র সহস্র উচ্চবংশীয় শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গেব লোক কেশব বাবু অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক জানিত, অধিক ভক্তি করিত। পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা কিছু প্রচারিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই অদম্য অধ্যবসায়, অক্লান্ত যত্ন ও পরি-

শ্রমের প্রভাবে। তিনি সকল প্রকার ক্লেশ ও বিপদ অগ্রাহ্য ও স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া পদব্রজে লোকের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন। পাপ ও দুর্নীতির অন্ধকারময় গর্ত্ত হইতে নরনারীগণকে উদ্ধার করিয়াছেন।

লাখুটিয়ার জমিদার ৺রাখালচন্দ্র রায়, ৺বিহারীলাল রায় প্রভৃতি সম্রান্ত বংশীয় যুবকগণ তাঁহাদ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ত্রিপুরা জেলার কালিকচ্ছনিবাসী মহাত্মা আনন্দচন্দ্র নন্দী ও তাঁহার সহোদরগণকে তিনিই ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করেন। "যমুনালহরী" নামক সুবিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতা ৺গোবিন্দচন্দ্র রায় তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করেন। ঢাকা হিন্দুসমাজের অন্যতম দলপতি ৺কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম পুত্র ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় তৎকর্ত্তৃকই ব্রাহ্মসমাজে আনীত হন। সমাজের এতগুলি যুবক ব্রাহ্ম হওয়াতে হিন্দুগণ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। আন্দোলনের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হিন্দুগণ ব্রাহ্মদিগকে জব্দ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভাস্থাপন করিয়া তাহা হইতে "হিন্দুহিতৈষিনী" নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। এই কাগজে ব্রাহ্মদিগের নামে অনেক অযথা কুৎসা লেখা হইত। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারসম্বন্ধে কেশব বাবু তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

(কেশব বাবুর পত্র)

জয় জগদীশ।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার।

জয় জয়, বিজয়ের জয়! তুমি যে পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তাহা এখান হইতেই দেখিতেছি। তোমার উৎসাহের তরঙ্গ এখানে

আসিয়া আমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জলন্ত অগ্নি রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তুমি যে ভ্রম ও কুসংস্কার একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আবার বলি, জয় জয়! ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারক অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই মহিমা প্রকাশিত হইতেছে, আর আমাদের ভয় কি? ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁর নাম কীর্ত্তন কর। বৈরাগী হইয়া সংসারকে পদানত কর, উৎসাহের দ্বারা সকলকে জাগ্রত কর, প্রীতিসূত্রে সকলকে বদ্ধ কর; এবং দেশ-বিদেশ জয় করিয়া আমাদের রাজ্য বিস্তৃত কর এবং তোমার সঙ্গতের দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে সম্রাট্ অপেক্ষা ধনবান কর। আমরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি; তুমি যত প্রচার করিবে, ততই আমাদের ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে।

ভাল, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এত স্বার্থপর কেন? তুমি কি একা সমুদায় সুখভোগ করিবে, ঢাকাতে যে সকল অমূল্য রত্ন "ঢাকা" ছিল তাহা কি কেবল আপনি গ্রহণ করিবে? আমাকে কি একবার ডাকিতে নাই? নিতান্ত দরিদ্রভাবে এখানে পড়িয়া আছি। তোমার উৎসবে কি আমাকে অংশী হইতে দিবে না? আমার কি ঢাকায় যাইবার কোন সুবিধা নাই? তুমি না পথ দেখাইয়া দিলে আমার অগ্রসর হইবার যো নাই।

| | |
|---|---|
| কলিকাতা কলুটোলা, | অভিন্নহৃদয় বন্ধু |
| ২৪ মাঘ ১৭৮৬ শক। | শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। |

বিখ্যাত "ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকা" তাঁহার প্রচারকার্য্যসম্বন্ধে যে মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"গোস্বামিমহাশয়ের মহচ্চরিত্র ও প্রচারকার্য্য বিষয়ে তাঁহার অসামান্য স্বর্গীয় উৎসাহ বোধ হয় পাঠকবর্গের নিকট অবিদিত নাই। তাঁহার ন্যায় একাগ্রচিত্ত প্রচারকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইবে, এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণ সংসাধিত হইবে। পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়ে আরও ধর্ম্মবল, উৎসাহ, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য প্রেরণ করুন, যেন তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য দিন দিন সুবিস্তৃত হয়। তাঁহার স্বর্গীয় স্বাধীন চেষ্টায় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের কীদৃশী উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের অপেক্ষা মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ উত্তমরূপে অবগত আছেন। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামস্থ নিস্তব্ধ গিরিশিখর অবধি নবদ্বীপস্থ পৌত্তলিকতার দুর্গম দুর্গস্বরূপ চতুষ্পাঠিচয় পর্য্যন্ত তাঁহার চরণদ্বয় নিরবধি পরিভ্রমণ করিয়াছে। তিনি বঙ্গদেশের পূর্ব্ব সীমা হইতে অকূল বঙ্গোপসাগরের ঘন নীলাম্বুরাশির মধ্যে সূর্য্যের সন্ধ্যাবগাহন দর্শন করিয়াছেন। তিনি শত শত তরঙ্গাস্ফালিত নদনদীর ভ্রূকুটি অতিক্রম করিয়াছেন। একখানি ক্ষুদ্র তরণীযোগে বিশালবক্ষ ভীষণ পদ্মার বিষম আবর্ত্তের সন্নিহিত হইয়াছেন। তিনি অনেক ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়াছেন, অনেক ব্রাহ্মিকার হৃদয়ের স্বাস্থ্যবিধান করিয়াছেন।"

ধর্ম্মতত্ত্ব ১৭৮৭ শক, চৈত্র।

"ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত" ও "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় তাঁহার প্রচার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"জ্বলন্ত প্রাণ লইয়া, ভগবৎ কৃপা সহায় করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ প্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বর্ষার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত গিরিতরঙ্গিণী যেমন প্রবল বেগে উভয় কূল ভাসাইয়া লইয়া যায়, মহোৎসাহে সমুচ্ছ্বসিতপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মনামে সেইরূপ দেশদেশান্তর ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন।"

"বিজয়কৃষ্ণ প্রচারক্ষেত্রে নামিলেন। প্রকৃত স্বর্গদূতের ন্যায়, প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় নামিলেন। দেহমন ঢালিয়া, ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ মহামন্ত্র সার করিয়া, প্রভুর চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া প্রভুর মহাকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুর কার্য্যে তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার অবসর ছিল না। তিনি আপনার শরীরের দিকেও দৃক্‌পাত করিলেন না। পরিজনের সুবিধা অসুবিধা, সুখসচ্ছন্দতার পানেও চাহিলেন না এবং নিন্দাপ্রশংসার মুখাপেক্ষাও করিলেন না। কিন্তু অবিচলিত উৎসাহে, অটল অধ্যবসায়ে, পূর্ণপ্রাণে প্রভুর কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার গতি অবারিত, এবং বাণী অপরাঙ্মুখী হইল।"

একবার চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচার করিবার সময়ে গোস্বামিপাদ এক পর্ব্বতের উপর ভীষণ দাবানলের মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। অনলদেব চতুর্দ্দিক হইতে লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে আসিতে লাগিলেন। জীবনরক্ষার কোন উপায় কিংবা আশা রহিল না। এমন সময়ে এক প্রকাণ্ডকায় পুরুষ সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া পর্ব্বত হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং নিরাপদস্থানে রাখিয়া অদৃশ্য হইলেন।

আর একবার তিনি সেরপুরঅঞ্চলে একটি বন্যমহিষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। মহিষ দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। তিনি আত্মরক্ষার কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া একান্তভাবে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতর বাণী শুনিয়া ভগবান্ আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার রক্ষার উপায় করিলেন। জোর বাতাসে একটা স্থানের কাসার বৃক্ষ সরিয়া যাওয়াতে প্রভুপাদ সেই স্থানে কুম্ভকার খনিত এক বৃহৎ গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি সেই গর্ত্তে

প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবিষ্ট হইবামাত্র কাসার বুক্কে গর্ত্তের মুখ ঢাকিয়া গেল। শীকার হাতছাড়া হওয়াতে মহিষের দারুণ ক্রোধ হইল। সে সেই স্থানের মাটি চষিয়া ফেলিল ও মলমূত্রত্যাগ করিয়া একদিকে চলিয়া গেল। এই প্রকার অভাবনীয় উপায়ে ভগবৎকৃপায় জীবন-রক্ষা হওয়াতে তিনি ভক্তিতে বিগলিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে বারংবার ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন।

মহিষের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তিনি আর এক বিপদের সম্মুখীন হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার আগে আগে একটি হরিণ ছুটিয়া যাইতেছে। তাহার পরেই এক ভীষণ ব্যাঘ্র বন হইতে বাহির হইয়া হরিণের অনুসরণে দৌড়িল। ভয়ংকর বাঘ দেখিয়া গোস্বামিপাদের বুক কাঁপিয়া উঠিল। যাহা হউক বাঘ হরিণের পশ্চাতেই ছুটিল। তাঁহাকে আক্রমণ করিল না। তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন। শার্দ্দূল ও মহিষের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া অনেক পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পর তিনি গোয়ালাদের বাথানে উপস্থিত হইলেন। গোপগণ তাঁহাকে অতিশয় পরিশ্রান্ত দেখিয়া পরিতোষপূর্ব্বক দুগ্ধপান করাইল। পরে তাঁহাকে বলিল, মহাশয়! এখানে অত্যন্ত বাঘের উৎপাত; আমরা অতি সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়ে রাত্রি কাটাই। আপনাকে এখানে রাখিতে আমরা কোন মতেই পারিব না। এই বলিয়া তাহারা তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে রাখিয়া আসিল। প্রভুপাদ গ্রামে গিয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে রহিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিবার পর, যত দিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ততদিন গোস্বামিমহাশয়কে ঘোর দরিদ্রতার মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি সপরিবারে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। সকল দিন তাঁহাদিগের দুই বেলা আহার

জুটিত না। কোন কোন দিন তাঁহাদিগকে অনাহারে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতে হইত। এক দিন তাঁহাদিগের গৃহ কপর্দ্দকশূন্য, আহারের কিছুমাত্র সংস্থান নাই। তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং সমস্ত দিন গোলদীঘিতে উপাসনা প্রার্থনা করিয়া কাটাইলেন। ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য হইলে উদর পূর্ণ করিয়া জলপান করিলেন। কিন্তু সে জল উদরে রহিল না, বমী হইয়া উঠিয়া গেল। তখন তিনি জল ঘোলাইয়া সেই জল পান করিলেন। এবার আর বমী হইল না। তাঁহার পত্নী ও শাশুড়ীও উপবাসী রহিয়াছেন। প্রভুপাদ সায়ংকালে গৃহে আসিলেন। সকলেই অভুক্তাবস্থায় শুইয়া পড়িলেন। এই সময়ে ৺যদুনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদিগের বাড়ীতে আসিয়া কথায় কথায় জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা সমস্ত দিন অনাহারে রহিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার বড়ই ক্লেশ হইল। তিনি তাঁহার পকেট অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন তাহাতে দেড়টি মাত্র পয়সা আছে; বাধ্য হইয়া তাহাই গোস্বামিমহাশয়ের হাতে দিলেন। দেড় পয়সার মুড়ি আসিল। তিন জনে তাহাই এক মুঠা করিয়া খাইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন।

এই প্রকার ঘোর দরিদ্রতার মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া অদম্য উৎসাহের সহিত তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। তিনি এত অভাবের মধ্যে বাস করিতেন যে বন্ধুবান্ধবকে পত্র লিখিবার তাঁহার পয়সা জুটিত না। একবার ৺ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন, "পয়সার অনাটনবশতঃ আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। এবার বেয়ারিং পত্র লিখিতে হইল।" তিনি ইচ্ছা করিলেই দারিদ্র্যদুঃখ দূর করিতে পারিতেন। চিকিৎসাকার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তিনি যখন ঢাকাতে চিকিৎসা করিতেন, তখন তাঁহার প্রচুর অর্থাগম

হইত। প্রচারকার্য্যের বিঘ্ন হয় বলিয়া তিনি স্বেচ্ছায় চিকিৎসাব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তির উপর নির্ভর করেন। ইহাতে তাঁহাকে অনেক সময়ে যারপরনাই আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। কোন দিন উপবাস, কোন দিন ব্যঞ্জনের অভাবে কাঁটা-নোটের ডাঁটা রাঁধিয়া কেবল তৎসহযোগে অন্ন উপযোগ করিতে হইয়াছে। এত কষ্টের মধ্যেও তিনি আপন ব্রত হইতে বিচলিত হন নাই। অবিচলিত থাকিয়া দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রচারফণ্ড স্থাপিত হইলে তাঁহাদিগের আর্থিক কষ্ট কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইয়াছিল।

প্রভুপাদের একটি পরম দয়ালুতার বিবরণ আমরা এখানে প্রদান করিলাম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গোস্বামিপাদ অত্যন্ত দয়ালু ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। অন্যের ক্লেশ দেখিলে তাঁহার কোমলহৃদয় দয়াতে গলিয়া যাইত। ক্লিষ্টব্যক্তির দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। সঙ্গে যাহাকিছু থাকিত, সমস্তই দিয়া দিতেন। স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস যখন বরিশালে ওকালতী করিতেন, সেই সময়ে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রভুপাদ সময়ে সময়ে সেখানে যাইতেন এবং দাস মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। একবার প্রভুপাদের বরিশাল অবস্থান সময়ে শীতকালে দাস মহাশয় তাঁহাকে একখানি মূল্যবান্ শীতবস্ত্র কিনিয়া দিলেন। গোস্বামিপাদ প্রচারে বাহির হইয়া এক জন শীতার্ত্ত দরিদ্র লোককে তাহা দিয়া আসিলেন। দাস মহাশয় তাঁহার দানের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ হইলেন। তিনিও এক জন পরম দয়ালু লোক ছিলেন।

এবং মুক্তহস্তে দান করিতেন। শীতবস্ত্রের অভাবে গোস্বামিপাদকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া তিনি আর একখানি ভাল শীতবস্ত্র আনাইয়া দিলেন। সেখানিও পূর্ব্ববৎ বিতরিত হইল। তখন দাস মহাশয় ভাবিলেন, ইহাঁকে বেশী মূল্যের কাপড় দিয়া পারা যাইবে না। ইনি যেরূপ দয়ালু, পরের দুঃখ দেখিলে ইহাঁর হৃদয় যেরূপ বিগলিত হয়, তাহাতে ইনি দান না করিয়া পারিবেন না। ইহাঁর দানের স্রোত রোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত। এ অবস্থায় অধিক মূল্যের কাপড় যোগান সম্ভবপর হইবে না। অল্পমূল্যের কাপড় অধিক বিতরিত হইলেও যোগান কঠিন হইবে না। এই মনে করিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের গাত্রবস্ত্র কিনিয়া দিলেন। এই প্রকারের কাপড়ও যে অনেকগুলি বিতরিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

১৮৬৭খৃঃ অব্দে গোস্বামিপাদ ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহে গমন করেন। তাঁহার আগমনে তথায় ধর্ম্মের প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাঁহার আদর্শ ধর্ম্মজীবন দেখিয়া ও ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া গোপীকৃষ্ণ সেন প্রভৃতি অনেকগুলি উচ্চবংশস্থ হিন্দুযুবক প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহাতে হিন্দুসমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দুগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত বন্ধ করিবার জন্য তাঁহারা একত্র হইয়া জেলাস্কুলের প্রধান পণ্ডিত ৺ পার্ব্বতীচরণ তর্করত্ন মহাশয়কে নেতা করিয়া ঢাকার অনুকরণে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মদিগকে নির্য্যাতিত করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরে এই সভার দ্বারা হিন্দুসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।

গোস্বামিমহাশয় ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে একবার ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কালিকচ্ছ গ্রামে গিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিপরিপ্লুত সুমধুর

উপদেশ ও ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া স্বর্গীয় আনন্দচন্দ নন্দী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহাতে নন্দীমহাশয়ের জননী সাতিশয় বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া গোস্বামিমহাশয়কে মারিবার জন্য গ্রামবাসিগণকে আহ্বান করিলেন। নন্দীজননীকর্ত্তৃক আহূত হইয়া অনেকে নন্দী বাবুদিগের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সংকীর্ত্তন হইতে ছিল। বিরোধিগণ গোস্বামিমহাশয়ের ভক্তিমাখা সুমিষ্ট কীর্ত্তন শুনিয়া ভক্তিতে গলিয়া গেলেন। তাঁহাদের বৈরভাব তিরোহিত হইল। তাঁহারা গোস্বামিপাদের সুখ্যাতি করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। নন্দী-মহাশয়ের জননী কিন্তু নিরস্ত হইলেন না। তিনি গোস্বামিপাদের উপর বিলক্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ঈশ্বরসম্বন্ধে কোন কথা ছিল না। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া গোস্বামিমহাশয়ের মনে হইল, সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে ঈশ্বরসম্বন্ধে কোন কথাই নাই; বাল্যকাল হইতেই শিশুদিগের মনে ঈশ্বরের ভাব মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে যাইয়া বলিলেন, মহাশয়, আপনি শিশুপাঠ্য বোধোদয় নামে যে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরসম্বন্ধে ত কোন কথা নাই। বাল্যকাল হইতেই শিশুদিগের মনে ধর্ম্মভাব, ঈশ্বরের ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করা উচিত। নতুবা ভবিষ্যজ্জীবনে তাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে যে একেবারে আস্থাহীন হইয়া পড়িবে। আর আপনার কোন পুস্তকেই ঈশ্বর-সম্বন্ধে কোন কথা নাই, এজন্য লোকে আপনাকে নাস্তিক বলে। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অতীব দুঃখিত হইয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, কি লোকে আমাকে নাস্তিক বলে?

আমি ত নাস্তিক নহি। তুমি আমায় ক্রটি দেখাইয়া দিয়া বড়ই উপকার করিলে। ভবিষ্যতে আমি আমার ক্রটি সংশোধন করিব। ইহার কিছুদিন পরে গোস্বামিমহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, আমি বোধোদয়ে ঈশ্বরসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ দিয়াছি; তুমি পড়িয়াছ কি? গোস্বামিমহাশয় সহাস্যবদনে বলিলেন হাঁ, পড়িয়াছি। ঈশ্বরসম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে অবস্থান

যুবক ব্রাহ্মগণ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, একথা পুর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু উপাসনাগৃহের অভাবে তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এজন্য তাঁহারা একটি উপাসনামন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ১৮৬৮ খৃঃঅব্দে তাঁহারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় উপাসনামন্দিরের নিম্নস্থ জমি ক্রয় করিয়া মন্দিরনির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। এই বৎসর মাঘোৎসবের পর কেশব বাবু কিছু দিন সপরিবারে মুঙ্গের নগরে বাস করিয়াছিলেন। তথায় কতকগুলি ব্রাহ্ম কেশব বাবুকে ঈশ্বরের অবতার মনে করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া লুটাইতেন। কেহ কেহ পা ধোওয়াইয়া দিয়া সেই জল পান করিতেন। হাত জোড় করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি চাহিতেন। কতকগুলি ব্রাহ্ম গোস্বামিমহাশয়কে বলেন যে কেশব বাবু স্বয়ং ভগবান্। ব্রাহ্মদিগের এই

সকল কথায় ও কার্য্যে গোস্বামিপাদ ও অপর কতকগুলি ব্রাহ্ম অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ইহা তাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইল। তাঁহারা কেশববাবুকে ইহার প্রতিকার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া কেশব বাবু বলিলেন যে আমি মানুষের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। (১) কেশব বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং ৺যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া "সোমপ্রকাশ" ও "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস্" সংবাদপত্রে এই গর্হিত কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; চারিদিকে আন্দোলনের প্রবলবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। গোস্বামিমহাশয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে যাইয়া চিকিৎসাব্যবসা আরম্ভ করিলেন। এখানেও তিনি স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট চিকিৎসাসম্বন্ধে সর্ব্বদা সাহায্য পাইতে লাগিলেন। কোন কঠিন রোগী তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাত্রিতে স্বপ্নে তাঁহাকে ঔষধের ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। ইহাতে গোস্বামিমহাশয়ের চিকিৎসাকার্য্যের অত্যন্ত সুবিধা হইল। অন্যান্য চিকিৎসকগণ যে সকল রোগী আরোগ্য করিতে অসমর্থ হইতেন, গোস্বামিপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবস্থা-গুণে অতিসহজে তাহাদিগকে আরোগ্য করিতেন। ইহাতে অতি শীঘ্র তাঁহার পসার হওয়ায় যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল।

শান্তিপুরে চিকিৎসা করিবার সময়ে তাঁহার অদ্ভুত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও রোগীর প্রতি গভীর ভালবাসার ও সমবেদনার চিহ্নস্বরূপ একটী সুন্দর ঘটনা আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। গঙ্গার পরপারস্থ একটি

(১) কেশব বাবু যে আপনাকে অবতার মনে করিতেন, তাঁহার পরবর্ত্তী লেখা ও কার্য্যের দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

রোগীর চিকিৎসার ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোগীর পীড়া অতিশয় কঠিন ছিল, এজন্য প্রভুপাদ প্রতিদিনই তাহাকে দেখিতে যাইতেন। এক দিন অতিশয় ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে তিনি পারে যাইবার নৌকা পাইলেন না। গঙ্গায় ভয়ানক ঢেউ। মাঝিরা সেই তরঙ্গে নৌকা চালাইতে সম্মত হইল না। তখন তিনি ঔষধের শিশিগুলি উত্তরীয় বস্ত্রের সহিত মস্তকে বন্ধন করিলেন এবং সন্তরণদ্বারা গঙ্গা পার হইয়া যাইয়া রোগীকে ঔষধ দিলেন। রোগীর আত্মীয়গণ তাঁহার এই অসংসাহসিক কার্য্যের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর একটি রোগী বহু দিন হইতে ভুগিতেছিল। কেহই তাহাকে ভাল করিতে পারে নাই। শেষে গোস্বামিমহাশয়ের হাতে সেই রোগী আসিল। তিনি কিছুতেই রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এক দিন রাত্রিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন, এ কৃমিঘটিত পীড়া, স্যাণ্টনাইন দিয়া জোলাপ দিলেই পীড়া আরোগ্য হইবে। বস্তুতঃও তাহাই হইল। এই রোগী আরাম হওয়াতে গোস্বামিমহাশয়ের অত্যন্ত সুখ্যাতিলাভ হইল।

এক দিন গোস্বামিমহাশয়দিগের গৃহদেবতা ৺ শ্যামসুন্দর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এ স্থান পরিত্যাগ কর। আমি তোমাকে ঘর হইতে বাহির করিলাম, তুমি আবার গৃহে প্রবেশ করিলে? আমি তোমাকে গৃহে থাকিয়া সংসারে লিপ্ত হইতে দিব না।" ৺শ্যামসুন্দরের কথা শুনিয়া তিনি যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

গোস্বামিমহাশয় যখনই শান্তিপুরে যাইতেন, তখনই শ্যামসুন্দর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে অনেক কথা বলিতেন এবং
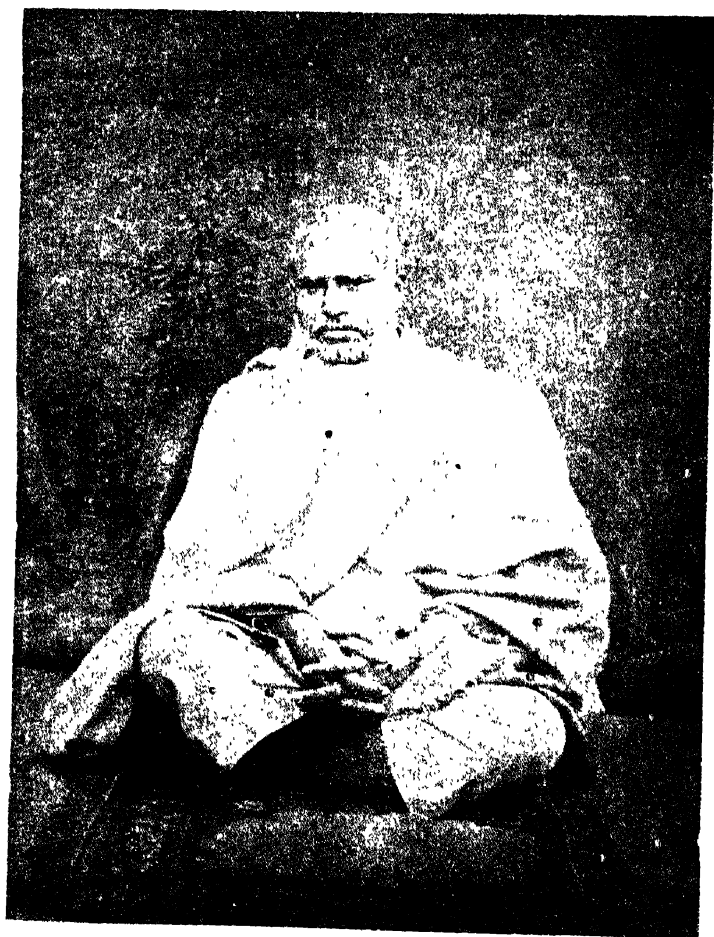
প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
( ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে )

নানারূপ আব্দার করিতেন। তিনি একবার বলেন,"আমার বাঁশী নাই, তুই আমাকে বাঁশী দে।" গোস্বামিমহাশয় ঢাকা হইতে একটি সুন্দর বাঁশী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আর একবার বলিলেন, "আমার চূড়া নাই, আমাকে চূড়া দে।" গোস্বামিমহাশয় ঢাকা হইতে একটি রূপার চূড়া করিয়া দিলেন। রূপার চূড়া শ্যামসুন্দরের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন, "আমি রূপার চূড়া লইব না। সোণার চূড়া চাই।" গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, আমি ভিক্ষুক, সোণার চূড়ার টাকা কোথায় পাইব। শ্যামসুন্দর বলিলেন, "রাঙ্গা ঠাকুরাণীর (প্রভুপাদের খুড়ীর) অনেক টাকা আছে, আমার নাম করিয়া তাহাকে গিয়া বল্।" গোস্বামিমহাশয় রাঙ্গা ঠাকুরাণীকে শ্যামসুন্দরের কথা বলিলেন। তিনি শুনিয়া আহ্লাদে গদ গদ হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন, কি, শ্যামসুন্দর আমার কাছে চূড়া চেয়েছেন! ভক্তিতে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রফুল্লচিত্তে গোস্বামিমহাশয়কে টাকা দিলেন। সেই টাকায় রূপার চূড়া সোণার পাতে অতি সুন্দর করিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইল। শ্যামসুন্দর চূড়া পাইয়া অতিশয় খুসি হইয়া বলিলেন, "আমি চূড়াবাঁশী পরিয়া কেমন সাজিযাছি, মন্দিরে যাইয়া একবার দেখ্‌বি না?" গোস্বামিমহাশয় বলিলেন,আমি যে ব্রাহ্ম,আমার ও সকল দেখিতে নাই। শ্যামসুন্দর হাসিয়া বলিলেন "হলিই বা ব্রাহ্ম, দেখ্‌তে দোষ নাই। তোকে ত আমিই ব্রাহ্ম করেছি।" শ্যামসুন্দরের কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ মন্দিরে যাইয়া শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলেন। একবার পুজারি শ্যামসুন্দরের ভোগ দিবার সময় পানীয় জল দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। শ্যামসুন্দর সে কথাও প্রভুপাদকে বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজত্যাগ করিবার পর একবার গোস্বামিপাদ শান্তিপুরে গিয়া-

ছিলেন। সেই সময়ে এক দিন শ্যামসুন্দর ধড়াচূড়া পরিয়া হাতে বাঁশী লইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাকে কেমন দেখিতেছিস্?" গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, অতি, সুন্দর। এই কথা বলিয়া তিনি ঠাকুরকে বলিলেন, প্রভো! আমাকে যদি এত দয়া করিবে মনে ছিল, তবে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া নাস্তানাবুদ করিলে কেন? শ্যামসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "জানিস্, অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া গড়িলে দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়।" একদিন ৺ শ্যামসুন্দরের মন্দিরে চোর প্রবেশ করিয়া রাধিকার মুকুট চুরি করিয়া বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া চলিয়া যায়। দেবতার গহনা বলিয়া বোধ হয় চোরের মনে ভয় হইয়াছিল। অলঙ্কার চুরির কথা যখন সকলে জানিতে পারিলেন, তখন সকলেই খুঁজিতে লাগিলেন। গোস্বামিমহাশয় তখন আসনে বসিয়া ভজন করিতেছিলেন। রাধারাণী তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়া চোর যে স্থানে অলঙ্কার ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহা বলিয়া দিলেন। রাধারাণীর কথা প্রভুপাদ সকলকে বলিলেন। রাধারাণী-কথিত স্থানে মুকুট পাওয়া গেল।

প্রভুপাদ ও যদু বাবু সংবাদপত্রে নরপূজার প্রতিবাদ করিলে চারিদিকে ভয়ঙ্কর আন্দোলনের ঢেউ উঠিল। লোকে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কুৎসা রটাইতে লাগিল। বহু সংবাদপত্রে ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা বাহির হইল। এই সকল ঘটনা দেখিয়া কেশববাবুর চৈতন্য হইল। তখন তিনি তাঁহার ক্রটি বুঝিতে পারিলেন এবং অবিলম্বে পদধারণ, চরণপূজা প্রভৃতি এতদিন যাহা নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছিল এবং এতদিন যাহা তিনি সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং অবিলম্বে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া গোস্বামিপাদকে এক পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলেন, তুমি শীঘ্র

কলিকাতায় আসিয়া যাহাতে এই গোলযোগ মিটিয়া যায়, তাহার উপায় কর। কেশববাবুর পত্র পাইয়া প্রভুপাদ অবিলম্বে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে গোলমাল মিটিয়া যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই জন্য তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় একখানি বিস্তৃত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিম্নে পত্রখানি উদ্ধৃত হইল :—

"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি কয়েক জন ব্রাহ্মভ্রাতার ভক্তিপ্রকাশের আতিশয্যদর্শনে ব্যথিত হইয়া তন্নিবারণের জন্য আমি বিগত আশ্বিন মাসে উহা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে এবং অনেক স্থলে উহাতে ভয়ানক বিবাদ বিসম্বাদ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে উৎসাহপূর্ব্বক পরস্পরের গ্লানি প্রচার করিতেছেন এবং অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির অবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি হইতেছে। এই সমুদায় অনিষ্ট ফল দেখিয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। আমিই অনেকটা এই আন্দোলনের মূল কারণ। এই জন্য আমার আরও বিশেষ দুঃখ হইতেছে। অতএব ইহার অনিষ্টফল নিবারণের জন্য আমার এসময়ে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। আমার পূর্ব্বাবধি হৃদ্গত ভাব কি এবং আন্দোলনসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট বিনীতভাবে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর করুন, যেন এই পত্র দ্বারা সকলের সন্দেহ ও বিষাদ দূর হয় এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সদ্ভাবের বিস্তার হয়।

"আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে উল্লিখিত ভ্রাতারা যে প্রণালীতে ভক্তিপ্রকাশ করেন, তাহা আমার বিবেচনায় দূষণীয় ও অনিষ্টকর। কিন্তু

এরূপে ভক্তিপ্রকাশ করা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ মত ও ভাব হইতে উৎপন্ন হয় কিনা, তাহা আমি পূর্ব্বে বিশেষরূপে জানিতাম না। বাহ্যিক আড়ম্বরের অবশ্যই দূষিত মূল থাকিবে, ইহা মনে করিয়া আমি আমার ভ্রাতাদিগকে মনুষ্যউপাসনাদোষে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং এসম্বন্ধে মুঙ্গেরে ও এলাহাবাদে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কেহই স্পষ্ট উত্তর না দেওয়াতে আমার উক্ত সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। এখন আমার সে সংস্কার নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছি যে কেবল বাহ্যিক কার্য্য ও শব্দে আতিশয্যদোষ আছে; তাঁহাদের মতে কোন দোষ নাই। যাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মনুষ্যউপাসনা করেন না এবং ঈশ্বরের অথবা মুক্তিদাতা অথবা পাপী ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী-জ্ঞানে কোন মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করেন না। কেশব বাবুর প্রতি তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা যতই অযৌক্তিক হউক না তথাপি আমি কথনই এরূপ মনে করিতে পারি না যে তাঁহারা উক্ত মহাশয়কে ভক্তপরিবারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং পরম উপকারী বন্ধু ভিন্ন অন্য কোন ভাবে দেখেন। এইরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মনুষ্যের প্রতি যতই অল্প হয়, ততই ভাল। কেন না তদ্দারা অপরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি ভ্রাতাদিগকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি যে তাহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাঁহারা দুর্ব্বল ভ্রাতাদের মঙ্গলের জন্য যেন ভক্তির এমন সকল বাহ্যলক্ষণ রহিত করেন, যদ্দারা ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অপকার হইতে পারে।

ভক্তিভাজন কেশব বাবুর প্রতি আমি কখনই দোষারোপ করি নাই। অপর ভ্রাতারা তাঁহাকে সম্মানার্থ যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনি তজ্জন্য দায়ী নহেন। তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাষী

নহেন; তজ্জন্য কাহাকেও অনুরোধ করেন নাই। বরং ইহা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা অনেকবার বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে তৎকালে ঐরূপ সম্মানপ্রকাশে নিষেধ করেন নাই, তাঁহার কেবল এইটুকু ক্রটি আমি দেখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁহার অণুমাত্র অপরাধ নাই, ইহা আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি।

এক্ষণে আমার শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্ত্তমান আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হউন। তাঁহার আশঙ্কা করিবার আর কোন কারণ নাই। এখন নিরর্থক ভ্রাতাদের দোষ ঘোষণা করিলে পিতার নিকট অপরাধী হইতে হইবে। তাঁহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না, তখন তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যায়। এতকাল যাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমরা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাঁহাদিগের সরল সত্যবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করা অকৃতজ্ঞের কার্য্য সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভক্তিভাজন কেশব বাবুকে যে প্রণালীতে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীতে তাঁহারা অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতাকেও যথাপরিমাণে সম্মান করেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের মত সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধভাব দেখা যায় না। কারণ সাধুভক্তদিগকে শ্রদ্ধা করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। অতএব আসুন পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় এক পরিবারে মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার রাজ্যে শান্তিসংস্থাপন এবং বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরে অমূল্য ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য সম্ভোগ করি। পরিশেষে সমুদায় ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের নিকট আমার সানুনয়ে নিবেদন এই যে তাঁহারা কেশব বাবুকে অকারণে এবং নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ না করেন এবং তাঁহার অনুগত শিষ্যদিগের প্রতি মনুষ্যোপাসনা দোষারোপ না

করেন। আমার হৃদ্‌গত বিশ্বাসসূচক এই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহারা সকল সংশয় দূর করুন। বর্ত্তমান গোলযোগে চতুর্দ্দিকে যে ভয়ানক শুষ্কতার মহামারী উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যে কত ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এক্ষণে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মহামারী নিবারণ এবং প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি বিস্তারে যত্নশীল হইয়া আপনাদিগের এবং দেশস্থ ভ্রাতাদিগের মঙ্গল সাধন করুন।

১৭৯১ শক, ১৫ই আষাঢ়। } শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

এই ঘটনা উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"১৮৬৯ খৃঃঅব্দের গ্রীষ্মের শেষে কেশব বাবুর দলের সহিত তাঁহার (গোস্বামিমহাশয়ের) পুনর্ম্মিলন হয়। সেই সময়ে গোঁসাইজীর মহত্ত্ব দেখিলাম। তিনি যেই বুঝিলেন যে তিনি যাহাকে নবপূজা মনে করিয়াছিলেন, তাহা নবপূজা নহে, ভক্তি প্রকাশের আতিশয্যমাত্র, অমনি কেশব বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মসমাজের বহুসংখ্যক লোক গোঁসাইজীর পশ্চাদ্‌গামী। তিনি মনে করিলে নিজের একটা দল বাঁধিতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিজের জয় চাহিলেন না, ব্রাহ্মধর্ম্মেরই জয় চাহিলেন। ইহাতে তিনি আমার হৃদয়ের নিকট সহস্রগুণ প্রিয় হইলেন।"

সংবাদপত্রে প্রতিবাদ করাতে কেশব বাবুর সাঙ্গোপাঙ্গগণ গোস্বামি-পাদের প্রতি যথেষ্ট গালিবর্ষণ ও তাঁহার নামে অনেক অলীক কুৎসা-রটনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে সকল উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত সদ্ভাবের সহিত কেশব বাবুর সহিত মিলিত হইলেন।

এ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, "যে সকল বন্ধুবান্ধব অন্তরের সহিত আমাকে স্নেহ করিতেন, তাঁহারাও ঘৃণাপূর্ব্বক আমাকে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, পাষণ্ড বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মভ্রাতা এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন যে আমাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন. বোধ হয় আমি যে এখনও কোন কোন ভ্রাতার নিকট ঘৃণিত এবং অবিশ্বাসের পাত্র রহিয়াছি, এই ঘটনাই তাহার মূল কারণ।" তিনি ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া ভ্রাতৃভাবে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে গালি দিয়াছিলেন, প্রহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উদারভাবে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। নির্ব্বৈর, বিশ্বপ্রেমিক, ক্ষমাসর্ব্বস্ব মহাপুরুষ তাঁহাদের সমস্ত অত্যাচার ও নির্য্যাতনের কথা বিস্মৃত হইয়া প্রেমবাহু বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"পুনর্ব্বার আমি বন্ধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইলাম। বন্ধুদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র অসদ্ভাব ছিল না। অসত্য দূরীভূত করিবার জন্যই বিশেষ চেষ্টা ছিল।" কেশব বাবুর অনুগামিগণ এই ব্যাপারে গোস্বামিপাদের উপর এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারেন নাই। সারাজীবন তাঁহারা এই অসদ্ভাব পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ইহা লইয়াই পরলোকগত হইয়াছেন। গোস্বামিপাদের স্বর্গারোহণের অনেক দিন পরে আমি ৺ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের ( চিরংজীব শর্ম্মা নববিধান সমাজের সঙ্গীত প্রচারক ) নিকট গোস্বামিপাদের জীবনবৃত্তের কিছু উপাদান সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলাম। উপাদান প্রদানের পরিবর্ত্তে তিনি গোস্বামিমহাশয়কে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

১৮৬৯ খৃঃঅব্দের ২২শে আগষ্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। এই উপলক্ষে স্বর্গীয় আনন্দমোহন

বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺কৃষ্ণবিহারী সেন, ৺রজনীনাথ রায় প্রভৃতি অনেক গুলি কৃতবিদ্য যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া কেশববাবু, গোস্বামিপাদ ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্তপ্রমুখ প্রচারকগণের সঙ্গে একত্র হইয়া অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত ভারতের নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবনদর্শন ও উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতাশ্রবণ করিয়া শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত লোকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া খৃষ্টান মিসনরিগণ প্রমাদ গণিলেন। এতদিন তাঁহারা নির্ব্বিবাদে ও বিনা বাধায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। হিন্দুসমাজ তাহাদের কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ বা তাদৃশ বাধা প্রদান করেন নাই। এক্ষণে কেশব বাবু ও তাঁহার সহযোগিগণের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারবিষয়ে সাফল্য দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা যতই প্রচারিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যতই দেশময় বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল, খৃষ্টানগণের মনে ততই ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। তাঁহারা আর চুপ করিয়া থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। লালবিহারী দে প্রমুখ খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ রণদামামা বাজাইয়া সম্মুখসমরে অগ্রসর হইলেন। বক্তৃতা ও সাময়িক পত্রের সাহায্যে কিছুদিন বিলক্ষণ যুদ্ধ চলিল। পরে খৃষ্টানগণ পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। সেই হইতে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের স্রোত অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়া গেল। শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের নিকট খৃষ্টধর্ম্মের আর কোন আকর্ষণ রহিল না।

১৮৭০ খৃঃঅব্দে গোস্বামিমহাশয়ের একমাত্র পুত্র যোগজীবন জন্মগ্রহণ করেন। কন্যার পিঠে পুত্র হওয়াতে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পুত্রের শুভ কামনায় নানা প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। গোস্বামিপাদ আদর করিয়া পুত্রের নাম যোগজীবন রাখিলেন। মহাপুরুষের রক্ষিত নাম যোগজীবনে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল। বালক বস্তুতঃই যোগজীবন ছিলেন। ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ গুপ্ত থাকিয়া পরে প্রকাশ পায়, এই বালকের মধ্যেও মহাপুরুষের সমস্ত উপকরণ গুপ্তভাবে থাকিয়া কালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই শিশু কালে এক জন মহৎ লোক হইয়াছিলেন। যোগজীবন যথার্থই অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদারপ্রকৃতি, অমায়িক, নির্ব্বৈর পুরুষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি কাহারও প্রতি বৈরভাব পোষণ করিতে পারিতেন না। ঘোর শত্রুকেও তিনি বন্ধুভাবে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিতেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় কারুণ্যরসে গলিয়া যাইত। তিনি প্রাণপণে দুঃখির দুঃখ বিমোচনের চেষ্টা করিতেন। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। অর্থের প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি না থাকাতে তিনি অজস্র অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। তাঁহার ন্যায় ঈশ্বরবিশ্বাসী, ভগবদ্ভক্ত আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। গুরুভক্তি ও গুরুআনুগত্য তাঁহার অসামান্য ছিল। গুরুর ভিতরে তিনি আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। গুরুব্যতীত তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। তাঁহার জনক ও গুরু গোস্বামিপাদের ইচ্ছার সহিত তিনি তাঁহার ইচ্ছা এক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বৃহৎ অর্ণবপোতে সংযুক্ত তরণি যেমন সর্ব্বতোভাবে অর্ণবপোতেরই অনুগমন করিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ গুরুদেবের অনুসরণ করিতেন।

গোস্বামিমহাশয়কে তিনি স্বীয় প্রাণ হইতেও অধিক ভালবাসিতেন। একটি ঘটনায় তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গোস্বামিমহাশয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া আত্মবিনাশে কৃতসংকল্প হন। তিনি শূন্যগৃহে গলদেশে পরিধেয় বস্ত্র বন্ধনপূর্ব্বক উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগছি মহাশয় দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি যোগজীবনের এই প্রকার অধ্যবসায় দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পরে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। বাগছি মহাশয়ের বাক্যে যোগজীবন অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। নবকুমার বাবু তাঁহাকে অন্য স্থলে লইয়া গেলেন। ১৩১২ সালের ১৮ই আশ্বিন বুধবার মহাপ্রাণ যোগজীবন দিব্য ধামে গমন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য কেশববাবু এই বৎসর ইংলণ্ডে গমন করেন। বিলাতবাসিগণ তাঁহাকে অতিশয় সমাদর করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তথায় তিনি ছয় মাস কাল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে আসিয়া তিনি "ভারতসংস্কারক" নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। এই সভা পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। সুলভসাহিত্যবিভাগ, দাতব্যবিভাগ, শ্রমজীবিদিগের শিক্ষাবিভাগ, স্ত্রীবিদ্যালয়বিভাগ ও সুরাপাননিবারণবিভাগ। সুলভ সাহিত্যবিভাগ হইতে সুলভ সমাচার নামে এক পয়সা মূল্যের এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত।

এই সময়ে কলিকাতার দক্ষিণস্থ বেহালা গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরের

অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। ভারতসংস্কারক সভার অন্তর্গত দাতব্যবিভাগ হইতে এই গ্রামে ঔষধ বিতরণ করা হইত। গোস্বামিমহাশয় এই ঔষধ বিতরণকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তিনি যখন যে কার্য্যে উৎসাহিত হইতেন, তাহাতে একেবারে ডুবিয়া যাইতেন। এ কার্য্যেও তিনি একেবারে আপনাকে ঢালিয়া দিলেন। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে বেহালা গ্রামে গমন করিতেন এবং বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া পীড়িত লোকদিগকে ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিতেন। এই কার্য্য শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার একটা-দেড়টা হইয়া যাইত। অতঃপর স্নানাহার শেষ করিয়া স্ত্রীবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন। রজনীযোগে আবার সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহাকে এই প্রকার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ সর্ব্বদা তাঁহাকে শ্রমলাঘব করিতে বলিতেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই পরিশ্রম কমাইতে পারিলেন না। এত পরিশ্রম তাঁহার শরীরে সহ্য হইল না। এক দিন অকস্মাৎ তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ডে দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হইল। বেদনায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকগণ অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। এই হইতে তিনি দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগে চিরকালের জন্য আক্রান্ত হইলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই রোগে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। এই পীড়াতে তিনি প্রায়ই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। এক দিন তাঁহার মূর্চ্ছা আর কিছুতেই দূর হয় না। তিনি জীবিত কি মৃত তাহা বুঝা কঠিন হইয়া পড়িল। তাঁহার পরিবারস্থ সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আত্মীয়বর্গের প্রাণপণ শুশ্রূষায় ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরি মহাশয়ের যত্নে ও সুচিকিৎসায় তাঁহার

মূর্চ্ছা অপনীত হইল। তাঁহার এই কঠিন পীড়াতে সকলেই অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইলেন। যখনতখন যেখানেসেখানে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এজন্য কেশব বাবু তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক জন লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সে সর্ব্বদা গোস্বামিপাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে এক দিন মধ্যাহ্ন-কালে প্রভুপাদ স্বপ্ন দেখিলেন যে জগন্নাথের ঘাটে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন এবং তিনি পীড়াশান্তির জন্য সেই সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া ঔষধ চাওয়াতে সাধু তাঁহাকে ঔষধ প্রদান করিলেন। সেই ঔষধ খাইয়া তাঁহার রোগ ভাল হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র গোস্বামিমহাশয় জগন্নাথের ঘাটে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়াই তিনি স্বপ্নদৃষ্ট সাধুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সাধু তাঁহার দিকে চাহিয়াই বলিলেন, তোমার কি মূর্চ্ছার পীড়া আছে? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, হাঁ আছে। তাঁহার নিকট পীড়ার বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া সাধু বলি-লেন, তোমার যে পীড়া হইয়াছে, তাহার ঔষধ আমার নিকটে ছিল। লোককে দিতে দিতে প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। অতি অল্পই আছে, তাহা তোমাকে দিতেছি। ইহাতে তোমার মূর্চ্ছা দূর হইবে বটে, কিন্তু পীড়া একেবারে সারিবে না। এই বলিয়া সাধু অল্প কিছু সাদা গুঁড়া ধুনির ভস্মের সহিত মিশাইয়া গোস্বামিমহাশয়কে দিলেন। সেই ঔষধ সেবন করাতে তাঁহার মূর্চ্ছা দূর হইল, কিন্তু রোগের মূল নষ্ট হইল না। পীড়া একেবারে সারিল না। হৃদপিণ্ডের বেদনা একেবারে ভাল হইল না। ইহার পূর্ব্বে সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি প্রভুপাদের তাদৃশ ভক্তি ছিল না; এই ঘটনা হইতে তাঁহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও আস্থা হইল। অনন্তর তিনি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্স সাহেবের নিকট যাইয়া

তাঁহাকে পীড়ার অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। সাহেব পীড়ার বিবরণ শুনিয়া তাঁহাকে মর্ফিয়া খাইবার ব্যবস্থা দিলেন। সেই হইতে গোস্বামিমহাশয় মর্ফিয়া সেবন করিতে আরম্ভ করেন। মর্ফিয়া খাইলে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের বেদনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইত। (১)

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ তিনি সর্ব্বদাই বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও বেহারে গমন করিতেন। একবার তিনি ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে পঞ্জাবে গমন করেন। পঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসর নগরে শিখদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মমন্দির অবস্থিত। তাহাকে 'গুরুদোয়ারা' বলে। এখানে দিবারাত্রি ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। কেহ সঙ্গীত করিতে-ছেন, কেহ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, কেহ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে-ছেন, কেহ ভজনা করিতেছেন, এইরূপে অষ্ট প্রহর একটা প্রবল ধর্ম্মের স্রোত তথায় প্রবহমান রহিয়াছে।

গোস্বামিমহাশয় অমৃতসরে উপনীত হইয়া গুরুদোয়ারা দর্শন করিলেন। গুরুদোয়ারা একটী সরোবরের মধ্যভাগে অবস্থিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে জল। একটি সেতুদ্বারা মন্দিরে গমন করিতে হয়। এই সরোবরকে অমৃতসর বলে। এই অমৃতসরের নাম হইতেই নগরের নাম অমৃতসর হইয়াছে। গুরু রামদাসকর্ত্তৃক অমৃতসর ও গুরুদোয়ারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সায়ংকালে গুরুদোয়ারায় গ্রন্থসাহেবের আরতি (২) হইয়া থাকে। এই আরতি অতিশয় গম্ভীর ও আনন্দ-দায়ক। গুরুদোয়ারার আরতি দেখিলে অতি পাষণ্ড ও নাস্তিকের

---

(১) হেরিসন রোডে অবস্থানসময়ে তিনি কথনও কথনও দুঃখ করিয়া বলিতেন, যৌবনের অদম্য উৎসাহে মত্ত হইয়া বৃথা কাজে শরীরটাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। শরীরটা এইরূপ ভগ্ন না হইলে এখন কতই সুবিধা হইত।

(২) শিখগণ এই গানটি গাইতে গাইতে পঞ্চ প্রদীপাদি দ্বারা গ্রন্থসাহেবের আরতি করেন :—গগনমৈ থালু রবচন্দ দীপক বনে তারকামণ্ডলা জনক মোতী। ধুপ মলয়ানিলো

মনেও ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হয়। ভারতবর্ষে যত বিখ্যাত দেবালয় আছে, তাহার মধ্যে তিন স্থানের আরতি অতি সুন্দর। বারাণসীধামে ৺বিশ্বনাথের আরতি, মথুরায় বিশ্রামঘাটে যমুনার আরতি ও অমৃতসরের গুরুদোয়ারার আরতি। গোস্বামিমহাশয় অমৃতসরে গুরুদোয়ারার আরতি ও অহোরাত্রি অবিরাম ধর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। অমৃতসর হইতে লাহোরে গমন করিয়া তিনি তথায় কিছুদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। এই স্থানে অবস্থানসময়ে জনৈক সুন্দরী যুবতী দর্শন করিয়া তাঁহার মনে বিকার উপস্থিত হয়। অন্তরের এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। আত্মগ্লানির তীব্রযাতনায়

পবন চবরো করৈ সগল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতী। কৈসী আরতী হোই ভবখণ্ডন তেরী আরতী অনাহতশব্দ বাজন্ত ভেরী। রহাও। সহস তব নৈন নন নৈহ হহি তোহী কউ সহস মূরতি ননা এক তোহী। সহস পদবিমল নন একপদ গন্ধবিনু সহস তব গন্ধ ইব চলত মোহী। সভমহি জ্যোত জ্যোত হৈ সোই। তিসদে চানন সভিমহি চানন হোই। গুরুসাখী জ্যোত পরগট হোই। জ্যোতিস ভবৈ সো আরতি হোই। হরিচরণ-কমল-মকরন্দলোভিত মন অনদিনো মোহিয়াহী পিয়াসা। কিরপা জল দেহু নানক সারঙ্গ কউ হোই জাতে তেরৈ নাই বাসা। (রাগ ধনাসরী মহলা ১)—"হে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরজি, গগনরূপ থালে রবিচন্দ্র প্রদীপস্বরূপ হইয়াছে ও তারকামণ্ডল মুক্তাসদৃশ শোভা পাইতেছে। সুগন্ধ মলয়ানিল ধূপস্বরূপ হইয়াছে এবং পবন চামরব্যজন করিতেছে। সকল বনরাজি উজ্জ্বল পুষ্প প্রদান করিতেছে। হে ভবখণ্ডন, এইরূপে তোমার কেমন আরতি হইতেছে। অনাহত শব্দসকল ভেরী বাজাইতেছে। তোমার সহস্র নয়ন অথচ তোমার একটিও নয়ন নাই। সহস্র মূর্ত্তি অথচ একটিও মূর্ত্তি নাই। সহস্র বিমল পদ অথচ একটিও পদ নাই। গন্ধ নাই অথচ সহস্র তব গন্ধ। এইরূপ তোমার মনোহর চরিত্র। সকলের মধ্যে যে জ্যোতিঃ তাহাই তাঁহার জ্যোতিঃ। তাঁহার প্রকাশে সকলই প্রকাশিত হয়। গুরু সাক্ষাৎ হইলে এই জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। যে সাধক যখন তাঁহাকে ভক্তি করে, তখনই তাঁহার আরতি হয়। আমার মন হরির চরণকমলের মকরন্দে মুগ্ধ হইয়াছে, দিবানিশি আমি তাঁহারই জন্য তৃষিত। নানক চাতককে কৃপাবারি প্রদান কর, যদ্দ্বারা তোমার নামের মধ্যে আমার চিরবাস হয়।" "নানক প্রকাশ" ১ম ভাগ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজপ্রচারবিভাগকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অস্থির হইয়া কটিদেশে প্রস্তরবন্ধনপূর্ব্বক তিনি রাবি নদীতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন। নদীতীরে উপনীত হইয়া তিনি যেই জলমগ্ন হইবেন, অমনি এক জন ফকির আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। ইনি আসনে বসিয়া ভজন করিতেছিলেন, হঠাৎ বাণী শুনিলেন, আত্মহত্যা করিতেছে, শীঘ্র যাইয়া রক্ষা কর। বাণী শুনিয়াই তিনি ছুটিয়া আসিয়া প্রভুপাদকে ধরিলেন এবং প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিলেন। এসম্বন্ধে প্রভুপাদ নিজে লিখিয়াছেন—"পাপ মনে আসাতে আত্মহত্যা করিতে রাবি নদীতে যাই। লাহোরে রাবি নদীতীরে এক ফকির আমাকে ধরিয়া বলিলেন, ও বাচ্চা! শরীর ছোড়্‌নেসে পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হোগা নেই। তু ধীরজ ধর্। তেরা ভালা হোগা। যব পাপ ছুটেগা, তু কুছ নেই জানেগা। আবি বহুত রোজ দের হ্যায়। খোদা সব কামকা সময় ঠিক কর রাখা। বাতাসে যো ধূর উড়তা, ওভি খোদাকা ইচ্ছা সে হোতা। ঘাবরাও মৎ। দুনিয়ামে খোদাকা খেল দেখ্। তেরা ভালা হোগা।" (১)

(১) তিনি এই সময়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারা তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গানটি উদ্ধৃত হইল :—

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়?
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত পাবক যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তোমার নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়?
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়।"

ইহার পর গোস্বামিপাদ কিছুদিন সপরিবারে মুঙ্গেরে বাস করেন। এই স্থানে তাঁহার প্রথমা কন্যা সন্তোষিণী জ্বরবিকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কন্যাশোকে গোস্বামিপাদ অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে এই শোকের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, শোকের জ্বালা যে কি যন্ত্রণাপ্রদ সন্তোষিণীর মৃত্যুতে আমি তাহা বুঝিয়াছি। অপত্যশোকে মানুষের হৃদয় ছিদ্র হইয়া যায়। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময়ে একটি রমণীর মৃতদেহ কাটিতে গিয়া এইরূপ ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমারও মনে হইত, যেন বুকটা ছিঁড়িয়া গেল।

গোস্বামিমহাশয় একবার বিন্ধ্যাচলে গিয়াছিলেন। এক দিন বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং কাননের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে অন্যমনে অনেক দূর চলিয়া যান। সেই নিবিড় বনে এক সাধুর আশ্রম ছিল। প্রভুপাদ সেই আশ্রমে যাইয়া সাধুকে প্রণাম করিলেন। সাধু তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইলেন। দুই জনের মধ্যে ধর্ম্মালাপ আরম্ভ হইল। ধর্ম্মকথা বলিতে বলিতে উভয়ে এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, কখন সন্ধ্যা হইয়াছে, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। রাত্রি হওয়াতে সাধু প্রভুপাদকে আসিতে দিলেন না। আশ্রমেই রাখিলেন। তিনি বন্য ফলমূলদ্বারা অতিথির সৎকার করিয়া কুটিরে গোস্বামিপাদের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আশ্রমের নিকটেই কতকগুলি দস্যু বাস করিত। গোস্বমিপাদ যখন আশ্রমে প্রবেশ করেন, তখন তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিল। তাঁহার ভদ্রোচিত পরিচ্ছদাদি দেখিয়া দস্যুগণের মনে হইয়াছিল যে, ইনি সম্ভ্রান্ত লোক এবং ইঁহার সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ আছে। ইঁহাকে আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিতে পারিলে

বিলক্ষণ লাভ হইবে। এইরূপ মৎলব আঁটিয়া গভীর রাত্রিতে দলবদ্ধ হইয়া তাহারা আশ্রমের দিকে আসিল। আশ্রমে প্রবেশ করিবার দুইটি পথ। তাহারা প্রথমে একটি পথ দিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখিল, পথ আগুলিয়া এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে মাটিতে লেজ আছড়াইতেছে। আগুনের মত তাহার দুই চক্ষু অন্ধকারে জ্বলিতেছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড বাঘ দেখিয়া দস্যুগণ ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। প্রথম পথে এইরূপ বিঘ্ন হওয়াতে তাহারা দ্বিতীয় পথ দিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিতে গেল। সে পথেও ঢুকিতে পারিল না। সে পথেও বাঘ। সেও প্রবেশপথ আগুলিয়া বসিয়া গাঁ গাঁ শব্দ করিতেছে। এইরূপে দুই পথে বাঘ দেখিয়া তাহারা বড়ই বিরক্ত ও দুঃখিত হইল। তাহারা কিছু দূরে যাইয়া বাঘের চলিয়া যাইবার অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইল। বাজ পড়িয়া দস্যুগণের কয়েকজন মারা পড়িল। তখন অবশিষ্ট দস্যুগণ ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। শেষরাত্রে ঝড়বৃষ্টি থামিল। আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। চাঁদ উঠিল। গোস্বামিপাদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি এই সকল ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারেন নাই। সাধু জাগিয়া থাকিয়া সমস্তই দেখিয়াছিলেন। তিনি গোস্বামিপাদকে জাগাইয়া একটি সোজা পথে তাঁহাকে বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদূর আসিতেই গোস্বামিমহাশয় বিন্ধ্যদেবীর মঙ্গল আরতির কাঁসর, ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাইয়া সহজেই মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তাড়াতাড়ি আসাতে তাঁহার অতিশয় ক্লান্তিবোধ হইয়াছিল, তিনি মন্দিরের দ্বারে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দস্যুগণ তাঁহার কাছে আসিয়া তাহাদের রাত্রির দুরভিসন্ধি ও দুর্দ্দশার কথা সমস্ত বলিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। গোস্বামিপাদ সমস্ত

কথা শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। পরে তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন।

কেশববাবু, গোস্বামিপাদ ও অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের যত্ন ও উদ্যোগে ১৮৭২ খৃঃঅব্দে গভর্ণমেণ্ট সিভিল বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করেন। প্রথমে এই আইন ব্রাহ্মবিবাহআইন নামে অভিহিত হইবার কথা হয়। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিকূলতায় গভর্ণমেণ্ট আইনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সিভিল বিবাহবিধি রাখেন।

এই সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্মপরিবারকে এক সঙ্গে রাখিয়া দৈনিক উপাসনা, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, সৎপ্রসঙ্গ, সংযম, যুক্ত আহার-বিহারাদির নিয়ম শিক্ষাদ্বারা কতকগুলি আদর্শ ব্রাহ্মপরিবার সংগঠন করিবার উদ্দেশ্যে কেশববাবু ভারতাশ্রম স্থাপন করেন। এই কার্য্যে গোস্বামি-মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী ও কেশববাবুর এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কেশব বাবু যখন যে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন, তখনই তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। কেশববাবুও, গোস্বামিমহাশয় ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্তকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। প্রচারকদিগের মধ্যে তিনি গোস্বামি-মহাশয়কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। অঘোরবাবু পরলোকগত হইলে এবং কোচবিহার বিবাহের পর গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার ডান হাতখানি বিকল এবং বাঁ হাতখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রভুপাদও কেশববাবুকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কোন উপাদেয় ভোজ্যবস্তু দেখিলে যত্ন করিয়া তাহা কিনিয়া আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। অনেক সময় স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া আহারের পয়সাদ্বারা ভাল বস্তু কিনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছেন। এক দিন

পূর্ব্বাহ্নে তিনি সাধু অঘোরনাথের সহিত কোন কার্য্য উপলক্ষে বাগবাজারে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিতে অনেক বেলা হইল। পথে যাইতে যাইতে গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, অঘোর! অনেক বেলা হইয়াছে, ক্ষুধাও বেশ পাইয়াছে। আমার নিকট চারিটি পয়সা আছে। চল, কোন দোকানে গিয়া কিছু খাই। এই বলিয়া তাঁহারা একখানি মেঠাইএর দোকানে গেলেন। সেখানে উৎকৃষ্ট রসগোল্লা দেখিয়া গোস্বামিমহাশয় অঘোরবাবুকে বলিলেন, ভাই অঘোর, দেখেছ, কেমন সুন্দর রসগোল্লা। কেশববাবু রসগোল্লা অত্যন্ত ভাল বাসেন। এস আমরা দুই পয়সার মুড়ি মুড়কি খাইয়া তাঁহার জন্য একটি রসগোল্লা লইয়া যাই। এই বলিয়া তাঁহারা দুই বন্ধুতে দুই পয়সার মুড়ি মুড়কি খাইয়া কেশববাবুর জন্য একটি রসগোল্লা লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। তিনি অনেক সময়ে বলিতেন, কেশববাবু বড় ঘরের ছেলে, চিরদিন ভাল খাওয়া ও ভালভাবে থাকা অভ্যাস; তিনি কি আমাদিগের ন্যায় কষ্ট সহ্য করিতে পারেন? তাঁহার আহারাদি বিষয়ে ক্লেশ দেখিলে আমার বড়ই কষ্ট হইত।

ভারতাশ্রমে প্রচারকগণ ও কতকগুলি ব্রাহ্ম এক সঙ্গে সপরিবারে বাস করিতেন। কেশববাবু সকলকে লইয়া দৈনিক উপাসনা করিতেন। এক সঙ্গে সকলের আহার হইত। সকলে আপন আপন অংশমত অর্থপ্রদান করিতেন। উমানাথ গুপ্ত নামক এক জন প্রচারক আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। আশ্রমের যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। হরনাথ বসু নামে এক জন ব্রাহ্ম সপরিবারে আশ্রমে বাস করিতেন। উমানাথবাবুর সহিত আর্থিক ব্যাপার লইয়া তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে

তাঁহার দেয়অর্থ প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়াতে অধ্যক্ষ তাঁহার আহার বন্ধ করেন। ইহাই বিবাদের কারণ। অধ্যক্ষের কোন কোন কার্য্যে ও ব্যবহারে অনেকেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে ভয়ানক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই সূত্র ধরিয়া কয়েকখানি সংবাদপত্রে আশ্রমবাসী নরনারীগণের সম্বন্ধে অনেক কুৎসা প্রকাশিত হয়। কেশববাবু কুৎসাকারী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে উচ্চতম বিচারালয়ে (হাইকোর্টে) অভিযোগ আনয়ন করেন। প্রতিবাদিগণ ক্ষমাভিক্ষা ও আপনাদিগের লিখিত বাক্য প্রত্যাহার করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলেন। অতঃপর ভারতাশ্রম উঠিয়া যায়।

ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইণ্ডিয়ান মিরারপত্রে প্রচারকদিগের বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজীবনের অনেক নিন্দা করিয়া কোন লোক একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বে উক্ত পত্রের প্রতিবাদ হয়। গোস্বামিমহাশয় ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিবাদপত্র পড়িয়া যারপরনাই দুঃখিত হন এবং ধর্ম্মতত্ত্বে উহার প্রতিবাদ করেন। গোস্বামিপাদের সেই প্রতিবাদপত্রের কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া গেল। এই অংশ হইতে পাঠকগণ তাঁহার অসামান্য উদারতা, ক্ষমাশীলতা, অমানিতা ও নির্ব্বৈরভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। আর সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মভাব কেমন ম্লান হইয়া গিয়াছিল, তাহারও নিদর্শন ইহাতে দেখিতে পাইবেন :—

"প্রচারকদিগকে গালি দিউক, কিম্বা প্রহার করুক, তাঁহারা অম্লানবদনে সহ্য করিবেন। যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য দয়াময় পিতার নিকট সরলহৃদয়ে প্রার্থনা করিবেন। প্রচারকগণ কখনই আপনার ইচ্ছাতে বা আপনার বলে ধর্ম্মপ্রচার

করেন না। দয়াময় পিতা দৃঢ়রূপে আদেশ করিলে এবং উপযুক্ত বলবিধান করিলে তাঁহারা বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন। কোন মানুষকে পাপ করিতে দেখিলে অশ্রুপাত করিয়া প্রার্থনা করেন। বাস্তবিক মহামারী-পীড়িত ও দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে দেখিলে যেরূপ দয়া হয়, ধর্ম্মহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার সহস্রগুণ দয়া হয়। সেই স্বর্গীয় দয়া হৃদয়ে প্রকাশ হইলে মূর্খ কৃষক, জ্ঞানহীন বালক কিম্বা অবলা নারী ব্যাকুলহৃদয়ে ধর্ম্ম-প্রচার না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রচারকগণ এইরূপ ব্যাকুলহৃদয়ে অস্থির হইয়া দয়াময়নাম ঘোষণা করেন। তাহাতে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। দয়াময়নামের গুণে, সত্যের অসীমপরাক্রমে জগতে ধর্ম্ম-প্রচারিত হয়। মনুষ্যের সাধ্য কি তাহা জগতে প্রচার করিতে পারে?

কতিপয় ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রচারকগণ যাঁহাদের জন্য দিবানিশি অশ্রুপাত করিয়াছেন, এখন তাঁহারা উপযুক্ত হইয়া যদি প্রচারকদিগকে নির্য্যাতন করেন, তথাপি প্রচারকগণ প্রাণান্তেও তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হইতে পারে না। কারণ ভ্রাতাদের ক্রোধে ও উদ্ধতভাবে যদি স্বর্গীয় সম্বন্ধ তিরোহিত হয়, তাহা অপেক্ষা অবিশ্বাসের কার্য্য আর কিছুই নাই।

সাধনভজন না থাকিলেই মনুষ্য ঘোর সংসারী হইয়া পড়ে। সাধনাদ্বারা মন বিনীত হয়, সর্ব্বদা দীনহীন অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বর-চরণ পূজা করিতে অভিলাষ হয়। ভ্রাতাভগিনীদের পদানত থাকিতে ইচ্ছা করে। সাধনহীন মন অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া সকলকেই আঘাত করে, অকৃতজ্ঞ হইয়া উপকারী ব্যক্তিকে গালিবর্ষণ করে।

ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ ! ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ দেবতা নহেন। তাঁহারা মনুষ্য ; মনুষ্য দোষগুণমিশ্রিত। এমন অনেক ব্রাহ্ম আছেন, যাঁহারা প্রচারক দিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রচারকগণ তাঁহাদিগকে ভক্তি করিয়া থাকেন। অতএব প্রচারকদিগের দোষ থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। প্রচারকদিগের যদি দোষ দেখেন, তবে দয়াপূর্ব্বক ক্ষমা করুন। যাঁহাদিগের দোষ দেখিবেন, সদ্‌ভাবে তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের দোষ প্রকাশ করিয়া সংশোধন করুন।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক ভ্রাতৃগণ ! আপনাদের চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, একবার দেখুন। ব্রাহ্মসমাজে সাধন না থাকাতে ব্রাহ্মগণ শুষ্ক হইয়া কি ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন। অনেকের শুষ্কতা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, তাঁহারা উপাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে উপাসনা লইয়া উপহাস করিতেছেন। ঈশ্বরের আদেশ, বিশ্বাস, করুণা এই সকল মুক্তিপ্রদ সত্যে অবিশ্বাস করিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন। ঈশ্বরদর্শনকে কল্পনা মনে করিয়া সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা অনন্ত কালের একমাত্র অবলম্বন, সেই উপাসনা, আদেশ, করুণা, দর্শন প্রভৃতির প্রতি যাঁহারা অবিশ্বাস করিলেন, তাঁহাদের অসহায় শোচনীয় জীবন স্মরণ করিতেও হৃদয় ব্যথিত হয়। ব্রাহ্মদিগের পরিণাম যদি এইরূপ অবিশ্বাসে পরিণত হয়, তবে জগতের লোক কোন্ সাহসে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিবে ?

এখন যাহাতে ব্রাহ্মগণ সাধনভজন করিয়া বিনীত হন, পরিত্রাণার্থী হন, সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন। যদি আপনারা বিরক্ত হন, অভিমানী হন, তবে নিশ্চয়ই আপনাদেরও পতন হইবে। দয়াময়ের চরণে আপনারা জীবন বিক্রয় করিয়াছেন, সে জীবনে পিতার

সন্তানদিগের সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং ভ্রাতাভগিনীগণ যাহা বলিবেন, তাহা সত্য হইলে শিরোধার্য্য করিতে হইবে। প্রতিবাদের ভাব আমাদের মনে যেন স্থান না পায়।”

নিবেদক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ভারত আশ্রমে অবস্থানসময়ে এক দিন রাত্রিতে উপাসনায় বসিয়া গোঁসাইজী একেবারে গভীর ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া যান। সে সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে নাই। তাঁহার এই অবস্থায় ভক্তগণসহ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিকট আগমন করেন। পূজ্যপাদ অদ্বৈত প্রভুও সেই সঙ্গে ছিলেন। তিনি গোস্বামিপাদকে বলিলেন, তুমি শীঘ্র স্নান করিয়া আইস, মহাপ্রভু তোমাকে দীক্ষা দিবেন। অদ্বৈত প্রভুর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ কূয়াতলায় যাইয়া জল তুলিয়া স্নান করিলেন এবং ভিজা কাপড় ছাড়িয়া তাঁহার আসনে আসিয়া বসিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে গোস্বামিপাদ সকলকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের অন্তর্ধানের পর গোঁসাইজীর সমাধি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন গণসহ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন ও তাহার দীক্ষাদান তাঁহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কূয়াতলায় যাইয়া যখন ভিজা কাপড় এবং গা মাথা ভিজা দেখিলেন, তখন আর স্বপ্ন মনে হইল না। সত্য ঘটনা বলিয়াই বিশ্বাস হইল।

ইহার কিছু দিন পরে তিনি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কাশী যাইয়া ৺লোকনাথ মৈত্রের বাড়ীতে কিছু দিন বাস করেন। মৈত্রমহাশয় কাশীতে ডাক্তারি করিতেন। কাশীথাকাসময়ে গোস্বামিপাদ দিবসের অধিকাংশ সময় মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর কাছে থাকিতেন। স্বামীজী মৌনী ছিলেন। কাহারও সহিত কথা বলিতেন না। কিছু দিন পরে এক দিন

সন্ধ্যাকালে তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং গোস্বামিমহাশয়কে তাঁহার অনুগামী হইতে ইঙ্গিত করিয়া বরুণানদীর দিকে চলিলেন। কিছু দূর যাইয়া এক নির্জন স্থানে তিনি গোস্বামিপাদকে বলিলেন, স্নান করিয়া আইস, আমি তোমাকে দীক্ষা দিব। স্বামীজীর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, দীক্ষা দিবেন কি, আমি ত ও সব মানি না। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া স্বামীজী একটু হাসিলেন, এবং জোর করিয়া ধরিয়া গঙ্গায় স্নান করাইয়া দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে বলিলেন, আমি তোমাকে যে দীক্ষা দিলাম, ইহাই তোমার শেষ দীক্ষা নহে। আবার তোমার দীক্ষা হইবে। তোমার গুরু উপযুক্ত সময়ে তোমাকে দীক্ষা দিবেন। তিনি সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমার প্রতি যেটুকু দিবার ভার ছিল, তাহা তোমাকে দিলাম।

ইহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দীক্ষালাভ করিবার পর গোস্বামিমহাশয় একবার কাশীতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে স্বামীজী অজগরব্রত লইয়াছেন। গোস্বামিমহাশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে স্বামীজী তাঁহার দিকে চাহিয়া মাটিতে লিখিলেন, "ইয়াদ্ হ্যায়"? গোস্বামিমহাশয় স্বামীজীর প্রশ্ন শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ মহারাজ! ইয়াদ্ হ্যায়"। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া স্বামীজী হাস্য করিলেন।

এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ৺রাসমণির কালীবাড়ীতে পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বাস করিতেন। এই মহাপুরুষের সহিত গোস্বামিমহাশয়ের অতিশয় সৌহৃদ্য ছিল। প্রভুপাদ পরমহংসদেবকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। পরমহংসদেবও তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। গোস্বামিমহাশয় সর্ব্বদাই পরমহংসদেবের নিকট

যাইয়া তাঁহার সঙ্গসুখ সম্ভোগ করিতেন। প্রভুপাদকে পাইলে পরমহংসদেবের আনন্দের সীমা থাকিত না। তিনি গোস্বামিপাদের সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতেন। প্রভুপাদকে পাইলে তিনি ছাড়িতে চাহিতেন না। তিনি সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। দুই মহাপুরুষের সম্মিলনে প্রেমের বন্যা ও সৎপ্রসঙ্গের তরঙ্গ উঠিত। পরমহংসদেব প্রভুপাদকে বলিতেন, তোমাকে দেখিলে আমার হৃৎপদ্ম যেন বিকসিত হইয়া উঠে। তোমার সঙ্গ আমার বড়ই প্রীতিপ্রদ। এত আনন্দ আমি কোথাও পাই না।

তিনি যখন সাংঘাতিক কণ্ঠনালীর ক্ষতপীড়ায় শয্যাগত, সেই সময়ে গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তখন কাশীপুরে একটি উদ্যানে বাস করিতেন। গোস্বামিমহাশয় বাগানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট গমনোদ্যত হইলে শিষ্যগণ বলিলেন, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। ডাক্তার তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। কথা বলিলে তাঁহার পীড়া বাড়িবে। আপনাকে পাইলে তিনি অনেক কথা বলিবেন, তাহাতে তাঁহার রোগ বাড়িয়া যাইবে। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি, একবার দেখিয়াই চলিয়া যাইব, তাঁহার সহিত একটি কথাও বলিব না। যাহাতে তাঁহার রোগ বাড়িবে, আমি এমন কার্য্য করিব কেন? গোস্বামি-মহাশয়ের এ কথা শুনিয়া শিষ্যগণ তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। এদিকে পরমহংসমহাশয়ের নিকট গোস্বামিমহাশয়ের আগমনবার্ত্তা অপরিজ্ঞাত রহিল না। তিনি এক জন লোক পাঠাইয়া গোস্বামি-মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন এবং গৃহটি নির্জ্জন করিয়া সমস্ত দ্বার

রুদ্ধ করিলেন। এই রুদ্ধগৃহে তাঁহারা অনেকক্ষণ ছিলেন। নির্জ্জনে দুই মহাপুরুষ কি করিলেন, তাঁহারা তাহা কাহাকেও বলেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের সেই কার্য্য সাধারণের নিকট অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে।

১৭৯৩ শকের ১৩ই ফাল্গুন গোস্বামিমহাশয় ভক্তিসাধনব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাল্যবন্ধু সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত যোগ-সাধনব্রত, ৺ গৌরগোবিন্দ রায় জ্ঞানসাধনব্রত এবং গোস্বামিমহাশয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী পূজনীয়া মুক্তকেশী দেবী সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইঁহাদিগের সাধনের জন্য কোন্নগরের নিকটবর্ত্তী মোড়পুকুর গ্রামে একটী উদ্যান ক্রয় করিয়া তাহার নাম "সাধনকানন" রাখা হয়।

ভক্তিব্রত গ্রহণ করিবার এক বৎসর পরে কেশববাবু এক দিন গোস্বামিপাদকে বলিলেন, গোঁসাই! ভক্তিতে তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। গোঁসাই কিন্তু এ কথায় ভুলিলেন না। তিনি লোকের কথায় ভুলিবার এবং আত্মপ্রতারিত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি কেশববাবুকে বলিলেন, "আমি এখনও ভক্তিলাভ করিতে পারি নাই।

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভক্তিলাভের এই প্রকার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। কই আমার ত ইহার একটিও হয় নাই।"

নির্জ্জনে সাধন করিবার জন্য গোস্বামিমহাশয় মধ্যে মধ্যে ইডেন্ গার্ডেনে যাইতেন। গমনসময়ে তিনি প্রতিদিনই দেখিতেন, একটি

লোক পথের ধারে বসিয়া লোকের ছেঁড়া জুতা মেরামত করিয়া দেয়। কিন্তু কখনও কাহার নিকটে মজুরী চায় না। যে যাহা দেয়, সে তাহাই লয়। পাদুকাসংস্কারকের এই কার্য্য তাঁহার নিকট নিতান্তই অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। তিনি এক দিন সন্ধ্যাকালে তাহার অনুসরণ করিলেন। এই লোকটি খিদিরপুরে থাকিত। কাজ শেষ করিয়া সে তাহার বাসাতে উপনীত হইয়া গঙ্গাস্নান করিল। পরে বিগ্রহ ও তুলসীর অর্চ্চনা করিয়া তাহার সমস্ত দিনের অর্জ্জিত পয়সাদ্বারা ঘৃত আটা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিল এবং রুটি তরকারী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিল। তাহার পর উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিয়া আপনি ভোজন করিল। সে প্রতিদিন যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা সমস্তই এইরূপে ব্যয় করিত। ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিত না। গোস্বামিমহাশয় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে তিনি এক জন উচ্চ সাধক। কর্ম্মক্ষয়ের জন্য তাঁহার গুরু তাঁহাকে এই কর্ম্ম করিতে আদেশ করিয়াছেন। গুরুআজ্ঞায় তিনি এই রূপ করিতেছেন। লোকের নিকট পয়সা চাওয়া গুরুদেবের নিষেধ, এজন্য তিনি কাহারও কাছে পয়সা চাহিতেন না।

একবার রংপুর অঞ্চলে কোন স্থানে যাইতে এক দিন অপরাহ্ণ সময়ে গোস্বামিপাদ এক বিস্তীর্ণ ময়দানে গিয়া পড়িলেন। সেই সময়ে ভয়ংকর ঝড়বৃষ্টি আসিল। মেঘগর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রবল ঝড়ের সহিত মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তিনি জলে ভিজিতে ভিজিতে প্রবল ঝড় মাথায় করিয়া আশ্রয়-লাভের জন্য দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। এইরূপে অবিশ্রান্ত চলিয়া রাত্রি প্রহরেকের সময় তিনি একটি ক্ষুদ্র বাজার পাইলেন।

তিনি তথায় আশ্রয়স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিদেশী লোক বলিয়া কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। দোকানদারগণ কেহই তাঁহাকে স্থান দিতে সম্মত হইল না। তখন তিনি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অদূরবর্ত্তী এক বৃক্ষতলে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া তিনি এক উন্মাদিনীকে দেখিতে পাইলেন। উন্মাদিনী কৃষ্ণবর্ণা, উন্নতদেহা, শীর্ণকায়া ও উলঙ্গিনী। তাঁহার জ্যোতিষ্মান্ নয়ন দুইটি নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। সুদীর্ঘ উন্মুক্ত কেশকলাপ পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত। উহা তৈলসেকে আটাযুক্ত হইয়া জটার আকার ধারণ করিয়াছে। গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, মা! তুমি কে? তুমি কি মানবী? অথবা অন্য কিছু? মাতৃ-সম্বোধন শুনিয়া উন্মাদিনী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গোস্বামি-মহাশয়ের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুই আজি আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া আমার অন্তরে যে কি আনন্দ ঢালিয়া দিলি, তাহা বলিতে পারি না। রামপ্রসাদ মধুমাখা মাতৃসম্বোধনে আমার প্রাণ শীতল করিয়া দিত। তাহার পর আর কেহ আমাকে মা বলিয়া আমার হৃদয় স্নিগ্ধ করে নাই। আজি তোর মুখে মিষ্ট মাতৃসম্বোধন শুনিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। তৈলাভাবে আমার মাথা জ্বলিয়া যাইতেছে। আমাকে একটু তৈল দিবি? রামপ্রসাদ তৈল দিয়া আমার মাথা ঠাণ্ডা করিয়া দিত। তাহার পর আর আমার মাথায় এক বিন্দুও তৈল পড়ে নাই।

গোস্বামিমহাশয়ের কাছে পাঁচটি টাকা ছিল, তিনি তাহা লইয়া পুনরায় বাজারে গেলেন এবং দোকানদারকে অনেক বলিয়া কহিয়া কিছু তৈল কিনিয়া আনিলেন। উন্মাদিনী তাঁহাকে তৈল লইয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং মাথায় তৈল দিবার

জন্য মাথা পাতিয়া দিলেন। গোস্বামিমহাশয় অতি আদর ও যত্নের সহিত তাঁহার মাথায় তৈল মাখাইয়া দিলেন। ইহাতে উন্মাদিনী বড়ই তৃপ্তিবোধ করিলেন। পরে তিনি যখন শুনিলেন যে, দোকানদারগণ গোস্বামিপাদকে তাহাদের দোকানঘরে থাকিবার স্থান দেয় নাই, কাতরভাবে বহু অনুনয়বিনয় করিলেও তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই, তখন তিনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি এক প্রকাণ্ড যষ্টি লইয়া বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং দন্ত কড় মড় করিয়া দোকান ঘরে লাঠির আঘাত করিতে লাগিলেন। উন্মাদিনীর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দোকানদারগণ অতিশয় ভীত হইল এবং তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া গোস্বামিমহাশয়কে থাকিবার স্থান দিল। গোস্বামিপাদ আশ্রয় পাইলে উন্মাদিনী অকস্মাৎ অন্তর্ধান করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে কেশববাবুর কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া গোস্বামিমহাশয়ের মনে হইল যে, কেশববাবু আপনাকে অবতার বলিয়া মনে করেন। তিনি এক দিন গোস্বামিমহাশয়কে বলিয়াছিলেন, গোঁসাই! আমার ভিতরে শ্রীচৈতন্যের ভাব (spirit) এবং তোমার ভিতরে শ্রীঅদ্বৈতের ভাব (spirit) বর্ত্তমান। কেশববাবুর এই কথা গোস্বামিমহাশয়ের ভাল লাগিল না। প্রচারকদিগের সহিতও সময়ে সময়ে তাঁহার অনেক বিষয়ে মতভেদ হইতে লাগিল। এক দিন তাঁহাদের সহিত তাঁহার অতিশয় তর্ক হয়। এই সকল কারণে তাঁহার মনে ভয়ানক অশান্তির উদয় হওয়াতে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যশোহর জেলায় বাগআঁচড়া গ্রামে যাইয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে ১৮৭৮ খৃঃঅব্দে কোচবিহারবিবাহের আন্দোলন উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। কোচ

বিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার সহিত কেশববাবুর অপ্রাপ্তবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হওয়াতে ব্রাহ্মগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৮৭২ খৃঃঅব্দে ব্রাহ্মগণ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা বিবাহসম্বন্ধে যে রাজবিধি বিধিবদ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা বরের অষ্টাদশ বৎসর এবং পাত্রীর পঞ্চদশ বৎসর বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট করেন। কোচবিহারের রাজার এবং কেশববাবুর কন্যার বয়স তদপেক্ষা ন্যূন ছিল। আর বিবাহকার্য্যে হিন্দু অনুষ্ঠান হইবে, ইহা জানিতে পারিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্ম এই বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন যে, পাত্রপাত্রী উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং বিবাহে বরপক্ষের লোকেরা হিন্দু অনুষ্ঠান করিবেন, এ কথা যখন তাঁহারা বলিয়াছেন, তখন এ বিবাহ কিছুতেই হওয়া উচিত নহে। আপনি এ বিবাহ দিবেন না। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, আপনি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে নিরস্ত হউন। কিন্তু কেশববাবু স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাদিগের কথা অগ্রাহ্য করিলেন। পূর্ব্বে তিনি যে কার্য্যকে পৌত্তলিকতা বলিতেন, পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতেন, কেবল রাজা জামাতার লোভে সেই সকল হিন্দু-অনুষ্ঠান এ বিবাহে অনুষ্ঠিত হইবে জানিয়াও ঈশ্বরের আদেশে এই বিবাহ হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম একত্র হইয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি তাহা পড়িলেন না। বলিলেন, এ পত্র পড়া মহাপাপ। এইরূপে সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি কন্যা লইয়া কোচবিহারে চলিয়া গেলেন; এবং বরাবর যে হিন্দু-অনুষ্ঠানসমূহকে তিনি পৌত্তলিকতা, পাপানুষ্ঠান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহাই মানিয়া লইয়া হিন্দুমতে কন্যার বিবাহ দিলেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, এই জন্য বরপক্ষীয়গণ তাঁহাকে বিবাহের কোন অনুষ্ঠানই করিতে দেন নাই। বিবাহের পর কেশববাবু কলিকাতা

আসিলে, ব্রাহ্মসমাজে প্রলয়ের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিবাদকারিগণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হইলেন।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন

কোচবিহারের রাজার সহিত কেশববাবুর কন্যার যখন বিবাহ স্থির হয়, গোস্বামিপাদ তখন বাগআঁচড়ায় ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নানারূপ আন্দোলন ও দলাদলিতে তাঁহার মনে অতিশয় অশান্তির উদয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ আর তাঁহার নিকট ভাল লাগিতেছিল না। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জীবন যাপন করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। এ জন্য তিনি গ্রামের বাহিরে একটি বাগানে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এক দিন প্রার্থনা করিবার সময় অকস্মাৎ তাঁহার ভিতরে একটি জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হইল যে "তুই আর দলে আবদ্ধ থাকিস্ না। গণ্ডির ভিতরে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না।" এই বাণীশ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল অশান্তি চলিয়া গেল। তাঁহার প্রাণ মন স্নিগ্ধ হইল। তিনি নিরুদ্বেগে বাগআঁচড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে কিন্তু প্রচারকগণ তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় আসিবার জন্য তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা লিখিলেন, "তুমি শীঘ্র কলিকাতায় না আসিলে শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। মাতৃস্তন্য

পান না করিলে ( কেশববাবুর নিকটে না থাকিলে ) বাঁচিবে কিরূপে ?” পুনঃ পুনঃ প্রচারকদিগের এইরূপ পত্র পাইয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। দলে টানিবার জন্য তাঁহাকে বার বার এই প্রকার পত্র লেখা হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই কলিকাতায় আসিলেন না। ইহাতে তাঁহারা রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই সকল পত্র পাইয়া গোস্বামিপাদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “কলিকাতা হইতে প্রচারক ভ্রাতারা পত্র লিখিতে লাগিলেন যে তুমি শুষ্ক হইয়া মরিবে। মাতৃস্তন্য পান না করিলে অর্থাৎ কেশববাবুর নিকটে না থাকিলে বাঁচিবে কিরূপে ? এই পত্র পাইয়া আমি অবাক্ হইলাম। আমি নিজে আছি ভাল, তাঁহারা গালি দেন, ইহার কারণ কি ? আবার আমাকে কে যেন ডাকিয়া বলিল, যদি ধর্ম্মজীবন চাও ত আর গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিও না। আমি পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় উড়িতে গিয়া পাখায় বল পাই না। তখন বুঝিলাম, ইহা গণ্ডির পরিণাম।”

ধনের লোভে অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার সহিত অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়া এবং ভগবানের আদেশে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, বলিয়া প্রচার করা, প্রভুপাদের নিকট একান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হওয়াতে তিনি কেশববাবুর সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন।

যে সকল ব্রাহ্ম বিবাহের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কেশববাবু ও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত তাঁহাদের বিবাদ বাধিয়া উঠিল। ভারতবর্ষীয় মন্দির লইয়া দুই দলে অতিশয় কলহ আরম্ভ হইয়া শেষে হাতাহাতি রক্তারক্তি হইয়া গেল। মন্দিরের জমির কবালা নিজ নামে থাকাতে পুলিসের সাহায্যে প্রতিবাদকারিগণকে বিতাড়িত করিয়া সেনমহাশয়

সাধারণের অর্থে নির্ম্মিত মন্দির আত্মসাৎ করিলেন। তখন স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করা ভিন্ন প্রতিবাদকারিগণের গত্যন্তর রহিল না। ৺শিবচন্দ্র দেব, ৺আনন্দমোহন বসু, ৺পণ্ডিত-শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, ৺দুর্গামোহন দাস, ৺রজনীনাথ রায় প্রভৃতি প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মগণ স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। ইংলণ্ডবাসিনী মিস্ কলেট্ নূতন সমাজস্থাপনের সংবাদ পাইয়া আনন্দমোহন বসুকে লিখিলেন, আপনারা নূতন সমাজ স্থাপন করিবেন শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। আপনাদের এই সংকল্প অতি সৎ ও মহৎ। আপনাদিগকে এই সময়ে আমার একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। গোস্বামিপাদ কোথায়? তিনি যেখানেই থাকুন, আপনারা তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া নূতন সমাজ স্থাপন করুন। মিস্ কলেটের পত্র পাইয়া আনন্দমোহন বাবু ও প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মগণ গোস্বামিমহাশয়কে কলিকাতায় আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, আর কোন দলে প্রবেশ করিবেন না, কাজেই ব্রাহ্মদের পত্র পাইয়াও তিনি আসিলেন না। পরে তাঁহাদের কেহ কেহ বাগআঁচড়ায় গিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। এই নূতন সমাজ স্থাপন উদ্দেশ্যে ১২৮৫ সালে টাউন হলে ব্রাহ্মসাধারণের যে সভা হয়, তাহার প্রথম প্রস্তাব গোস্বামিপাদ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দির নির্ম্মিত হইলে তিনি তাহার এক জন ট্রষ্টী হইয়াছিলেন।

প্রভুপাদ সাধারণসমাজের আচার্য্য ও প্রচারকপদে অধিষ্ঠিত হইয়া অদম্য উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইলেন। সত্যরক্ষার জন্য কর্ত্তব্য-বোধে তিনি এই সময়ে উদ্দীপনাময়ী বহু বক্তৃতা দ্বারা কেশববাবুর কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। "নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" প্রভৃতি

অগ্নিময়ী বক্তৃতা সে সময়ে লোকের মনে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। বহু সংবাদপত্রেও তিনি অনেক প্রবন্ধ ও পত্রাদি প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মানন্দের তদানীন্তন কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এস্থলে সেই সকল হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল :—

"পূর্ব্বে মনে করিতাম, ব্রাহ্মসমাজ চিরশান্তির স্থান। এখানে কোন প্রকার গোলযোগ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। এক একবার মনে করি, ব্রাহ্মসমাজে যাহা হয়, হউক, আর কোন প্রকার আন্দোলন করিব না। কিন্তু সত্যের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, এবং স্বদেশের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর স্থির থাকিতে পারি না। অন্যায় ও অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ, সুতরাং উদাসীন থাকিতে পারি না। আমি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্ব-সাধারণের নিকট নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"কেশববাবুর সহিত আমার শত্রুতা ছিল না, এখনও নাই। কেবল ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার কথা বলিতে হইতেছে। আমাকে লোকে অস্থির চঞ্চল প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করিতেছে; তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। যখন যাহা সত্য বুঝিব, তাহাই প্রতিপালন করিব। তজ্জন্য চিরদিন বরং অস্থির থাকিতে অভিলাষ করি। কিন্তু কোন বিষয়কে অসত্য জানিয়াও স্থায়িভাবে তাহার অনুসরণকে কপটতা, মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি।

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনাবধি আমি দেখিয়া আসিয়াছি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মদের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। কেশববাবু যাহা করেন, তাহাই হয়। সাধারণের নিকট প্রকৃত ঘটনা

গোপন রাখিবার প্রয়োজন কি, যাহা সত্য, তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেবল কেশববাবুর আধিপত্যে পরিচালিত হইয়া থাকে, একথা কি অস্বীকার করা যায়? সাধারণ ব্রাহ্মদের প্রতি যদি কেশববাবুর স্নেহমমতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া রাখিতেন না। বিশেষতঃ নিঃস্ব ব্রাহ্মদিগকে তিনি যে অবজ্ঞা করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এক দিন কোন কার্য্যোপলক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে কেশব সেন আবার তেলি মালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করিবে! অধিক কি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি যদি যথার্থই অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে স্বীয় পদমর্য্যাদার জন্য ব্রাহ্মদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও সৃষ্টি হইত না।

"কেশববাবু ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ হইলে ব্রহ্মমন্দির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই বিধি কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের বিধি, তাঁহার আদেশেই সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় কন্যার বিবাহে কেশব বাবু সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এক নূতন আদেশ প্রচার করিলেন; যাহাতে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবে।"

"পাপ-কার্য্যকে ঈশ্বরের আদেশ বলিলে যেরূপ ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি অপ্রেমও প্রকাশিত হয়। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি কি নিজের দোষ উপাস্য দেবতার উপর স্থাপন করিতে পারেন? কখনই না।

"ঈশ্বরের আদেশ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহা তাঁহারা কোন কালে অস্বীকার করিতে পারেন না। যথার্থ ঈশ্বরের আদেশকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকি। ঈশ্বর সত্য, পবিত্র, অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহার আদেশও সত্য, পবিত্র এবং অপরিবর্ত্তনীয়

হইবে। আদেশ অসত্য, অপবিত্র এবং পরিবর্ত্তনীয় বলিলে আমরা ঘৃণার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিব।"

গোস্বামিপাদ কেশববাবুর অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করাতে কেশববাবুর অনুগামী ব্রাহ্মদল তাঁহার উপর এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা একাধিকবার তাঁহার প্রাণ-বধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্যভাবে অনিষ্ট ও অপদস্থ করিবার ত বহু চেষ্টাই করা হইয়াছিল। নববিধান সমাজের লোকেরা গোস্বামি-মহাশয়কে মারিবার জন্য গুণ্ডা লাগাইয়াছিল।

গোস্বামিমহাশয় কিছু দিন কলেজস্কোয়ারে সংস্কৃত কলেজের উত্তরে ৺গুরুচরণ মহলানবীশের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়েই এই ঘৃণিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এক দিন পূর্ব্বাহ্ণে প্রভুপাদের এক জন পরিচিত লোক ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলি-লেন। মহাশয়! একি কথা? আজি আমি এক লোমহর্ষণ ব্যাপারের সংবাদ লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। আমি আজ নববিধান সমাজে গিয়াছিলাম। সেখানে যে কথা শুনিয়া আসিলাম, তাহাতে আমার হাতপা পেটের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। আর এই ব্যাপারে আমার মনে হইয়াছে যে ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই মিথ্যা। লোকটির ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয়ের অত্যন্ত ভয় হইল। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল-ভাবে বলিলেন,মহাশয় কি কথা শুনিয়া আসিয়াছেন,শীঘ্র বলুন। আপ-নার ভাব দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। তখন সেই লোকটি বলিল, মহাশয়! বলিব কি মাথা মুণ্ড। সে কি বলিবার কথা? সে কথা কি মুখে আসে? নববিধান সমাজের কতকগুলি প্রধান লোক পরামর্শ করিয়া আপনার প্রাণবধের জন্য গুণ্ডা ঠিক করিয়াছে। সেই সমাজের এক জন বিশিষ্ট লোক সন্ধ্যার পর আপনাকে হত্যা করিবার

জন্য গুণ্ডা লইয়া আসিবেন। এই ভয়ানক কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, প্রথমে এ কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না। পরে লোকটি যখন সমস্তই খুলিয়া বলিল, তখন তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইল। অতঃপর সেই লোকটি গোস্বামিপাদকে বাড়ীর সদর দরজা, সিড়ির দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে এবং অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকিতে বলিয়া চলিয়া গেল। গোস্বামিমহাশয় সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই নীচের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া সতর্ক হইয়া রহিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইলে কথিত ব্রাহ্ম সাধুটি তাঁহার জনৈক বন্ধু এবং গুণ্ডা সঙ্গে লইয়া সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছু দূরে গাঢাকা দিয়া থাকিয়া বন্ধুর সঙ্গে গুণ্ডাকে গোস্বামিপাদের বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন। বন্ধুবরও গুণ্ডাকে একটু আড়ালে রাখিয়া প্রভুপাদের বাড়ীব সদর দরজার কাছে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। উপর হইতে এক জন লোক বলিল, আপনার কি দরকার? তাঁহার শরীর আজ ভাল নাই। তিনি নীচে যাইতে পারিবেন না। ইহাতে আগন্তুক বাবু বলিলেন, তাঁহার সহিত আমার অতি গোপনীয় ও আবশ্যকীয় কথা আছে। একবার দুমিনিটের জন্য তাঁহাকে নীচে আসিতে বলুন। এই বলিয়া তিনি বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোস্বামিপাদ যখন কিছুতেই নীচে নামিলেন না, তখন তিনি বিষণ্ণমনে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। এত সাধের পুণ্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে না পারিয়া যে তাঁহার মনে বিষম ক্লেশের সঞ্চার হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেলে গুণ্ডা গুপ্তস্থল হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে আসিল, তখন উভয়ে একত্র হইয়া, ব্রাহ্মপুঙ্গব যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, বন্ধু তথায় গমন করিল। গুণ্ডা ব্রাহ্মভ্রাতার নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য লইয়া এক দিকে

চলিয়া গেল। ব্রাহ্মভ্রাতাও বন্ধুসমভিব্যাহারে অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন গোস্বামিপাদ ও বাড়ীর সমস্ত লোক জানালা হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হায়রে সাম্প্রদায়িকতা! তোমার কি অপূর্ব্ব মহিমা! একবার এই সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলির খর্পরে পড়িলে মানুষের কি আর নিস্তার আছে? ইহার প্ররোচনায় মানুষ না করিতে পারে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই।

সাধারণসমাজ স্থাপিত হইবার পর ১৮০০ শকে প্রভুপাদ ঢাকা-যান। নববিধানবাদিগণ তাঁহাকে মারিবার জন্য এখানেও গুণ্ডা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা গুণ্ডাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্ম সমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে গোঁসাই যখন সপরিবারে গাড়ি করিয়া বাড়ী যাইবেন, সেই সময়ে গাড়ী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে হইবে। গুণ্ডাগণ তাহাতে সম্মত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেদিন গোস্বামিমহাশয়ের স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন ছিল। সমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি অন্য পথে পদব্রজে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। গুণ্ডারা ইহা জানিতে পারে নাই। গোস্বামি-মহাশয়ের পরিবারবর্গ গাড়ি করিয়া* যাই রাস্তার বাহির হইলেন, অমনি তাহারা আসিয়া গাড়ী ধরিল। গাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের গায়ক চন্দ্রমোহনবাবু ছিলেন। তিনি গুণ্ডাদিগকে বলিলেন, তোমরা গাড়ি আটকাইলে কেন? কি চাও? গুণ্ডারা বলিল, আমরা গোঁসা-ইকে চাই। চন্দ্রবাবু বলিলেন, তিনি গাড়িতে নাই। তখন তাহারা গাড়ি ছাড়িয়া দিল এবং আজ পাইলে জান লইতাম, এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। তাহাদের কথা শুনিয়া মাতা যোগমায়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

* এই ঘটনা দুইটি গোস্বামিমহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রভুপাদের যোগদানের পূর্ব্বে কেশববাবু তাহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। গোস্বামিপাদ যোগ দিলে তাঁহার সে সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইল।

ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্মসমাজ নববিধানসমাজনামে অভিহিত হইলে কেশববাবু তাহার শাসন ও সংরক্ষণ জন্য যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি নিয়ম এই ছিল যে, নববিধানবাদিগণ যেমন আত্মীয়বন্ধুগণের সেবা করিবেন, সেইরূপ তাঁহাদিগকে শত্রুরও সেবা করিতে হইবে। এক জন নববিধানবাদী প্রচারক অতি প্রত্যুষে তিন চারিটি ঝাঁটার কাঠি হস্তে লইয়া গোস্বামিমহাশয়ের প্রাঙ্গণে দুই চারিবার বুলাইয়া শত্রুর সেবা করিতেন। কেশববাবুর অমূল্য উপদেশের এই প্রকার সদ্ব্যবহার হইত।† সাধারণসমাজ স্থাপিত হইবার পর কেশববাবুর ধর্ম্ম নববিধানধর্ম্ম এবং তাঁহার সমাজ নববিধানসমাজ নামে অভিহিত হয়।

এই প্রকার অত্যাচারিত হইয়াও প্রভুপাদ বিরোধীদিগের প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বসদ্ভাব ও প্রীতির বিন্দুমাত্রও বৈলক্ষণ্য হয় নাই। ক্ষমার অবতার গোস্বামিপাদ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের শুভকামনা করিতেন। মহাত্মা যিশু যেমন তাঁহার আততায়িদিগকে ক্ষমা করিয়া ভগবানের নিকটে তাহাদিগের মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন, গোস্বামিমহাশয়ও সেই প্রকার সর্ব্বদা ভগবানের নিকটে তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা করিতেন। তাঁহার মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, অসদ্ভাব প্রভৃতির লেশমাত্রও ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বৈর ও নির্ব্বিকার ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অন্তরে কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাবের উদয় হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।

† এই বিষয়টী গোস্বামিমহাশয়ের শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট শুনিয়াছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে গোস্বামিমহাশয় প্রাণপণে তাহার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের সহিত তিনি দেশে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা প্রেমমালা কলিকাতায় জ্বরবিকারে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। মৃত্যুসময়ে তাঁহার বয়স চারি বৎসর হইয়াছিল। গোস্বামিপাদের প্রথমা কন্যা সন্তোষিণীও এই বয়সেই কলেবর ত্যাগ করেন। গোস্বামিমহাশয়ের চারিটী কন্যা ও একটী পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার প্রথমা কন্যা সন্তোষিণীর ও পুত্র যোগজীবনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার অপর কন্যাত্রয়ের নাম শান্তিসুধা, প্রেমমালা ও প্রেমসখী। একমাত্র শান্তিসুধাই জীবিতা আছেন; আর সকলেই অমরধামের যাত্রী হইয়াছেন।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে কেশববাবু বহুমূত্ররোগে পীড়িত হইয়া অতিশয় ভগ্নশরীরে সিমলা হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিলে গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য তদীয় বাসভবন কমলকুটীরে গমন করেন। তিনি তথায় উপনীত হইলে নববিধানসমাজের প্রচারকদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্ব আক্রোশ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার উদর ও পার্শ্বদেশে মুষ্ট্যাঘাত করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের এইরূপ দুর্ব্যবহারে গোস্বামিমহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেশববাবু দ্বিতলে ছিলেন। নিম্নতলে অত্যন্ত গোলমাল হইতেছে শুনিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্য এক জন লোক প্রেরণ করিলেন। প্রেরিত লোক গোলযোগের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে জানাইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত বিরক্ত ও লজ্জিত হইলেন। তিনি আদরপূর্ব্বক গোস্বামিমহাশয়কে দ্বিতলে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা

করিলেন। প্রহারকারিদিগকে ডাকিয়া অতিশয় তিরস্কার করিলে তিনি তাঁহার দলস্থ প্রচারকদিগের দোষ ও গুণ লিখিয়াছিলে তাহা তিনি গোস্বামিমহাশয়কে পড়িয়া শুনাইলেন। ধর্ম্ম পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে বাস পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কাল অচিরে তাঁহাকে পরলো লইয়া যাওয়াতে তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর আর তাহা মুদ্রিত হয় নাই। *

১৮৮৪ খৃঃঅব্দের জানুয়ারি মাসে কেশববাবু পরলোকগত হন ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে যদিও গোস্বামিমহাশয় তাঁহা সহিত পৃথক্ হইয়াছিলেন এবং তীব্রভাবে তাঁহার ধর্ম্মমত সকলে প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিয়াছিলেন, তথাপি কেশববাবুর প্রতি তাঁহার যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল, তাহার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হ

* এই সময়ে কেশববাবুর সহিত গোস্বামিমহাশয়ের ধর্ম্ম বিষয়ে যে আলা হইয়াছিল, তাহা তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন।

"কেশববাবুর মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলা যে শরীর মৃতদেহের ন্যায় প্রভাহীন হইয়াছে। তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশ করাতে বলিলেন, গোঁসাই! যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন হইল না। পথহারা হইয়া ঘুরিয়া যখন পথের সন্ধান পাইলাম বলিয়া আশা হইতেছিল, এমন সময়ে এই পীড়া :—

"আমাকে বলিলেন, তুমি নাকি নূতন মত অবলম্বন করিয়াছ? আমি বলিলাম, নূতন পুরাতন বুঝি না; ভগবান্‌কে লাভ করিব বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। এখন কত পরিবার ব্রাহ্মসমাজে; তখন কিছুই ছিল না। সুতরাং সামাজিক বাহিরের বিষয় লইয়া গোল করিতে আসি নাই।

"ভগবান্‌কে পাইলাম, ইহা প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে কিছুতেই ফিরব না। যে কোন উপায় ধরিতে হয়, ধরিব। বাহিরের উপায় কিছুই নহে। মৃত্যুকালে আমি কৃতার্থ, আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, প্রভু তুমিই সত্য, ইহা বলিয়া মরিব, এই আকাঙ্ক্ষা। আশীর্ব্বাদ করুন। কেশববাবু বলিলেন, এ সম্বন্ধে আমার অনেক বলিবার আছে। যদি আরোগ্যলাভ করি, তোমাকে ডাকাইব। দুঃখের বিষয় তাঁহার লীলাসংবরণ হইল।"

নাই। কেশববাবুর লোকান্তরপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া তিনি অতিশয় শোকাভিভূত হন। শবের অনুগমন করিবার সংকল্প করিয়া তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইবেন, এমন সময়ে মর্ম্মান্তিক বন্ধুবিচ্ছেদকষ্টে তাঁহার ভয়ানক জর হইল। তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার আর শবের অনুগম করা হইল না।

এই সময়ে তিনি আত্মজীবন উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ধর্ম্মজীবন আর অগ্রসর হইতেছে না। এক স্থানে স্থির হইয়া রহিয়াছে। মানুষ নিজের চেষ্টায় ধর্ম্মপথে কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। তাঁহাকে পাইতে হইলে সদ্‌গুরুর সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা না পাইলে কিছুতেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। গোস্বামিমহাশয় সে সময় ইহা মানিতেন না।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## দীক্ষাপ্রাপ্তি

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে, সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে হয়, গোস্বামিমহাশয় যে ইহা মানিতেন না, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ধর্ম্মলাভ ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে হইলে গুরুকরণ অবশ্যকর্ত্তব্য। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে কিছুতেই ধর্ম্মলাভ ও ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। ধর্ম্মরাজ্যে গুরুকরণরূপ সনাতন অখণ্ড নিয়ম আবহমান কাল হইতে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম,

মুসলমানধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মেই গুরুকরণ ও দীক্ষাগ্রহণ প্রণালী প্রচলিত। যাঁহারা অবতার, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ এবং সকল দেশের সকল সময়ের যাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদিগের সকলকেই গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশু, রাম, কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণ এবং শঙ্করাচার্য্য, কবীর, নানক প্রভৃতি মহাজনগণ সকলেই গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। সকলেরই গুরুকরণ হইয়াছে। রামচন্দ্রের গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব। পূজ্যপাদ মহর্ষি গর্গ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুরু। মহাত্মা যীশুর গুরু জন্-দি-ব্যাপ্‌টিষ্ট্।

দুগ্ধপোষ্য শিশু ধ্রুব শ্বাপদসঙ্কুল বিজন মধুবনে উপনীত হইয়া কাতরপ্রাণে "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সকরুণ আহ্বান ও ক্রন্দনধ্বনিতে মধুবন মুখরিত হইয়া উঠিল। ধ্রুবের কাতর রোদনধ্বনি শুনিয়া লক্ষ্মীদেবীর মন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভগবান্‌কে বলিলেন, দুগ্ধপোষ্য বালক ধ্রুব কাতরকণ্ঠে তোমাকে ডাকিতেছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছ। তুমি ত বড় নির্ম্মম। জগজ্জননী কমলার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ সহাস্যবদনে বলিলেন, সৃষ্টিসংরক্ষণ ও পরিচালন করিবার জন্য আমি যে সকল সনাতন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহা ভঙ্গ হইতে পারে না। গুরুকরণ ব্যতীত কেহ কখনও আমার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে না, এই সনাতন বিধি আমিই স্থাপন করিয়াছি। আবহমান কাল হইতে এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইয়া আসিতেছে। ধ্রুবের জন্য সেই নিয়ম ভঙ্গ হইতে পারে না। তবে আমি ইহার উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি। অচিরেই তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া তিনি দেবর্ষি নারদকে মধুবনে প্রেরণ করিলেন। দেবর্ষি

তথায় যাইয়া ধ্রুবকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে ভগবান্ ধ্রুবের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন।

গোস্বামিমহাশয় গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে মানসসরোবরবাসী পরমহংসজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সিদ্ধাবস্থালাভ করিবার পর, ওঁকারনাথনিবাসী পরলোকগত ৺প্যারিলাল ঘোষ মহাশয়কে তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ না করিলে কিছুতেই ব্রহ্মদর্শন হয় না। গুরুকরণ ও দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত ভগবান্‌কে লাভ করা সর্ব্বথা অসম্ভব।*

তাঁহার স্বপ্রণীত "আশাবতীর উপাখ্যান" নামক গ্রন্থ তাঁহার সিদ্ধাবস্থালাভ করিবার পর লিখিত হয়। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন :—

"গুরু না পাইলে কি ধর্ম্মলাভ করা যায় না?

"না, গুরু না পাইলে ধর্ম্মলাভ হয় না। ক, খ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন, কৃষি বা বাণিজ্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কেবল ধর্ম্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহার পর আশ্চর্য্যের কথা আর নাই। যদি বল, ধর্ম্ম আমাদের মধ্যেই আছে, তাহা আবার কাহার নিকট শিক্ষা করিব? তবে ক, খ প্রভৃতি সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় ত পড়িয়া আছে, শিখিলেই হয়, তজ্জন্য অন্যের খোসামোদ করা হয় কেন? বনজঙ্গলে, পাহাড়ে, খনিতে রোগের ঔষধ আছে, তাহা শিখিবার জন্য কবিরাজের শিষ্য হও কেন? যাহার জলপিপাসা হয়, সে ব্যক্তি কোদাল, খন্তা লইয়া

* ৺প্যারীলাল ঘোষ (মৌনীবাবা) মহাশয়কে গোস্বামিমহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, যথাস্থানে তাহা প্রকাশিত হইবে।

কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যেখানে জলাশয় আছে, সেখানে জলপাত্র লইয়া জলগ্রহণ করে। তদ্রূপ সেই জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং গুরুশক্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। যেখানে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছেন, সেস্থান হইতে সেইরূপ শিক্ষা-লাভ করিয়া থাকি। যেখানে প্রেম-ভক্তি-বিশ্বাসপবিত্রতারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেস্থান হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্ম একটি প্রণালী নহে; স্বয়ং ভগবানই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাক্য নহে, শক্তি। ধর্ম্ম মত নহে, কিন্তু সম্ভোগের বস্তু। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখাইয়া দেন, অন্তরে জানাইয়া দেন, তিনিই গুরু। যিনি যে বিষয়ের শিক্ষা দেন, তিনি সেই বিষয়ের গুরু। সকলের পদানত হইয়া পদধূলি লইতে লইতে অহংকার নষ্ট হইয়া হৃদয় এরূপ বিনীত না হইলে গুরুদর্শন হয় না।

"নিজে নিজে ঈশ্বরের নাম লইলে কি ধর্ম্ম হয় না?"

"হবে না কেন? পুষ্করিণী কাটিয়া জলপান করার মত। পিপাসায় প্রাণ যায়, নিকটে পুষ্করিণী, তাহাতে জলপান না করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়া জলপান করিলে যেরূপ সুবুদ্ধির কার্য্য হয়, তদ্রূপ। বিশেষতঃ ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নাম শক্তি। আমি যে নাম করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম-স্পর্শমাত্র যদি প্রেমভক্তিপবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটি অক্ষর। এ বিষয়ে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলি, শ্রবণ কর:—

এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। ব্যাস বলিলেন, হে বিপ্র! তুমি কি জন্য আমার নিকট দৈন্যপ্রকাশ করিতেছ? আমি তোমার কি উপকার করিব? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে পরাশরের পুত্র! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি

তোমার শরণাগত, আমার উপকার কর। আমাকে এমন কিছু শিখা-ইয়া দাও যে, আমি যথেচ্ছগমনাগমন করিতে পারি। ব্রাহ্মণের এই দৈন্যোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিল্বপত্রে কিছু লিখিয়া দিয়া বলিলেন, হে দ্বিজ! এই বিল্বপত্রে যাহা লিখিয়া দিলাম, তাহা দেখিও না। ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে। এই পত্র হস্তে থাকিতে তোমার স্বৈরবিহারে কেহই বাধা দিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ সেই পত্র লইয়া পরমানন্দে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কখনও ইন্দ্র-লোকে, কখনও চন্দ্রলোকে, কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে মনের সাধে ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিন দেখিলেন, পত্রটী শুকাইয়া গিয়াছে। মনে করিলেন পত্রটি শুষ্ক হইল, কখন চূর্ণ হইয়া যাইবে, অতএব ইহাতে যাহা আছে, তাহা একটী নূতন পত্রে লিখিয়া লই। পত্রটি খুলিয়া দেখেন, তাহাতে লেখা আছে, ওঁ রাম'; আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নহে, হিজি বিজি। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন, ও হরি! এই সঙ্কেত। ওঁরাম! লেখারও শ্রী দেখ। দূর হউক, শুষ্ক পত্রটা রাখিয়া আর লাভ কি? আমার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, মুক্তার মত। ইহা বলিয়া একটি বিল্বপত্রে [illegible] অক্ষরে ওঁরাম লিখিলেন। শুষ্ক পত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ হস্তেলিখিত পত্রটী হস্তে লইয়া মনে করিলেন, মন চল, একবার কাশী যাই। ওঃ একি, উঠি না কেন? অনেক চেষ্টা করিলেন, সমস্ত বিফল হইল, কাশী যাওয়া হইল না। তখন ঘৃণা লজ্জা, দুঃখে অবসন্ন হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। আর কোন উপায় না দেখিয়া পুনঃ ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া বিষয় সমস্ত বর্ণন করিলেন। ব্যাস কহিলেন, হে বিপ্র! তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি তোমাকে বলি-য়াছিলাম যে, এই পত্রের মধ্যে কি আছে, তাহা দেখিও না, আমি বহুকাল গুরুসেবা করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করি। সেই গুরুদত্ত শক্তি হৃদয়ে ধারণ

করিতে সেই শক্তি আমার দেবতারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় ও বরে আমি তাহা সঞ্চারণ করিতে পারি, এজন্য আমার লিখিত নামে সেই শক্তি বর্ত্তমান ছিল। সেই শক্তিপ্রভাবেই তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়াছ। 'ওঁরাম, এই কটি অক্ষরের কোন মূল্য নাই। এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ অনেক রোদন করিলেন, কিন্তু ব্যাস অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে সময় হয় নাই বলিয়া আর শক্তিসঞ্চারণ করিলেন না।"

যে দুরত্যয়া মায়া জীবগণকে অনাদি কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন করিতেছে; কখনও নরকে নিপাতিত, কখনও স্বর্গভোগে নিয়োজিত, ভোগাবসানে আবার যোনিগত করিতেছে, সেই মায়া সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানেরই অন্যতমা শক্তি। ভগবান্ স্বয়ং জীবকে এই বলবতী মায়ার আলিঙ্গন হইতে, উদ্ধার না করিলে, ক্ষুদ্রশক্তি জীবের সাধ্য কি যে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব মায়ার হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে হইলে অবশ্যই সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি শিষ্যকে মায়ার আলিঙ্গন হইতে, দুশ্ছেদ্য কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। মায়াশক্তি হইতে গুরুশক্তি প্রবল। এই জন্যই সদ্‌গুরু পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
সর্ব্বতীর্থাশ্রমশ্চৈব সর্ব্বদেবাশ্রয়ো গুরুঃ।
সর্ব্ববেদস্বরূপশ্চ গুরুরূপী হরিঃ স্বয়ম্॥
গুরুশ্চন্দ্রস্তথেন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ বরুণোঽনলঃ।
সর্ব্বরূপো হি ভগবান্ পরমাত্মা স্বয়ং গুরুঃ॥"

গুরুকরণ ও দীক্ষাগ্রহণ যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ইহা ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মবিরুদ্ধ ; কাজেই ব্রাহ্মগণ তাহা মানেন না। তখন গোস্বামিমহাশয় ব্রাহ্ম, সুতরাং তিনিও তাহা মানিতেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বারাণসীধামবাসী পূজ্যপাদ ত্রৈলঙ্গস্বামী যখন তাঁহাকে দীক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন, তখন তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই।

গুরুকরণ ও দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা স্বীকার না করিলেও তিনি তাঁহার তদানীন্তন ধর্ম্মজীবনের অবস্থাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী অনুসারে প্রাণপণে সাধন করিয়াও অভিলষিত অবস্থা লাভ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মগণের মধ্যে অতি অল্প লোকই তাঁহার ন্যায় কঠোর সাধন করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন "গোঁসাইজীর রাত্রিতে প্রায়ই শয়ন করা ঘটিয়া উঠিত না। শয়নের পূর্ব্বে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে বসিয়া তিনি এমনই গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন যে রাত্রি কোন দিক্ দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন না। চক্ষু খুলিয়া দেখিতেন রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তখন আর তাঁহার শয়ন করা হইত না। প্রতিদিনই প্রায় এইরূপ ঘটিত।" শাস্ত্রিমহাশয় আর এক দিন বলিয়াছিলেন, "এক দিন আমি গোঁসাইজীর সহিত এক দোতলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলাম, কথায় কথায় ঈশ্বরপ্রাপ্তির কথা উঠিলে তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, যদি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে এই বারান্দা হইতে নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে আমি এখনই তাহা করিতে পারি। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।" শাস্ত্রিমহাশয় আর একবার বলিয়াছিলেন, "সহস্র বক্তৃতা ও উপদেশে যতটা ধর্ম্মপ্রচার না হয়, গোঁসাইজীকে একখানি চৌকিতে বসাইয়া রাস্তা দিয়া লইয়া বেড়াইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রচার হয়। আমার বিশ্বাস গোঁসাইএর আঙ্গুল ছুঁইলে লোকের ভক্তি হয়। আমি

তাঁহাকে দেখিয়াই ব্রাহ্ম হইয়াছি।" প্রভুপাদের প্রতি শাস্ত্রিমহাশয়ের এই ভাব স্থায়ী হয় নাই। গোস্বামিপাদের জীবনের গতিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে শাস্ত্রিমহাশয়ের শ্রদ্ধারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

গোস্বামিপাদ ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী অনুসারে প্রাণপণে সাধন করিয়াও ধর্ম্মের স্থিরভূমি লাভ করিতে পারিলেন না। এই সাধনে তাঁহার উচ্চাবস্থা লাভ হইলেও তিনি যাহা চাহেন, তাহা পান নাই। মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে তিনি সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার এই সময়কার অবস্থা "যোগসাধন" নামক গ্রন্থে স্বয়ং তিনি এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না। কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না। উপাসনার সময়ে অনেক সময় তাঁহার জাগ্রত জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ, আশা ও শান্তি উপভোগ করিতাম সত্য, কিন্তু কেন জানি না, এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। অনেক সময়েই তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাটাইতে হইত এবং তখন অত্যন্ত ক্লেশ হইত।

"শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আন্দোলনের কিছু পূর্ব্বে আমি যখন বাগআঁচড়া গ্রামে ছিলাম, তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হয় এবং তাহাতে দেখি যে, জীবনে প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা অতিহীন। সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থাৎ তখনও পাপাসক্তির মূল জীবিত ছিল। অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীনাবস্থা দেখিয়া

আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্ম্মচিন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি করিয়াছি এবং নানা দেশ বিদেশে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া, হায়! আমার অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয়। তবে ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ্‌ভূমি কি আর নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইল। বুঝিলাম যে, ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার আর কোন উপায়ই নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্য ঔষধি নাই। তখন নানা স্থানে ঐ ঔষধের অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। * কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধুর সহবাসে প্রাণায়াম

* ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রভুপাদ বাউলসম্প্রদায়ে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাউল সম্প্রদায়ে গমনের বিবরণ শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু প্রণীত 'সদ্‌গুরু লীলা' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। হরিদাস বাবু এই বিবরণটি প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া তাঁহার গ্রন্থে যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, এ স্থলে অবিকল তাহাই উদ্ধৃত হইল—

"বীরভূম জেলার অন্তর্গত কোটাশুর গ্রামে ক্ষেপামায়ের এক আখড়া আছে। ইহা বাউল সম্প্রদায়ের লোকগণের এক প্রধান আড্ডা। এই আখড়ায় থাকিয়া গোস্বামি-মহাশয় বাউলসম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া কিছু দিন তাহাদের সঙ্গে সাধনভজন করেন। তৎপর তাহারা গোস্বামিমহাশয়কে মলমূত্র শুক্র ও শোণিত খাইতে বলে। গোস্বামিমহাশয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহা খাইলে কি হইবে? ইহাতে কি ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে? যদি এই সব খাইলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে আমি হাঁড়ি হাঁড়ি খাইতে প্রস্তুত আছি।

বাউলগণ। না, ইহাতে ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে না; তবে শরীর সুস্থ থাকিবে ও দীর্ঘ-জীবন লাভ হইবে।

গোঁসাই। শরীর নশ্বর, এক দিন না এক দিন ইহা বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। তার জন্য এই কদর্য্য আহার কেন করিব?

বাউলগণ। তোমাকে খাইতেই হইবে। তুমি আমাদের দলে মিশিয়া আমাদের গুহ্য

শিক্ষা করিলাম ও তাঁহাদিগের নিকট বিস্তর ধর্ম্মকথা ও অনেক উপদেশ পাইলাম। কিন্তু তাহাতে আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিল না; আমার অন্তরের বস্তু সেখানেও পাইলাম না। তখন নানা স্থানে ভ্রমণ করিলাম। অঘোরপন্থীদের কাছে গেলাম; তাঁহারা সাধক বটেন, কিন্তু তাঁহাদের নরমাংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইল না। কাপালিকদিগের ব্যবহার আরও ভয়াবহ দেখিলাম। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকির এবং বৌদ্ধযোগী সকলের নিকট গেলাম, কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না।"

এই সময়ে গোস্বামিমহাশয়ের এক জন জ্ঞাতির মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হন। ইহাতে গোস্বামিমহাশয়ের মনে হইল যে, এই বিষয়টি আমি পাইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত। অন্তরে এইরূপ ভাব উদিত হইবামাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন। "একি, আমার মনে এই ঘৃণিত চিন্তার উদয় হইল

ব্যাপার সব জানিয়াছ; এখন যদি না খাও,' তোমাকে বলপূর্ব্বক খাওয়াইব এবং মারিয়া তোমার হাড় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। এই বলিয়া বলপ্রয়োগের উপক্রম করিল।

গোঁসাই। তোরা জানিস আমি কে? আমি শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামী। এদেশে আমাদের বহু শিষ্য আছে। তোদের এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমাকে এমন কথা বলিস্। আমি একটা ডাক দিলে এখনই কতলোক আসিয়া তোদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। এই কথাতে বাউলগণ নিরস্ত হইল। তিনি ধর্ম্মার্থী হইয়া বাউলদিগের নিকট গেলে তাঁহারা তাঁহাকে বাসনমাজা, জলতোলা, কাঠচেরা প্রভৃতি শ্রমসাধ্য হীনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনি প্রফুল্লচিত্তে বহু দিন ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। পরে মল-মূত্রাদি ভোজন লইয়া তাহাদের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি তাহাদের দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন।"

কেন? তবে ত আমার বিষয়বাসনা দূর হয় নাই। পাপাসক্তির মূল বিনষ্ট হয় নাই। তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য ব্যাকুলান্তরে দেশবিদেশে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কর্ত্তাভজা, অঘোরপন্থী, কাপালিক, বাউল, ন্যাড়া, বৌদ্ধযোগী প্রভৃতি বিবিধসম্প্রদায়ে এই সময়ে তিনি গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন সম্প্রদায়েই তিনি তাঁহার প্রাণের বস্তু পান নাই। কর্ত্তাভজাদিগের সহিত মিশিয়া অনেক দিন প্রাণায়ামসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। কর্ত্তাভজাদিগের ধর্ম্মমত তাঁহার নিকট নাস্তিকতা বলিয়া মনে হওয়াতে তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

ইহার অনেক দিন পরে ঠনঠনিয়ার মোড়ে একটি সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসীর শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি প্রভুপাদের অতিশয় ভক্তি হইল। তিনি বিনীতভাবে স্বামীজীকে অভিবাদন করিলে স্বামীজী তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্বামীজীর পবিত্র করস্পর্শে তাঁহার দেহমন স্নিগ্ধ হইয়া গেল। ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বামীজীর সহিত তাঁহার অনেক কথা হইল। এইরূপে আলাপ করিতে করিতে তাঁহারা অনেক পথ গেলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে যখন পৃথক্ হন, তখন গোস্বামিপাদ স্বামীজীকে ব্রাহ্মসমাজে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী প্রভুপাদের এই নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। রবিবারে যথাসময়ে স্বামীজী সমাজে আসিলেন। সেদিন গোস্বামিমহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে তিনি স্বামীজীর নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের সমাজ কেমন দেখিলেন; উপাসনা কেমন লাগিল?

স্বামীজী। বেশ ভাল লাগিয়াছে। তুমি ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, গীতা,

উপনিষদ্ ইত্যাদি শাস্ত্রের কথা বলিলে, তাহা কাহার না ভাল লাগিবে? আমি বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

গোস্বামিপাদ। ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, শাস্ত্রের উচ্চ উচ্চ কথা ত বলিলাম, কিন্তু আমার অন্তরের অশান্তি ও অভাব ত ঘোচে না। আমি ত এখনও ধর্ম্মের নিরাপদ্‌ভূমি লাভ করিতে পারিলাম না। কি উপায়ে তাহা পাইতে পারি, আমাকে বলিয়া দিন।

স্বামীজী। এ সকল কথা আমাকে না বলিয়া তোমার গুরুকে বল। তিনি যাহা হয়, একটা উপায় করিবেন।

গোস্বামিপাদ। আমার গুরু থাকিলে ত বলিব। আমার গুরু নাই।

স্বামীজী। (সবিস্ময়ে) সে কি? গুরু নাই এ কি কথা!

গোস্বামিপাদ। গুরুর নিকট দীক্ষা না লইলে ধর্ম্ম হয় না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

স্বামীজী। তুমি বিশ্বাস না করিলে কি হইবে, ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে অবশ্যই গুরু চাই। গুরুর নিকট দীক্ষা না লইলে কিছুতেই ধর্ম্মলাভ হয় না। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ এ কথা কি জান না? রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণকেও দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইয়াছে। অদীক্ষিত লোকের ধর্ম্মকর্ম্ম প্রস্তরে উপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়।

স্বামীজীর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয়ের জীবনের যেন একটা দিক্ খুলিয়া গেল। তিনি গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। তখন তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, গুরু ভিন্ন যদি ধর্ম্ম কিছুতেই না হয়, তবে আপনি আমার গুরু হন। আপনিই আমাকে দীক্ষাপ্রদান করুন। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, আমার কাছে তোমার দীক্ষা হইবে না। যিনি তোমার গুরু তাঁহার কাছেই তোমার দীক্ষা হইবে। তিনি সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। সময় হইলেই

আসিয়া দীক্ষা দিবেন। স্বামীজীর কথায় গোস্বামিপাদ্ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

গোস্বামিমহাশয় একবার দারজিলিং গিয়াছিলেন। সেস্থানে তিনি যতদিন ছিলেন, সর্ব্বদা বৌদ্ধলামাদিগের নিকট যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিতেন। এক দিন রাত্রিতে এক বনের পার্শ্ব দিয়া আসিবার সময়ে বনের মধ্যে এক আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ দেখিয়া তিনি দ্রুতপদে সেই স্থানে গেলেন। যাইয়া দেখেন যে, এক জন বৌদ্ধযোগী আসনে ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারই মস্তক হইতে সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইয়া চারিদিক্ আলোকিত করিয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া গোস্বামি-মহাশয়ের মনে অতিশয় বিস্ময়ের উদয় হইল। তিনি একদৃষ্টে যোগীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছু কাল পরে যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল। ধ্যানভঙ্গ হইবামাত্র যোগীর মস্তকস্থ সেই দিব্যজ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন গোস্বামিপাদ যোগীকে প্রণাম করিয়া জ্যোতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে যোগী বলিলেন, সাধনবলে কুণ্ডলিনীশক্তি যখন ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মস্তকস্থ সহস্রদলপদ্মে উপনীত হন, তখন মাথাতে এই জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। যোগীর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় পুনর্ব্বার সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। প্রভুপাদের প্রার্থনা শুনিয়া যোগী আবার সেই ক্রিয়া করিলেন, আবার জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। পরে গোস্বামিপাদ এই যোগীর নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। প্রভুপাদের কথা শুনিয়া যোগী বলিলেন, আমার দীক্ষা দিবার ক্ষমতা নাই। নর্ম্মদাতীরে আমার গুরু আছেন, আপনি তাঁহার কাছে যাইয়া দীক্ষাগ্রহণ করুন। যোগীর কথায় গোস্বামিপাদ নর্ম্মদাতীরে যাইয়া যোগিবরের গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কাছে দীক্ষা চাহিলেন। তাহাতে যোগীবরের গুরু বলিলেন, আমি ত তোমার

গুরু নহি। তোমার যিনি গুরু তিনি সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। সময় হইলেই তিনি তোমাকে দীক্ষা দিবেন। তুমি উতলা হইও না; সময়ে তোমার গুরুলাভ হইবে। এই কথা শুনিয়া প্রভুপাদ শান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে গোস্বামিপাদ ধর্ম্মপ্রচারোপলক্ষে গয়াতে যাইয়া গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত নামক জনৈক ব্রাহ্মের বাড়ীতে অবস্থিতি করেন। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দবাবু তাঁহাকে বলিলেন যে, আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবরদাস নামে এক জন রামাৎ সাধু থাকেন, তিনি অসাধারণ ভক্তলোক। লোকে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ মনে করিয়া অতিশয় ভক্তি করে। রঘুবর দাস বস্তুতঃই এক জন উচ্চ সাধু। আর আকাশগঙ্গার আশ্রমটিও অতিশয় মনোরম। স্থানটি এমনই নির্জ্জন, পবিত্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ যে, তথায় যাওয়ামাত্র বিষয়াসক্ত চিত্তও ভগবানে সমাহিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে অবনত হইয়া পড়ে। স্থানটী সাধনের অতি অনুকূল। গোবিন্দবাবুর মুখে বাবাজীর ও আশ্রমের সুখ্যাতি শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় সেখানে যাইবার জন্য সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। পর দিবস তাঁহারা তথায় গেলেন। বাবাজী দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া সাদরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বাবাজীকে দেখিয়া গোস্বামিমহাশয় ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন। আমি অজ্ঞান, ধর্ম্মবিষয়ে কিছুই জানি না। যাহাতে ভগবৎচরণে আমার ভক্তি হয়, এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। বাবাজী তাঁহার কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, তুমি নিরাশ হইও না। অবশ্যই তোমার ভক্তিলাভ হইবে। তোমার ন্যায় ব্যাকুল ও দীনাত্মারাই ভক্তিদেবীর কৃপাপাত্র। তুমি অচিরে তাঁহার কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে; এই বলিয়া তিনি গোস্বামিমহাশয়কে আশ্বাস প্রদান

করিলেন। জননী যেমন সন্তানের প্রতি বাৎসল্য প্রদর্শন করেন, সেইরূপ স্নেহের সহিত স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আহার করাইলেন। বাবাজীর প্রতি গোস্বামিপাদের অতিশয় ভক্তি হইল। সেই হইতে তিনি সর্ব্বদাই আকাশগঙ্গার আশ্রমে বাবাজীর নিকটে বাস করিয়া সাধনভজন ও বিবিধ সৎপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতেন। কিছু দিন বাবাজীর সংসর্গে বাস করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বাবাজী বস্তুতঃই এক জন মহাপুরুষ। লোকে যে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভক্তি করে, তাহা অন্যায় নহে। ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা। ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ। তাঁহার ভজনের এতদূর প্রভাব যে অন্তরীক্ষচারী বিহঙ্গ ও নরশোণিতলোলুপ ব্যাঘ্র অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। (১)

আর একটী ব্রহ্মচারী এই সময়ে আকাশগঙ্গার আশ্রমে বাস করিতেন। একত্র থাকাতে তাঁহার সহিত গোস্বামিপাদের অতিশয় সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহারা সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকিতেন।

এই আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ১২৯০ সালের আষাঢ় মাসে প্রভুপাদের গুরুলাভ হয়। এক দিন তিনি তাঁহার ব্রহ্মচারী বন্ধুর সহিত আশ্রমে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কয়েকটি রাখাল আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিল যে, পর্ব্বতের উপরে এক জন সাধু বসিয়া আছেন। রাখালগণের কথা শুনিয়া কিছু সেবার বস্তু লইয়া তাঁহারা মহাপুরুষের নিকট গমন করিলেন। মহাপুরুষের সৌম্যমূর্ত্তি, দিব্যকান্তি। শরীর হইতে দিব্য-

(১) অনেক সময়ে তিনি আকাশচারী পক্ষীকে "আও" বলিয়া আহ্বান করিতেন। ডাকামাত্র পাখী তাঁহার কাছে আসিয়া কাঁধে বসিয়া তাঁহার কান জটা ঠোকরাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিত। বাঘ আশ্রমে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিলে তিনি ধমক দেওয়ামাত্র শান্ত হইত এবং চলিয়া যাইতে বলিলে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইত।

জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। ইহা দেখিয়া গোস্বামিমহাশয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মহাত্মার উপরে তাঁহার অতিশয় ভক্তি হইল। তাঁহারা সেবার বস্তুগুলি মহাপুরুষের পায়ের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরে করজোড়ে একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। সাধু তাঁহাদের সহিত দুই চারিটি কথা বলিয়াই তাঁহাদিগকে যাইতে বলিলেন। আরও কিছুকাল থাকিয়া মহাপুরুষকে দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সাধুবাক্যলংঘন করা অনুচিত মনে করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহারা সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। তাঁহারা দুইজনে প্রতিদিনই একবার করিয়া সাধুদর্শনে যাইতেন। এইরূপে কয়েক দিন গত হইলে ব্রহ্মচারী এক দিন বুধগয়ায় (বুদ্ধগয়ায়) বেড়াইতে গেলেন। গোস্বামিমহাশয় সেদিন একাকীই মহাপুরুষের কাছে গেলেন। মহাত্মার দিকে চাহিবামাত্র তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সাধু তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন। গোস্বামিমহাশয় নিকটে গেলে মহাত্মা তাঁহাকে কোলে বসাইয়া দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা দিবার সময়ে গোস্বামিপাদের মনে হইল যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিল। পরে মহাপুরুষ তাঁহাকে সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিলেন।

শিক্ষার পর গোস্বামিমহাশয় গুরুদেবকে প্রণাম করিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিবার পর যখন তাঁহার চেতনা হইল, তখন তিনি আর মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাইলেন না। তখন অতি বিষন্নমনে তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে তিনি রামশিলাপাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। এক নির্জ্জন স্থান দিয়া যাইবার সময়ে হঠাৎ তাঁহার গুরুদেব কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'ঘাবরাও মৎ। ভজন কর, বখ্‌তমে সব

মিল্ যায়েগা।' এইরূপে অভাবনীয়ভাবে গুরুদেবকে দর্শন করিয়া গোস্বামি-মহাশয় যতদূর পরমানন্দ লাভ করিলেন, তাঁহার আশ্বাসবাণী শুনিয়া ততোধিক প্রীত ও আশ্বস্ত হইয়া আশ্রমে আসিলেন এবং একান্তভাবে ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আশাবতীর উপাখ্যান গ্রন্থে" গোস্বামিপাদ তাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্তির বিবরণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নীচে তুলিয়া দিলাম :—

"আশাবতী* স্নানপূজা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কয়েকটি রাখাল আসিয়া বলিল যে, উপরের পাহাড়ে একটি মহাত্মা বসিয়া আছেন। ইহা শ্রবণমাত্র আশাবতী কিছু সেবার বস্তু লইয়া সেই মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাত্মার দিব্যকান্তি, দিব্যলাবণ্য। এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তদ্দর্শনে আশাবতী মুগ্ধ হইলেন। জ্ঞানহারা হইয়া অজ্ঞাতভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা যেমন সন্তানকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, মহাত্মা আশাবতীকে সেইরূপ গ্রহণ করিলেন। আশাবতী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সেই মহাপুরুষের প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন। মহাত্মা শক্তিসঞ্চার-পূর্ব্বক আশাবতীকে দীক্ষিত করিলেন। আশাবতীর প্রাণে এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রবেশ করিল। মহাপুরুষ আশাবতীকে সাধন-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। আশাবতী এই অযাচিত দয়া লাভ করিয়া ভক্তিভাবে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। আশাবতী প্রণাম করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন; উঠিয়া দেখিলেন, মহাপুরুষ প্রস্থান করিয়াছেন। আশাবতী অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে পাইলেন না।"

দীক্ষাপ্রাপ্তির পর গোস্বামিমহাশয় কিছু দিন আকাশগঙ্গার

* গোস্বামিমহাশয়ই আশাবতী।

আশ্রমে অবস্থান করিয়া সাধন করেন। এই আশ্রমে একটি গহ্বর আছে, তিনি সেই গুহাতে সাধন করিতেন। এখানে তিনি এগার দিন সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আসনত্যাগ, স্নানাহার এবং মলমূত্র পরিত্যাগ করেন নাই।

এইস্থানে গোস্বামিমহাশয়ের গুরুদেবের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

গোস্বামিমহাশয়ের গুরুদেবের নাম ব্রহ্মানন্দ স্বামী। সকলে তাহাকে পরমহংসজী বলিতেন। তাঁহার পঞ্জাবদেশীয় ব্রাহ্মণ দেহ। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি প্রথমে নানকপন্থী ছিলেন। পরে বৈদিক পন্থায় প্রবেশ করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করেন। এই বৈদিক পন্থারই অন্য নাম ঋষিপন্থা। উপনিষদে এই পন্থার কথা বিবৃত হইয়াছে। তিনি মানসসরোবরে বাস করিতেন। তিব্বত দেশের মানসসরোবর নামে যে হ্রদের কথা ভূগোলে পাঠ করা যায়, সকলে উহাকেই শাস্ত্রোক্ত মানসসরোবর বলেন। সাধু মহাত্মাগণ এই স্থানে অবস্থান করিয়া তপস্যা করেন, ইহাই তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও ধারণা। কিন্তু তিব্বতদেশের মানসসরোবর হ্রদ আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত মানসসরোবর নহে। সাধুরা এই হ্রদকে মানতালাও বলেন। বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে মানসসরোবর কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থিত এবং সরযূনদী মানসসরোবর হইতে বাহির হইয়াছে। সে স্থান বরফময় ও অতিশয় শীতপ্রধান। সাধারণ লোক সে স্থানে যাইতে পারে না। যাঁহারা যোগের ক্রিয়াতে সিদ্ধ, শীতাতপদ্বন্দ্বসহিষ্ণু তাঁহারাই সেই স্থানে গমন ও অবস্থান করিতে পারেন। য়ুরোপীয়গণ তথায় এ পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হন নাই। মহাপুরুষদিগের নিকট শুনিয়াছি যে মানতালাও প্রদক্ষিণ করিতে কুড়ি দিন লাগে, কিন্তু দুই

মাসের কমে মানসসরোবর প্রদক্ষিণ করিতে পারা যায়না। আর মানস-সরোবরে কচ্ছপাকৃতি প্রকাণ্ডকায় একটি জন্তু কখনও কখনও জলের উপরে ভাসিতে দেখা যায়। সেটি যখন ভাসিয়া উঠে, তখন বোধ হয় যেন সরোবরে একটি দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে। আর তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষরে বহুসংখ্যক প্রণব অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।*

গয়া নগরের নিম্নস্থ ফল্গুনদীর অপর পারে রামগয়া। ভগবান্ রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে এই স্থানে পিতৃলোকদিগের শ্রাদ্ধতর্পণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই স্থানকে রামগয়া বলে। গোস্বামিমহাশয়, এক দিন রাম-গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানকার নৃসিংহদেবের মন্দিরে উপ-স্থিত হইলে অকস্মাৎ পূর্ব্বজন্মের কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি পূর্ব্বজন্মে সন্ন্যাস লইয়া এই মন্দিরে বাস করিতেন। তাঁহার সহিত আরও তিনটি সাধু তাঁহার সঙ্গে ওখানে থাকিতেন। এই মন্দিরের নিকটে একটি বটবৃক্ষ ছিল। পূর্ব্বজন্মে তিনি সেই বৃক্ষের উত্তর দিকের শাখায় 'ওঁরাম' এই শব্দ অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি বৃক্ষের নিকটে গিয়া লেখা

* মানসসরোবর সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য হইতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। কেননা যাঁহারা মানতালাও এবং মানসসরোবর দুইই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছি। প্রভুপাদও এই কথাই বলিয়াছেন। আর প্রাণীদেহে প্রণব থাকাও অসম্ভব নহে। এই পুস্তকের স্থানান্তরে পাঠকগণ শ্রীবৃন্দাবনে কদম্ববৃক্ষে রাধা ও রামনাম প্রকটিত হওয়ায় যে বিবরণটি পাঠ করিবেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছি। বৃক্ষের গাত্রে যদি ভগবানের নাম প্রকটিত হইতে পারে, তাহা হইলে প্রাণীদেহে প্রণব প্রকটিত হইতে না পারিবে কেন? প্রভুপাদ শ্রীবৃন্দাবনে হরেকৃষ্ণ নামাঙ্কিত একখানি অস্থি পাইয়াছিলেন, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

খুঁজিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করিবার পর লেখাটি দেখিতে পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন। বৃক্ষটি বড় হইয়াছে, সেই জন্য অক্ষরগুলি ঠিকমত নাই, কিছু টেরাবাঁকা হইয়া গিয়াছে। অন্যে দেখিয়া সহসা বুঝিতে পারে না। এইরূপে পূর্ব্বজন্মের কথা মনে হওয়াতে তিনি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এ সম্বন্ধে গোস্বামিমহাশয় আশাবতীগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"একি, একি? আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। আমি যেন এখানে ছিলাম। আরও তিনটি সাধু এখানে থাকিতেন। এই বৃক্ষতলে আমার আসন ছিল। ঐ বৃক্ষের উত্তরের শাখায় আমার একটি চিহ্ন আছে। সকলে চিহ্ন দর্শন করিলেন। নৃসিংহ দেবকে দর্শন করিয়া 'এই যে, এই যে' বলিয়া যেন কত পরিচিত আত্মীয়জনের চরণে প্রণাম করিলেন।"

এক দিন গোস্বামিপাদ শুনিতে পাইলেন যে, বরাবর পাহাড়ে কয়েকজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন। বাঁকিপুর হইতে রেলে চড়িয়া গয়া যাইবার পথে বরাবর পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়ে তপস্যার উপযোগী অনেকগুলি গুহা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকার-সময়ে বৌদ্ধভিক্ষুদিগের তপস্যার জন্য পর্ব্বত খনন করিয়া এই সকল গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব গয়ার তিনক্রোশ দূরস্থিত বুদ্ধগয়া নামক স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন। এক সময়ে গয়া প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল আধিপত্য ছিল। যে নালন্দা বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা এই প্রদেশেই বর্ত্তমান ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের সহিত নালন্দার পতন হয় এবং বরাবর পাহাড়ের গুহা-সকলও হিন্দুসাধুদিগের তপস্যাক্ষেত্রে পরিণত হয়। গোস্বামিমহাশয় যে সময়ে বরাবর পাহাড়ে সাধু দেখিতে যান, সেই সময়ে তথায়

এক জন অঘোরপন্থী সাধু বাস করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভৈরব বলিত।

গোস্বামিমহাশয় তাঁহার ব্রহ্মচারী বন্ধুর সহিত মহাপুরুষ দেখিবার জন্য আকাশগঙ্গার আশ্রম হইতে বরাবর পাহাড়ে গমন করিলেন। তাঁহারা পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, ভৈরব সর্ব্বাঙ্গে কালী ও মুখে সিন্দূর মাখিয়া ভয়ানকরূপে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র তিনি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইহাতে ভীত না হইয়া ভৈরবের স্তব করিতে করিতে তাঁহার নিকট গিয়া চরণ ধরিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, প্রভো! আমাদিগকে দয়া করুন, আমাদিগকে মহাপুরুষ দর্শন করান। স্তব স্তুতিতে ভৈরবের দয়া হইল।

ভৈরব। তোরা কিছু প্রসাদ পাবি? তোদের ক্ষুধা হইয়াছে; প্রসাদ গ্রহণ কর।

গোস্বামিপাদ। আপনি দয়া করিয়া যাহা দিবেন, তাহাই প্রসাদ। দয়া করিয়া প্রসাদ দিন।

ভৈরব প্রসাদ আনিয়া দিলেন। প্রসাদ নরমাংস।

গোস্বামিপাদ। আজ্ঞা, আমরা মৎস্য মাংস ভোজন করি না। বিশেষতঃ নরমাংস।

ভৈরব। তবে তোরা ভৈরবের আশ্রমে আসিয়াছিস্ কেন?

গোস্বামিপাদ। প্রভো! দয়া করুন। আমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন না। আমরা সন্তান, পিতা পরীক্ষা করিলে কি সন্তান রক্ষা পায়? এই কথা শুনিয়া ভৈরব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, চল্ তোরা চল্। মহাপুরুষ, কত মহাপুরুষ দেখ্‌বি চল্। এই বলিয়া ভৈরব উভয়কে সঙ্গে লইয়া

এক সংকীর্ণ পথ দিয়া এক প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সে গৃহের চারিকোণে চারি জন মহাত্মা সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া ছিলেন।

দিবাবসানসময়ে তাঁহাদিগের সমাধিভঙ্গ হইল। তাঁহারা স্নানাদি কার্য্যসমাপন করিয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অভ্যাগতদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভৈরব। ইহাঁরা আপনাদিগকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

মহাপুরুষ। সেবা হইয়াছে?

ভৈরব। মহাপ্রসাদ দিয়াছিলাম, উঁহারা নরমাংস বলিয়া ত্যাগ করিলেন। যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল সেবা করিয়াছেন।

মহাপুরুষ। একি অন্যায়। তোমার ধর্ম্মে নরমাংস ভোজন করে বলিয়া কি সকলেই তাহা করিবে? ইহাতে অতিথির অপমান করা হয়।

গোস্বামিপাদ। আজ্ঞা, ওরূপ বস্তু ভোজন করা কি ধর্ম্মের অঙ্গ?

মহাপুরুষ। না মহারাজ। ধর্ম্ম এক, গম্য স্থানও এক। লোকের রুচি অনুসারে নানা মত, নানা পথ। যে, যে পথে গমন করে, সেই পথের অনুরূপ তাহার আহারব্যবহার। কোন পথে অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় খাদ্যবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন পথে মাংস ভিন্ন আর কিছুই মিলে না। গম্যস্থানে উপনীত হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। দেখুন, আমরা এই চারিজন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে চলিতাম। এক জন রামাৎ, এক জন নানকপন্থী, এক জন কাপালিক, আর আমি অঘোরী। পূর্ব্বে আমাদিগের মধ্যে মিল ছিল না, বরং বিরোধ ছিল। পথে চলিতে চলিতে যখন আমরা গম্যস্থানে অর্থাৎ সত্যগৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন আমরা চারিজনেই দেখি যে, আমরা এক স্থানে আসিয়াছি। আমাদের

সমস্ত ভিন্নতা চলিয়া গিয়াছে। আমরা এক গৃহে এক ভাবে এক বস্তু দেখিতেছি। এক রূপ আস্বাদন করিতেছি। ভেদজ্ঞানে হৃদয়ে যে ক্লেশভোগ করিতাম, এখন সে ক্লেশ নাই। যত দিন গম্যস্থানে উপস্থিত না হওয়া যায়, তত দিনই মতভেদ, দলাদলী, সম্প্রদায়; সুতরাং মতভেদের সঙ্গেই আহারবিহার সমস্ত বিষয়েই ভিন্নতা থাকে।

গোস্বামিপাদ। আপনার উপদেশে আমরা যারপরনাই উপকৃত হইলাম। এখন অনুমতি করুণ, আমরা প্রস্থান করি।

এই বলিয়া তাঁহারা মহাপুরুষগণকে * অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক আকাশগঙ্গার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

অতঃপর তিনি আকাশগঙ্গার আশ্রমে থাকিয়া কঠোর সাধন করিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি আসনে বসিয়া ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাহাতে আপনাকে ঢালিয়া দিতেন, তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন। আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এইভাবে কার্য্য করিতেন। নূতন সাধনেও তিনি ঐইভাবে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে এক দিন তাঁহার গুরুদেব তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমাকে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হইবে। ৺কাশীধামে হরিহরানন্দ সরস্বতী নামে এক জন সন্ন্যাসী আছেন, তুমি তাঁহার কাছে যাইয়া

* মহাপুরুষ চারিজনের মধ্যে বাবা গম্ভীরানাথস্বামী এক জন। গোরক্ষপুরে নাথ-সম্প্রদায়ের যে মঠ আছে, তিনি সেই মঠের মহান্ত ছিলেন। ইনিই গোস্বামিপাদকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইনি অঘোরপন্থী সাধু। ইনি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সেই সম্প্রদায়কে কাণফাট্টাযোগী সম্প্রদায় বলে। মহাত্মা গোরক্ষনাথ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

সন্ন্যাসগ্রহণ কর। ব্রাহ্মসমাজে গমন, উপবীতত্যাগ, ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্নভোজন প্রভৃতি যাহা কিছু তোমার জীবনে ঘটিয়াছে, সে সমস্তই তাঁহার নিকট বলিও ; কোন কথাই গোপন করিও না। তোমার কথা শুনিয়া তিনি তোমাকে যেরূপ করিতে বলিবেন, তুমি অবিচারে তাহা করিও। তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।

গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গোস্বামিমহাশয় তাঁহার ব্রহ্মচারী বন্ধুর সহিত ৺কাশীধামে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া হরিহরানন্দসরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার গুরুদেব যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, স্বামীজীকে আনুপূর্ব্বিক তাহা জানাইয়া সন্ন্যাসগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী গোস্বামি-মহাশয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, তুমি যেরূপ নির্ম্মল ও পবিত্র তাহাতে তোমার কিছুরই আবশ্যক নাই। তবে শাস্ত্র ও সদাচারের মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তোমাকে উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ করিবার পর আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব। আমি শাস্ত্রের দাস, সুতরাং শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। এই জন্যই তোমাকে এই কথা বলিলাম। আর তুমি যখন আমার কাছে আসিয়াছ, তখন যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, আমার তাহাই করা উচিত। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত না লইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে তোমার কোন ফল হইবে না। সন্ন্যাস লওয়া বিফল হইবে। আর ব্রাহ্মণের শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে হয়। উপবীত না থাকিলে ত্যাগ করিবে কি ? এই জন্যই তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৈতা লইতে বলিতেছি। গোস্বামিমহাশয় স্বামীজীর আদেশপালনে সম্মত হইলেন। তখন স্বামীজী তাঁহাকে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপবীত প্রদান করিলেন ; পরে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিলেন। গোস্বামি-

মহাশয় শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে বিরজা হোমাদি সমাপন করিয়া শিখা ও সূত্রত্যাগপূর্ব্বক চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পর তিনি সংসারপরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব পরমহংসজী তাঁহাকে সংসার ছাড়িতে নিষেধ করিয়া বলিলেন; তুমি পূর্ব্বের ন্যায় স্ত্রীপুত্রাদির সহিত একত্র থাকিয়া সাধন কর; তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। এই তোমার পথ। সংসার ত্যাগ করা তোমার পথ নহে। তাহা করা তোমার ঠিক হইবে না। আর ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিও না; যেমন আছ, সেইরূপই থাক। কালে সর্পনির্ম্মোকের ন্যায় একে একে সমস্তই খসিয়া যাইবে। হঠ করিয়া কিছু করিলে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইবে। গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গোস্বামিপাদ গয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং আকাশগঙ্গার আশ্রমে থাকিয়া কঠোর সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরুদেব এই সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাধনসম্বন্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

এক দিন গোস্বামিপাদ তাঁহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধির কথা আছে, তাহা কি সত্য? মানুষের কি ঐ সকল অলৌকিক শক্তি হয়?

পরমহংসজী। (সহাস্যে) অষ্টসিদ্ধির কথা যাহা শাস্ত্রে আছে, তাহা সমস্তই সত্য। তপস্যাদ্বারা সাধকের ঐ সকল শক্তি হয়।

গোস্বামিমহাশয়। আমার বিশ্বাস হয় না।

পরমহংসজী। স্বচক্ষে দেখিলে বিশ্বাস করিবে? দেখিতে চাও ত আমার সঙ্গে আইস। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে এক নির্জ্জনস্থানে লইয়া গেলেন এবং এক একটি করিয়া অষ্টসিদ্ধির সমস্তগুলি ব্যাপার তাঁহাকে দেখাইলেন।

তিনি কখনও বাতাস অপেক্ষা লঘু হইয়া পক্ষীর ন্যায় শূন্যে বায়ুসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখনও পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া পর্ব্বত ভেদ করিয়া অপর পার্শ্বে গমন করিলেন। এইরূপে তিনি শিষ্যকে অষ্টসিদ্ধির যাবতীয় কার্য্যগুলি দেখাইলেন।* অনন্তর পরমহংসজী সূক্ষ্মদেহে অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার ব্যাপারও দেখাইলেন। তথায় একটি মৃতদেহ পড়িয়াছিল। তিনি স্বীয় স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্মদেহে বাহির হইয়া সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। তিনি মৃতদেহে প্রবেশ করিলে, সেই শব সজীব হইয়া উঠিয়া বসিল এবং তাঁহার নিজের শরীর মৃতবৎ হইল। মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া পরমহংসজী গোস্বামিমহাশয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এখন বিশ্বাস হইল কি?

গোস্বামিমহাশয় এতক্ষণ অবাক্ হইয়া তাঁহার গুরুদেবের কার্য্য দেখিতে ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার কথা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। পরে বিনীতভাবে বলিলেন, আর অবিশ্বাস হইবে কেন? আপনি

* অষ্টসিদ্ধি যথা—অণিমা, লঘিমা, মহিমা বা গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব এবং যত্রকামাবসায়িত্ব।

অণিমা—আয়তনে বৃহৎ হইলেও পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র হইবার শক্তি।

লঘিমা—গুরুভার হইলেও তুলার ন্যায় লঘু হইবার সামর্থ্য।

মহিমা—ক্ষুদ্র হইলেও পর্ব্বত প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ হইবার ক্ষমতা।

প্রাপ্তি—ইচ্ছামাত্র দূরবর্ত্তি পদার্থ নিকটে প্রাপ্ত হইবার শক্তি।

প্রাকাম্য—ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাত। যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই সুসিদ্ধ হইবে।

বশিত্ব—যে শক্তির প্রভাবে সমস্ত বশীভূত হয়।

ঈশিত্ব—সমস্ত পদার্থের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা।

যত্রকামাবসায়িত্ব—সত্যসংকল্পতা; এই শক্তির প্রভাবে বিষকে অমৃত, অমৃতকে বিষ, মৃতকে জীবিত এবং জীবিতকে মৃত করিতে পারা যায়।

যাহা দেখাইলেন,ইহাতে কি আর অবিশ্বাস থাকিতে পারে ? আপনার অলৌকিক ক্ষমতা। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া পরমহংসজী বলিলেন, সাধন কর, তোমার এই সকল ক্ষমতা হইবে। *

গোস্বামিপাদের গৈরিক বস্ত্র পরিধান ও তীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণের মনে ভয় হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, গোঁসাই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। এইরূপ ভয় হওয়াতে তাঁহারা কলিকাতায় ভগবতী যোগমায়াকে লিখিলেন যে, আপনি শীঘ্র আসিয়া আপনার স্বামীকে লইয়া যান। আসিতে বিলম্ব করিলে তাঁহাকে হারাইবেন। পত্র পাইয়া জননী অবিলম্বে গয়ায় গেলেন এবং প্রভুপাদকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

গোস্বামিপাদ এক দিন ভজন করিতে বসিয়া কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনে দারুণ অশান্তির উদয় হইল। অভিমানের আগুণে প্রাণ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। গৃহে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ছুটিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, কি করিলে এই যাতনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে এক জন মুটে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোস্বামিমহাশয় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন এবং দুই হাতে তাহার পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে মুটের প্রাণও গলিয়া গেল। তাহার নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সেও গোস্বামিমহাশয়ের পদরেণু গ্রহণ করিতে লাগিল। পথের লোক মুগ্ধনেত্রে অবাক্ হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গত

* উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি।

হইলে উভয়ে স্থির হইয়া উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ করাতে গোস্বামিমহাশয়ের প্রাণের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা, সমুদায় অশান্তি দূর হইল। তিনি প্রশান্তমনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মুটেও তাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

এক দিন গোস্বামিপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার কাছে যান। মহর্ষি সে সময়ে চূঁচড়ায় গঙ্গার উপরে একটি বাড়ীতে থাকিতেন। গোস্বামিপাদ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমাকে যে নূতন মানুষ দেখিতেছি। তুমি কিছু নূতন বস্তু লাভ করিয়াছ। এ অমূল্য পদার্থ কোথায় পাইলে?

গোস্বামিমহাশয়। গয়ার পাহাড়ে একটি মহাপুরুষ কৃপা করিয়া আমাকে ইহা দিয়াছেন।

মহর্ষি। যে বস্তু পাইয়াছ, ইহাদ্বারা তুমি ধন্য হইবে, উদ্ধার হইয়া যাইবে। এ দেবদুর্লভ পদার্থ কদাচ পরিত্যাগ করিও না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তোমার স্থান হইবে না, তুমি তথায় তিষ্ঠিতে পারিবে না। ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে হয়, করিবে; কিন্তু এ বস্তু কখনও ছাড়িও না।

অনন্তর মহর্ষি মহাশয়ের সহিত গোস্বামিপাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। পরে তিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## শুষ্কতা, সাধনত্যাগ
## ও
## গুরু আজ্ঞায় জ্বালামুখীগমন

কলিকাতায় কিছু দিন থাকিয়া গোস্বামিপাদ ঢাকায় গমন করিলেন। সেখানে কিছু দিন সাধন করিবার পর তাঁহার জীবনে অত্যন্ত শুষ্কতা উপস্থিত হইল।

ভগবানের নামরূপ অগ্নিতে সাধকের বাসনা দগ্ধ হইয়া যায়, ইহাকে পঞ্চতপা বলে। অনেক সাধক বাহিরে অগ্নি জ্বালাইয়া পঞ্চতপা করেন, ইহা বাহ্যিক পঞ্চতপা। ইহাতে সাধকের আভ্যন্তরিক কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না, বাসনা দগ্ধ হয় না। সাধকের মনে নামের অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াই যথার্থ পঞ্চতপা। সাধন করিতে করিতে যখন সাধকের ভিতরে এই নামের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তখনই তাঁহার বাসনা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। এ সময়ে সাধককে অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। নামাগ্নির তীব্র উত্তাপে তাঁহাকে ভাজা ভাজা হইতে হয়। এই সময়ে সাধকের ভয়ংকর গাত্রদাহ হয়। মনে সুখের লেশমাত্র থাকে না। যে সকল বস্তু পূর্ব্বে তাঁহাকে সুখপ্রদান করিত, তাহারা আর তাঁহাকে সুখ দিতে পারে না। সেই সকল আরামের বস্তু তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হয়। আমোদপ্রমোদ, ক্রীড়াকৌতুক, আত্মীয়বন্ধুদিগের সহবাস কিছুতেই আরাম পাওয়া যায় না। এমন কি প্রিয়তমা

পত্নী, প্রাণাধিক সন্তানসন্ততিগণের সঙ্গও তাঁহার প্রীতিকর বোধ হয় না। জীবনধারণ করা বিড়ম্বনাবোধ হয়। সকল সাধককেই এই নামাগ্নির ভিতর দিয়া, পঞ্চতপার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এই অবস্থায় অনেক সাধক আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন। এই অবস্থায় পড়িয়া সনাতনগোস্বামী জগন্নাথদেবের রথচক্রে দেহপাত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী তিন বার পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগের উদ্যম করিয়াছিলেন। গোস্বামিপাদও দুই বার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ঐ যন্ত্রণায় আমি দুই বার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম, পরমহংসজী রক্ষা করিলেন। সর্ব্বদা অগ্নি জ্বলিত। কত জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ, তাহাকে দগ্ধ করিতে অনেক অগ্নির প্রয়োজন। এই যন্ত্রণাই যথার্থ মুক্তির হেতু। ইহা যাহার হয়, সে কৃত্রিম ধর্ম্মের ভান করিতে পারে না। যাতে জ্বালা নিবারণ হয়, তাহা ভিন্ন তাহার তৃপ্তি হয় না।"

গোস্বামিমহাশয় এই অবস্থায় পতিত হইয়া নামের আগুনে দিবা-নিশি পুড়িতে লাগিলেন। এই সময়কার কথা তিনি এই প্রকার বলিয়াছেন,—"আমার প্রাণ দিবানিশি হু হু করিয়া জ্বলিয়া যাইত, কিছুতেই সুখ পাইতাম না। আহারবিহার সমস্তই বিষবৎ বোধ হইত। অত্যন্ত গাত্রদাহ, যেন ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। এক এক সময় যাতনা অসহ্য বোধ হইত। আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইত। এই প্রকার যাতনাভোগ করিয়াও কিছু দিন সাধন করিলাম। শেষে আর পারিলাম না। যন্ত্রণা সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তখন সাধন করা ছাড়িয়া দিলাম।

"গুরুদেব এই সময়ে আমাকে সাধন করিতে বলিতেন। তাঁহার কথা আমার ভাল লাগিত না। আমি তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক এবং

সাধনসম্বন্ধে অবিশ্বাস ও অনাস্থাপ্রদর্শন করিতাম। গুরুজী সহাস্য-বদনে বলিতেন, অধীর হইও না, স্থির হইয়া ধৈর্য্যের সহিত কিছু দিন সাধন কর, এ অবস্থা থাকিবে না। তাঁহার কথায় আমার বিশ্বাস হইত না। তখন তিনি আমাকে জ্বালামুখী যাইতে বলিলেন। আমি প্রথমে তাঁহার কথায় সম্মত হই নাই। পরে যখন তিনি বলিলেন যে জ্বালামুখীতে গিয়া সাধন করিলে অতিসত্বর তোমার এই অবস্থা চলিয়া যাইবে, তখন আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম। সেখানে যাইয়া কিছু দিন সাধন করিবার পর আমার সমস্ত জ্বালা চলিয়া গিয়া প্রাণ সরস হইল। অতঃপর আমি ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম।”

ইহার কিছুদিন পরে তিনি বেহার প্রদেশে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার সাধনের কতকগুলি অবস্থা খুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি ইহা সাধনের অবস্থা বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বড়ই ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় তিনি দারভাঙ্গায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে এক দিন তাঁহার গুরুদেব অকস্মাৎ তাঁহার নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। গোস্বামিপাদ গুরুদেবকে দর্শন করিয়া অতিশয় পুলকিত হইয়া তাঁহার অবস্থার কথা সমস্ত তাঁহাকে বলিলেন। পরমহংসজী সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, তোমার ভিতরে যে সকল অবস্থা হইয়াছে, তাহা কি, বিচারসাগর ও হঠযোগ-প্রদীপিকা নামক পুস্তক দুই খানি পড়িয়া দেখিলে জানিতে পারিবে। অমুক দোকানে এই দুই খানি পুস্তক এক খণ্ড করিয়া আছে, তাহার মূল্য এই লাগিবে। তুমি এখনই যাইয়া পুস্তক দুই খানি কিনিয়া আন। এই বলিয়া তিনি দোকানের ঠিকানা ও পুস্তকের মূল্য বলিয়া

গোস্বামিপাদকে পাঠাইয়া দিলেন। গুরুর আদেশে প্রভুপাদ তখনই দোকানে যাইয়া পুস্তক দুই খানি কিনিয়া আনিলেন। পরমহংসজী পুস্তকের মূল্য যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, দোকানদার ঠিক তাহাই লইল। সে আরও বলিল, এই দুই খানি ভিন্ন এই পুস্তক আমার দোকানে আর নাই। গোস্বামিপাদ পুস্তক দুই খানি পড়িয়া দেখিলেন, তাঁহার যাহা অবস্থা হইয়াছে, পুস্তক দুইখানিতে তাহাই লেখা আছে। ইহা যোগের অবস্থা। সাধকজীবনে এই সকল অবস্থা হয়। শাস্ত্রের সাক্ষ্য পাইয়া গোস্বামিমহাশয় নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, পূর্ব্বে আমাকে এই পুস্তক পড়িতে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে ত আমাকে সংশয়ে পড়িতে হইত না। তাঁহার কথা শুনিয়া পরমহংসজী হাসিয়া বলিলেন তুমি যে ছেলে, পূর্ব্বে এই পুস্তক পড়িলে মনে করিতে যে পুস্তক পড়ার সংস্কারবশতঃই তোমার ভিতরে এই সকল ভাব আসিয়াছে, ইহা যে যোগের অবস্থা, সাধনের সময়ে সাধকের ভিতরে খোলে, ইহাতে তোমার বিশ্বাস হইত না। যাহা হউক এখন ত বুঝিলে যে ইহা তোমার চিত্তবিকার বা কোন রোগ নহে; ইহা সাধনের অবস্থা। গুরুজীর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, হাঁ তাহা বুঝিয়াছি।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## সিদ্ধিলাভ

বেহার হইতে ঢাকায় প্রত্যাগত হইয়া গোস্বামিপাদ কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-ভবনে বাস করিতেন। ঢাকার উপকণ্ঠে গেণ্ডারিয়া নামক একটি পল্লি আছে, সেই পল্লির এক নির্জ্জনস্থানে একটী বটবৃক্ষতলে আসন-স্থাপন করিয়া তিনি প্রাণপণে সাধন করিতে লাগিলেন। (১) এই স্থানে সাধন কবিবার সময়ে তাঁহাকে অনেক দৈব উৎপাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। আমাদিগের শাস্ত্রে তপস্যার সময়ে সাধকজীবনে যে সকল উপদ্রবভোগের কথা লিখিত আছে, যে সকল বিভীষিকাদর্শনের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, গোস্বামিপাদকে সে সমস্তই ভোগ করিতে হইয়াছিল। শাস্ত্রে ইহাকে ইন্দ্রদেবতার অত্যাচার বলে। সাধক-মাত্রকেই এ অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। গোস্বামিমহাশয়ও ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। কিন্তু তিনি অটল বীরের ন্যায় সমস্ত বিভীষিকা, সমুদায় অত্যাচার, সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার আসনের অনতিদূরে এক জন যোগিনী বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, বিভীষিকাদি দর্শনের সময়ে উত্তরসাধকের ন্যায় নিয়ত তিনি তাঁহাকে সাহসপ্রদান করিতেন। প্রভুপাদ তাঁহার পরীক্ষার কথা এইরূপ লিখিয়াছেন,—"এখনও আমাকে পরীক্ষা করে। রাত্রিতে স্বপ্নের মধ্যে

(১) এই বৃক্ষটি এখন নাই। ব্রাহ্ম ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় বৃক্ষটি কাটিয়া ফেলিয়াছেন।

চারি জন পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুতেই যখন কৃতকার্য্য হইল না, তখন এক কলসী সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিল। তাহাতেও কিছু হইল না। তখন বলিল, আমাদিগকে শিষ্য কর। আমি বলিলাম, তোমরা কে? আমরা পতিতা নারি; উদ্ধার কর। বলিলাম মাথার চুল মুড়াও, অলঙ্কার ও সুন্দর বসন ত্যাগ করিয়া ছিন্নবস্ত্র পর। ইহা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, আমাদের চেন না, আমরা মায়ার দাসী। কত দিন আমাদের চরণসেবা করিয়াছ; এখন দিন পাইয়া চিনিতে পারিতেছ না। ভাল, তোমার কল্যাণ হউক। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।" ইহা বলিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে কিছু দিন সাধন করিবার পর তিনি অভীপ্সিত অবস্থা লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইলেন। যাহার জন্য তিনি হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, উপবীত ত্যাগ করিয়া জননীর হৃদয়ে দারুণ ক্লেশ দিয়াছিলেন, আত্মীয়গণের মনে মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইলেন। যে ভগবান্‌কে পাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল অন্তরে কত রোদন, কত প্রার্থনা, কত সাধনভজন করিয়াছেন; দিনরজনী অনাহারে অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই প্রাণারাম ভগবান্‌কে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। তাঁহার উত্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া তাঁহার উপনিষদোক্ত "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" এই দেবদুর্ল্লভ অবস্থা লাভ হইল। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য যবনিকা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে তাহা অপসারিত হইয়া গেল। তিনি কালত্রয়দর্শী হইলেন। স্থান ও কালের ব্যবধান তাঁহার

নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। ব্রহ্মাণ্ডের কোন ঘটনা বা তত্ত্ব তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। অষ্টসিদ্ধি দাসী হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মবিদ্ হইলেন। উপনিষদের ত্রিতত্ত্ব অর্থাৎ বিরাট্ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন। বিরাট্‌ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরব্রহ্মই ভাগবতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন।*

* সাধক যখন মায়াতীত হইয়া ব্রহ্মে সংযুক্ত হন, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হন, তখন তাঁহার কামাদি রিপুসকল এবং অহঙ্কার, বাসনা প্রভৃতি মায়াজনিত সকল প্রকার বন্ধন নষ্ট হইয়া যায়। যেমন বৃক্ষের মূল ছেদন করিলে তাহার কাণ্ড,শাখা,প্রশাখা, পত্র,পুষ্প, ফল প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হয়, রোগের নিদান নষ্ট হইলে যেমন সমস্ত উপসর্গ নষ্ট হইয়া যায় ; সেই প্রকার সাধনবলে ও ভগবৎকৃপায় সাধক যখন মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করেন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয় নষ্ট হইয়া যায়, তখন মায়াজনিত কামাদির যে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইবে ইহা বলা বাহুল্য। চেষ্টা ও যত্নদ্বারা এক একটি প্রবৃত্তিদমন করিবার প্রয়াস পাইলে কখনই প্রবৃত্তিগণকে দমন করিতে পারা যায় না। স্বকীয় চেষ্টাদ্বারা প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ হয় না। আর আমাদিগের দেশের সাধনপ্রণালীও তাহা নহে। রোগের মূল নষ্ট হইলে তজ্জনিত উপসর্গসকল যেমন আপনা হইতে দূর হইয়া যায়, আমাদিগের দেশের সাধনপ্রণালীও ঠিক সেই প্রকার। বহু চেষ্টা করিয়া কাম এক অঙ্গুলি কম করা, ক্রোধ দুই অঙ্গুলি হ্রাস করা, ইহা পাশ্চাত্য প্রণালী।

ভগবান্ রসস্বরূপ। "রসো বৈ সঃ"। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে; তাঁহাতে নিত্যযুক্ত হইলে, তাঁহার সমস্ত রস, সমস্ত ভাব, সাধকের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সাধক তখন ব্রহ্মের সারূপ্য লাভ করেন। তাঁহাকে আর মিষ্টতা তিক্ততা প্রভৃতি রস সাধন করিয়া লাভ করিতে হয় না। নিজের চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা এক একটি রিপু দমন এবং মিষ্টতা প্রভৃতি রস লাভ করা, সাধকের কদাচ সাধ্যায়ত্ত নহে। কেননা মহতের দয়া ও ভগবৎকৃপা ভিন্ন মানুষ নিজের চেষ্টায়, ইহা কখনই প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভগবানের কৃপায় মানুষ মুহূর্ত্তমধ্যে এই সকল দেবদুর্ল্লভ অবস্থা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। এই জন্যই হিন্দুসাধকগণ গুরুঅনুগত হইয়া বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফলের এক একটির উচ্ছেদ দ্বারা বৃক্ষকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা না করিয়া বৃক্ষের মূল ছেদন করিয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকেন। সাধনের দ্বারা মায়ার মূলোচ্ছেদ করিয়া তজ্জনিত প্রবৃত্তিনিচয়কে বিনাশ করেন।

গোস্বামী মহাশয়ও যোগসাধন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "পাপ ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কেহ

গোস্বামিপাদ যখন গেণ্ডারিয়ার সাধন করিতেন, তখনকার একটি ঘটনা এখানে বিবৃত হইল। এক দিন গোস্বামিমহাশয় আসন ছাড়িয়া নিকটে বেড়াইতেছিলেন। যোগজীবন তখন ছেলে মানুষ; বালচপলতাবশতঃ তিনি পিতার শূন্যআসনে যাইয়া বসেন। বসিবা-মাত্র এক অদৃশ্যহস্ত তাঁহার গলা টিপিয়া ধরে। ইহাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। মুখ দিয়া ফেন বাহির হইতে থাকে। যোগজীবনের এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন। তখনই গোস্বামি-মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া হইল। খবর পাওয়ামাত্র তিনি সেখানে আসিয়া পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। যোগজীবন সুস্থ হইলে তিনি বলিলেন, তুমি আমার আসনে বসিয়া অতি অন্যায় করিয়াছ;

কখন নিজের চেষ্টায় দূর করিয়া ধার্ম্মিক হইতে পারেনা। যখন প্রার্থনা করিতে করিতে জ্ঞানপ্রেমপবিত্রতার অনন্ত আধার পরমেশ্বর নিজগুণে কৃপা করিয়া আত্মস্বরূপ সাধকের আত্মার সম্মুখে প্রকাশ করেন, তখনই তাঁহার সমস্ত অজ্ঞানতা শুষ্কতা ও মলিনতা দূর হয়।

সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন, তখন অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সমস্ত যোগশক্তিই তিনি প্রাপ্ত হন। এই সকল শক্তিদ্বারা তিনি অসাধ্যসাধন করিতে পারেন। ইচ্ছা-মাত্র তিনি মৃত মনুষ্যের জীবনদান, সশরীরে শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য সকল করিতে পারেন। দেবতাগণ এই শক্তির প্রভাবেই অতিমানুষ কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যে সকল সাধক ভক্তিপথের পথিক, তাঁহারা এই সকল ক্ষমতালাভ করিয়াও সেই সকলের প্রতি কিছুমাত্র আস্থাপ্রদর্শন করেন না। তাঁহারা এ সকলকে তাঁহাদিগের সাধনপথের বিঘ্ন মনে করিয়া তৎপ্রতি সম্পূর্ণ ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেননা এই সকল শক্তির প্রতি মনোযোগপ্রদান করিলে ভক্তিলাভের সমূহ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই সকল ক্ষমতার প্রতি যদি সাধকের আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে তাঁহার পতন অনিবার্য্য। যে সকল সাধক অধিক পরিমাণে এই সকল ক্ষমতার পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। এই কারণে ভক্তিমার্গের আচার্য্যগণ নিজেরাও এই সকল শক্তির চালনা করেন না এবং শিষ্যদিগকেও করিতে দেন না। শয়তান যখন মহাত্মা ঈশাকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। গোস্বামিমহাশয়ও ঐশ্বর্য্যপ্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ শক্তি তিনি সর্ব্বদাই গোপন করিয়া চলিতেন। তিনি ভক্তিমার্গের আচার্য্য। নিজে ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নরনারীবৃন্দকে

মহাপুরুষগণ সর্ব্বদা আমার আসন রক্ষা করিয়া থাকেন। আসনের কোনরূপ অমর্য্যাদা হইলে তাঁহারা তাহা সহ্য করেন না। কেহ আসনের অসম্মান করিলে তাঁহারা তাঁহাকে কঠিন দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকেন। তুমি বালক এবং কোন মন্দ অভিপ্রায়ে উপবেশন কর নাই, সেই জন্য তাঁহারা তোমাকে অল্পে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহারা অপরাধীর প্রাণদণ্ডও করিয়া থাকেন। সাবধান ভবিষ্যতে আর এরূপ কার্য্য করিও না।

---

ভক্তিসুধা বিতরণ করিবেন, তিনি কেন শক্তির প্রতি আসক্ত হইবেন। অষ্টসিদ্ধি তাঁহার করতলগত হইলেও, পরিচারিকা হইয়া পরিচর্য্যার জন্য লালায়িত হইলেও তিনি তৎপ্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেন, যে সাধক শক্তি পরিচালনার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করেন, তিনি কখনও ভক্তিলাভ করিতে পারেন না। সিদ্ধি ভক্তিপথের ভয়ানক বিঘ্ন। আর তিনি সর্ব্বদাই ভগবৎ প্রেমে ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যপ্রকাশের সময়ই বা কোথায়? আর কেনই বা তাঁহার তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে? ভক্তিরসাস্বাদনে যে সুখ, ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তবে অনুগত শিষ্যগণ তাঁহার এই অসাধারণ ঐশ্বর্য্যের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। তিনি দয়া করিয়া তাঁহাদের নিকট কখনও কখনও তাঁহার সেই অলৌকিক শক্তি ও অসীম ক্ষমতার কিছু কিছু প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সেই লোকোত্তর শক্তির যেটুকু তিনি তাঁহার কৃপাপাত্র শিষ্যদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় শিষ্যগণ যতটুকু জানিতে পারিয়াছেন, তাহারই কিছু কিছু এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি অল্প।

# নবম পরিচ্ছেদ

## গয়াতে গমন ও চক্রদর্শন

ঢাকায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর তিনি তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে গয়ায় গিয়াছিলেন। এই সময়ে সেখানে এক জন তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। এক দিন পরমহংসজী গোস্বামিপাদকে বলিলেন, এখানে এক জন তান্ত্রিক মহাত্মা আছেন, আগমোক্ত পন্থায় তিনি সিদ্ধ। তাঁহারা ভৈরবচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমার ইচ্ছা যে তুমি তাঁহাদিগের চক্রে যাইয়া একবার তাহা দেখ। ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার হইবে। তান্ত্রিক ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিবে। অনেক লোকের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের উপর ভয়ানক কুসংস্কার আছে। তাঁহারা মনে করেন, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অতিশয় কুৎসিত ও জঘন্য। ধর্ম্মের নামে সুরাপান, ব্যভিচার প্রভৃতি কদর্য্য ভ্রষ্টাচারের ব্যাপার সকল অনুষ্ঠিত হয়। বাস্তবিক তন্ত্রোক্ত ব্যাপার ইহার কিছুই নহে। উহা অতিশয় উচ্চ ও পবিত্র, মুক্তির সোপান। চক্র দেখিলে তুমি ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে। আমি মহাত্মাকে তোমার কথা বলিয়াছি। তিনি তোমাকে চক্রে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। তুমি অবশ্য যাইও। গোস্বামিমহাশয় পরমহংসজীর আদেশমত সিদ্ধপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চক্রদর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে চক্রে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। চক্রের অধিবেশনের দিন গোস্বামিপাদ তথায় উপনীত হইলেন। মহাত্মা চক্রেশ্বর হইয়া চক্রের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। চক্রে একটী শক্তি (স্ত্রীলোক) ছিলেন; বিধানমত তিনি অর্চ্চিতা হইলেন। চক্র

আরম্ভ হইলে চক্রস্থ সমস্ত লোকের মনে সেই রমণীর প্রতি মাতৃ-ভাবের উদয় হইল। তাঁহাদের মনে হইল যে ইনি আমাদিগের জননী, আমরা ইহাঁর গর্ভজাত সন্তান। গোস্বামিমহাশয় তাঁহাদের মনের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে চক্রেশ্বর পূজা করিবার জন্ত যে দেবতাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, আহ্বানমাত্র সেই দেবতা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়া পূজাগ্রহণ করিতে লাগিলেন, পূজান্তে চক্রেশ্বর-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। এইরূপে পূজার জন্ত যতগুলি দেবতাকে আহ্বান করা হইল, তাঁহারা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিলেন। পূজান্তে চক্রে-শ্বর বিসর্জ্জন কবিলে নিজ নিজ ধামে চলিয়া গেলেন।

চক্র যতক্ষণ বিদ্যমান ছিল, ততক্ষণ তথায় এক আনন্দস্রোত উপ-স্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল। সকলেই সে বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন।

গোস্বামিমহাশয় অনেক সময় এই চক্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, তান্ত্রিকক্রিয়া যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।' পরম দয়ালু মহাদেব কনিষ্ঠ অধিকারীদিগের কল্যাণের জন্ত তান্ত্রিক পন্থার প্রচার করিয়াছেন। না বুঝিয়া না জানিয়া অথবা লোকে পন্থার অপব্যবহার করে বলিয়া তন্ত্রের নিন্দা করা অতিশয় অনুচিত ও গর্হিত কার্য্য। (১)

(১) গয়া হইতে বুদ্ধগয়ায় যে রাস্তা গিয়াছে, সেই পথের পাশে মহাবীরের এক মন্দির আছে। এই মন্দিরে চক্র বসিয়াছিল। চক্রানুষ্ঠানের সময় মন্দিরের চারিদিকে রক্ষিগণ অস্ত্র লইয়া প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিল। প্রভুপাদের অন্ত চরিতাখ্যায়কদেরদ্বারা এই ঘটনাটি অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রভুপাদ কিন্তু আমার কাছে ইহার অধিক বলেন নাই।

গোস্বামিমহাশয়ের অবস্থা খুলিয়া গেলে, তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হইলে, ভগবান্ নানা স্থানে নানা ভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। নানারূপে তাঁহাকে দর্শন দিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই লীলাময় তাঁহার প্রিয়তমের সহিত বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন।

এক দিন গোস্বামিপাদ বরাহনগরের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ রাস্তার ধারে একটি প্রকাণ্ড বাঘ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। দিনের বেলা চারিদিকে লোক, এখানে বাঘ কোথা হইতে আসিল? তাঁহার ভারি আশ্চর্য্যবোধ হইল। তিনি অনেক-ক্ষণ সেই বাঘের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই স্থান দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, তাহারা কিন্তু সেই বাঘ দেখিতে পাইতেছিল না। ইহাতে গোস্বামিপাদ আরও বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি মনোযোগের সহিত সেই বাঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারি-লেন, ইহা প্রকৃত বাঘ নহে। তাঁহার ইষ্টদেবতা ব্যাঘ্রমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। তখন তিনি ভাবে আত্মহারা ও ভক্তিতে বিগলিত হইয়া সেই স্থানে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ তাঁহার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

আর এক দিন গোস্বামিপাদ, জননী যোগমায়া দেবীর সহিত নির্জ্জনে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। পত্নীর মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হইল। পত্নীর মুখে এইরূপে ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন হওয়াতে তিনি ভাবে বিবশ হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং দুই হাতে তাঁহার পদরেণু লইয়া মাথায় ও গায়ে মাখিতে লাগিলেন।

পত্নী ত প্রথমে অবাক হইয়া গেলেন। পরে অতিশয় কুণ্ঠিতা হইয়া বলিলেন, তুমি এ কি করিতেছ? গোস্বামিপাদের মুখে কথা নাই। ভাবে তাঁহার বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পত্নীর কথা তাঁহার শ্রবণবিবরে একেবারেই প্রবেশ করে নাই। তিনি স্ত্রীর কথার কোন উত্তরই প্রদান করিলেন না। কেবল তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন ভগবতী যোগমায়া তাঁহাকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন, তোমার মধ্যে আমি আমার ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকেই প্রণাম করিলাম। তোমার মুখে অপূর্ব্ব ব্রহ্মজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তোমার সমস্ত দেহ হইতে ব্রাহ্মীশ্রী বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আমি তোমাকে প্রণাম করি নাই, তোমার ভিতরস্থ জগজ্জননীকে অভিবাদন করিয়া ধন্য হইয়াছি।

---*---

# দশম পরিচ্ছেদ

## সাধনপ্রদান

গোস্বামিমহাশয় সিদ্ধিলাভ করিয়া, ব্রহ্মে নিত্যযুক্ত হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান। অনন্তর তিনি সদ্‌গুরুপদে বরিত হইলেন। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, গুরুদেব আমাকে সদ্‌গুরুপদে বরণ করিয়া শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক দীক্ষা-প্রদান করিবার আদেশপ্রদান করিলেন। আমার শরীর অতিশয়

পীড়িত ও ভগ্ন, অতএব আমাদ্বারা এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন বিবেচনা করিয়া আমি আপত্তি উত্থাপন করাতে তিনি বলিলেন যে তুমি এই কার্য্যের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছ, কাজেই তোমাকে ইহা করিতে হইবে। তুমি ব্যতীত আর কাহারও এ কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও অধিকার নাই।

এস্থলে সদ্‌গুরুসম্বন্ধে কিছু বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মবিদ্ তাঁহাকে সদ্‌গুরু বলে। শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদে যে সকল মন্ত্র আছে, সেই সকলের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যাঁহার নিকট প্রকাশিত হন, তাঁহাকেই শব্দব্রহ্মবিদ্ বলে। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চারি খানি বেদপাঠ করিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেই শব্দব্রহ্মবিদ্ বা বেদজ্ঞ হওয়া যায় না; তাহাকে বেদবিদ্ বলে না। মহাভারতে উপমন্যু, আরুণি প্রভৃতির যে সকল উপাখ্যান আছে, তাহাতে দেখা যায় যে দীর্ঘকাল গুরুসেবা করিবার পর গুরু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর দিলেন যে, তোমাদিগের মধ্যে নিখিল বেদ স্ফূর্ত্তিলাভ করুক। বরপ্রদানমাত্র তাঁহাদিগের মধ্যে সমগ্রবেদ স্ফূর্ত্তিলাভ করিল। বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়া বেদের প্রকৃত মর্ম্ম, যথার্থ অর্থ ও সমস্ত তত্ত্ব তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রকাশিত করিলেন। তখন তাঁহারা সমগ্র বেদের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া বেদবিদ্ হইলেন, শব্দব্রহ্মবিদ্ হইলেন। এইরূপে যিনি বেদার্থ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, বেদের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে পারিয়াছেন, বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে দর্শন করিয়া শব্দব্রহ্মবিদ্ হইয়াছেন এবং পরমব্রহ্মকে লাভ করিয়া পরমব্রহ্মবিদ্ হইয়াছেন, তিনিই সদ্‌গুরুপদবাচ্য, সদ্‌গুরুনামে অভিহিত। এই প্রকার সদ্‌গুরুই শিষ্যের কুণ্ড-

লিনী শক্তি জাগ্রত করিতে পারেন এবং শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক চৈতন্যময় মন্ত্রপ্রদান করিয়া শিষ্যগণকে উদ্ধার করিতে পারেন। এই প্রকার সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিতে পারিলেই মানুষ মায়ামুক্ত হইয়া পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে সমর্থ হয়। এই প্রকার সদ্‌গুরু লাভ করা অতিশয় কঠিন। অনেক জন্মের সুকৃতির বলে মানুষের সদ্‌গুরু লাভ হয়। সদ্‌গুরু সর্ব্বদা পৃথিবীতে আগমন করেন না। আর এক সময়ে এক জনের অধিক সদ্‌গুরু ধরাধামে অবতীর্ণ হন না। ভগবানের অবতার-গ্রহণসম্বন্ধে যে নিয়ম অর্থাৎ এক সময়ে পৃথিবীতে এক ভিন্ন অনেক অবতার হয় না, সদ্‌গুরুর মর্ত্তধামে আগমনও তদ্রূপ। সিদ্ধ বা মহাপুরুষ হইলেই সদ্‌গুরু হয় না। সিদ্ধ বা মহাপুরুষগণ জীবকোটী, ভগবানের আবেশ। তাঁহাদিগের দেহ ও দেহী ভিন্ন। সদ্‌গুরু ব্রহ্মকোটী, স্বয়ং ভগবান্। গুরুগীতাতে সদ্‌গুরুর যে প্রণাম আছে, তাহাতে তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানূরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।*

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং। দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং॥ একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং। ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

এই সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন কিছুতেই জীবের মায়া নষ্ট হয় না। বহু ভাগ্যে যাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই অনাদি কর্ম্মবন্ধনের হাত এড়াইয়া মুক্ত হইতে পারেন, মায়ার আলি-

* সদ্‌গুরু সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, ইহা প্রভুপাদের শ্রীমুখের বাক্য। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহা আমাদিগের কথা নহে। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত গুরুশিষ্যসংবাদ নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে। পাঠক ইচ্ছা করিলে সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

জন্ম হইতে নিস্তার পাইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নরনারীর প্রাণে ভাবের প্রবাহ আনিয়া দিতে পারেন, কিন্তু কর্ম্ম নষ্ট করিতে পারেন না। কর্ম্ম কাটাইবার কর্ত্তা একমাত্র সদ্‌গুরু।

গোস্বামিপাদ সদ্‌গুরু পদে বৃত হইয়া তাঁহার গুরুজীর আদেশে দীক্ষাদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। শক্তিসঞ্চার করিয়া জীবের কর্ম্ম নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। (১)

তাঁহার সাধনদান সম্বন্ধে সংক্ষেপ কিছু লিখিলাম। কোন লোক তাঁহার নিকট সাধন চাহিলে তিনি তাঁহার গুরুদেবকে সে কথা জানাইতেন। মহাপুরুষদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক টেলিফোন্ আছে। স্থান এবং কালের ব্যবধান তাঁহাদের নিকট থাকে না। এক স্থানে থাকিয়া তাঁহারা দূরবর্ত্তী স্থান দেখিতে পান। সেখানকার লোকের সহিত সংবাদ আদানপ্রদান করিতে পারেন। গোস্বামিপাদ আসনে বসিয়াই তাঁহার গুরুদেবের সহিত কথা কহিতেন। কেহ দীক্ষা চাহিলে আসনে থাকিয়াই গুরুজীর অনুমতি লইতেন। পরমহংসজীর অনুমতি হইলে তিনি সাধনের সময় স্থির করিয়া দিতেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্জ্জন স্থানে দীক্ষার্থীকে শক্তিসঞ্চার করিয়া দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিতেন। দীক্ষাস্থানে শিষ্যগণ ভিন্ন অন্য কেহ থাকিতে পাইতেন না।

(১) কর্ম্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। জন্ম জন্মান্তরের শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের যে সংস্কার অদৃষ্ট হইয়া মানুষের ভিতরে বর্ত্তমান থাকে, তাহার নাম সঞ্চিত কর্ম্ম। আর যে কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফলোন্মুখী হওয়াতে দেহধারণাদি কার্য্য হইতেছে, তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। আর বর্ত্তমান জন্মে যে নূতন কার্য্য হইতেছে, তাহার নাম ক্রিয়মাণ কর্ম্ম। সদ্গুরুর কৃপা পাইলে সঞ্চিত কর্ম্ম নিঃশেষে ভস্ম হইয়া যায়। ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতে আর নূতন অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়, ভোগ ভিন্ন কিছুতেই প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হয় না।

গোস্বামিপাদ যে সাধন দিতেন, তাহা অতি সহজ। কৃচ্ছ্রসাধনের লেশমাত্রও তাহাতে নাই। শ্বাসে শ্বাসে গুরুদত্ত নাম জপই এই সাধন। এক প্রকার প্রাণায়াম দেখাইয়া দিতেন। সাধনের অঙ্গস্বরূপ এই প্রাণায়ামও করিতে হইত। উচ্ছিষ্ট ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার মাদকসেবনে বিরত থাকিয়া, সত্য ও বীর্য্য রক্ষা, পরনিন্দা-ত্যাগ, প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান, পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা-জ্ঞানে অর্চ্চনা, সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তগণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন এবং পতিপত্নীর মধ্যে ভগবৎসম্বন্ধস্থাপন করিয়া, প্রতিদিন প্রাণায়াম-পূর্ব্বক শ্বাসে শ্বাসে নামসাধন করাই গোস্বামিপাদদত্ত সাধন। এই সাধনের দ্বারা মানুষ তিন জন্মে মায়ামুক্ত হইয়া ভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। এই সাধন গোপনে করিতে তিনি আদেশ করিতেন।

গোস্বামিমহাশয় বলিতেন, আমি যখন সাধন দিতে বসি, তখন-সেই স্থানে গুরুজী উপস্থিত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া তিনিই সাধন দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটি একবার পতিত হইয়াছিল। নগেন্দ্রবাবু যখন ১২নং কৃষ্ণ দাস পালের লেনে থাকিতেন, তখন গোস্বামিপাদ ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিলে সেই বাড়ীতেই বাস করিতেন। নগেন্দ্র বাবুর সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল। নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবীকে প্রভুপাদ আনন্দময়ী মা বলিয়া ডাকিতেন। মাত-ঙ্গিনী দেবীও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন।

এই বাড়ীতে অনেক লোক গোস্বামিপাদের নিকট সাধন পাই য়াছেন। আমিও এই বাড়ীতেই ১২৯৪ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ দীক্ষা পাই। এক দিন কতকগুলি লোক সাধন পাইলেন। নগেন্দ্র বাবু সাধন-

স্থলে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদ সাধনস্থানে তাঁহাকে থাকিতে দিতেন। সাধন দেওয়া শেষ হইয়া গেলে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, গোঁসাই! সাধন দিবার সময়ে একটি অদ্ভুত ব্যাপার আমার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে? আমি কিছুতেই তাহার রহস্যভেদ করিতে পারিতেছি না। গোস্বামিপাদ বলিলেন, কি ব্যাপার আপনার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে? নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, আপনি যখন সাধন দিতেছিলেন, তখন আপনার পশ্চাদ্ভাগে এক জন শ্বেতশ্মশ্রু, গৌরবর্ণ, উন্নতকায় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। আপনার মস্তক তাঁহার বক্ষঃস্থলের নিম্নে ছিল। আমি এ কি দেখিলাম? গোস্বামি-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, আপনি আমার গুরুজীকে দেখিয়াছেন। তিনি দয়া করিয়া আপনাকে দর্শন দিয়াছেন। সাধন দিবার সময় আমার দেহ আশ্রয় করিয়া তিনিই সাধন দিয়া থাকেন।

গোস্বামিপাদদত্ত সাধনদ্বারা কাহারও কোন প্রকার স্বাধীনতা বিনষ্ট হইত না। তিনি কাহারও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাদিগের ধর্ম্মে থাকিয়া, আপন আপন ধর্ম্মবিশ্বাস অটুট্ রাখিয়া, সাধনগ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, ভগবানের জল, বায়ু, রৌদ্র যেমন জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে সমানভাবে ভোগ করিয়া থাকে, যে সাধনে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাহাও সেই প্রকার উদার। তাহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই। তাহাতে সমস্ত লোকের সমান অধিকার। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দুমুসলমান, নরনারী বলিয়া কোন ইতরবিশেষ নাই। এই জন্যই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল ধর্ম্মের লোক তাঁহার নিকট সাধন পাইয়াছে।

তাঁহার দীক্ষাদানস্থলে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিত। ১৯১২নং

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে গোস্বামিপাদ যখন ছিলেন, সেই সময়ে পুস্তকবিক্রেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের মাতা তাঁহার নিকট সাধন পান। প্রভুপাদ তাঁহাকে নাম দিয়া যাই শক্তি সঞ্চার করিলেন, অমনি তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার কর্ণে নাম দিবার পর তাঁহার চৈতন্য হইল। চৈতন্যলাভের পর তিনি গোসাঁইজীর পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে জাগাইলেন কেন? আহা! আমি কি সুন্দর রূপ দেখিতেছিলাম। আপনি না জাগাইলে প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ দেখিতাম"। সেইরূপ দেখিতে দেখিতে আমি আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আপনি আমাকে ধরিয়া রাখিলেন কেন? তাঁহার কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, তাই ত, তুমি দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাও, আর পুলিশ্ আসিয়া আমার হাতে দড়ি দিক্। এ যে লোকালয়, এখানে কি যা তা করিলে চলে? সব দিক্ বাঁচাইয়া কাজ করিতে হয়। আজকার এই ব্যাপার যদি কোন বনে জঙ্গলে হইত, তাহা হইলে আমি তোমাকে ফিরাইতাম না। তুমি অতি ভাগ্যবতী। এই বলিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভগবান্ যেন দেখা দিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। দীক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গেসঙ্গেই দর্শনদান। এক নারদের এই অবস্থা হইয়াছিল।

পরলোকবাসীগণও এ সাধন পাইয়াছেন। সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এক জন ব্রাহ্মণযুবক গোস্বামি-পাদের নিকট সাধনপ্রার্থী হন। প্রভুপাদ তাঁহার সাধন পাইবার দিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ওলাউঠারোগে যুবকের মৃত্যু হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রভুপাদ শৌচে যাইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই শৌচাগারে গেলেন। শৌচান্তে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া সেই স্থানেই সেই

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
( সিদ্ধিলাভানন্তর সাধন-প্রদান কালে )

পরলোকবাসী যুবকটিকে দীক্ষা দিলেন। সরলনাথ দরজায় বসিয়াছিলেন, তিনি এই ব্যাপার জানিতে পারেন নি। পরে প্রভুপাদ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলে সরলনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন? গোস্বামিপাদ বলিলেন, আজ সেই ব্রাহ্মণ-যুবকটির দীক্ষা হইল। সরলনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, পরলোকের লোকও কি এ দীক্ষা পায়? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, "কেন পাইবে না? সময় হইলেই পায়। ইহলোক এবং পরলোকবাসী সকলেই এই সাধন পাইতে পারে।"

প্রভুপাদের সাধন সম্পূর্ণ অহৈতুকী ছিল। কোন হেতু ধরিয়া সে সাধন পাওয়া যাইত না। জাতিকুলের বা সচ্চরিত্রতার দোহাই দিয়া কেহ তাহা পাইবার দাবী করিতে পারিত না। সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁহার আশ্রমের পরিচারিকা অন্নদা ঝি তাঁহার নিকট সাধন পায়। অন্নদার স্বভাব কলিকাতার অন্যান্য চাকরাণী-দেরই অনুরূপ ছিল। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার অন্যতম শিষ্য বাবু মনীন্দ্রমোহন মজুমদার ভবানীপুরবাসী আশুতোষ দত্ত নামক এক জন সচ্চরিত্র যুবকের দীক্ষার জন্য গোস্বামিমহাশয়কে বলেন। গোস্বামিপাদ দত্তবাবুকে সাধন দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে মণীবাবু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, মহাশয় আপনাদের কার্য্য কিছুই বুঝা যায় না। কুলটা অন্নদা ঝিকে ডাকিয়া দীক্ষা দিলেন; আর এই সচ্চরিত্র লোকটিকে সাধন দিতে অস্বীকার করিলেন! মণীবাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, 'মণী, এ সাধন সম্পূর্ণ অহৈতুকী। জাতি, বংশ বা সচ্চরিত্রতার দোহাই দিয়া কেহ এই সাধন পাইবার দাবী করিতে পারেন না। ইহা সম্পূর্ণ ভগবানের দান। তিনি যাহাকে দয়া করিয়া দিবেন, তিনিই পাইবেন। আর আমি কি করি

আসিয়াছি, তাহা যদি তুমি জানিতে, তাহা হইলে আর এরূপ কথা বলিতে না। পাতকীউদ্ধার করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। এই কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য গৌর, নিতাই ও সীতানাথ সর্ব্বদাই আমার কাছে আসিয়া থাকেন। আর তোমাদের আফিসে কর্ম্মচারীদের যেমন নামের তালিকা আছে, যাহারা সাধন পাইবে, তাহাদের নামও সেইরূপ তালিকাভুক্ত হইয়া আছে। যে ব্যক্তি যে দিন, যে সময়ে সাধন পাইবে,তাহা স্থির হইয়া আছে। কেবল সেই তালিকাভুক্ত লোকেরাই সাধন পাইতেছে। তাহারা ভিন্ন অন্য একটি লোকও সাধন পাইবে না। সাধারণ দীক্ষায় দীক্ষার্থীর রাশি, নক্ষত্র জানিয়া দীক্ষামন্ত্র স্থির করিতে হয়, এ সাধনে তাহার কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সাধনপ্রার্থীর রাশি, নক্ষত্র সমস্তই সদ্‌গুরুর জানা থাকে।" প্রভুপাদের কথা শুনিয়া মণীবাবু অবাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার দীক্ষাদানস্থানে মহাপ্রভু, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনগণ উপস্থিত থাকিতেন।

দীক্ষা দিবার সময়ে গোস্বামিপাদ শিষ্যদিগকে স্ত্রীলোকদের সহিত মেশামিশিসম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান করিয়া দিতেন। স্ত্রীপুরুষের এক ঘরে বসিয়া সাধন করিতে তিনি বিশেষ ভাবে নিষেধ করিতেন। "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" এই ঋষিবাক্য বলিয়া তিনি কাশীর দণ্ডীস্বামির বৃত্তান্তও উল্লেখ করিতেন। বারাণসীধামবাসী এক জন দণ্ডী ভাগবতের এক খানি টীকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি 'অপি কর্ষতি' স্থানে 'নহি কর্ষতি' করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ইন্দ্রিয়গণ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে কদাচ আকর্ষণ করিতে পারে না। কিছু দিন পরে এক দিন অপরাহ্নে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একটি রমণী বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইল। বৃষ্টি

কিছুতেই থামিল না। রাত্রি হইয়া আসিল। স্বামিজীর আশ্রমে এক খানি মাত্র পর্ণকুটীর। রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া স্বামিজী স্ত্রীলোককে ঘর ছাড়িয়া দিয়া বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। রমণী ভিতর হইতে দ্বারবন্ধ করিয়া রহিল। গভীর রাত্রিতে স্বামিজীর মনে অনঙ্গবিকার উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি রমণীকে ডাকিয়া তাঁহার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। স্বামিজীর কথা শুনিয়া রমণী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি বিদ্বান্, তোমার এ দুর্মতি কেন? তুমিই না বেদব্যাসের কলমের উপর কলম চালাইয়া 'অপি কর্ষতি' স্থানে 'নহি কর্ষতি' করিয়াছ। এখন ও কি কথা? কন্দর্প-বেগে স্বামিজীর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি কিছুতেই প্রবৃত্তিরোধ করিতে না পারিয়া দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু রমণী কিছুতেই তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন না। দ্বাররুদ্ধ; গৃহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া স্বামিজী চালে উঠিলেন এবং চালের মটকা ফাঁক করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া 'নষযৌ নতস্থৌ' অবস্থায় দুই চালের মাঝখানে ঝুলিতে লাগিলেন। দুই দিক্ হইতে দুই চাল তাঁহাকে এমনই চাপিয়া ধরিল যে তিনি না পারেন নীচে নামিতে, না পারেন উপরে উঠিতে। এই অবস্থায় রজনী শেষ হইয়া গেল। রমণী চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে অনেক লোক সেখানে একত্র হইয়া স্বামিজীকে তদবস্থায় দর্শন করিল এবং রমণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইল। তখন সকলে স্বামিজীকে চাল হইতে নীচে নামাইল। স্বামিজী ত লজ্জায় অধোবদন হইয়া 'নহি কর্ষতি' কাটিয়া পুনরায় 'অপি কর্ষতি' লিখিলেন। প্রভুপাদ এই উপদেশ দিয়া শিষ্যদিগকে সাবধান করিতেন।

এইরূপে তিনি কখনও কলিকাতায় কখনও ঢাকায় অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিতেন এবং কখনও নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও মুমুক্ষু নরনারীগণকে সাধনপ্রদান করিতেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের সুবর্ণ সময় গিয়াছে। তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেন, তখন প্রতিদিন উপাসনাগৃহে মহোৎসব হইত। ভক্তির স্রোতে, ভাবের তরঙ্গে উপাসকগণ হাবুডুবু খাইতেন। সমাজগৃহে প্রেমের বন্যা বহিয়া যাইত। বেদীতে বসিয়া যখন তিনি জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তিগদগদ বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে 'মা মা' বলিয়া ডাকিতেন, তখন সমাজগৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রন্দনের রোল উঠিয়া সকলকে আকুল ও আত্মহারা করিয়া ফেলিত।' গোস্বামিপাদের সেই ভক্তিমাখা 'মা মা' ধ্বনি শুনিয়া সাধকদিগের প্রাণ একেবারে গলিয়া যাইত। দর্শনার্থী-রূপে যাঁহারা উপাসনাগৃহে উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারাও কাঁদিয়া আকুল হইতেন। যাঁহারা গোস্বামিপাদের সেই ব্রাহ্মীশোভাযুক্ত দিব্যজ্যোতিঃমণ্ডিত, প্রেমবারিপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। কীর্ত্তনের সময় তিনি যখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া হরিনামের উচ্চধ্বনিতে ব্রহ্মমন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন, মহাভাবে বিহ্বল ও মাতোয়ারা হইয়া ভূমিতে লুটাইতেন এবং তাঁহার সেই ভাব উপাসকগণের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগকেও ভাবে মাতোয়ারা করিয়া তুলিত, তখন ব্রাহ্মসমাজ দেবসমাজে পরিণত হইত। মনে হইত, এই ত স্বর্গ।" তখন উপাসক-মণ্ডলীর সমবেতকণ্ঠোচ্চারিত 'ব্রহ্ম কৃপাহিকেবলম্'ধ্বনিতে যেন সমাজ-গৃহের ছাদ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। প্রতিবৎসর ১১ই মাঘ প্রাতে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ বেদীতে বসিয়া যখন ভক্তিগদগদবাক্যে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে

ডাকিতেন, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উদ্বোধন, আরাধনা করিতেন, তখন উপাসকগণের বাহ্যস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাঁহারা প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতেন। কখনও কখনও তাঁহাদের মধ্য হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল মধুময় করিত। ইষ্টদেবতার স্তব করিতে করিতে কখনও কখনও গোস্বামিপাদের কণ্ঠরোধ হইয়া যাইত। কখনও বা তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তাঁহার ক্রন্দনে সকলেই রোদন করিতেন। এইরূপে তিনি নিজে মাতিয়া সকলকেই মাতাইতেন, নিজে কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইতেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই সুবর্ণ সময়ের কথা মনে হইলে এখনও পুলকে শরীর শিহরিয়া উঠে, নিরাশপ্রাণে আশার সঞ্চার ও মৃতদেহে চৈতন্যের উদয় হয়।

একবার মাঘোৎসবে ১১ই মাঘ প্রাতে গোস্বামিপাদ বেদীতে বসিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ দেবগণ মর্ত্তে আগমন করিয়া মনুষ্যের সহিত যোগদান করিয়াছেন। আজ দেবতা ও মানবে মিলিত হইয়া পরব্রহ্মের পূজা করিতেছেন। আজি স্বর্গমর্ত্ত এক হইয়া গিয়াছে। তিনি বেদী হইতে যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন এক বৈদ্যুতিক শক্তি সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিল। সকলে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন সাধারণ সমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। পাল খাটাইয়া উৎসব হইতেছে। কীর্ত্তনের দল নগর প্রদক্ষিণ করিয়া যখন উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, তখন সকলে ভাবে পাগল হইয়া কে কোথায় পড়ে তাহার কিছুই ঠিক রহিল না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খোয়ারাশির উপর আছাড় পড়িয়া তাঁহাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতে লাগিল; সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। সকলে একেবারে বেহুঁস। আহা সে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না।

একবার মাঘোৎসবে কুমারখালির কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ (১) সদলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবপূর্ণ মধুর সঙ্গীতে ব্রাহ্মপল্লি আনন্দ-বাজারে পরিণত হইয়াছিল। তিনি যে কয় দিন ছিলেন, সে কয় দিনে ব্রাহ্মপাড়া ভাবের জোয়ারে টলমল করিয়াছিল। গোস্বামিপাদ অবাত-বিক্ষোভিত মহাসমুদ্রের ন্যায় নিশ্চলভাবে ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া আছেন; আর ফিকিরচাঁদ তাঁহার দিকে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে গদগদস্বরে গান করিতেছেন। গোস্বামিপাদের হৃদয়নদী ভক্তি ও প্রেমের বন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উপছাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি সে বেগ যেন ধারণ করিতে না পারিয়া এক একবার 'আহা, উহু,' শব্দ করিয়া আনন্দের তরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন, উপস্থিত নরনারীগণ সেই মধুমাখা 'আহাউহু' শব্দ শুনিয়া এবং তাঁহার ভক্তিমাখা সুন্দর মুখশ্রী দর্শন করিয়া ভাবে বিবশ ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। সে যে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার, সুন্দর দৃশ্য, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এই সুদিন অধিক দিন রহিল না। শীঘ্রই এই সুবর্ণ সময়ের অবসান হইল।

এই সময়কার তত্ত্বকৌমুদীতে গোস্বামিপাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

"পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বেদীতে আরোহণ করিয়া উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন। উদ্বোধন শেষ হইল, আরাধনা শেষ হইল, ধ্যানের সময় অতীত হইল, সমস্বরে প্রার্থনা হইয়া গেল, উপাসকদিগের মনে

(১) কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার। কুমারখালিতে তাঁহার বাড়ী ছিল। তিনি বহু দিন গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা নামে এক খানি সংবাদপত্র চালাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বিজয়বসন্ত প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তকও তাঁহার প্রণীত। শেষ জীবনে তিনি এক জন উচ্চ সাধক হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডবেদ নামে এক খানি উপাদেয় ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন।

আর ধৈর্য্য ধরে না। অবশেষে উপদেশের সময় প্রাণ ফাটিয়া ক্রন্দনের রোল উঠিল। পাষাণ গলিয়া গেল; নরনারীর বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া চলিল। সে দৃশ্য, সে স্বর্গীয় দৃশ্য কে বর্ণন করিবে? রমণীয় উদ্যানে একেবারে শত স্ফটিক ফোয়ারা উন্মুক্ত হইলে যে শোভা হয়, আজ তাহাও ভক্তির শত প্রস্রবণের নিকট পরাজিত হইল। নরনারীর প্রাণ ভেদ করিয়া ভক্তিবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাঠক! আর নয়। সে দৃশ্য বর্ণনা করিবার প্রয়াস বৃথা। যদি সহৃদয় হও, কল্পনার চক্ষে সে চিত্র অঙ্কিত করিয়া কথঞ্চিৎ বুঝিলেও বুঝিতে পার।"

প্রভুপাদের কলিকাতায় অবস্থানসময়ে এক দিন তাঁহার গুরুদেব পূজ্যপাদ পরমহংসজী আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গে চল। গোস্বামিপাদ বলিলেন, আমাকে প্রস্তুত হইয়া আসিতে একটু সময় দিন। পরমহংসজী বলিলেন, আমি বিলম্ব করিতে পারিব না; তুমি পরে আসিও। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, আপনার সহিত কোথায় আমার সাক্ষাৎ হইবে? পরমহংসজী বলিলেন, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন বা নর্ম্মদাতটে; এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পরে গোস্বামিপাদ শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগ্‌ছিকে সঙ্গে লইয়া গুরুদর্শনে বাহির হইলেন। তিনি বাঁকিপুরে কয়েক দিন বাবু ব্রজেন্দ্রমোহন দাসের বাড়ীতে থাকিয়া গয়ায় গেলেন। তিনি সেখানে রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে গুরুদেবের দর্শনার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই স্থানে থাকা সময়ে তিনি অনেক সময়েই ভ্রমণে বাহির হইতেন। ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি গয়ার প্রসিদ্ধ স্থান সকল দর্শন এবং গম্ভীরানাথ বাবা, রাধাশ্যাম বাবা ইত্যাদি সাধুদের আশ্রমে যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিতেন। এখানে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়াতে তিনি কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা,

লক্ষ্ণৌ, গাজিপুর, কানপুর প্রভৃতি স্থানে পরমহংসজীর সন্ধানে গমন করিলেন। এ সকল স্থানেও পরমহংসজীর সহিত তাঁহার দেখা হইল না। তখন তিনি বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এই স্থানে গুরুদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর প্রভুপাদ বনদর্শনে বাহির হইলেন। গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, কাম্যবন, কুসুমসরোবর প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

কলিকাতায় কিছু দিন থাকিয়া তিনি কুমারখালি হইয়া নাটোরে যান। এইস্থানে সাধকশ্রেষ্ঠ রাজা রামকৃষ্ণ স্থাপিত ৺জয়কালী দেবী কুমারী মূর্ত্তিতে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া অঙ্গুলীসংকেতে প্রভুপাদকে তাঁহার অনুগমন করিতে ইঙ্গিত করেন। গোস্বামিপাদ তৎকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বালিকা তাঁহাকে এক সরোবরের তীরে লইয়া গেলেন। এই সরোবরের মাঝখানে একটী প্রাচীন বাড়ী। গোস্বামিপাদ তথায় উপস্থিত হইয়া একটি মন্দির দেখিতে পাইলেন। সেই মন্দিরে রাজা রামকৃষ্ণপ্রতিষ্ঠিত ৺জয়কালী দেবীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। প্রতিমার প্রস্তরনির্ম্মিত আসন এক দিকে বসিয়া যাওয়াতে দেবীমূর্ত্তিও এক দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। এই জয়কালীই বালিকা হইয়া প্রভুপাদকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন; শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগ্‌ছি সে সময়ে প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনিও তাঁহার সহিত জয়কালীর মন্দিরে গিয়াছিলেন। জগজ্জননী বালিকা মূর্ত্তিতে বাগ্‌ছি মহাশয়কে দর্শন দেন নাই, কেবল প্রভুপাদকেই দর্শন দিয়াছিলেন।

অনন্তর প্রভুপাদ রামপুরবোয়ালিয়া প্রভৃতি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া মাণিকদহে গমন করেন। এই স্থানে একটি মুসলমান গোস্বামি-মহাশয়কে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ইনি সাধারণ লোক নহেন।

ইঁহাকে দেখিয়া আমার মনে আল্লাতালার ভাব উদয় হইতেছে। মাণিকদহ হইতে প্রভুপাদ ঢাকায় গমন করেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি দারভাঙ্গায় যান। সেখানে যাইয়া তিনি বাবু রাধাকৃষ্ণ দত্ত, ৺কৃপানাথ মজুমদার এবং আরও কয়েক জনকে সাধনপ্রদান করেন। দারভাঙ্গা হইতে মোজাফরপুর এবং মতিহারী গমন করেন। ৺শ্রীধর ঘোষ প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন। মতিহারী হইতে তিনি এক জন সাধুর সঙ্গে পশুপতিনাথ দর্শন করিবার জন্য নেপালে গমন করেন। নেপালের পথে এক জন কাপালিক বলি দিবার জন্য শ্রীধরকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। এক জন রামাৎ বৈষ্ণব তাঁহাকে কাপালিকের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীধরের নেপাল হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই গোস্বামীপাদ মতিহারীর ৺উমাচরণ ঘটকের কাছে তাঁহার পাথেয় ব্যয়ের টাকা রাখিয়া জামালপুরে ৺অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আসেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড দেখিয়া কোন্নগরে ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আগমন করেন। প্রভুপাদের উপস্থিতিতে নগেন্দ্রবাবুর পত্নী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবীর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি ভাবে ও আহ্লাদে আত্মহারা হইলেন। পরমানন্দে তিনি প্রভুপাদের সেবা করিয়া যারপরনাই তৃপ্তিলাভ করিলেন।

---

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## ব্রহ্মচারিসম্মিলন

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বারদী গ্রামে এক জন সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন। লোকে ইহাঁকে ব্রহ্মচারী * বলিয়া ডাকিত। ইনি এক জন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। যে সময়ে গোস্বামি মহাশয়ের সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল, সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর হইয়াছিল। মানুষ এত অধিক দিন বাঁচে, অনেকে হয় ত ইহা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আমাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কলিযুগ ব্যতীত অন্য যুগত্রয়ে মানুষের আয়ু দুই তিন ও চারি শত বৎসর ছিল। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে মানবগণ সত্যযুগে চারি শত, ত্রেতাযুগে তিন শত এবং দ্বাপরযুগে দুই শত বৎসর জীবিত থাকিত।

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ,

কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ।" মনুসংহিতা। ১।৮৩।

বাইবেল (Bible) গ্রন্থেও মানুষের সাত আট শত বৎসর আয়ুর কথা আছে। পুরাতন বাইবেলে (Old Testament) ৭।৮ শত বৎসরের দীর্ঘজীবী অনেকগুলি লোকের নাম পাওয়া যায়। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থসকলে এবং বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে যখন

* ব্রহ্মচারিমহাশয় অদ্বৈতবংশে জন্মিয়াছিলেন। তিনি গোস্বামিপাদের প্রপিতামহ ছিলেন। উপনয়নের পরই তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আপনমুখে প্রভুপাদের নিকট নিজের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন।

মানবগণের দীর্ঘজীবনের কথা লিখিত আছে, তখন তাহা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন কারণ দেখা যায় না। সকল দেশের সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে অসত্য কথা লিখিত হইয়াছে, ইহা কখনই নহে। দর্পোদ্ধত ব্যক্তিগণ ভিন্ন আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন কোন লোক এরূপ বলিতে কদাচ সাহসী হইবেন না। বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপেও সওয়া শত দেড় শতবর্ষজীবী মানবগণের বিবরণ পাঠ করা যায়।

মিতাচার, সংযম, শৌচ প্রভৃতি দ্বারা মানুষ দীর্ঘজীবনলাভ করিতে পরে। পানভোজনসম্বন্ধে যাঁহারা মিতাচারী, যাঁহারা যুক্তাহার যুক্তবিহারাদি করিয়া থাকেন, কামক্রোধাদি রিপুসকল যাঁহাদিগের সংযত, যাঁহাদের শরীর ও মন পবিত্র,তাঁহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ,পানভোজনবিষয়ে স্বেচ্ছাচারী,অশুচি মানবগণ হইতে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন যোগের দ্বারাও লোক দীর্ঘজীবী হইতে পারে। যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ শত শত বৎসর বাঁচিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পৌনে দুই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইহাঁর অসাধারণ যোগশক্তি ছিল। ইহাঁর কথাতে এবং ইহাঁর প্রসাদ খাইয়া অনেক লোকের উৎকট পীড়া ভাল হইয়া গিয়াছে। ঢাকা জেলার এক জন জমিদার বাতরোগে একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এত ব্যথা হইয়াছিল যে তিনি দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে পারিতেন না। নড়িতে চড়িতে, পাশ ফিরিয়া শুইতেও তাঁহার অতিশয় ক্লেশ হইত। জমিদার বাবুর পয়সার অভাব ছিল না। কাজেই চিকিৎসার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী প্রভৃতি সকল প্রকার চিকিৎসা করিয়াও যখন তিনি রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শরণ লইতে হইল।

তিনি বারদী যাইয়া তাঁহার কাছে হত্যা দিয়া পড়িলেন এবং কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করিয়া পীড়াশান্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় ব্রহ্মচারীর মন গলিল না। তিনি রোগীকে ধমক দিয়া তাঁহার আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। রোগীর প্রাণের দায়, ধমক খাইয়াও আশ্রমেই পড়িয়া রহিলেন। এইরূপে অনেক দিন গত হইলে একদিন অতিশয় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রস্রাবের বেগ হওয়াতে রোগীকে সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে অতিকষ্টে হামা দিয়া বাহিরে যাইতে হইল। প্রস্রাব করিয়া আর তিনি ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। ব্যথায় অতিশয় কাতর হইয়া কাদায় পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী আসনে বসিয়া একদৃষ্টে এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন। বাবুর এইরূপ কষ্ট দেখিয়া তাঁহার প্রাণ গলিল, রোগীর উপর দয়া আসিল। তখন তিনি অতি তেজের সহিত বলিলেন। উঠ, উঠিয়া দাঁড়া। তোর আর রোগ নাই। এই কথা বলিবামাত্র রোগীর পীড়া ভাল হইয়া গেল। এত যে ব্যথা তাহা নিমেষমধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ব্রহ্মচারীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, যা, এখন বাড়ী যা। আর সুরাপান বা পরস্ত্রীগমন করিস্ না। সংযত হইয়া থাকিস্। পুনরায় অন্যায় করিলে এই রোগ আবার হইবে। ব্রহ্মচারীর আদেশ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইয়া বাবু চলিয়া গেলেন।

আর এক দিন একটি লোক জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী মহাশয় তখন আহার করিতেছিলেন। ভোজনান্তে বাহিরে আসিয়া তিনি লোকটিকে

দেখিতে পাইলেন। তাহার রোগের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার মনে দয়া হইল। তিনি তাঁহার একটি প্রসাদী ভাত তাহাকে খাইতে দিলেন। ভক্তির সহিত ভাতটি খাইবামাত্র রোগীর জ্বর ছাড়িয়া গেল। তখন সে সুস্থ হইয়া ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

গোস্বামিপাদের অন্যতম শিষ্য বাবু কুঞ্জলাল নাগের বাড়ী এই বারদী গ্রামে। তিনিই প্রভুপাদকে ব্রহ্মচারীর কথা বলেন। নাগ মহাশয়ের নিকট ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য বারদী গমন করেন। তিনি আশ্রমে উপনীত হইলে ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে অতিশয় আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। দুই মহাপুরুষের সম্মিলনে ভাব ও প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

গোস্বামিমহাশয় ব্রহ্মচারী মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ও গোস্বামিমহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। দুই জনে একত্র হইলে উভয়ের মধ্যে ভাব ও আনন্দের বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রবাহিত হইত। উভয়ের সম্মিলনে বারদীর আশ্রম গঙ্গাযমুনার মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইত। গোঁস্বামিমহাশয় ঢাকায় অবস্থান সময়ে প্রায়ই বারদী যাইতেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় গোস্বামিমহাশয়ের পরিজন-বর্গকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। (১)

গোস্বামিমহাশয়ের সহিত পরিচয় হইবার পর হইতে, তাঁহার নাম ও প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ঢাকাও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের

(১) একবার ব্রহ্মচারী মহাশয় গোস্বামিপাদকে দেখাইয়া এক জন গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের ঠাকুর (গৌরাঙ্গ বিগ্রহ) কাষ্ঠের বা মাটির, কথা বলে না; আমার এই গৌরাঙ্গ সজীব, কথা বলে।

এবং কলিকাতার অনেক শিক্ষিত লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য বারদী যাইয়া তাঁহার অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে যারপরনাই উপকৃত হইতেন। ১২৯৭ সালে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তিনি অমর ধামের যাত্রী হন।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## নানা স্থানে ভ্রমণ

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কোন্নগরনিবাসী ৺শিবচন্দ্র দেকর্ত্তৃক আহূত হইয়া কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবুর কোন্নগরে অবস্থান সময়ে গোস্বামিপাদ একবার তাঁহার বাড়ীতে গিয়া কয়েক দিন ছিলেন। তাঁহার আগমনে কোন্নগরের শ্রী ফিরিয়া গেল। নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে দিনরাত্রি ধর্ম্মের স্রোত বহিতে লাগিল। কীর্ত্তন,ধর্ম্মালাপ প্রভৃতির বিরাম নাই। অষ্ট প্রহর যেন আনন্দবাজার। এক দিন কীর্ত্তনের সময় একটি রুগ্ন কুকুর খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কীর্ত্তনস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদকে প্রদক্ষিণ করিল। পরে ঘরের এক পাশে শুইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল। এই অবস্থাতেই তাহার দেহত্যাগ হইল। প্রভুপাদ যত্ন করিয়া কুকুরের দেহ গঙ্গাসাৎ করিলেন। আর এক দিন সংকীর্ত্তন শুনিয়া একটি ছাগলের সমাধি হইয়াছিল। যে স্থানে কীর্ত্তন হইতেছিল, তাহার অদূরে একটি ছাগল চরিতেছিল। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ছাগলটা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল। ছাগলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন,

ইহার সমাধি হইয়াছে, ইহাকে হরিনাম শুনাও। তাহার কানে হরিনাম দেওয়া হইল। নাম শুনাইতে ছাগলের চৈতন্য হইল। (১)

গোস্বামিপাদ একবার কুমারখালির অদূরবর্ত্তী হিজলাবট গ্রামে ৺ চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে কিছু দিন ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গরই নদীর তীরে এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভজন করিতেন। এক দিন তিনি চন্দ্রের দিকে চাহিতে দেখিতে পাইলেন যে চন্দ্রলোক হইতে এক জন লোক নামিয়া আসিতেছেন। তিনি স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সত্য সত্যই এক জন লোক চন্দ্রলোক হইতে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। ইনি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভুপাদ অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিলেন। তিনিও গোস্বামিপাদকে অতিশয় অভিনন্দন করিলেন। পরে কেশব বাবু বলিলেন, গোঁসাই! আমরা গায়ের রক্ত জল করিয়া যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি করিয়াছিলাম, এখন তাহার দুরবস্থা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তুমি একবার তাহার দিকে দৃষ্টি কর। যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ অধঃপতন হইতে রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা কর। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, আমার দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া আর এখন সম্ভবপর নহে। আমি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়াছি, ব্রাহ্মদেরও আমার উপর সদ্ভাব নাই। এ অবস্থায় আমার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মরা আমার কথা কখনই শুনিবেন না। আর যে কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টানধর্ম্মের স্রোত রোধ ও দেশে সুনীতিপ্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। সে কার্য্য হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার

(১) নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট এই ঘটনা দুইটি শুনিয়াছি।

কার্য্যকারিতাও ফুরাইয়া গিয়াছে। প্রভুপাদের কথা শুনিয়া কেশব বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া চন্দ্রলোকে ফিরিয়া গেলেন।*

গোস্বামিমহাশয় একবার স্বর্গীয় প্যারিলাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত হিজলীকাঁথিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পান। অসংখ্য রক্তকমল প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের অনির্ব্বচনীয় শোভাসম্পাদন করিয়াছে। মধুকরগণ গুণ্ গুণ্ স্বরে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া মধুপান করিতেছে। গোস্বামিপাদ অনিমেষনয়নে সরোবরের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ একটি বৃহৎ পদ্মের উপরে কমলেকামিনী দর্শন করিলেন। দর্শনমাত্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য সরোবরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। যে পদ্মে কমলেকামিনী উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি সেটি তুলিয়া আনিলেন। প্যারী বাবু তাঁহার এই অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গোস্বামিমহাশয়ের ভিতর হইতে এক প্রবল শক্তি তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হইল। সেই শক্তির প্রভাবে তাঁহার মনে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি ওঁকারনাথ তীর্থে গমন করিয়া কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মৌনী হইয়াছিলেন, এজন্য সকলে তাঁহাকে মৌনীবাবা বলিত। এখন তিনি পরলোকবাসী।†

* গোস্বামিমহাশয়ের মুখে এই ঘটনা শুনিয়াছি।

† গোস্বামিমহাশয়ের নিকট এই ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পদ্মফুলটি দিয়াছিলেন।

তীর্থভ্রমণোদ্দেশ্যে একবার গোস্বামিমহাশয় কাশী হইয়া অযোধ্যায় গমন করেন। কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করিতে গিয়া তিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া বিশ্বনাথের উপর পড়িয়া যান। সেই দিন রজনীযোগে বিশ্বনাথ তাঁহার বাসস্থানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন।

কাশী হইতে ফৈজাবাদ হইয়া তিনি অযোধ্যায় গমন করেন। ফৈজাবাদে প্রভুপাদের অনুগত শিষ্য ৺হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজকার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেছিলেন। তিনি সেখানকার সরকারী ডাক্তার ছিলেন। গোস্বামিপাদ হরকান্ত বাবুর বাড়ীতে কয়েক দিন বাস করিয়া অযোধ্যায় গমন করেন। গমনসময়ে পথে সীতাদেবী তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া গিয়াছিলেন। গোস্বামিপাদ সেখানে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## সাধারণ ব্রাহ্মসমাজত্যাগ

জগতে আমিই একমাত্র সত্যধর্ম্ম, মুক্তি কেবল আমারই আয়ত্ত, অন্য ধর্ম্মের সেবা করিলে মুক্তি হয় না, যে ধর্ম্ম এই কথা বলে, সে ধর্ম্ম সত্য ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। তাহা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উপদেশ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।" গীতোক্ত এই ভগবদ্বাক্যের অনুরূপ কথাই সে ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। নদীসকল ঋজুকুটিল প্রভৃতি নানা পথে প্রবাহিত

হইয়া শেষে যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাধকগণও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করিয়া অবশেষে সকলেই এক সচ্চিদানন্দসাগরে প্রবেশ করেন। পৃথিবীতে আপ্তবাক্যমূলক যতগুলি ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই ভগবানে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ। মানুষ যতদিন পথে বিচরণ করে, ততদিনই গণ্ডগোল, ততদিনই মত লইয়া মারামারি। গম্যস্থানে উপস্থিত হইলে আর কিছুমাত্র গোল থাকে না। মতভেদ, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা তখন সমস্তই চলিয়া যায়। সকলেরই গম্যস্থান ভগবান্; ভগবানে উপস্থিত হইলে সকলেই দেখিতে পান যে তাঁহারা সকলেই এক স্থানে উপস্থিত হইয়া একই বস্তু দর্শন ও একই আনন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

গোস্বামিমহাশয় সিদ্ধিলাভ করিয়া এই উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মলাভ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট হইতে মতের গণ্ডগোল, দলাদলির হাঙ্গামা, এ ধর্ম্ম ভাল ও ধর্ম্ম মন্দ, এ সকলের কিছুই রহিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মসকল ভগবানকে লাভ করিবার বিভিন্ন পন্থা। যাহারা অজ্ঞ, ধর্ম্মজগতের কোন সংবাদ জানে না, তাহারাই মনে করে, আমার ধর্ম্ম ভাল, অন্য ধর্ম্ম মন্দ; আমার ধর্ম্মেই কেবল মুক্তি হয়, অন্য ধর্ম্মে মুক্তি হয় না। সেই সকল অজ্ঞ লোকই দলাদলি ও মত লইয়া কোলাহল করিয়া বেড়ায়। এই সকল লোক ভগবান্ হইতে বহু দূরে রহিয়াছে। ইহারা এখনও ধর্ম্মরাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। ভগবৎকৃপায় যাঁহারা অধ্যাত্মজগতের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সকল প্রকার

মতভেদ, সর্ব্ববিধ দলাদলি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারাই বিভিন্ন ধর্ম্মপথের যাত্রীগণকে আপনার মনে করিয়া প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনদান করিতে সমর্থ হন।

গোস্বামিমহাশয় যখন ধর্ম্মের সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, মতের গণ্ডী ও দলাদলির উপরে উঠিয়া গেলেন, গন্তব্য স্থান ভগবানে উপনীত হইলেন, তখন তিনি, সকল সম্প্রদায়ের সাধু, ভক্ত ও মহাপুরুষদিগকে সমান ভক্তি, সমান আদরযত্ন করিতে লাগিলেন। এ সম্প্রদায়ের সাধু আমার আপনার, ও সম্প্রদায়ের সাধু আমার পর, এ ভাব তাঁহার নিকট হইতে একেবারে চলিয়া গেল। তিনি যাহার মধ্যে প্রকৃত সাধুতা, যথার্থ ভগবদ্ভক্তি দেখিতে পাইতেন, সম্প্রদায়বিচার না করিয়া তাঁহাকেই আদরযত্ন করিতেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বাউল, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া অতুল আনন্দলাভ করিতেন। তিনিও সকল সম্প্রদায়ের সাধু মহাপুরুষদিগের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গসুখ-সম্ভোগে আনন্দিত হইতেন। তাঁহার এই ভাব কিন্তু ব্রাহ্মগণের নিকট প্রীতিকর বোধ হইত না। তাঁহার এই ভাবকে তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদিগের ধর্ম্মই জগতে একমাত্র মুক্তিপ্রদ সত্য ধর্ম্ম; জগতের আর সমুদায় ধর্ম্ম অসত্য, ভ্রমপূর্ণ উপধর্ম্ম। সাধুতা, ভগবদ্ভক্তি যাহা কিছু তাঁহাদিগের ধর্ম্মেরই একায়ত্ত, অন্য ধর্ম্মে তাহার একান্ত অভাব। আর অন্য সম্প্রদায়ের সাধুগণ কুসংস্কারাপন্ন ভণ্ড মাদকসেবী। এই সকল কারণে তাঁহারা গোস্বামিমহাশয়ের উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন না। প্রভুপাদ অন্য সম্প্রদায়ের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই অন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করিতেন না।

তবে তিনি যে পন্থায় চলিতেন, সে পন্থার বিধিনিষেধ অতিক্রম করিতেন না; সে সমস্ত সম্পূর্ণ মানিয়া চলিতেন। নিজের পন্থায় স্থির ও অটল থাকিয়া তিনি সকল সম্প্রদায়কে অতি উদারভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। অত্যন্ত সদ্ভাবের সহিত তিনি সকল সম্প্রদায়ের সাধুমহাত্মাদিগের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতেন। কোন তান্ত্রিক সাধক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে প্রয়োজনমত তিনি তাঁহাকে 'কারণ' অর্থাৎ মদ্য আনিয়া দিতেন। যে সকল সাধু গাঁজা-চরস প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করেন, তিনি তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করিতেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট বসিয়া সেই সকল বস্তু সেবন করিতেন। ইহা তাঁহার নিকট কিছুমাত্র অন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বোধ হইত না। কিন্তু ব্রাহ্মগণ গোস্বামিপাদের এই সকল কার্য্যের অনুমোদন করিতেন না। প্রভুপাদ আরও দেখিলেন যে শোনা-ধর্ম্মে ও ফোটাধর্ম্মে অনেক প্রভেদ। ভগবৎকৃপায় মানুষের মধ্যে যখন ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে শোনা ও ফোটা ধর্ম্মের পার্থক্য বুঝিতে পারে। যথার্থ ধর্ম্মের আবাসভূমি, ধর্ম্মাবহ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম। সুতরাং ভগবানের পদারবিন্দলাভ করিতে না পারিলে প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। আর এই প্রকৃত ধর্ম্ম,—ফোটাধর্ম্ম লাভ করিতে না পারিলেও মানুষ নিরাপদ ও কৃতার্থ হইতে পারে না। এই ধর্ম্মই মনুষ্যকে মুক্তি দেয়, ভক্তিরাজ্যে লইয়া যায়। শোনাধর্ম্ম-দ্বারা মানবের বাসনাই ক্ষয় হয় না, মুক্তি ত বহু দূরের কথা। সিদ্ধি-লাভ করিবার পর গোস্বামিপাদ যখন যথার্থ ধর্ম্ম কি, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইলেন, ফোটাধর্ম্ম কি তাহা জানিলেন, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ধর্ম্মের স্বরূপ তাঁহার দিব্যদৃষ্টির গোচরীভূত হইল, তখন আর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

ভগবান অনন্ত ও মুক্ত; তাঁহার ধর্ম্মও অনন্ত এবং মুক্ত। সেই অনন্ত ও মুক্তকে যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিতে পারেন? *

এইরূপে প্রভুপাদের যখন অবস্থা খুলিয়া গেল, গুরুকৃপায় যখন তিনি সিদ্ধাবস্থা লাভ করিলেন এবং শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিদের প্রসাদে যখন শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অযৌক্তিকতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলেন। তিনি দেখিলেন শাস্ত্রসকল অভ্রান্ত, ভ্রমপ্রমাদশূন্য ও শাশ্বত। মানুষের বিবেক অভ্রান্ত নহে, তাহা সংস্কারের অধীন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "শাস্ত্রে বিন্দুমাত্রও ভ্রম বা প্রমাদ নাই। শাস্ত্রের প্রত্যেক কথা অভ্রান্ত; কেবল অভ্রান্ত নহে, তাহার প্রত্যেক অক্ষর সজীব। যাহা অপৌরুষেয় এবং যাহা ঋষিদের লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে সে সমস্তই অভ্রান্ত এবং জীবিত। সমুদায় শাস্ত্র আমার সহিত কথা বলে। বৃক্ষের শাখায় পক্ষী সারি দিয়া বসিয়া যেমন শব্দ করে, নড়ে চড়ে, খেলা করে, শাস্ত্রের অক্ষর সকলও সেই প্রকার নড়ে চড়ে, আমার সঙ্গে কথা বলে। তবে শাস্ত্রের মধ্যে যে সকল প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, যাহা অন্য লোকের লেখা, ঋষিবাক্য নহে, সে সমুদায় অংশ অভ্রান্ত বা সজীব নহে। শাস্ত্রের একটি বাক্যও নিরর্থক নহে।" হেরিসন রোডে অবস্থান সময়ে তিনি আমার নিকট হইতে কালিদাসের 'নলোদয়' লইয়া পাঠ করেন। পড়া শেষ হইলে আমাকে পুস্তকখানি

* ৺মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় নব্যভারত পত্রে লিখিয়াছেন যে গোস্বামিমহাশয় রংপুর জেলার অন্তর্গত কাঁকিনা হইতে কাউনিয়াতে যাইবার সময়ে স্বর্গীয় মহাত্মা হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ) মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে "কেশববাবু যে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা শেখাধর্ম্ম, কল্পনার ধর্ম্ম; কোটাধর্ম্ম নহে।" মজুমদার মহাশয়ও তাহাই বলিলেন। মনোরঞ্জন বাবু গোস্বামিমহাশয়ের সহিত এক নৌকাতে ছিলেন।

ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, লেখা অতি সুন্দর, কিন্তু মরা। ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ পড়িয়া যে ভাব হয়, যে আনন্দ পাওয়া যায়, ইহাতে তাহা হয় না। আর এক দিন পাণিনিব্যাকরণ পড়িয়া বলিলেন, ইহার প্রত্যেক সূত্র,প্রত্যেক বর্ণ সজীব। পুরীতে তিনি শৌচাগার হইতে আসনে আসিয়াই বলিলেন, অমুক গ্রন্থখানি ঠিক ভাবে রাখা হয় নাই, বিপরীত ভাবে রাখা হইয়াছে। গ্রন্থ আমাকে এ কথা এখনই বলিলেন। ঘরে গিয়া দেখা গেল, বস্তুতঃই গ্রন্থখানি বিপরীত ভাবে রহিয়াছে।

ব্রাহ্মগণ বলেন, সমস্ত শাস্ত্রই ভ্রমপ্রমাদযুক্ত অপূর্ণ মনুষ্যপ্রণীত, অতএব সত্য ও অসত্যমিশ্রিত। এই সত্যাসত্যজড়িত শাস্ত্র কখনও ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।" এখন জিজ্ঞাস্য এই যে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সহজজ্ঞান কি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ অপূর্ণ মানুষের নহে? অপূর্ণ মনুষ্যপ্রণীত শাস্ত্র যদি অভ্রান্ত না হয়, তবে অপূর্ণ মানুষের সহজজ্ঞান অভ্রান্ত হয় কিরূপে? মানবপ্রণীত শাস্ত্র ভ্রমপ্রমাদযুক্ত হইলে মানুষের সহজজ্ঞানও অবশ্যই ভ্রমপূর্ণ হইবে। গোস্বামিপাদও এই কথাই বলিতেন। ব্রাহ্মগণ একটি কথা জানেন না। সে কথাটী এই যে মানুষ মুক্তাবস্থায় যখন ব্রহ্মে যুক্ত হন, তাঁহার জ্ঞান যখন অনন্তজ্ঞানময় পুরুষের জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তিনি ভ্রমপ্রমাদের অতীত হইয়া যান। "ব্রহ্ম বেদ

ব্রহ্মৈব ভবতি।” তখন তিনি যাহা ভাবেন, যাহা বলেন, যাহা লেখেন, তাহা সমস্তই অভ্রান্ত। তাহাতে ভ্রমপ্রমাদের গন্ধও থাকে না। আর হিন্দুর বেদ মনুষ্যপ্রণীত নহে, তাহা অপৌরুষেয় ভগবদ্বাক্য। এ সকল কথা ব্রাহ্মেরা জানেন না, বুঝেন না, কাজেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতি না থাকিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। ব্রাহ্মদের মধ্যে কাহারও এ অবস্থা হয় নাই, কাজেই এ সকল বিষয় তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যাহার যে অবস্থা হয় নাই, সে কখনই তাহা বুঝিতে, জানিতে পারে না। তবেই দেখা গেল, মানবের সহজজ্ঞান ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি হইতে পারে না। ব্রাহ্মদের এ মতটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গোস্বামিপাদ দিব্যজ্ঞানে ইহা বুঝিলেন। অনেক বার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে মানুষের বিবেক, মানবের সহজজ্ঞান, সমস্তই ভ্রমপ্রমাদযুক্ত। একমাত্র শাস্ত্রবাক্যই সত্য ও অভ্রান্ত। ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সহজজ্ঞান ধর্ম্মের ভিত্তি নহে। ধর্ম্মের যথার্থ এবং একমাত্র ভিত্তি আপ্তবাক্য, ঋষিবাক্য, বেদাদি শাস্ত্র। যেখানেই মানুষের সহজজ্ঞান ধর্ম্মের ভিত্তি, সেই স্থানেই যথেচ্ছাচার। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করে। সে স্থানে বাঁধাবাঁধি নিয়মশৃঙ্খলা কিছুই থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম্ম দাঁড়ায় না। স্বেচ্ছাচারই ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। অচিরে সে সমাজের ঘোর অধঃপতন হয়।

অভ্রান্ত শাস্ত্রই ধর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি, এই তত্ত্ব যখন গোস্বামিপাদের নিকট প্রকাশিত হইল, তখন তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিত্তিহীন; তাহার কোন স্থিরভূমি নাই। আপ্তবাক্যমূলক অভ্রান্ত শাস্ত্রই ধর্ম্মের যথার্থ ভিত্তিভূমি। বেদ ও তদনুগত শাস্ত্র হিন্দুধর্ম্মের, বাইবেল খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এবং কোরাণ মহম্মদীয় ধর্ম্মের ভিত্তি। এইরূপ প্রত্যেক ধর্ম্মই কোন না কোন ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রই যে ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি ব্রাহ্মগণ এ কথা মানেন না। কেননা তাঁহারা কোন শাস্ত্রেরই অভ্রান্ততা

স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বিবেকের সহিত যাহা মিলে না, তাঁহারা সে শাস্ত্র মানেন না। শাস্ত্রাপেক্ষা বিবেককেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠস্থান দেন। কিন্তু বিবেক যে সংস্কারের অধীন ইহা তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না, কাজেই বুঝিতে পারেন না। যাহার যেরূপ সংস্কার তাহার বিবেকও সেই প্রকার হইয়া থাকে। এক জন অঘোরপন্থী বা কাপালিকের বিবেক এক জন বৈষ্ণবের বিবেকের অনুরূপ নহে। এক জন খৃষ্টানের বিবেকও এক জন হিন্দুর বিবেক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপ্তবাক্যমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধর্ম্ম যে কেবল ভিত্তিহীন হয় এমন নহে; সে ধর্ম্মের সহিত ভগবানের কিছুমাত্র যোগ থাকে না। ঈশ্বরের সহিত যোগ না থাকিলে ধর্ম্ম সজীব হয় না। ভগবান্ হইতে বিযুক্তধর্ম্ম প্রাণহীন, মৃত। বিভিন্ন আপ্তবাক্যমূলক সজীব ধর্ম্মবৃক্ষ হইতে কতকগুলি নীতি-কুসুম চয়ন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ একটি তোড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে সুন্দর হইলেও তাহা জীবনহীন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর অস্থি চয়ন করিয়া একটি জীবকংকাল প্রস্তুত করিলে তাহা কখনও সজীব জন্তু হয় না।

গোস্বামিপাদ আরও এক বিষয়ে ব্রাহ্মদের অজ্ঞতা দেখিতে পাইলেন। ভগবান্ যেমন সমষ্টিভাবে—এক অখণ্ড ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেইরূপ তিনি ব্যষ্টিভাবে সমস্ত পদার্থের মধ্যে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিদ্যমান আছেন। এই সকল দেবতার স্বরূপ—বিগ্রহ—মূর্ত্তি আছে। সাধকগণের নিকট প্রকাশিত হইয়া ইহাঁরা তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া থাকেন। শাস্ত্রে অগ্নিদেবতা, বায়ুদেবতা, জলদেবতা বলিয়া হুতাশন, পবন, বরুণ প্রভৃতির যে স্তবস্তুতি আছে, সেই সকল দেবতা কাল্পনিক নহে। এই যে এত লোক প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন, লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তিভাবে গঙ্গাদেবীকে ভক্তির সহিত পূজা অর্চ্চনা করেন, ইহা কি

কেবল কল্পনার ব্যাপার, কখনই নহে। এই সমস্ত দেবতা সত্য সত্যই আছেন। সিদ্ধিলাভের পর প্রভুপাদ এই সকল দেবতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতেন। ব্রাহ্মগণ এই সকল দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা আরও মনে করেন, পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোথাও প্রাণী নাই। এই যে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র, সে সমস্তই জীবহীন। তুমি ইহা কিরূপে জানিলে যে এই সকল স্থানে প্রাণী নাই! ক্ষুদ্র মানব তুমি, সেই অনন্ত পুরুষের অনন্ত সৃষ্টিব্যাপারের কতটুকু জান? কেবল অহংকারে মত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান কর বই ত নয়। অপূর্ণ ক্ষুদ্র জীব কি সেই পূর্ণপুরুষের সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারে?

উপাস্যসম্বন্ধেও ব্রাহ্মদের সহিত গোস্বামিপাদের মতান্তর উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের আরাধ্যদেবতা ব্রহ্মের বিগ্রহ মানেন না। তাঁহারা বলেন, তিনি নিরাকার। তাঁহার কোন স্বরূপ-বিগ্রহ নাই। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রেই তাঁহার বিগ্রহ স্বীকার করা হইয়াছে। ভগবানের যে বিগ্রহ আছে, তনু আছে, এ কথা কোরাণ, বাইবেলেও উক্ত হইয়াছে। ঋষিগণ তাঁহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কৃপা করিয়া যখন ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন, তখন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপেই হইয়া থাকেন। তবে যে শাস্ত্রে তাঁহাকে নিরাকার বলা হইয়াছে, তাহার অন্য কারণ আছে। তাঁহার কোন জড়ীয় রূপ নাই, প্রাকৃত তনু নাই। এই জন্যই ঋষিগণ এবং ভিন্ন দেশীয় মহাজনগণ তাঁহাকে নিরাকার বলিয়াছেন। নিরাকার অর্থে তাঁহারা ব্রহ্মকে বিগ্রহবিহীন, খপুষ্পবৎ, শূন্যপদার্থ বুঝিতেন না। ব্রাহ্মরা বলেন তাঁহাদের নিরাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহেন। কেবল অনুভবের বিষয়। তাঁহাদের এই কথা তাঁহাদের উপাস্য ব্রহ্মে সম্পূর্ণই প্রযুজ্য হয়। শূন্যপদার্থের কি

প্রত্যক্ষগোচর হওয়া সম্ভবপর? বিগ্রহহীন যাহা তাহা কখনও দেখা যায় না। আর সে বস্তুর কখনও ধারণা হইতে পারে না। কেবল 'যেন বুঝিয়' সাহায্যে তাহা কথঞ্চিৎ অনুমানযোগ্য হইতে পারে।

গুরুকৃপায় যখন গোস্বামিপাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল, ভগবান্ যখন তাঁহার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে দর্শন করিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্" প্রত্যক্ষ হইলে ব্রাহ্মগণের ভ্রান্তি তাঁহার উপলব্ধি হইল।

ব্রাহ্মেরা বলেন, মানবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল। একথা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ। মানবাত্মা পরিমিত বস্তু। হিন্দুশাস্ত্রে তাহাকে অনুস্বভাব বলা হইয়াছে। জীবাত্মা যে সীমাবিশিষ্ট পরিমিত পদার্থ, ব্রাহ্মগণও সে কথা স্বীকার করেন। যাহা পরিমিত, তাহার অনন্ত উন্নতি হয় কিরূপে? পরিমিত পদার্থের সমস্তই পরিমিত হইবে, তাহার কিছুই অনন্ত হইতে পারে না। অতএব পরিমিত মানবাত্মার অনন্ত উন্নতি বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় একেবারেই অসম্ভব। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে (১) ভগবান্ বেদব্যাস অকাট্য যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে মুক্ত হইলে জীবাত্মা তাঁহার নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মের সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া

(১) সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ। ব্রহ্মসূত্র ৪থ অ ৪ পা ১ম সূত্র।

এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেনরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে॥

ঠিক এই প্রকার এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরংজ্যোতিকে (পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে আবিভূ‌ত হন। মুক্তাবস্থায় জীবের যে কিছুমাত্র অভাব বা অপূর্ণতা থাকে না, ব্যাসদেব পর পর সূত্রদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতির ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। পাঠক ইচ্ছা করিলে মূলগ্রন্থ পড়িয়া দেখিতে পারেন।

থাকেন। তখন আর তাঁহার কোন অভাববোধ থাকে না। অভাববোধ থাকিলে ত উন্নতি হইবে। যাহার কোন অভাব নাই, তাহার আবার উন্নতি কি? এ বিষয়েও ব্রাহ্মদের ভ্রান্তি দেখিয়া গোস্বামিপাদ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলেন না।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ভক্ত তাঁহার সেই অপ্রাকৃতরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিবার সময়ে গোস্বামিপাদ এ কথা উক্ত সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও সাধারণ ব্রাহ্মগণের নিকট দুই খানি পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পরবর্ত্তিসময়েও তিনি অনেক বার বলিয়াছেন যে ভগবান্ যাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার অধিকার প্রদান করেন, সেই ভাগ্যবান্ সাধক তাঁহাকে শ্যামসুন্দররূপে দর্শন করিয়া ধন্য হন।

তিনি আরও দেখিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত উপাসনাপ্রণালীদ্বারা ভগবানুকে পাওয়া যায় না। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত ব্রহ্মপ্রাপ্তির অন্য পন্থা নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" ভগবান্‌কে পাইতে হইলে অবশ্যই সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত প্রণালীদ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি ত দূরের কথা, একটি প্রবৃত্তিও নষ্ট হয় না। আত্মশক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরবশতঃ এই সাধনে সাধকের মনে অহংকারের উদয় হয়। তখন তিনি অতিশয় গর্ব্বিত, উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত হইয়া পড়েন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ভিন্ন যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, গোস্বামিমহাশয় ওঁকারনাথবাসী ৺প্যারিলাল ঘোষ (মৌনী বাবা) মহাশয়কে একথা অতি স্পষ্টভাবে লিখিয়াছিলেন। পাঠকগণ এই গ্রন্থের স্থানান্তরে সেই পত্র দেখিতে পাইবেন।

ব্রাহ্মগণ জন্মান্তর মানেন না। অথচ গোস্বামিপাদের অতীত জন্মসকলের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। 'আশাবতীর উপাখ্যানে'

তিনি তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পরলোকসম্বন্ধেও তিনি দেখিলেন যে ব্রাহ্মদিগের কথা কাল্পনিক ও ভ্রমাত্মক। যখন তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল, যখন ইহলোক ও পরলোক তাঁহার নিকট এক হইয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন যে পরলোকসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই সত্য, তাহাই প্রামাণিক। ব্রাহ্মগণ যাহা বলেন, তাহা সমস্তই আনুমানিক ও ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। এইরূপে তিনি দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে জানিতে পারিলেন যে বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই সত্য; হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মই অভ্রান্ত ও সনাতন। মানুষের মনগড়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নিতান্তই আনুমানিক। ধর্ম্ম আপ্তবাক্যমূলক না হইলে তাহা অভ্রান্ত হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম আপ্তবাক্যমূলক নহে, তাহা ধর্ম্মপদবাচ্য নহে; তাহা জীবনহীন কতকগুলি মতমাত্র। তাহা দ্বারা জীবের কোনরূপ শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন সঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥ (গীতা)

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া অর্থাৎ মনমুখী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করে, সে কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। তাহার সুখ ও পরাগতিপ্রাপ্তি হয় না।

এই সকল কারণে গোস্বামিমহাশয়কে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। এই সকল কারণে প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মে গোস্বামিপাদের আর আস্থা রহিল না।

ব্রাহ্মগণ যাহাকে ধর্ম্ম এবং যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, প্রকৃত ধর্ম্ম তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আচার্য্যের উপদেশমত সাধন করিয়া ধর্ম্মলাভ করিলে তবে যথার্থ ধর্ম্ম কি তাহা জানা যায়। গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে সাধন না করিলে

কিছুতেই ধর্ম্ম জানা যায় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির সমস্ত পরিশ্রম পাষাণে উপ্তবীজবৎ নিষ্ফল। লক্ষ বৎসর পরিশ্রম করিলেও তাহার ধর্ম্মলাভ হয় না। আচার্য্যের অনুগত হইয়া প্রণালীমত সাধনদ্বারা ধর্ম্মলাভ করিয়া তাহার যথার্থ তত্ত্ব ও স্বরূপ অবগত হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মগণ অনুমান ও কল্পনাদ্বারা ধর্ম্মের যে স্বরূপ স্থির করিয়া লন, তাহা যথার্থ ধর্ম্ম নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। এইরূপে গোস্বামিমহাশয়ের সহিত ব্রাহ্মগণের ধর্ম্মসম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হইল।

ব্রাহ্মগণ প্রভুপাদের সকল কার্য্যের সহিত সহানুভূতি রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার অনেক কার্য্য তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি সাধুসন্ন্যাসীদিগকে মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য প্রদান করেন, তাঁহার নিকট রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান ও শ্যামাসঙ্গীত হয় এবং তাহাতে তিনি যোগদান করেন, তাঁহার বাসগৃহে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি রাখা হয়, * দেবদর্শনের জন্য তিনি দেবালয়ে যান এবং দেবমূর্ত্তির ভিতরে নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সেখানে প্রণাম করেন, তিনি অভ্রান্ত গুরুবাদে বিশ্বাস করেন, ব্রাহ্মদিগের নিকট ইহা গুরুতর অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইল। এই বিষয় লইয়া কতকগুলি ব্রাহ্ম আন্দোলন উপস্থিত করিয়া ঘোঁট করিতে লাগিলেন। অতঃপর ৺পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার ও শ্রীযুত গগনচন্দ্র হোম নামক দুই জন ব্রাহ্ম গোঁস্বামিমহাশয়ের বর্ত্তমান মত সকল ব্রাহ্মসমাজের অতিশয় অনিষ্টকর, এই মর্ম্মে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট দুই খানি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্র দুই খানির মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

* হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ঘরে রাখা ব্রাহ্মরা দোষ মনে করেন; কিন্তু খৃষ্টের মূর্ত্তি রাখা দোষাবহ মনে করেন না।

## পুণ্যদাপ্রসাদের পত্র

"গোস্বামিমহাশয় বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত। গোস্বামিমহাশয়কে প্রচারকপদ হইতে বিচ্যুত করা হউক। তিনি ভিন্ন কি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিবে না? তিনি ব্রাহ্মসমাজে থাকেন কেন? যোগসাধন করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, সমাজ হইতে পৃথক হইয়া করুন।"

## গগনচন্দ্রের পত্র।

"ব্রাহ্মসমাজের বাড়ীতে পৌত্তলিক গান হয়। গোস্বামিমহাশয়ের গৃহে অশ্লীল ছবি, যেমন নবনারীকুঞ্জর, অষ্টসখীঘোড়া (১) ইত্যাদি রাখা হয়। ইহা অতিশয় অন্যায় ও ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ।

"গোস্বামিমহাশয় গোপনে সাধনপ্রদান করেন। সাধন গোপনে দেওয়া হয় কেন? তাঁহার প্রদত্তসাধনপ্রণালী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে তাহা প্রচারিত হউক। লোকে বিচার-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। যাঁহারা কিছু দিন গোস্বামিমহাশয়ের প্রদত্ত-সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধনভজন করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন। তাঁহার শিষ্যগণের বিশ্বাস যে তাঁহার চরণে মস্তক রাখিলে তাঁহাদিগের উপকার হয়। এ কি ভয়ানক কথা!

(১) নয় জন গোপী একত্র হইয়া হস্তীর এবং আট জন গোপী একত্র হইয়া অশ্বের আকার ধারণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ করিয়াছেন, এইরূপ চিত্রপটকে নবনারীকুঞ্জর, অষ্টসখীঘোড়া বলে।

ইহাদ্বারা মানুষ ভগবানের আসনে অভিষিক্ত হইতেছে কি না? সত্বর ইহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক।"

পুণ্যদা বাবু ও গগন বাবু পত্র লিখিবার পূর্ব্বেই গোস্বামিপাদের কার্য্য লইয়া ব্রাহ্মদের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া প্রভুপাদ ১৮০৮ শকের ১০ই চৈত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট তাঁহার প্রচারকপদের ত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে উক্ত ত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে হয়। অনন্তর পুণ্যদা বাবু ও গগন বাবুর পত্র পাইয়া উক্ত সভা তাঁহার ধর্ম্মমতসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক সবকমিটি নিযুক্ত করেন। ৺আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সব কমিটির সভ্য হন। তাঁহারা ১৮০৯ শকের ৩০শে বৈশাখ (১৩ই মে) সিটিকলেজে সভা করিয়া, গোস্বামিপাদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট সেই সকলের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। গোস্বামিপাদ কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে এইরূপে আমি আপনাদিগকে কিছুই বলিব না। আমার বাড়ীতে গিয়া বন্ধুভাবে এ সম্বন্ধে আলাপ করিতে ইচ্ছা করিলে আমি তাহাতে সম্মত আছি। তাঁহার এই কথায় সভ্যগণ সন্তুষ্ট হইলেন না। কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা তাঁহাদিগকে গোস্বামিপাদের কথাতেই সম্মত হইতে হইল। তাঁহারা তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্মমতসম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। তাহার পর তাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট তাঁহাদের মন্তব্য প্রদান করিলেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট সবকমিটির মন্তব্য প্রেরিত হইবার

পূর্ব্বেই গোস্বামিমহাশয় প্রচারকের পদ ত্যাগ করিয়া "ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন" নামে এক আবেদনপত্র মুদ্রিত করিয়া সকলের নিকট প্রেরণ করিবার সংকল্প করিলেন। ইহাতে কলিকাতার ব্রাহ্মগণ অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, এইরূপ হইলে তাঁহাদের দল ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাঁহাদিগের অনুরোধে গোস্বামিমহাশয় এ কার্য্যে ক্ষান্ত হইয়া এলবার্ট হলে প্রকাশ্যসভা আহ্বান করিয়া প্রচারকের পদত্যাগ করিতে চাহিলেন। ইহাতেও ব্রাহ্মগণ ভীত হইলেন। তাঁহারা আপত্তি তুলিলেন যে এরূপ করিলে ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন ব্রাহ্মদের অনুরোধে সিটি কলেজে ১৭ই মে সোমবারে কেবল ব্রাহ্মদিগের এক সভা আহূত হইল। প্রভুপাদ উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রদান করিলেন। সভাস্থ অনেকেরই ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার এই পদত্যাগপত্র এখন গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে আরও কিছু দিন সময় দেওয়া হউক। ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধত্যাগ করা উচিত কি না, তাহা তিনি আর একবার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন। আর তাঁহার ন্যায় ভগবদ্ভক্ত আদর্শ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা উচিত কিনা, ব্রাহ্মসমাজও তাহা ভাবিয়া দেখুন। অনেকে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেও শিবনাথ বাবু তাঁহাদের সকলের কথা উপেক্ষা করিয়া বলিলেন যে আমি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পক্ষ হইতে গোস্বামিমহাশয়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলাম। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পদত্যাগপত্র গ্রহণ করাই স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিষয় লইয়া আর সময় নষ্ট করিতে চাহেন না। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কার্য্যে ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। (১)

(১) শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি অনেকগুলি ব্রাহ্ম এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

## সব কমিটির মন্তব্যের সারমর্ম্ম।

"আমরা অনুসন্ধানের দ্বারা অবগত হইয়াছি যে গোস্বামিমহাশয় এক নূতন সাধনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিতেছেন। তাহাতে তিনটি বিষয় আছে; নামজপ, প্রাণায়াম ও শক্তিসঞ্চার। তাঁহারা তাঁহাদের সাধনপ্রণালীর কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না এবং অপরের নিকট সাধন করেন না। তিনি এই সাধন অপগণ্ড বালক ও কুসংস্কারাপন্ন পৌত্তলিককে দিয়া থাকেন। ইহা যদি মানবাত্মার মুক্তির পথ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের আর সকল সত্য যেমন প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা হয়, ইহাও সেইভাবে প্রচার হওয়া উচিত। যাহার ইহাতে বিশ্বাস হইবে, সে গ্রহণ করিবে; যাহার বিশ্বাস হইবে না, সে গ্রহণ করিবে না। ব্রাহ্মসমাজের এক দল লোক যদি এই সাধন গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকিয়া একটী গুপ্তদল সৃষ্টি করে, তাহা হইলে তাহাদ্বারা ভ্রাতৃভাবের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইবে। এই সাধনাবলম্বিগণ আপনাদিগের সাধনপ্রণালীকে উৎকৃষ্ট প্রণালী মনে করিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে প্রকাশ করিবেন না। ইহাতে দুইদলে বিরোধ উপস্থিত হইবে।

"গোস্বামিমহাশয়ের সাধনপ্রণালী বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইলে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত আরাধনা, প্রার্থনা প্রভৃতি তিষ্ঠিতে পারিবে না।

"এই গুপ্তদলের মনে অহংকার জন্মিবে। এই সাধন, বালক ও পৌত্তলিকদিগকে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে সাধন করিতে করিতে কালে সত্য প্রকাশিত হইবে। এ মত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর। ইহাতে লোকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইবে না। গোস্বামিমহাশয়ের সাধনে কেবল ভাবুকতার বিকাশই দেখা যায়।

এই সাধনাবলম্বিগণ ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞান ও কার্য্যকে তুচ্ছ মনে করিবেন। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইবেন। এ সাধনে লোককে স্বাধীনচিন্তাশূন্য ও গুরুমুখাপেক্ষী করিয়া ফেলিবে। এই সাধনপথাবলম্বিগণ অন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন না। তাঁহারা বলেন, উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে অপরের অনেক পীড়া নিজের হইতে পারে। ইহার উত্তরে এই বক্তব্য যে অপরের ব্যবহার করা কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে, ও অন্যের শয্যায় শয়ন করিলেও ত রোগ হইতে পারে। গোস্বামিমহাশয় বলেন যে মহাত্মারা বলেন, উচ্ছিষ্টভোজন করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিরও বিঘ্ন হয়। উচ্ছিষ্ট-ভোজনের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। বরং ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিবারই কথা। ইহা দ্বারা ভ্রাতৃভাববৃদ্ধির সমূহ বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই সাধনপথাবলম্বিগণ মৎস্য আহার করেন, কিন্তু মাংসভোজন অতিশয় নিষিদ্ধ মনে করেন। ধর্ম্মবুদ্ধির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মাংসভোজনও যেরূপ ও মৎস্য-ভোজনও সেইরূপ। মৎস্য খাইলে আমার ধর্ম্মের হানি হইবে না, মাংস খাইলে আমার ধর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে, এ এক অপূর্ব্ব যুক্তি। গোস্বামিমহাশয় বলেন, মানুষ গুরু নাই। গুরু একমাত্র পরমেশ্বর। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের মধ্যে গুরুবাদ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে তাঁহাদের মধ্যে গুরুবাদ প্রচার হইতেছে। তাঁহার "আশাবতীর উপাখ্যানে" ব্যাস ও ব্রাহ্মণসংবাদ গুরুবাদের সমর্থন করিতেছে। গোস্বামিমহাশয় তাঁহার শিষ্যদিগকে যে সাধনপ্রদান করেন, তাহা তাঁহারা অভ্রান্ত মনে করেন। এ অতি মারাত্মক কথা। গোস্বামি-মহাশয়কে প্রণাম করিলে, তাঁহার পদধূলিগ্রহণ করিলে এবং তাঁহার পায়ে মস্তক দিয়া পড়িয়া থাকিলে, আধ্যাত্মিক উপকার হয়, গোস্বামি-

মহাশয়ের শিষ্যগণ ইহা বিশ্বাস করেন। এই মত সম্পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। ইহা এক প্রকার নরপূজা। গোস্বামিমহাশয়ের নিকট রাধাকৃষ্ণের ছবি থাকে। রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকিলেও তাহা দ্বারা বৈষ্ণবসমাজের মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। সুতরাং তাহা একেবারে বর্জ্জন করা উচিত। গোস্বামিমহাশয় বলেন, ভগবান্‌কে কালী, দুর্গা, আল্লা, সকল নামেই ডাকা যায়। এ মত ব্রাহ্মগণ মারাত্মক মনে করেন। কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামের সহিত দেশপ্রচলিত পৌত্তলিকতা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। ঐ নাম উচ্চারণ করিলে সেই সকল প্রতিমাকে মনে পড়ে। সুতরাং ব্রাহ্মগণ ব্রহ্ম-নামের পরিবর্ত্তে কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌত্তলিক নাম ব্যবহার করিতে পারেন না।

"আমরা এই সকল কারণে গোস্বামিমহাশয়ের বর্ত্তমান মত ও সাধনপ্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মের অনিষ্টকারী মনে করি। ইহার কোন প্রকার প্রতিকার না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে।

"বিজয় বাবু বলেন, পরলোকগত সাধুগণ তাঁহার নিকট আগমন করেন। জীবিত সাধুগণ সূক্ষ্মদেহে এবং যোগবলে সদেহে তাঁহার নিকট আসিয়া থাকেন। একটি বৃক্ষ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই বৃক্ষে একটি আত্মা আছে। বৃক্ষের তলে কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে সে উদ্ধার হইয়া যাইবে। তাঁহার গুরুদেব তাঁহার নিকট আগমন করেন। একটি জন্মজড় বালক দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার দেহে একটি যোগিনী বাস করিতেছে; সে ছাড়িয়া গেলে এ ভাল হইবে। এ সকল তাঁহার কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক অবস্থাবশতঃ হয় কি না, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই দ্বার দিয়া অনেক কুসংস্কার ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারে।"

## গোস্বামিমহাশয়ের পদত্যাগপত্র।

সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে দিব্য চক্ষে দর্শন করা যায় এবং তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। তাঁহাকে নিয়ত দেখা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের দিব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা, এক কথায়, তাঁহাকে লাভ করিয়া নিয়ত তাঁহার সত্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সমস্ত কর্ম্ম করা ও জীবনযাপন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ।

১। ঐইরূপ ব্রহ্মলাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে হয় না। সম্পূর্ণ তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য সাধন-ভজন করিলে যথাসময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য তাঁহার চরণেই আমার ধর্ম্মজীবনের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত সাধনপথ অবলম্বনে গত কয়েক বৎসর চলিয়া আসিতেছি। পরমহংসবাবাজীর উপদেশ অনুসারে যোগপিপাসু ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থে উক্ত সাধনপথ তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছি।

২। এই সাধনে বাহিরের কিছুরই সহিত সংস্রব নাই। ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে কিছু দিনের জন্য ভূতশুদ্ধি করণোদ্দেশে অনেককে প্রাণায়াম করিতে হয়। কিন্তু উহা আমাদের সাধন নহে।

৩। এই জন্য সাধকমণ্ডলীর বহির্ভূত লোকদিগের সম্মুখে আমরা সাধন করি না। তাঁহারা ইহার ভিতরের তত্ত্বকথা কিছুই বুঝিবেন না, কেবল বাহিরের প্রাণায়ামটুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা হইলে তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অহংকার বা পাপাচার, পাপচিন্তা, পাপকল্পনা পর্য্যন্ত দ্বারা এ সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে।

৪। আমরা কোন সম্প্রদায়বিশেষ মানি না। হিন্দু পৌত্তলিক,

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃষ্টান, মুসলমান এবং ব্রাহ্মসমাজের লোক যে কেহ আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থী হন, তিনিই সাধন পাইতে পারেন। সাধনা করিতে থাকিলে তাঁহার সমস্ত ভ্রম, অজ্ঞানতা, পাপ, নীচতা ও কুসংস্কার ব্রহ্মকৃপায় দূর হইয়া তিনি পবিত্র হইবেন।

৫। ইহাতে গুরুবাদের লেশমাত্র নাই। ঈশ্বর স্বয়ং ইহার গুরু, আর সকলেই উপদেষ্টা ও তন্নিযুক্ত পথপ্রদর্শকমাত্র। যেমন তিনি বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, উপগ্রহ ও পর্ব্বত প্রভৃতি উপায়দ্বারা নানাভাবে শিক্ষা দেন, তদ্রূপ মনুষ্যরূপ উপায়দ্বারাও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। এই-জন্য আমরা সমস্ত পদার্থকে ও মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই এই যোগ শক্তি বর্ত্তমান আছে। এই যোগশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য এক জন জাগ্রত শক্তিশালী মনুষ্যের সাহায্য আবশ্যক এবং তদ্ভিন্নও নিতান্ত ব্যাকুলতা থাকিলে, অন্যান্য অবস্থাও ঠিক অনুকূল হইলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের শক্তিও লাভ করিতে পারেন; কিন্তু সেরূপ অবস্থা অতীব বিরল। সুতরাং মনুষ্যের সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। যেমন চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি ভগবান্ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যদি কোন কুটি পড়ে, তাহা অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না।

৬। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকেও প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা করা ধর্ম্মসঙ্গত। পদধূলি লওয়ার সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই। আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধূলি গ্রহণের ইচ্ছা হয়, সেই বিনীত অবস্থা অতি সুন্দর ও উপকারী। এইজন্য উপকার হইতেছে দেখিলে আমার পদধূলি লইতে বাধা দেই না। আমিও সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাকে যিনি যখনই প্রণাম করেন, তখনই আমি সেই প্রণাম সেই বিশ্বগুরুর প্রাপ্য, এই অর্থে

"জয় গুরু জয় গুরু" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকি। একটি প্রণাম স্বয়ং গ্রহণ করি না।

৭। আমরা অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন উচিত মনে করি না। তাহাতে নানা শারীরিক ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাহাতে আধ্যাত্মিক অবনতি হয়, একথাও সাধু মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন এবং তাহা পরীক্ষিতও হইয়াছে। তবে পিতামাতা গুরুজন যখন আদর করিয়া কিছু দেন, তাহা এবং যখন কোন শ্রদ্ধেয় মহাত্মার ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলিয়া মনে হয়, তাহা আহার করিলে হানি নাই; বরং উপকারই হইয়া থাকে। এ জন্য সকল সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক লোকের প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে করিয়া থাকি।

৮। দেবতার মন্দিরে কালী দুর্গা বা অন্য প্রতিমার সম্মুখেই যদি আমার ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয়, তবে সেইখানেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই ও আমার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া ও হয়ত সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া চরিতার্থ হই। আমার ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আমি যেখানেই তাঁহার দর্শন পাই, সেইখানেই মুগ্ধ হই। স্থানের বিচার থাকে না।

৯। কালী, দুর্গা সকল নামেই ভক্ত ভগবানকে ডাকিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ দেখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে আরাম হয়, তখন তাই বলিয়াই ডাকিয়া থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময়ে কোথাও এই সকল ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ করাও উপযুক্ত মনে করি না।

১০। রাধাকৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম্ম ও যোগপথের সহায় অন্য কোন ভাব নাই মনে করি। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্যদেবতা, পরমেশ্বর। এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আমি ঐ ভাবসাধনের চেষ্টা করি ও যাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিকভাবে উপকার পান, তাঁহাদিগকে লইয়া একত্রে রাধাকৃষ্ণের

গান করিয়া থাকি। তবে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার সময়ে কখন ঐ নাম গ্রহণ করি নাই এবং বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ করা উচিতও মনে করি না।

এই আমাদিগের যোগসাধনের সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা। ভিতরের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যের সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। যাহা সত্য বুঝিব, তাহাই অবনতমস্তকে অনুসরণ করিব এই জন্য এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসপ্রচারের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করেন বলিয়া, আমি উক্ত সমাজের সহিত সমস্ত বাহ্যিক সংশ্রব পরিত্যাগ করিলাম। আন্তরিক যোগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ব্ববৎ অক্ষুন্ন রহিল। কেবল প্রচারকপদ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি ধর্ম্মপ্রচারের সমস্ত কার্য্য আমার নিজের দায়িত্বে করিতে থাকিব। আমার একটি কথাও এখন অবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিয়া পরিগণিত না হউক।

আমি মনে করি যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর মধ্যেই এই সত্য লাভ করা যায়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। পরমেশ্বর এক, তাঁহার ধর্ম্মও এক। মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদ ও রুচি অনুসারে নানা প্রকার দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মে দল বা সম্প্রদায় নাই। আমি এই সারসত্য, অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছি এবং করিব। (১) আমি মনুষ্যসমাজের দাসানুদাস, কিন্তু কোন দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।

(১) এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম নহে। ইহা উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতির ধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত আছে।

দয়াময় প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন, এই সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিন প্রচার করিতে পারি।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রম, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৩ সন, ১৮০৮ শক।

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

পদত্যাগের সঙ্গে গোস্বামিমহাশয় ব্রাহ্মসাধারণের নিকট যে একখানি নিবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

## ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন

"যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। ইহাতে দলাদলি নাই। এই জন্য আমি যেখানে সত্য পাই এবং যাহা সত্য বুঝি, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে আমার কার্য্যে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহ্যিকসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দুসমাজ, খৃষ্টীয়সমাজ, মুসলমানসমাজ, আমি সকল সমাজের দাসানুদাস। আমার কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ সকল সম্প্রদায় আমার। যেখানে যতটুকু সত্য, সেইটুকু আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম। এখন হইতে এই সারসত্য সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব।

"এই অসীম বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দশান্তিমঙ্গলস্বরূপ, অজর, অমর, নিত্য, একমাত্র অদ্বিতীয়, পবিত্রস্বরূপ। তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার জড়ীয় রূপ নাই। তিনি সকলের স্রষ্টা, কোন সৃষ্ট বস্তুর মত তিনি নহেন। তিনি স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত তুলনা হয় না।

"তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, জগতে দুই জন ঈশ্বর নাই, তিন জনও নাই, অথবা অনেক ঈশ্বর নাই। যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকে, সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ডাকে। আর দ্বিতীয় যখন নাই, তখন অন্য ঈশ্বর কোথা হইতে আসিবে।

"পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। নানা দেশের লোকে আপন আপন ভাষায় তাঁহাকে এক একটি নাম করিয়া ডাকিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ম বল, আল্লা বল, খোদা বল, হরি বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল, কালী বল, দুর্গা বল; তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কেহ বলেন, লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে, এ কথা ঠিক নহে। কারণ হরি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর, এবং পাপহরণকর্ত্তা পরমেশ্বর এই সমস্তগুলি বুঝাইয়া থাকে। কেহ যদি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া হরি বলিয়া গদ্‌গদভাবে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রুপাত করে, তখন এমন লোক কেহ নাই যে বলিবে, এ লোকটা বানর প্রভৃতি পশুগুলাকে ডাকিয়া কাঁদিতেছে। বিশেষতঃ মনুষ্যের ভ্রম হইলেই বা ক্ষতি কি? আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা মনুষ্য নহেন। আমার দেবতা অন্তর্য্যামী; তিনি জানিলেই হইবে। তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ কর, সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামেই ডাকুক, তাহাতে আপত্তি কি?

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই। এজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দরূপ আছে (১)

(১) ব্রাহ্মগণ ভগবানের বিগ্রহ বা স্বরূপ মানেন না। তাঁহারা নিরাকারের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, আমাদিগের শাস্ত্রকর্ত্তাগণ সেরূপ করেন নাই। ব্রাহ্মদিগের নিরাকার ব্রহ্ম হইতে শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঋষিরা নিরাকার অর্থে শূন্য পদার্থ বুঝিতেন না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, অনন্ত, অসীম ভগবান্‌কে বুঝিতেন। আমাদের বেদ-পুরাণ-স্মৃতি-তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র একবাক্যে

যাহা জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা যায়। যেমন জ্ঞানচক্ষু আছে, সেইরূপ জ্ঞান-কর্ণ আছে, জ্ঞাননাসিকা, জ্ঞানরসনা আছে; যাহাতে শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন অনুভব হয়। জ্ঞানচক্ষে, ইহলোকে ও পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধনদ্বারা জ্ঞানচক্ষু বিকশিত করা হয়। যাঁহার শরীর, আত্মা নির্ম্মল, তাঁহার আপনাআপনি জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইতে পারে; অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক, তাঁহার প্রদত্ত মানবীয় ধর্ম্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য ধর্ম্মের দল নাই, সম্প্রদায় নাই। মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদে দলাদলির সৃষ্টি হয়। প্রকৃত ধর্ম্মে দল নাই।

বলিতেছেন যে ভগবানের মূর্ত্তি আছে। তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, প্রভৃতি অবয়ব আছে, তবে তাহা সচ্চিদানন্দময়। ভগবদ্বিগ্রহ জড়ীয় নহে, প্রাকৃত নহে; তাহা অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। এই জন্যই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ তাঁহাকে নিরাকার বলিয়াছেন। আকার বলিলেই আমরা জড় বুঝি; কিন্তু ভগবান্ জড় নহেন, চিন্ময়। ব্রাহ্মগণ জড়ের দৃষ্টান্ত চৈতন্যে প্রয়োগ করিয়া প্রাকৃতের ধর্ম্ম অপ্রাকৃতে আরোপ করিয়া বলেন যে অনন্ত, অসীম, সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্ম সাকার হইতে পারেন না। সাকার হইলে তিনি সান্ত ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়েন। ভগবান্ জড় পদার্থের সমষ্টি হইলে এই প্রকার হইবারই কথা। কিন্তু তিনিত জড় নহেন। সুতরাং জড়ের ধর্ম্ম, জড়ের দৃষ্টান্ত, তাঁহাতে আরোপিত ও প্রযুক্ত হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ চৈতন্যপদার্থের কিছুমাত্র সন্ধান পান নাই বলিয়াই এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অপর সকল দেশের সমস্ত সাধুভক্ত ও মহাজনগণ ভগবানের বিগ্রহ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থেও ভগবানের বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত শাস্ত্রগ্রন্থসকল মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার কথার সাক্ষ্যপ্রদান করিবেন। যাঁহারা বাস্তবিক সাধক, সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক প্রণালীমত সাধনভজন করিয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছেন, দিব্যদৃষ্টিলাভ করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত চিন্ময়মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সমস্বরে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া গিয়াছেন।

"ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিলে, তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা যায়। আমি যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাসি, তাহা হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করেন, তিনিই আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু। এজন্য যেখানে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা হয়, সেই স্থানেই গমন করি। যেখানে তাঁহার নাম কীর্ত্তন হয়, সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করি। আমার প্রভুকে পূজা করিতেছে, কত আনন্দ; আনন্দ ধরে না। এজন্য শাক্ত শৈব, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান সকল স্থানে প্রভুকে অন্বেষণ করি। কত বৃক্ষতলে, কত পর্ব্বতে, নদীগর্ভে, দেবমন্দিরে, মস্‌জিদে, গির্জ্জায়, আমার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

"আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ একটি আধ্যাত্মিক রূপক। উপাসনা ও যোগের এরূপ উচ্চভাব আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্যদেবতা, পরমেশ্বর। বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ

যাহারা শাস্ত্র মানেন না, সদাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন না, গুরুকরণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, কতকগুলি মনমুখী মতকে ধর্ম্ম মনে করিয়া তাহার অনুসরণ করেন, তাঁহারাই ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ না হইয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অপ্রাকৃত তনু, চিন্ময় স্বরূপ মানিতে চাহেন না। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণঃ নিত্যঃ শরীরীচ তস্য তেজোহি বর্ত্ততে। তেজোহভ্যন্তর এবাহ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ॥ ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে তত্তেজো ভক্তিপূর্ব্বকং। সুপক্ক—ভক্ত্যা কালেন যোগীচ বৈষ্ণবো ভবেৎ॥ তেজোহভ্যন্তররূপ চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা। দাসানাং চ কুতো দাস্যং বিনা দেহেন নারদ॥"

এই স্থানে ভগবানের দেহের কথা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।

আমাদের ভক্তির পাত্র। উপাসনাকালে ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে দর্শন করা যায়।

"পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জল, বায়ু, অগ্নি, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলের মধ্য দিয়া সেই জগদ্‌গুরু শিক্ষা দিতেছেন! যখন যে বস্তুর মধ্যে শিক্ষা পাই, সেই বস্তুকেই ভালবাসি, ভক্তি করি। পিতা, মাতা, উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করা প্রয়োজন। তাঁহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে ধর্ম্মলাভ হয়। কোন মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে কি তাঁহার অবতার কি মধ্যবর্ত্তীরূপে প্রার্থনা করিলে অধোগতি হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে নরনারীমাত্রেরই পদধূলিগ্রহণ করা বিশেষ উপায়।

"অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্ম্মের অঙ্কুর বাহির হয় না। পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞানপ্রেমশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার জ্ঞানপ্রেমশক্তির যোগ করাকেই যোগসাধন বলে। এই যোগসাধন করিলে মনুষ্যের দিব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না; এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন,

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার নিবাস,
৩১শে বৈশাখ, ১৮০৮ শক।

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গোস্বামিমহাশয়ের পদত্যাগ পত্র ও সব কমিটির মন্তব্য প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে মীমাংসা করেন, তাহার অবিকল নকল নিম্নে প্রদান করিলাম:—

## কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মীমাংসা

"স্থির হইল যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি।

১। গুরুর আবশ্যকতা অর্থাৎ গুরুর সাহায্য ব্যতীত নিজের চেষ্টা ও প্রার্থনাদ্বারা ঈশ্বরের শক্তিলাভ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল, এই মত।

২। ঈশ্বরে চিত্ত অর্পিত থাকিলেও দেবমন্দিরে ও দেবমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম ও গড়াগড়ি দেওয়া।

৩। নিজের উপাসনাকালে অথবা অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রকাশ্য উপাসনাকালে কালী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির নামগ্রহণ।

৪। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও লীলাসংক্রান্ত গীত সকল ধর্ম্মসাধন স্থলে গান করা এবং রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদিগের লীলাবিহারসংক্রান্ত ছবি সকল উপাসনা স্থলে রক্ষা করা। কোন প্রকারে ঐ সকল গান ও ছবির আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটাইতে পারিলেও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়।

৫। যে প্রণালীতে ও যে যে নিয়মে গোস্বামিমহাশয় দীক্ষা দিতেছেন, সেই প্রণালী ও সেই সকল নিয়ম।

৬। কোন কোন মত বা আচরণ, কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তিবিশেষের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার না করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, এই মত।

৭। কোন ব্যক্তিবিশেষের পদধূলির কিছু আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য আছে, এরূপ জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করা, কি তাহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হওয়া কিম্বা পদধূলি দ্বারা অপরের আধ্যাত্মিক কি শারীরিক যাতনা

নিবারণের সাহায্য হইতে পারে, এই বিশ্বাসে অপরের অঙ্গে তাহা মাখাইয়া দেওয়া।

অতীব আপত্তিযোগ্য এবং তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সকল মত বা আচরণ অবলম্বন করিয়াছেন; কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগ্রহ ও সদ্ভাবের সহিত তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা একবার ঐ সকল মত ও আচরণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন এবং তদ্দ্বারা কত অনিষ্ট ঘটিবে ও ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মতসকলের ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যের কিরূপ উচ্ছেদসাধন করিবে, তাহা অনুভব করিয়া এ গুলিকে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য বাধা দিবার উপায় করুন।

( ২ )

তাঁহাদের ( সভার ) সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিমহাশয় দ্বিতীয় বার পদত্যাগ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গভীর দুঃখের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। তিনি অনেক পরীক্ষা ও যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের যে সেবা করিয়াছেন, সে সেবার মূল্য নাই। তাহার জন্য উক্ত সভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন এবং আগ্রহ ও প্রীতির সহিত অনুরোধ করিতেছেন যে তিনি একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ। তাঁহার বর্ত্তমান মত ও কার্য্যের প্রকৃতি কিরূপ এবং তাহার কিরূপ ফল দর্শিবে। পূর্ব্বোক্ত যে যে প্রস্তাব কমিটি একবাক্যে নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহার সহিত মিলাইয়া ঐ সকল বিষয়ে চিন্তা করুন। সভ্যগণ ব্যাকুলান্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে তাঁহাদের ভক্তিভাজন প্রচারক ভ্রাতা যেন সত্বর আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্ত হইতে

পারেন এবং যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি স্বার্থবিসর্জ্জন দিয়া যাবজ্জীবন নিযুক্ত আছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত যেন পুনরায় আপনার অগ্নিময় উৎসাহ বল ও চরিত্রের সাধুতা নিয়োগ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা আরও আশা করেন যে তাঁহার সহিত প্রচারকের সম্বন্ধ রহিত হইলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে, তাহা চিরদিন প্রবল থাকে।"

সব কমিটির মন্তব্যের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে যে "বিজয় বাবু বলেন, পরলোকগত সাধুগণ তাঁহার নিকট আগমন করেন। জীবিত সাধুগণ সূক্ষ্মদেহে এবং যোগবলে সদেহে তাঁহার নিকট আসিয়া থাকেন। একটি বৃক্ষ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে বৃক্ষে একটি আত্মা আছে; বৃক্ষতলে কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে সে উদ্ধার হইয়া যাইবে। তাঁহার গুরুদেব তাঁহার নিকট আগমন করেন। একটি জন্মজড় বালক দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার দেহে একটি যোগিনী বাস করিতেছে, সে ছাড়িয়া গেলে এ ভাল হইবে। এ সকল তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থাবশতঃ হয় কি না, তাহা বলিতে পারি না।" সব কমিটিপ্রোক্ত "শারীরিক ও মানসিক অবস্থাবিশেষ" শব্দ কয়েকটির মধ্যে একটু বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ আছে। সে কটাক্ষটি এই যে গোস্বামিমহাশয় হৃদ্‌রোগের জন্য মর্‌ফিয়া সেবন করিতেন। এই মর্‌ফিয়া সেবন করাতে তাঁহার "শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষ" উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি দর্শনাদির কথা বা মহাত্মাদিগের আগমনের বিষয় যাহা বলেন, তাহা সত্য নহে; বাস্তবিক সে সকল কিছুই ঘটে না। মরফিয়া সেবনজনিত "শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষ" দ্বারা তিনি নানা প্রকার খেয়াল দেখিয়া থাকেন! সাম্প্রদায়িকতায় মানুষের কি সর্ব্বনাশই না করে। ব্রাহ্মগণ সম্প্রদায়ের কুহকে পড়িয়া

তাঁহাদের এত কালের ধর্ম্মবন্ধুর সত্যবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না। "শারীরিক ও মানসিক অবস্থাবিশেষ" বলিয়া ইঙ্গিতে বিদ্রূপ করিলেন। জিজ্ঞাসা করি, "শারীরিক ও মানসিক অবস্থাবিশেষ-দ্বারা" অপর লোকের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইতে পারে কি? গোস্বামিপাদ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া যে দেবদুর্ল্লভ অবস্থালাভ করিয়াছিলেন, তাহা যদি মরফিয়া সেবনের ফল হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপিপাসু মানবমাত্রেরই মরফিয়া সেবন করা উচিত। কেননা ধর্ম্মলাভের এ প্রকার সহজ ও সুলভ উপায় পরিত্যাগ করা কোন বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য নহে।

গোস্বামিমহাশয় যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, সেই সময় হইতেই তিনি মরফিয়া সেবন করিতেন। মরফিয়া সেবন করিতে আরম্ভ করিবার পরও তিনি বহুকাল ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন। কই সে সময়ে ত তাঁহার "শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষ" উৎপন্ন হয় নাই। ব্রাহ্মগণ ত কখনও সে কথা বলেন নাই। যোগমার্গে প্রবেশ করিয়া যখন তিনি সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরে উঠিয়া গেলেন, ব্রাহ্মসমাজের কল্পনার ধর্ম্মে যখন তাঁহার অনাস্থা উপস্থিত হইল, যখন তিনি ধর্ম্মাবহ ভগবানকে পাইয়া ব্রহ্মবিদ্ হইলেন, ব্রাহ্মগণের সহিত যখন তাঁহার মতপার্থক্য উপস্থিত হইল, তখনই তাঁহার "শারীরিক ও মানসিক অবস্থাবিশেষ" উৎপন্ন হইল। দলের কি অপূর্ব্ব মহিমা! সাম্প্রদায়িকতার মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ হইলে কি দুরবস্থাই ঘটে? (১)

(১) এইস্থানে একটি হাস্যোদ্দীপক কৌতুকাবহ কথার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ব্রাহ্মদের মধ্যে যাহারা গোস্বামিপাদের উচ্চতম ধর্ম্মভাবকে "শারীরিক ও মানসিক অবস্থাবিশেষ" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কোন আত্মীয়

ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে এইরূপ নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হন নাই। ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ লক্ষ্য লইয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কোন দিনই পরিত্যাগ করেন নাই। কঠোর সাধন করিয়া তিনি ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন সেই অনন্ত পুরুষকে পাইলেন, তখন তাঁহার অনন্তরূপে অনন্ত-ভাবে অনন্ত লীলায় একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। নিন্দাকারী তাঁহার সেই উচ্চ ভাব বুঝিতে পারিবেন কেন? তাঁহারা ত তাঁহার ন্যায় প্রণালীমত তপস্যা করিয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রের দুই পাঁচটি কথামাত্র তাঁহাদের পুঁজি। তাহাই লইয়া তাঁহারা নাড়াচাড়া করেন, কেবল তাহারাই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। দলের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিলে ধর্ম্মলাভ করিতে পারা যায় না। ভগবান্ গোস্বামিপাদকে গণ্ডি হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিখিল সত্যের আকর ও অনন্ত তত্ত্বের খনি ভগবান্‌কে লাভ করিয়া জগতে অনেক নূতন সত্য ও অভিনব তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিলে তিনিও নিন্দাকারিগণের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহাদের মত একই কথা চিরদিন বলিতেন।

গোস্বামিমহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কার্য্য পরি-

পরলোক গত হইলে তাঁহারা প্রভুপাদের কাছে আসিয়া সেই আত্মীয় পরলোকে কোথায় কি ভাবে আছেন জিজ্ঞাসা করিতেন। তদুত্তরে গোস্বামিপাদ যদি বলিতেন যে পরলোক-গত ব্যক্তি উন্নত লোকে ভাল অবস্থায় আছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। ইহার বিপরীত কথা শুনিলে তাঁহারা অত্যন্ত বিষন্ন হইতেন। আমার সাক্ষাতেই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

ত্যাগ করিলেন, অতএব তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে অর্থসাহায্য পাইতেন, এখন আর তাহা পাইবেন না; ইহাতে তাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হইবে; এই মনে করিয়া তাঁহার কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে আপনি ত ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িলেন, এখন আপনার সংসার চলিবে কিরূপে? এই কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন :— "আমি মানুষের মুখাপেক্ষী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই। আমি যখন ব্রাহ্ম হইয়াছিলাম, তখন একটি ব্রাহ্মপরিবারও ছিল না। তখন আমার ব্যয়ভার কে বহন করিয়াছিল? আমি চিরকালই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছি। এখনও তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া চলিব। সমুদ্রগর্ভস্থ প্রাণীর যিনি আহার যোগাইয়া থাকেন, আমি তাঁহারই হস্তে আমার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। মানুষ মানুষকে খাওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ ভুল। একমাত্র ভগবান্‌ই সকলকে অন্নবস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন। তিনিই একমাত্র অন্নদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি চিরদিন তাঁহাতেই নির্ভর করিয়া চলিতে পারি।"

গোস্বামিমহাশয় সাধারণব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলে সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে মাসিক বিশ টাকা পেন্‌সন্ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিক দিন তাঁহারা সে কথা রক্ষা করেন নাই। কয়েক মাস দিয়াই তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। (১)

প্রভুপাদের উপর শাস্ত্রিমহাশয়ের যে বদ্ধমূল অসদ্ভাব ছিল, ইতি-

(১) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ লোকই গোস্বামিপাদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। অনেকে তাঁহার নাম শুনিলে জ্বলিয়া যাইতেন। তিনি যখন হেরিসন রোডে ছিলেন। সেই সময়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভুপাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া অনেক সময়ে

হাসের পৃষ্ঠায় তিনি তাহার স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বপ্রণীত "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত" নামক পুস্তক হইতে গোস্বামিপাদের নাম মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যে লোক-সমাজে তিনি তাঁহার নিজের সম্মান ও প্রতিপত্তিকে অত্যন্ত আহত করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে গোস্বামিপাদের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

---

যাইতেন, কিন্তু কখনও প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। সাক্ষাৎ ত দূরের কথা, পাছে তাঁহাদের অক্রূর শত্রুর মুখ দেখিতে হয় এই ভয়ে তিনি ছত্র আড়াল দিয়া বিপরীত ফুটপাতে যাইতেন। গোস্বামিপাদের ভাব কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## দ্বারভাঙ্গায় গমন

সাধারণ সমাজের সহিত সম্বন্ধত্যাগ করিয়া গোস্বামিপাদ ঢাকায় চলিয়া গেলেন। সাধারণ সমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও ঢাকার পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রহিল। সাধারণ ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও ঢাকার ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে ছাড়িলেন না। তিনি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তথাকার প্রচারনিবাসে বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রচারনিবাসে অবস্থানসময়ে তথায় অনুক্ষণ এক প্রবল ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইত। সৎপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রচর্চ্চা, ধর্ম্মালাপ, হরি-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি সর্ব্বদাই হইত। ভক্তিদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া নিয়ত তথায় বাস করিতেন। প্রচারনিবাসের বাতাসও ভক্তি ও ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে বায়ু যাহার গায়ে লাগিত, তাহারই প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিত; অন্তরে ভক্তির তরঙ্গ উত্থিত হইত। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাও অত্যন্ত সরস ও সুন্দর হইত। মন্দিরে বিস্তর লোকসমাগম হইত। সমাজগৃহে লোক ধরিত না। ব্রাহ্ম ব্যতীত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিস্তর লোক সমাজে আসিতেন। গোস্বামি-মহাশয় যখন বেদীতে বসিয়া ভক্তিগদগদ-বাক্যে জগজ্জননীকে আহ্বান করিতেন তখন উপাসকগণ ভক্তিতে গলিয়া যাইতেন। তাঁহাদিগের নয়ন হইতে অবিরলধারায় অশ্রুবারি বিগলিত হইত। মন্দিরের এক

প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আকুলক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়া ব্রহ্মমন্দিরকে ত্রিদিবধামে পরিণত করিত। গোস্বামিমহাশয় যখন প্রাণস্পর্শী সুমধুর উপদেশ প্রদান করিতেন, তখন সকলের প্রাণ ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং তাঁহাদের ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চিত হইত।

সাধনপ্রাপ্ত শিষ্যগণ অধিকাংশ সময় গোঁসাইবাড়ীতে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সে বাড়ী ছাড়িতে পারিতেন না। বিষয়কর্ম্মের সময় বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্মস্থানে যাইতে হইত, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রাণ গোস্বামিমহাশয়ের নিকট পড়িয়া থাকিত। তাঁহারা কোনরূপে কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ করিয়াই গোঁসাইবাড়ীতে ছুটিয়া আসিতেন। অনেকের কর্ম্মস্থানের পরিচ্ছদত্যাগ করিবারও ভর সহিত না। তাঁহাদিগের মনোভৃঙ্গ পরিমললোভে গোস্বামিপাদের চরণপদ্মের চারিদিকে নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইত। চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ যেমন তাহাতে গিয়া সংলগ্ন হয়, শিষ্যগণও গোঁসাইবাড়ীর দিকে সেইরূপ আকৃষ্ট হইতেন। গৃহে যুবতী স্ত্রী পড়িয়া থাকিত, তাঁহারা বিনা বিছানায় সামান্য একটি মাদুর বা একখানি চাটাইতে শুইয়া রাত্রিযাপন করিতেন।

গোস্বামিপাদ প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শিষ্যগণের সহিত বসিয়া সাধন করিতেন। প্রতিদিন সায়ংকালে তাঁহার আশ্রমে কীর্ত্তন হইত। সে সংকীর্ত্তনে ভাবের স্রোত বহিয়া যাইত। তিনি যখন ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য ও উচ্চনাদে হরিধ্বনি করিতেন, তখন কীর্ত্তনস্থলে প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া সকলকে ডুবাইয়া দিত। সে নৃত্যের, সে হরিধ্বনির উপমা মিলে না। কেবল গোরাচাঁদের কীর্ত্তন, গৌরাঙ্গসুন্দরের নৃত্য ও হরিধ্বনির সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নদিয়াবিহারী যেরূপ নৃত্য; যে প্রকার হরিধ্বনি দ্বারা বঙ্গ ও উৎকলবাসিগণের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন, প্রভুপাদের নৃত্য ও হরিধ্বনি সেইপ্রকার বাঙ্গালার নরনারীগণের প্রাণে সুখ ঢালিয়া দিত। সেই কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইলে স্বতঃই শ্রীবাস-প্রাঙ্গনের কথা স্মরণ হইত। কীর্ত্তনসময়ে প্রভুপাদের দেহে যখন সাত্ত্বিক ভাবাবলি প্রকাশ পাইত, তখন মনে হইত ত্রিতাপদগ্ধ জীবের উপর কৃপা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝি আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। গোস্বামিপাদের সেই সুন্দর মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। অতি বড় বিষয়ী লোকও কিছুকালের জন্য বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবগণ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিতেন, ইনি সাক্ষাৎ অদ্বৈত প্রভু। জীবউদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন; নতুবা জীবে কি এরূপ অবস্থা সম্ভব? কেহ কেহ এ কথাও বলিতেন যে ইনি স্বয়ং শচীনন্দন; সংসারের দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই, তাই আবার আসিয়াছেন।

বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। ঢাকাতে অনেক মুসলমান ফকীর আছেন, তাঁহারাও সর্ব্বদা গোস্বামিমহাশয়ের নিকট আগমন করিতেন। এইরূপে তাঁহার আশ্রমে ধর্ম্মের একটা একটানা স্রোত সর্ব্বদা প্রবাহিত হইত। হরিনামের উত্তালতরঙ্গে আশ্রমস্থ নরনারীগণ হাবুডুবু খাইতেন। সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তরূপ নদনদীসকল প্রাণের টানে ছুটিয়া আসিয়া গোস্বামিপাদরূপ প্রশান্ত সমুদ্রে বিশ্রাম ও শান্তিলাভ করিত। প্রভুপাদ সর্ব্বদা আনন্দবাজার বসাইয়া সকলকে বিমল আনন্দদান করিতেন।

একবার তিনি কিছুদিনের জন্য বাগেরহাট, বরিশাল ও মাদারিপুর

অঞ্চলে গমন করেন। তাঁহার পদার্পণে সে প্রদেশ ভক্তির স্রোতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে স্থানে গমন করিতেন, সেইস্থানেই হরিনামের, সংকীর্ত্তনের, ধর্ম্মালাপের এবং শাস্ত্রচর্চ্চার মহোৎসব লাগিয়া যাইত। জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইয়া হৃদয় সুশীতল করিত। মৃদঙ্গ ও করতালের সহিত মধুর হরিসংকীর্ত্তন সকলকে ভাবের অমৃতসাগরে নিমগ্ন করিত। তাহার উপর আবার তাঁহার সুন্দর নৃত্য, হরিনামের মধুমাখা উচ্চধ্বনি। মনে হইত, এই ত' বৈকুণ্ঠ।

গোস্বামিমহাশয় বরিশাল ও মাদারিপুর গমন করিলে সেখানকার অনেকগুলি নরনারী তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, ৺গোরাচাঁদ দাস এবং লাখুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়ের সন্তানগণ তাঁহার নিকট সাধনপ্রাপ্ত হন। মাদারিপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর স্বর্গীয় দ্বারকানাথ রায় মহাশয় তাঁহাকে রাজোচিত অভ্যর্থনাসহকারে গ্রহণ করেন। প্রধানতম বা প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণের আগমনে যেরূপ আদর অভ্যর্থনার আয়োজন হয়, দ্বারিবাবু প্রভুপাদকে সেই প্রকার আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

এইরূপে বাগেরহাট, বরিশাল, মাদারিপুরবাসিদিগের ধর্ম্মপিপসার শান্তি করিয়া তিনি ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দের মে মাসে শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগ্‌ছি, ৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও ৺শ্রীধর ঘোষকে সঙ্গে লইয়া তিনি বেহার অঞ্চলে গমন করেন এবং নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া শেষে দারভাঙ্গায় উপনীত হন। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালী বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে সেই সময়ে এই স্থানে বাস করিতেন। রাধাকৃষ্ণ

বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত গোস্বামিমহাশয়ের এবং তাঁহার পরিজনগণের বহুকাল হইতে অত্যন্ত প্রণয় ও সদ্ভাব ছিল। ইঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এত অধিক ছিল যে এক পরিবারের লোক অন্য পরিবারস্থ লোকদিগকে ভিন্ন মনে করিতেন না। উভয় পরিবারের স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইয়া যেন এক পরিবার হইয়া গিয়াছিল। গোস্বামিমহাশয় দ্বারভাঙ্গায় গিয়া রাধাকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করেন।

এক দিন শ্রীধর বেড়াইতে বেড়াইতে নগরের বাহিরে চলিয়া যান। সেখানে একটি সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুর গায়ে একখানি কাল কম্বল। সাক্ষাৎ হইবামাত্র উভয়েই প্রেমে মগ্ন হইলেন। যেন কতকালের আলাপ। বাবাজী এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া শ্রীধরকে অর্দ্ধেক দিলেন, আপনি অর্দ্ধেক খাইলেন। অর্দ্ধঘণ্টাকাল সৎপ্রসঙ্গ ও আনন্দে কাটাইয়া সাধু চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আর ভালবাসার চিহ্ন কিছুই দেখা গেল না। অর্দ্ধঘণ্টাকাল কত ভালবাসা, কত আত্মীয়তা, কিন্তু যাইবার সময় একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। শ্রীধর আসিয়া গোস্বামিমহাশয়কে সমস্ত বলিলেন। শ্রীধরের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, কালকম্বলগায়ে গুরুপ্রসাদ দাস বাবাজি আমার গুরুভাই। আরও বলিলেন, সাধুদের দয়া থাকে, মায়া থাকে না। একবার এক জন সাধু পথিমধ্যে একজন পীড়িত লোককে দেখিতে পাইয়া অতি যত্নপূর্ব্বক তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিলেন। পীড়া উপশম হইবামাত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার তখনকার ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার মধ্যে মায়ার লেশমাত্র নাই। যতক্ষণ কাছে ছিলেন, কর্ত্তব্যবোধে সেবা ও যত্ন করিলেন। তাহার পর যখন পীড়া আরোগ্য হইল, তখন বিশ্বজননীর

তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে প্রস্থান করিলেন। তিনি জানেন, ভগবান্‌ই সকলের রক্ষাকর্ত্তা ও পালয়িতা।*

এখানে কিছুদিন বাস করিবার পর জুলাইমাসে গোস্বামিমহাশয় অত্যন্ত পীড়িত হন। পীড়া—দুই পঞ্জরের মধ্যস্থলে পেটের উপরে উৎকট বেদনা। এই বেদনায় তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিল। হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যতীত অন্য ঔষধ, খাইতে তিনি সম্মত হইলেন না। দারভাঙ্গার ডাক্তার নবীনচন্দ্র দত্ত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন তাঁহার চিকিৎসা চলিল, কিন্তু কিছুই উপকার বুঝা গেল না। তখন সমস্তিপুর হইতে ডাক্তার নগেন্দ্র বাবুকে আনা হইল। তিনি রোগনির্ণয় করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার ঔষধে কিছুই উপকার হইল না। গোস্বামিমহাশয়ের অন্যতম শিষ্য বাঁকিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া মধু বাবু নামক এক জন ডাক্তার পাঠাইয়া দিলেন। তিনি রোগ চিনিতে পারিলেন না। অতঃপর বাঁকিপুরের অন্য ডাক্তার পরেশ বাবু আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। গোস্বামিমহাশয়ের শরীর দিন দিনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। ৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৺শ্রীধর ঘোষ প্রভৃতি শিষ্যগণ পীড়ার সময়ে তাঁহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বহস্তে তাঁহার মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন। শ্যামাকান্ত বাবুর সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া গোস্বামিমহাশয় এক দিন বলিয়াছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় আমার পিতা। পিতা যেমন স্নেহের সহিত সন্তানের সেবা করে পণ্ডিত মহাশয়ও ঠিক সেই ভাবে আমার সেবা করিয়াছেন। তাঁহার এ ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না।

* মোজাফরপুরের উকিল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত হইতে সংগৃহীত। তিনি তখন দারভাঙ্গায় ছিলেন।

পীড়ার অবস্থা দিন দিনই মন্দ হইতে লাগিল। তখন সকলেই যারপরনাই ভীত হইলেন। ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে সংবাদ প্রেরিত হইল। নানা স্থান হইতে পত্র ও টাকা আসিতে লাগিল। চিকিৎসার জন্য শিষ্যগণ প্রায় সাত আট শত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে অনেক সাধুসন্ন্যাসী গোস্বামিমহাশয়কে দেখিতে আসিতেন। এক দিন প্রাতঃকালে জ্ঞানবাবু বাহিরে যাইয়া বারাণ্ডার বেঞ্চির উপরে গৌরবর্ণ এক জন সাধুকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তাঁহার পরিধানে একটি আলখোল্লা এবং হস্তে একখানি আশা বা সাধুদের ভরদিয়া বসিবার কাষ্ঠদণ্ড। জ্ঞানবাবু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মন উদ্বিগ্ন থাকাতে তাঁহার সহিত কোন কথা বলিলেন না। সাধু প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল উপবিষ্ট থাকিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর হইতেই গোস্বামিমহাশয়ের পীড়ার উপশম হইতে লাগিল। সমস্ত দিনে পীড়া প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় জ্ঞানবাবু গোস্বামি-মহাশয়কে বলিলেন, আজি প্রাতে এক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। অসুখ বেশী বলিয়া আপনার নিকট আসিতে বলি নাই। গোস্বামি-মহাশয় বলিলেন, হাঁ আজ পরমহংসজী আসিয়াছিলেন। সময় হয় নাই বলিয়া তিনি তোমাদের নিকট পরিচয় প্রদান করেন নাই। মাতা-ঠাকুরাণী এবং যোগজীবন প্রভৃতিকে দ্বারভাঙ্গা আসিবার জন্য আরে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়াই যে দিন তাঁহারা আসিলেন, সেইদিনই গোস্বামিমহাশয় অন্নপথ্য করিবেন। মাতা-ঠাকুরাণী পথ্য রন্ধন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই গোস্বামিমহাশয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই পীড়াতে ইহাই দেখা গেল যে মানুষের কোন ক্ষমতা নাই। ভগবানের

ইচ্ছাতেই সমস্ত হয়। পীড়ার সময়ে গোস্বামিমহাশয় যে বলিতেন, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে" তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। ডাক্তার, বৈদ্য সহস্র চেষ্টা করিয়াও পীড়ার কিছুই করিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন আরাম হইবার, তখন আপনিই আরাম হইল।*

দারভাঙ্গার পীড়াসম্বন্ধে গোস্বামিমহাশয় এক দিন বলিয়াছিলেন, "ডাক্তারগণ যে দিন আমার মৃত্যু হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই আমার পীড়া কমিতে লাগিল। সে সময়ে রাধাকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ হইত। সে দিন রবিবার। আমি যে ঘরে শুইয়া ছিলাম, তাহার পাশের ঘরে সকলে উপাসনা করিতে বসিলেন। আমি পীড়িত বলিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে সংক্ষেপে উপাসনা শেষ করিয়া আস্তে আস্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের শব্দ কানে আসিবামাত্র আমার রোগ, শরীরের অবসাদ ও দুর্ব্বলতা কোথায় চলিয়া গেল। আমার দেহে সিংহের বল আসিল। যে আমি পাশ ফিরিয়া শুইতে পারি না, সেই আমি ভাবে বিভোর হইয়া এক প্রবল শক্তির বলে ছুটিয়া কীর্ত্তনস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আত্মহারা হইয়া খুব নাচিলাম। সকলে ত দেখিয়া অবাক্। আমার নৃত্য দেখিয়া তাঁহাদের মনে ভয় হইয়াছিল যে নৃত্যের পরিশ্রমে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িব, এবং তাহাতে আমার বড়ই ক্ষতি হইবে; এমন কি আমার জীবন লইয়াও টানাটানি হইতে পারে। কীর্ত্তনান্তে যখন তাঁহারা দেখিলেন, তাহার কিছুই হইল না, তখন তাঁহারা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সেই যে আমি

* জ্ঞানবাবুর নিকট হইতে সংগৃহীত। পীড়ার সময়ে জ্ঞানবাবু দারভাঙ্গায় ছিলেন এবং প্রাণপণে গোস্বামিমহাশয়ের সেবা করিয়াছিলেন।

উঠিয়া বসিলাম, আর শুইলাম না। আমার পীড়া আরোগ্য হইয়া গেল। আমি মারা গিয়াছি মনে করিয়া ডাক্তারগণ ভয়ে ভয়ে বাড়ী ঢুকিয়া যখন দেখিলেন, আমি বসিয়া আছি, তখন তাঁহাদের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহারা আমাকে বলিলেন, আপনি আমাদের অহংকার চূর্ণ করিয়াছেন। আমরা যে চিকিৎসাবিদ্যার বড়াই করি, তাহা সর্ব্বৈব ভুল। আপনার পীড়াতে আমাদের এই শিক্ষা হইল যে মানুষের কিছুই ক্ষমতা নাই; সমস্তই ভগবানের ইচ্ছায় হইতেছে।"

গোস্বামিপাদের প্রথম আরোগ্যস্নানের সময় শান্তিসুধা পিতার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি এক দিকে চাহিয়া ব্রহ্মচারী বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কন্যার চীৎকার শুনিয়া প্রভুপাদ তাহাকে চুপ করিতে বলিলেন। শান্তিসুধা বারদীর ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আর কখনও ব্রহ্মচারীকে দেখেন নাই। পরে দেখিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় লিঙ্গদেহে সেইস্থানে গিয়াছিলেন। প্রভুপাদ শান্তিসুধাকে এ ঘটনা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

পীড়াশান্তির দুই তিন দিন পরেই তিনি দারভাঙ্গা হইতে চলিয়া আসিলেন। পরমহংসজী তাঁহার সঙ্গে আসিয়া ছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে হিন্দুস্থানী মহাজনদিগের পরিচ্ছদ পরিয়া পার্শ্বের গাড়িতে ছিলেন। প্রভুপাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এখন লিচু না খাইয়া চলিয়া আসিলাম, হয় ত মোজাফরপুরের লিচু খাইবার জন্য লিচুর পোকা হইয়া জন্মাইতে হইবে। তাঁহার কথা শুনিয়া পরমহংসজী হাসিয়া বলিলেন, মহারাজ! লিচু খাইবে? প্রভুপাদ স্মিতমুখে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন। তখন পরমহংজী তাঁহার জামার পকেট হইতে অজস্র লিচু বাহির করিয়া

সমস্ত লোককে দিতে লাগিলেন। সকলে পেট ভরিয়া খাইলেন। ক্ষুদ্র পকেট হইতে রাশীকৃত লিচু বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই যারপর-নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

গাড়ি নওয়াডি (ঝাঝা) ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে গোস্বামিপাদ একদৃষ্টে নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের শোভা দেখিতে লাগিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পাহাড়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই পাহাড়ে এক জন মহাপুরুষ আছেন। অতঃপর তিনি বৈদ্যনাথে গিয়া কয়েক দিন ছিলেন। এক দিন প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি ৺রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলেন। বসু মহাশয় তাঁহাকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক ধর্ম্মালাপ হইল। বৈদ্যনাথ হইতে গোস্বামিপাদ কলিকাতায় আসিলেন এবং কয়েক দিন থাকিয়া সপরিবারে ঢাকায় চলিয়া গেলেন।

---

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## নৌকায় বাস

দ্বারভাঙ্গাতে যে কঠিন পীড়া হয়, তাহাতে গোস্বামিমহাশয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অগ্নি মন্দ হইয়া যাওয়াতে ভুক্তদ্রব্য সুচারুরূপে পরিপাক হইত না। আহারে অত্যন্ত অরুচি হইয়াছিল। তাঁহার শারীরিক অবস্থা এইরূপ দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে কিছু দিন পদ্মানদীতে নৌকায় বাস করিবার পরামর্শ দেন। গোস্বামিপাদ তাঁহাদিগের পরামর্শে এক খানি বজরা ভাড়া করিয়া কিছুদিন সপরিবারে পদ্মায় বাস করেন। নৌকাযোগে

তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। কিছু দিন পদ্মায় থাকাতে উৎকৃষ্ট জলবায়ুর গুণে তাঁহার শরীর সবল হইল। ক্ষুধাবৃদ্ধি হওয়াতে অগ্নিমান্দ্য চলিয়া গেল।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত চাঁচরতলা গ্রামে একটি কালীবাড়ী আছে। বহুকাল পূর্ব্বে এক জন সিদ্ধপুরুষ এইস্থানে কালীর এক ঘটস্থাপন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে চাঁচরতলার কালীবাড়ী অতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করে। সাধারণের বিশ্বাস যে এই কালীবাড়ী অতিশয় জাগ্রতস্থান। সমস্ত লোকে চাঁচরতলার কালীমাতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকেন। এখানে দেবীর কোন মূর্ত্তি নাই; ঘটে পূজা হয়। গোস্বামিমহাশয় কালীদর্শন করিবার জন্য চাঁচরতলায় গমন করিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার নৌকা তথায় উপস্থিত হইল। তিনি কালীবাড়ীতে উপনীত হইয়া কালীদর্শন করিলেন। সেই সময়ে বহুসংখ্যক লোক সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রভুপাদকে লইয়া উৎসাহ ও আনন্দের সহিত সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। গোস্বামিপাদ কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া উপস্থিত লোকের প্রাণে আনন্দ ঢালিয়া দিলেন। হরিনামের উচ্চধ্বনিতে তিনি দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। কীর্ত্তনসময়ে প্রভুপাদের শরীরে অশ্রুকম্পাদি যে সকল ভাবের বিকাশ হইল তাহা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কীর্ত্তনে গোস্বামিপাদ যখন নৃত্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল। শূন্য হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতে দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ অপূর্ব্বব্যাপার দর্শন করেন নাই। প্রভুপাদের আগমনে চাঁচরতলায় যে অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল সে অঞ্চলের লোকের নিকট তাহা একান্তই আশ্চর্য্য ও নূতন। এই

নূতন ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারা অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে তাঁহারা গোস্বামিপাদকে বলিলেন, প্রভো। আশ্চর্য্য ব্যাপার; আমরা কখনও এখানে কীর্ত্তন করিতে আসি না। এখানে কখনও কীর্ত্তন হয় না। আজি, সন্ধ্যাবেলা আমাদের মনে কালীবাড়ীতে আসিয়া সংকীর্ত্তন করিবার জন্য অতিশয় ইচ্ছা হইল। মনের সেই প্রবলবেগ আমরা কিছুতেই থামাইতে পারিলাম না। যেন এক অদৃশ্যশক্তি আমাদিগকে এখানে টানিয়া আনিল। সেই শক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়াই দেখি যে আপনার শুভাগমন হইয়াছে। আপনার আগমন হইবে বলিয়াই মা আমাদিগকে এখানে টানিয়া আনিয়াছেন। আমরা আজ আপনাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

এক দিন শান্তিসুধা ও প্রেমসখী পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বাবা! আমাদিগকে একটি গল্প বল। গোস্বামিপাদ সত্যবাক্যের মহিমাব্যঞ্জক এই আখ্যায়িকাটি তাহাদিগকে বলিলেন :—

এক ব্রাহ্মণের একটি পরিচারিকা ছিল। সে অতিশয় সত্যবাদিনী ও ধর্ম্মপরায়ণা। প্রাণান্তেও মিথ্যাকথা বলিত না। সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য ব্রাহ্মণদম্পতি তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের গঙ্গাস্নানে যাইবার ইচ্ছা হইল। তাঁহারা পরিচারিকার উপর বাড়ীর ভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন। যাইবার সময়ে পরিচারিকা সামান্য কিছু উপহার প্রভুপত্নীর হাতে দিয়া বলিল, "মা, গরিবের এই সামান্য উপহারটি মাগঙ্গাকে দিবেন। কিন্তু আপনি ইহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিবেন না। আপনি আমার

উপহারদ্রব্য লইয়া মাগঙ্গাকে মনে মনে স্মরণ করিয়া বলিবেন, মা, আমাদিগের দুঃখিনী পরিচারিকা আপনাকে এই যৎসামান্য উপহার দিয়াছে। তুমি ইহা হাতে করিয়া লও। মা যদি হাতে করিয়া আমার উপহারগ্রহণ করেন, তবেই দিও, নতুবা দিও না” ব্রাহ্মণী পরিচারিকার কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া তাহার দ্রব্যগুলি সঙ্গে লইলেন। তাঁহার মনে হইল, এ কি পাগল হইয়াছে? দেবতা কি কখন হাতে করিয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন? অনন্তর ব্রাহ্মণদম্পতি গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। তাঁহারা গঙ্গায় উপনীত হইয়া যথারীতি স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। পরে ব্রাহ্মণী পরিচারিকাপ্রদত্ত দ্রব্যগুলি লইয়া মাগঙ্গাকে মনে মনে বলিলেন, মা, আমার পরিচারিকা তোমাকে এই উপহারগুলি দিয়াছে। তাহার ইচ্ছা যে তুমি ইহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাহার সাধপূর্ণ কর। ব্রাহ্মণপত্নী মনে মনে এই কথা বলিবামাত্র গঙ্গাগর্ভ হইতে দিব্যাভরণে ভূষিত, পরমসুন্দর একখানি হস্ত উত্থিত হইল। ব্রাহ্মণী সেই সুন্দর হাতখানি দেখিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং অতিশয় ভক্তিভাবে পরিচারিকার উপহারগুলি সেই হস্তে দিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। পরিচারিকার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বর্দ্ধিত হইল। যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মণী পরিচারিকাকে বলিলেন, মা, তোমার উপহারগুলি মাগঙ্গা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। পরিচারিকা বলিল, মা, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। ব্রাহ্মণী বলিলেন, মা, তুমি কোন্ সাধনের বলে দেবতাকে এরূপ বশীভূত করিয়াছ? পরিচারিকা বলিল, মা, আমি সাধন-ভজন কিছুই জানি না। তবে আমি প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলি না। সর্ব্বদাই সত্যকথা বলিয়া থাকি। তাহার প্রভাবেই দেবতা

প্রসন্ন হইয়া আমাকে দয়া করিয়াছেন। আমি জন্মাবধি কখনও মিথ্যাকথা বলিয়াছি, ইহা আমার মনে হয় না।

গোস্বামিমহাশয়ের নিকট এই গল্পটি শুনিয়া শান্তিসুধা বলিলেন, বাবা, আমরাও ত কখনও মিথ্যা কথা বলি না। তবে কেন আমরা দেখিতে পাই না? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, কেন পাইবে না? কন্যাদ্বয় বলিলেন, তবে দেখাও। গোস্বামিপাদ বলিলেন, কাল দেখাইব। পর দিন তিনি স্নান করিয়া কন্যাদ্বয়কে বলিলেন, কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া আইস। শান্তিসুধা তাঁহার মাতার নিকট হইতে কিছু খাদ্যবস্তু লইয়া পিতার হস্তে দিলেন। প্রভুপাদ খাদ্যদ্রব্য হস্তে লইয়া কিছুক্ষণ স্তবপাঠ করিলেন। স্তবপাঠের কিছুকাল পরে জলের ভিতর হইতে দিব্যভূষণে ভূষিত একখানি পরম সুন্দর হস্ত উত্থিত হইল। গোস্বামিমহাশয় খাদ্যবস্তুগুলি সেই হস্তে প্রদান করিলে হাত ডুবিয়া গেল। এতক্ষণ কন্যাদ্বয় বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে দর্শন করিতেছিলেন; হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেলে তাঁহারা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা এ কি গঙ্গাদেবীর হাত? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, "না, পদ্মানদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পদ্মাদেবীর হাত (১) তোমরা অতিশয় ভাগ্যবতী। কলিতে এমন প্রত্যক্ষদর্শন অত্যন্ত দুর্লভ, প্রায় ঘটে না। তোমাদের জন্য আমিও দেখিয়া ধন্য হইলাম।"

(১) গোস্বামিপাদের অন্যতম চরিতাখ্যায়ক অমৃতবাবু ইহা গঙ্গাদেবীর হাত বলিয়া উল্লেখ করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন। শান্তিসুধা ও প্রেমসখী আমাকে পদ্মাদেবীর হাত বলিয়াছিলেন। তাঁহারা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন। পরে আমিও গোস্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি পদ্মাদেবীর হাত বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বাগ্‌ছি তাঁহার 'শ্রীশ্রীবিজয়কথামৃত' গ্রন্থে এই ঘটনাতে আরও ভুল করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে লিখিত অনেক ঘটনাই এইরূপ ভুল হইয়াছে। আবার একই বৃত্তান্ত পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে ভিন্নভাবে লেখা হইয়াছে। যেমন "যোগসাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর" নামক গ্রন্থের প্রণয়নবৃত্তান্ত।

তিনি আরও কিছুকাল নৌকায় বাস করিয়া পদ্মার উৎকৃষ্ট জল বায়ুর গুণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। তাঁহার পীড়াজনিত সকল দুর্ব্বলতা ও অবসাদ চলিয়া গেল। তখন তিনি বারদী যাইয়া ব্রহ্মচারিমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঢাকায় প্রত্যাগত হইলেন।

গোস্বামিমহাশয় যখন নৌকায় নানাস্থানে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত ছিলেন। তিনি প্রভুপাদের জলপথে ভ্রমণের যে বিবরণ আমাকে লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ দিলাম। "গোস্বামিপাদ জলপথে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া মাণিকদহ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। সেখানে মানিকদহের জমিদার স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র রায় সস্ত্রীক, তাঁহার ভগিনী এবং ৺কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকগুলি লোক তাঁহার নিকট সাধনগ্রহণ করেন। অতঃপর গোস্বামিপাদ নানাস্থানে বেড়াইয়া চাঁচরতলায় কালীদর্শন করেন। পরে বারদি গিয়া ব্রহ্মচারিমহাশয়কে দর্শন করিয়া তিনি ঢাকায় আইসেন।" (১২৯৪ সাল আশ্বিন মাস)।

গোস্বামিমহাশয়ের মাণিকদহ অবস্থান সময়ে বিপিন বাবু যোগসম্বন্ধে তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করাতে প্রভুপাদ তাহার উত্তরপ্রদান করিয়াছিলেন। ৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সেইগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন; কিছুদিন পরে তাহাই 'যোগসাধনসম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। *

* এই পুস্তক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাওয়া যায়। মূল্য ৵০ মাত্র

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

## কাঁকিনা হইয়া কামাখ্যায় গমন

রংপুরের অন্তর্গত কাঁকিনার জমীদার স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় কাঁকিনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যাইবার জন্য গোস্বামিপাদকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। রাজা বাহাদুরের একান্ত আগ্রহে প্রভুপাদ সপরিবারে ও সশিষ্যে কাঁকিনা গমন করেন। কুমারখালীর কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদও সদলে তথায় গিয়াছিলেন। প্রভুপাদ ও কাঙ্গালের আগমনে কাঁকিনার যেন জীবনসঞ্চার হইয়া নির্জীব দেহ সজীব হইয়া উঠিল। গোস্বামিপাদের সহিত বিখ্যাত বক্তা ৺মনোরঞ্জন গুহও কাঁকিনায় গিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সাধারণ ও নববিধান সমাজের কয়েকজন প্রচারকও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাসমারোহে ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ হইল। বক্তৃতা, শাস্ত্রপাঠ, সৎপ্রসঙ্গ ও সংকীর্ত্তনে কাঁকিনা টলমল করিতে লাগিল। প্রভুপাদ যে কয়েক দিন কাঁকিনাতে ছিলেন, সে কয় দিন সেখানে ধর্ম্মের একটা প্রবল একটানা স্রোত বহিয়া তত্রস্থ নরনারীদিগকে শীতল করিয়া রাখিয়াছিল। সে কয় দিন তাঁহারা সংসার ছাড়িয়া যেন কোন উচ্চ লোকে বাস করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর ও তাঁহার পরিবারস্থ কেহ কেহ এবং তাঁহার কর্ম্মচারিদের মধ্যে অনেকে এইবারে গোস্বামিপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এক দিন রাজা বাহাদুর গোস্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি নাকি সকল দেশের ভাষা বুঝিতে পারেন? ইহার উত্তরে প্রভুপাদ

বলিলেন, হাঁ। তখন রাজা বলিলেন, আপনি ত অন্য দেশের ভাষা শিক্ষা করেন নাই, তবে কিরূপে বুঝেন? ইহার উত্তরে গোস্বামিপাদ বলিলেন, "ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণপুরুষ; সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের পূর্ণজ্ঞানের সহিত মানবের জ্ঞান যুক্ত হইলে সমস্তই জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়। তখন আর তাহার কিছুই অজ্ঞাত থাকে না।"

এক দিন তথাকার বৈষ্ণবগণ বিকাল বেলা গোস্বামিপাদকে তাঁহাদিগের কীর্ত্তনে লইয়া গিয়াছিলেন। সে দিন সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসবে প্রভুপাদের আচার্য্যের কার্য্য করিবার কথা ছিল। কীর্ত্তনে ভাবাবেশ হওয়াতে তাঁহার আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়া পড়ে। ইহাতে ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক কটু কথা বলিয়াছিলেন। গোস্বামিমহাশয় উপাসনায় বসিয়াই বলিতে লাগিলেন, মা, এ কি? তোমার গায়ে আঘাতের চিহ্ন কেন? আমাকে যে সকল গালি দিয়াছে, এ যে তাহারই চিহ্ন। হায় হায়! আমার জন্য তোমাকে এত কষ্ট পাইতে হইয়াছে! প্রভুপাদের কথা শুনিয়া তিরস্কারকারিগণ লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলেন।

কাঁকিনার রাজ-পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য (এম, এ) প্রভুপাদের নিকট সাধনগ্রহণ করেন। সাধনপ্রাপ্তির পর তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বৎস! তোমাকে অন্যরূপ দেখিতেছি কেন? ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিলে মানুষের মুখশ্রী যেরূপ হয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তোমার মুখের শোভা তদনুরূপ হইয়াছে। তুমি কি কাহারও কাছে কিছু পাইয়াছ? কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ কি তোমাকে কৃপা করিয়াছেন? পিতার কথার উত্তরে পুত্র বলিলেন, আমি

গোস্বামিপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া পিতা বলিলেন, তুমি বড়ই ভাগ্যবান্। তোমার ভাগ্যের কথা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তুমি আমার বংশের প্রদীপ। যে বংশে এরূপ পুত্র উৎপন্ন হয়, সে বংশ উদ্ধার হইয়া যায়। আমিও গোস্বামিমহাশয়ের নিকট হইতে এই বস্তু গ্রহণ করিব। এই বলিয়া তিনি প্রভুপাদের নিকট যাইয়া সাধনগ্রহণ করিলেন।

কাঁকিনাবাসিদের শুষ্ককণ্ঠে হরিনামামৃত সিঞ্চন করিয়া গোস্বামিপাদ কামাখ্যায় গমন করেন। তিনি তথায় উপনীত হইয়া কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিলেন। কামাখ্যা পাহাড়ের শিখরদেশে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। প্রভুপাদ এইস্থানে উপস্থিত হইলে ভুবনেশ্বরীদেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার কামাখ্যা আগমন সফল করেন।

কামরূপ পর্ব্বতের পাদদেশে গৌহাটি নগর অবস্থিত। গোস্বামিমহাশয় যতদিন কামরূপে ছিলেন, এই নগরেই বাস করিয়াছিলেন। গৌহাটি হইতে তিন ক্রোশ দূরে বশিষ্ঠাশ্রম নামে একটী নির্জ্জন স্থান আছে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এই স্থানে কিছুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। এসিয়া মহাদেশের অনেক স্থানে তাঁহার আশ্রম আছে আমরা প্রভুপাদের মুখে শুনিয়াছি যে চীনদেশে পীত সমুদ্রের তীরেও বশিষ্ঠদেব বহুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। আসামের বশিষ্ঠাশ্রম প্রাকৃত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত হওয়াতে সাধন করিবার পক্ষে একান্ত অনুকূল। একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় স্রোতস্বতী কুল কুল স্বরে আশ্রমের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে আসিলে ঘোর বিষয়াসক্ত মনও বিশ্বনিয়ন্তার চরণে সমাহিত হইয়া পড়ে। গোস্বামিমহাশয় স্থানের নির্জ্জনতা ও নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত

দিন তথায় যাপন করেন। খেচরান্ন প্রস্তুত করতঃ সকলে মহাহ্লাদে বনভোজন করিয়া সায়ংকালে গৌহাটিতে আগমন করিলেন।

একদিন তথাকার একটি উকিল তাঁহার নিকটে কামাখ্যা মাতার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একটি অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত করেন। তিনি বলেন :—"গৌহাটি নগরের নিকটে কামাখ্যা পর্ব্বতের এক ক্ষুদ্র অংশ ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৌকাচলাচলের অত্যন্ত বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। নদের জল পর্ব্বতাংশে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিত। তাহাতে সময়ে সময়ে অনেক নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে বহু লোকের প্রাণবিনাশ ঘটিত। বৃহৎ বৃহৎ অর্ণব-পোত সকলও ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া বিপন্ন হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য গৌহাটির ডিপুটী কমিসনর সাহেব বারুদ দ্বারা নদীপ্রবিষ্ট পর্ব্বতাংশ উড়াইয়া দিবার আদেশ দেন। গৌহাটীর হিন্দু অধিবাসিগণ ও কামাখ্যাদেবীর পাণ্ডাবৃন্দ সাহেবের এই আদেশের অনৌচিত্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট এক খানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। আবেদনপত্রে লেখা হইল যে আমরা কেবল কামাখ্যাদেবীর মন্দিরটিকেই পীঠস্থান মনে করি না, সমস্ত পর্ব্বতকেই আমরা দেবীর পীঠ বলিয়া বিশ্বাস করি। আমাদিগের শাস্ত্রেও তাহাই লেখা আছে। পর্ব্বতের কোন অংশে আঘাত করিলে দেবীর দেহে আঘাত করা হয় বলিয়া আমরা মনে করি। পর্ব্বতের যে অংশ নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিলে দেবীর দেহের এক অংশ ছিন্ন করা হইবে। ইহাতে আমাদিগের ধর্ম্মে হস্তার্পণ করা হইবে। মহামান্যা স্বর্গীয়া মহারাজ্ঞির প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ করিয়া আপনি এই কার্য্য হইতে বিরত হউন। আবেদনকারিগণের ন্যায়সঙ্গত বাক্যে সাহেব কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহাদিগের

আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইল। পর্ব্বত উৎসাদনের জন্য লোক নিযুক্ত হইল। হিন্দুমজুর এ কার্য্য করিতে সম্মত না হওয়ায় মুসলমান মজুর নিযুক্ত করা হইল। তাহারা বহু চেষ্টায় ও অনেক পরিশ্রমে পর্ব্বতগাত্রে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া তাহা বারুদে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন দিল। অগ্নিসংযোগে বারুদ ফুটিয়া উঠাতে অতি ক্ষুদ্র এক খণ্ড প্রস্তর পর্ব্বতগাত্র হইতে বিচ্যুত হইল। পর্ব্বতের আর কিছু অনিষ্ট হইল না। পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড স্খলিত হইলে ক্ষতস্থানে শোণিত-চিহ্ন দৃষ্ট হইল। ইহাতে মজুরগণ ভীত হইয়া কর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। পলাইয়াও তাহারা নিষ্কৃতি পাইল না; বিসূচিকা রোগে অনেকেই মারা পড়িল। সাহেব পর দিন নূতন লোক নিযুক্ত করিয়া পর্ব্বত উড়াইয়া দিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক; হয় আর। ভগবান্ এক মুহূর্ত্তে মানুষের সকল সংকল্প চূর্ণ করিয়া দেন। রাত্রিতে কি ঘটিয়াছে, তাহা কেহই জানে না; সাহেব কিন্তু প্রত্যুষেই সরকারী উকীল বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উকীল বাবু উপস্থিত হইলে সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের দেবীর পূজা দিতে হইলে কত টাকার প্রয়োজন হয়। উকীল বাবু বলিলেন, তাহার কিছু নিয়ম নাই। যাহার যেমন ক্ষমতা, সে তদনুরূপ ব্যয় করিয়া দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। তখন সাহেব উকীল বাবুর হস্তে পাঁচশত টাকা দিয়া বলিলেন, আপনি এই টাকা দিয়া অদ্যই দেবীকে পূজা করুন। আর আমি পর্ব্বত উড়াইয়া দিবার যে আদেশ দিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যাহার করিলাম। উকীলবাবু এই ঘটনায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি দেবীকে কেন পূজা দিতেছেন? আর পর্ব্বত উড়াইয়া দিবার সংকল্পই বা পরিত্যাগ করিলেন কেন? সাহেব বলিলেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি সে-

কথা বলিতে পারিব না। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। অতএব এ সম্বন্ধে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। সাহেবের কথা শুনিয়া উকীল বাবু আর তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। সাহেবপ্রদত্ত টাকায় দেবীর পূজা হইল।”

গোস্বামিমহাশয় কিছুকাল কামরূপে অবস্থান করিয়া তথাকার দ্রষ্টব্যস্থান সকল দর্শনপূর্ব্বক ঢাকায় প্রত্যাগত হইলেন।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

## পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজত্যাগ

যে সকল কারণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত গোস্বামিপাদের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছিল, ঢাকাতেও তাহাই ঘটিল। প্রচারনিবাসে অবস্থানসময়ে সর্ব্বদাই প্রভুপাদের নিকট হিন্দু, মুসলমান, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু মহান্তগণ আগমন করিতেন। গোস্বামিপাদ তাঁহাদিগকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গসুখ সম্ভোগ করিতেন। তাঁহারাও প্রভুপাদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইতেন। দিবসের অধিকাংশ সময়ই গোস্বামিমহাশয় এই সকল সাধুভক্তগণদ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই আফিম্ ও গাঁজা খাইতেন। গোস্বামিপাদ ইহাঁদিগকে সেই সকল দ্রব্য আনাইয়া দিতেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সীমানার মধ্যে সর্ব্ববিধ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা সমাজের

ট্রষ্ট্‌ডিড্‌ পত্রের নিয়মবিরুদ্ধ, এজন্য তাঁহাদিগকে সমাজবাড়ীর সীমানার বাহিরে যাইয়া মাদকদ্রব্য সেবন করিতে হইত। তাঁহারা অনেক সময়ে গোস্বামিমহাশয়ের কাছে কৃষ্ণলীলার গান, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি গাইতেন। ইহা ভিন্ন গোস্বামিপাদের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার আসনগৃহের প্রাচীরে কয়েকখানি হিন্দু দেবদেবীর ছবি রাখিয়াছিলেন। ঢাকার কতকগুলি উন্নত ব্রাহ্মের নিকট এই সকল কার্য্য অতীব গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইল। তাঁহারা অতিশয় বিরক্ত হইয়া নিজেদের মধ্যে ইহা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের বিরক্তির আরও কারণ ঘটিয়াছিল। গোস্বামিপাদের প্রায় সকল শিষ্যই হিন্দুসমাজের লোক। তাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুপাদের কাছে থাকেন। সন্ধ্যার পর তাঁহাদিগকে লইয়া গোস্বামিপাদ গোপনে সাধন করেন; ব্রাহ্মগণকে সে স্থানে যাইতে দেওয়া হয় না। প্রতিদিন তাঁহারা গোস্বামিমহাশয়ের কাছে ব্রহ্মসংগীত না করিয়া কেবলই পৌত্তলিক গান করেন, তাহাও আবার তাঁহাদেরই সমাজবাড়ীতে বসিয়া, ইহা কি সহ্য করা যায়? এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মদের বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠিল। আর নূতন সাধনপ্রণালীর প্রভাববিস্তারের সঙ্গে তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী দিন দিন হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল। সাধনপ্রাপ্ত লোকদের কাছে ব্রাহ্মগণের প্রভা দিন দিনই ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। তাঁহারা আরও দেখিলেন, শিষ্যগণ গোস্বামিজীর সহিত যেমন অসংকোচে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেন, তাঁহারা সেভাবে মিশিতে পারেন না। ইঁহারা তাঁহাদের গোঁসাইকে যেন তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের পর করিয়া দিতেছেন। যিনি এতকাল তাঁহাদের আপনার জন ছিলেন, এতদিন যাঁহার উপরে তাঁহাদের ষোল আনা অধিকার

ছিল, সেই গোঁসাই তাঁহাদের পর হইয়া যাইবেন ; অপরে তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিবে ; ইহা তাঁহাদের একান্ত অসহ্য। এই সকল কারণে তাঁহারা অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের দলের লোক ব্যতীত হিন্দু সাধুসন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করেন না। হিন্দু সাধু সন্ন্যাসিগণ ভণ্ড, মাদকসেবী, পৌত্তলিক, কুসংস্কারাপন্ন অলসের দল। পরের গলগ্রহ হইয়া গাঁজা আফিং খাইয়া কেবল ভণ্ডামী করিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মসমাজের ধার্ম্মিক লোকদিগের এই সকল অসচ্চরিত্র ভণ্ডলোকের সঙ্গ করা সর্ব্বথা অনুচিত। এই সকল লোকের সংসর্গ পরিহার করা তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। গোস্বামিমহাশয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারক হইয়া নিয়ত এই সকল ভণ্ডদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র প্রচারনিবাস এই সকল পৌত্তলিক কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগের দ্বারা অপবিত্র ও কলুষিত হয়, উন্নত ব্রাহ্মদিগের পক্ষে ইহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল।

এই সকল কারণে ব্রাহ্মগণ আর চুপ করিয়া থাকা উচিত মনে করিলেন না। তাঁহারা ইহার প্রতিকার করিবার সংকল্প করিলেন। ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই কার্য্যের অগ্রণী হইলেন। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কয়েক জন ব্রাহ্ম গোস্বামিমহাশয়ের সাধুদিগকে মাদক-দ্রব্যপ্রদান, তাঁহার বাসগৃহে পৌত্তলিকছবিস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভার নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। প্রভুপাদ সে সময়ে ঢাকায় ছিলেন না, কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ব্রাহ্ম-দিগের এই সকল আন্দোলনের কথা তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলেন। তাঁহার পত্র পাইয়া প্রভুপাদ অবিলম্বে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী

ছাড়িয়া নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া যাইতে লিখিলেন। তিনি আরও লিখিলেন, "টাকার জন্য কোন চিন্তা করিও না। এতকাল যিনি আমাদিগের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন, এখনও তিনিই করিবেন। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যাও।"

এই পত্র পাইয়া জননী যোগমায়া নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় উঠিয়া গেলেন। ইহার কয়েক দিন পরে গোঁসাইজী ঢাকায় উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তিনি আকাশের ন্যায় মুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার একটি বন্ধন ছিল; এতদিনে তাহা ছিন্ন হইল। ব্রাহ্মসমাজের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে একটু চাপিয়া, একটু সতর্ক হইয়া চলিতে হইত। এখন আর তাহা রহিল না। শিষ্যগণও ব্রাহ্মসমাজের বাড়ীতে ভয়ে ভয়ে সংকোচের সহিত চলিতেন। তাঁহাদিগেরও সে ভয়, সে সংকোচ, দূর হইয়া গেল। তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত অসংকুচিত ভাবে ও নির্ভয়ে সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এতদিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল।*

* গোস্বামিপাদের অন্যতম চরিতাখ্যায়ক বাবু বঙ্কবিহারী কর তাঁহার গ্রন্থে, গোস্বামিজী আজীবন ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গোস্বামিপাদের জীবনের অনেক ঘটনা তাঁহার গ্রন্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে সত্যের অপলাপ ও অসত্যের সন্নিবেশও করা হইয়াছে। বঙ্কবাবু সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়া গোস্বামিমহাশয়ের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়াতেই পুস্তকের এই অমার্জ্জনীয় ত্রুটি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকভাব লইয়া জীবন্মুক্ত মহাজনদিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আকাশবৎ মুক্ত

নবকান্ত বাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ গোস্বামিপাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে বারদীর ব্রহ্মচারি মহাশয় তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন।

মহাপুরুষদিগের মহৎ জীবন সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস, ক্ষুদ্রস্থালীর ভিতরে হস্তী পুরিবার চেষ্টার ন্যায় নিতান্তই বিফল ও হাস্যজনক। বঙ্কবাবু যদি উদারভাব লইয়া গোস্বামিমহাশয়ের জীবনপর্য্যালোচনা করিতেন, সাম্প্রদায়িকতার রঙ্গিল চসমা পরিধান না করিয়া উন্মুক্তনয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই ভ্রান্তিতে পতিত এবং তাঁহার গ্রন্থপাঠ করিয়া সাধারণকেও ভ্রমজালে জড়িত হইতে হইত না। রঙ্গিল চস্‌মা পরিধান করাতেই তিনি নিজে স্বাভাবিক বস্তুকে অস্বাভাবিক-ভাবে দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার পাঠকগণকেও কর্ম্মভোগের মধ্যে ফেলিয়াছেন। শাস্ত্র ও সদাচাররক্ষাকারী, উদার, অসাম্প্রদায়িক মুক্ত মহাপুরুষের জীবন চরিতের স্থলে তাঁহাদিগকে এক জন শাস্ত্র ও সদাচারলঙ্ঘনকারী ব্রহ্মের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিতে হইতেছে।

পরমহংসজীর কৃপালাভ করিবার পর তিনি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা কে না জানে? দীক্ষাগ্রহণের পর গোস্বামিপাদের ধর্ম্মভাব সম্পূর্ণ ভিন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের পাশ্চাত্য একেশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া গীতা, উপনিষৎ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; পরমহংসগণের বিহারভূমি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভাগবতধর্ম্মে স্থিতিলাভ করিয়া স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং নরনারীবৃন্দকে সেই সুস্নিগ্ধ ধর্ম্মপাদপের আশ্রয়ে স্থানদান করিয়া তাঁহাদিগের ত্রিতাপক্লিষ্ট অন্তর সুশীতল করিয়াছিলেন। বঙ্কবাবু ত গোস্বামি-মহাশয়কে ব্রাহ্ম প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গোস্বামি-মহাশয় কি ব্রাহ্মসমাজপরিত্যাগ করিবার পরও ব্রাহ্ম ছিলেন? ব্রাহ্ম ছিলেন ত ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ ঘটিল কেন? তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন কেন? বঙ্কবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মগণ কি হিন্দুশাস্ত্র ও সদাচার অভ্রান্ত বলিয়া মানেন? রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, লক্ষ্মীনারায়ণ, হরপার্ব্বতী, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতিকে ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন? ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ,

ব্রাহ্মগণ প্রভুপাদের বিরুদ্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল ঃ—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যমহাশয়গণ সমীপেষু।

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিমহাশয়ের কতকগুলি কার্য্যে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মপ্রচারনিবাসের পবিত্রতারক্ষার বিলক্ষণ হানি এবং তাঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্মমতদ্বারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের যথেষ্ট বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। যাহাতে প্রচারনিবাসের

যম, কুবের প্রভৃতি দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? ধর্ম্মসংস্থাপন ও ভূভারহরণ করিবার জন্য ভগবান্ নর ও তির্য্যক্ দেহধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন, ইহা স্বীকার করেন? তীর্থসেবাদ্বারা মানুষের পাপদূর হয়, ইহা বিশ্বাস করেন? কদাচ নহে। এ সমস্তই ত তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু গোস্বামিপাদের এই সকলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তিনি গঙ্গাতীরে হিন্দুমতে মাতৃশ্রাদ্ধ করাইয়াছিলেন। জননীর পারলৌকিক কল্যাণের জন্য যোগজীবনের দ্বারা গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দেওয়াইয়াছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া প্রেমসখির বিবাহ তিনি হিন্দুমতে দিয়াছিলেন। দেববিগ্রহের নিকটে তিনি ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন করিতেন। তীর্থে যাইয়া তীর্থগুরু পাণ্ডাদিগের চরণ পূজা ও তাঁহাদিগের আনুগত্যস্বীকার করিতেন। পুরীতে জগন্নাথদেবের দারুময় বিগ্রহ প্রতিদিন স্বহস্তে তুলসী, পুষ্প ও চন্দনদ্বারা অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার আসনের নিকটে পবিত্র তুলসী বৃক্ষ থাকিত এবং তিনি প্রতিদিন তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি মালা পরিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন তিলক করিতেন। এ সকল কি ব্রাহ্মের লক্ষণ? এতৎসত্ত্বেও কি তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবেন? এ সকল যদি ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যত্ন বিফলপ্রয়াস নহে কি?

পবিত্রতারক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের বিঘ্ন নিরাকৃত হয়, তাহার উপায়-নির্দ্ধারণ করুন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীতে আছে যে ব্রাহ্মসমাজগৃহে বা প্রাঙ্গণে সৃষ্টবস্তু, কল্পিত দেবদেবীর পূজা, কোন লোকের পদধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য হইবে না। গোস্বামিমহাশয়ের শিষ্যগণ এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহার চরণে মস্তকস্থাপন ও পদধারণ করিয়া থাকেন। তিনি যখন আসনে থাকেন না, তখন তাঁহারা সেই শূন্য আসনের নিকটে প্রণাম করেন। পৌত্তলিক শিষ্যগণ প্রচারনিবাসে বসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নিন্দা করেন; গোস্বামি মহাশয় তাহার কোন প্রতিবাদ করেন না। দোলের সময় শিষ্যগণ প্রচারনিবাসে আবির খেলা করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক ও অন্য পৌত্তলিক গান গোস্বামিমহাশয়ের নিকটে প্রচারনিবাসে হইয়া থাকে। তিনি

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রুত অনেক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া বঙ্কবাবু গোস্বামিজীকে ব্রাহ্মরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কবাবু লিখিয়াছেন:—"নগেন্দ্রবাবু গোস্বামিপাদের চারিকালের বন্ধু।" 'চারিকালের বন্ধু' হইলেও এবং বহুকাল তাঁহার সঙ্গ করিলেও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির জন্য তিনি তাঁহাকে ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। আর যদি বুঝিতে পারিয়াও দলের অনুরোধে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তিনি তাঁহাকে ভিন্নবর্ণে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মভাবে প্রচার করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মহিমাবৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, তাঁহার এ কার্য্য ভাল হয় নাই। তিনি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন।

গোস্বামিপাদ যে উচ্চতম ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন, বঙ্কবাবু তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহার প্রণীত প্রভুপাদের জীবনচরিতে ব্রাহ্মসমাজের অংশ যেরূপ সুলিখিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী অংশ সেরূপ হয় নাই।

বলেন, গুরুকরণভিন্ন ধর্ম্মলাভ হয় না। পূর্ব্বে তিনি যে প্রকার তীব্রভাবে পৌত্তলিকধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া উপদেশ ও বক্তৃতা করিতেন, এখন তাহা করেন না। বরং বলেন যে, যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, সে তাহা করিতে থাকুক, যোগসাধন গ্রহণ করিলে কালে সত্যলাভ হইবে। এই মত প্রচার হইলে ব্রাহ্মসংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে না। অতিশয় দুঃখের সহিত আপনাদিগকে জানাইতে হইতেছে যে তিনি প্রচারনিবাসে বসিয়া সন্ন্যাসীদিগকে গাঁজা দেন। তিনি দেবমন্দিরে গমন করেন। তিনি গোপনে দীক্ষাপ্রদান করেন। এই দীক্ষা যদি সত্যধর্ম্মের দীক্ষা হয়, তাহা হইলে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার মধ্যে কিরূপে বাস করেন? বিজয়বাবু প্রাণায়ামদ্বারা ধর্ম্মসাধনের নূতন প্রণালী প্রচার করিতেছেন। তত্ত্বকৌমুদীপত্রিকায় প্রাণায়ামের অপকারিতা ও অনাবশ্যকতা-সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তারিতরূপে আলোচনা হইয়াছে। অতএব প্রাণায়ামসাধনের দ্বারা সাধকের কোন উপকার হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ন্যাসী, দণ্ডী, পরমহংস, ব্রহ্মচারী ও বৈরাগীর ধর্ম্ম নহে। আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতির জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। ইহা একদেশদর্শী, সংকীর্ণ ধর্ম্ম নহে। জ্ঞান, প্রেম ও অনুষ্ঠান এই তিনের সামঞ্জস্য না হইলে তাহা পূর্ণ আদর্শধর্ম্ম হইতে পারে না। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ—প্রকৃতব্রাহ্মজীবনে এই তিনটীই পূর্ণভাবে লক্ষিত হইবে।

ঢাকা
২৫শে কার্ত্তিক ১২৯৪ সন।

নিবেদক
শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

গোস্বামিমহাশয় তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিবার কারণ তিনি মৌনাবস্থায় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আমি যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ফিরিলাম, নিজের বুদ্ধিতে নহে। এক দিন স্বপ্নে সীতানাথ ( অদ্বৈত প্রভু ) মহাপ্রভুকে আমার নিকটে আনিয়া বলিলেন ওরে! ব্রাহ্মসমাজের কাজ হইয়াছে; এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হ।" *

ভগবদিচ্ছায় তিনি ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই ইঙ্গিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, শরীরপাত করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়া ভগবদাদেশে ব্রাহ্মসমাজপরিত্যাগ করিলেন। অনেকে বলেন, ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া তাঁহার ভুল হইয়াছিল। যাঁহারা ইহা বলেন, তাঁহারা কিছুই বুঝেন না। তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া কিছুমাত্র ভুল হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আমলে দেশের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। সে সময়ে দেশের নীতির অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং খৃষ্টানধর্ম্ম দেশে

* গোস্বামিমহাশয়ের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার জীবনের প্রারম্ভ হইতে এক অলক্ষ্য প্রবল শক্তি তাঁহার জীবন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াছে। তিনি যখন বৈদান্তিকমতাবলম্বী হইয়া পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখনও এই শক্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে চালিত করিয়াছে। এই শক্তিই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া গিয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু দেবদেবী, অবতার, মহাপুরুষ ইত্যাদিকে অবিশ্বাস এবং অগ্রাহ্য করিলেও তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের গৃহদেবতা ৺শ্যামসুন্দর সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। গোস্বামিমহাশয় শান্তিপুরে চিকিৎসাকার্য্য আরম্ভ করিলে তিনি তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ

অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না হইলে দেশের নীতির অবস্থা উন্নত ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের স্রোত কিছুতেই বন্ধ হইত না। এই জন্যই ভগবান্ রাজা রামমোহন রায়কে পাঠাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং গোস্বামিপাদও ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক দেশে সুনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। এখন আর ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যে কার্য্যের জন্য তাহার অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাজও ফুরাইয়াছে।

গোস্বামিপাদ ব্রাহ্মসমাজের সহিত পৃথক হইলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রভুপাদ মহর্ষির প্রথম পত্রখানির উত্তর দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় পত্রখানির আর উত্তর দেন নাই। এই পত্র তিনখানি পাঠ করিলে ইহাঁদের উভয়ের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবনের অবস্থা সুন্দররূপে জানিতে পারা যায়। পত্র তিনখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

করিয়াছিলেন। কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু নিয়ত যে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, মহাপ্রভুর দীক্ষাদান ও উপরোক্ত ঘটনা তাহার পরিচায়ক। অস্মদ্দেশীয় সাধুমহাত্মাগণও যে সতত তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, ৺কাশীধামের পূজ্যপাদ ত্রৈলঙ্গস্বামীর দীক্ষাপ্রদান এবং লাহোরে ফকির সাহেব কর্ত্তৃক তাঁহার জীবনরক্ষা তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। নিম্নলিখিত স্বপ্নটিও এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে বিবিধ হিংস্রজন্তু পূর্ণ এক গভীর অরণ্য মধ্যে পথহারা হইয়া তিনি নিরতিশয় বিপন্ন হইয়াছেন। কিছুতেই সেই নিবিড় বন হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না। এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে দোকানাদির বিজ্ঞাপন পত্রে যেরূপ একখানি হস্ত অঙ্কিত থাকে, সেপ্রকার একখানি জ্যোতির্ম্ময় হাত অন্তরীক্ষে প্রকাশিত হইয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিতেছে।

## মহর্ষির প্রথম পত্র

স্নেহাস্পদেষু!

তোমার মূর্ত্তি যেমন সৌম্য, তোমার প্রকৃতি যেমন ধীর, তোমার ঈশ্বরপ্রেম তাহারই সদৃশ। তুমি একদিন শুভক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে তাহাতে আকৃষ্ট হইলে এবং কত কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও প্রচার করিলে। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি আমার সমধিক আশা ছিল। কিন্তু তিনি পরম পিতার আহ্বানে অল্প বয়সেই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তোমাদের প্রতিই আমার সকল আশাভরসা নিহিত। তন্মধ্যে তুমি ধার্ম্মিক প্রচারকদিগের অগ্রণী হইয়া এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় প্রাণ মন অর্পণ করিয়া

ইহা দেখিয়া তিনি সেই হস্তের অনুগামী হইয়া চলিতে লাগিলেন। এইরূপে চলিয়া তিনি শীঘ্রই সেই ভীষণ অরণ্য হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর এক প্রকাণ্ড নদীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি সেই প্রবল তরঙ্গসঙ্কুল গভীর স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু শূন্যস্থিত সেই হস্ত তাঁহাকে পরপারে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি হস্তের অনুগামী হইয়া অবলীলাক্রমে পরপারে গমন করিলেন। অনন্তর সেই দিব্যহস্ত এক অপুর্ব্ব পুরির নিকটবর্ত্তী হইয়া স্থির হইলে তিনি সেই বিচিত্র ভবনের শিরোদেশে দৃষ্টি পাত করিয়া দেখিলেন যে বড় বড় জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে 'শান্তি ধাম' এই শব্দটি সেই স্থানে লেখা রহিয়াছে। অতঃপর তিনি সেই ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহার মনে হইল, ভগবান আমাকে স্বপ্নে ইহাই দেখাইলেন যে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে আমাকে ভগবদিচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে হইবে। সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। নিজের ইচ্ছানুসারে অথবা মানুষের কথায় আমি চলি ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

খাটিতেছ। "নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পটন্ গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্ গাং পর্য্যটন্ তুষ্টমনাঃ গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্ ন মদো বিমৎসরঃ।" তোমাকে এই যে উপদেশ দিয়া প্রচারকের আদর্শ দেখাইয়াছিলাম, তুমি সেই আদর্শকে ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া প্রচারকের নির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া বঙ্গদেশের সকল স্থানে বীজ ছড়াইয়া বেড়াইতেছ। তোমার নিষ্কাম ভক্তি ও ঈশ্বরেতে প্রীতি তোমার আত্মাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তোমার উৎসাহ জীবন্ত; যে উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উদ্দেশে তুমি আমার নিকটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে, তাহা আমার এখনও স্মরণ আছে। তোমাদের মধ্যে আমি আর অতি অল্প দিনই আছি। যখন আমি এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, তখন ব্রাহ্মসমাজ তোমাদেরই জীবন হইতে আলোক পাইয়া উজ্জ্বল হইবে এবং তোমাদেরই আত্মা হইতে জ্ঞানধর্ম্মলাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই আমার শেষ জীবনের আশা ও আনন্দ। এই আনন্দেই আমার শরীর সবল হয় ও ইন্দ্রিয় সতেজ হয়। কিন্তু বর্ত্তমানের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে তোমার উপরে কতকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী মতের আরোপ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া আমার এই জরাজীর্ণ দুর্ব্বল শরীরেও তোমাকে পত্র লিখিতেছি। সাধুদিগের পদধূলি গ্রহণ ও অঙ্গে মাথা ও পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য ধর্ম্মসাধনের উপায়; শক্তি সঞ্চার দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ব্যক্তি ও শিশুদিগকে দীক্ষা প্রদান করা; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আপনাআপনি পৌত্তলিকতা জাতিভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার চলিয়া যাইবে; পূর্ব্বে ঐ সকল ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মোপাসনার ক্ষতি নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম সরলভাবে বিশ্বাস করে, সেই ধর্ম্মসাধন করিতে করিতে সেই ব্যক্তি কালে সত্যলাভ

করিবে, সিদ্ধযোগীর সূক্ষ্মশরীরে আগমন আলাপাদি করা এই সকল কথা তোমার মত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসকে এই সকল অযথাবাদ ও কুসংস্কারযুক্ত করিয়া প্রচার করিতে হইলে তাহার গতিবোধ করা হয়। একমাত্র পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্যই এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব এবং রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ন। এই চেষ্টা ও যত্নের পরিণাম কি এই হইবে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে না? আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহা স্বাভাবিক যোগ এবং ঋষিদিগের আত্মা অবধি আমাদিগের প্রত্যেকের আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয়ের স্থানে কি এখন সাধুর পদে পড়িয়া না থাকিলে, সাধুর পদধূলি অঙ্গে না মাখিলে এবং অন্য কর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চারিত না হইলে মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না, এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে? এই প্রত্যয়কে যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্রী-মন্ত্রের মূল্য থাকে না, "হৃদা মনীষা মনসাভি ক্লৃপ্ত।" অর্থাৎ হৃদ্‌গত সংশয়রহিত বুদ্ধির যোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এই ঋষিবাক্য মিথ্যা হয় এবং আধ্যাত্মিকযোগের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলবিশ্বাস বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য, ধ্রুব সত্য। তাহা প্রথম যুগে যেমন, শেষ যুগেও তেমনি। দ্যুলোকেও যেমন, ভূলোকেও তেমন। তাহার রূপান্তর হয় না, পরিবর্ত্তন হয় না। তাহা সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর; তাহা মধুময়, প্রাণময়। এই সত্য তোমার হৃদয়ে অবিচলিত থাকুক; তোমার প্রতি আমার এই শুভ আশীর্ব্বাদ। প্রার্থনা করি যে, তোমাদের মধ্যে ধর্ম্মগত বিভিন্নতা তিরোহিত হইয়া সাম্য বিরাজ

করিতে থাকুক। তোমরা সকলে একহৃদয় একপ্রাণ হইয়া সত্য-প্রচারে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব রক্ষা কর এবং ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে আনন্দে পদনিক্ষেপ কর। ইতি, ১২৯৪ সাল, ১৭ই পৌষ।

নিতান্তশুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণঃ।

## গোস্বামিমহাশয়প্রদত্ত উত্তর

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্,

মহাশয়ের ১৭ই পৌষ তারিখের পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট ও আপ্যায়িত হইলাম। দুর্ব্বল শরীরে এতাদৃশ অনুগ্রহপ্রকাশদ্বারা আমার প্রতি আপনার অবিচলিত স্নেহেরই পরিচয় দিয়াছেন। প্রার্থনা করি যেন আপনাদের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত থাকিয়া জীবনে সত্য-স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি।

যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, আমার এইরূপ বিশ্বাস এবং এই সত্য আমি চিরদিন প্রচার করিয়া আসিতেছি। কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে কোনও সমাজ বা ব্যক্তি যে সকল সত্য প্রচার করেন, তদতিরিক্ত কোনও নূতন বা অপ্রকাশিত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় কেহই মনে করিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মসমাজের নিকট হয়ত এখনও এমন অনেকগুলি সত্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে, যাহা সহস্র সহস্র বৎসর মধ্যে ব্রাহ্ম সাধকের জীবনের মূল হইয়া দাঁড়াইবে। আর আমি যে পথে চলিতেছি, তাহা ঋষিপ্রবর্ত্তিত পথ; অতি পুরাকাল হইতে তদবলম্বনে অনেক মহাপুরুষ

কৃতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। আপনার ব্রাহ্মধর্ম্মব্যাখ্যান গ্রন্থেও তাহার অনেক আভাস পাওয়া যায়। "হৃদা মনীষা মনসাভি কৢপ্ত।" এই শ্লোক শিরোধার্য্য করিয়া আমি বিশ্বাস করি এবং ধ্রুব সত্য বলিয়া জানি যে নিঃসংশয় বুদ্ধিযোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশ ও লাভ হয়; কিন্তু বুদ্ধির অসংশয়তা লাভ অনায়াসসাধ্য নহে। তাহার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, ধর্ম্মপ্রচারের ও উপদেশের আবশ্যকতা থাকে না। মনের সেই উন্নত অবস্থালাভের জন্য বিবিধ উপায় থাকিতে পারে। যিনি যাহাতে ফললাভ করেন, তিনি তাহা অবলম্বন করুন। আমি এমন কথা বলি না যে, আমার প্রণালী ভিন্ন অন্য প্রণালী নাই। কিন্তু যে উপায় আমার ব্রহ্মযোগলাভের পক্ষে আমাকে সহায়তা করিয়াছে ও করিবে, তাহা আমার প্রাণের বস্তু, অতি আদরের ধন। সে ধনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। ধর্ম্মসাধনের উপায় সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থেই এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাই, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্‌প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।" ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সদ্‌গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেই হইবে। পৌত্তলিক ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকদিগকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ লোকেরই আধিক্য। যাঁহারা ব্রাহ্মমতে ধর্ম্মচর্য্যা করেন, অথচ নিজ নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা সরলবিশ্বাসী সাকারোপাসকের অবস্থা আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি। আর প্রকৃতবস্তু লাভ করিলে যখন সর্ব্বপ্রকার পদ্ধতি সাম্প্রদায়িকতা সর্পকঙ্কবৎ স্বতঃই স্খলিত হইয়া পড়ে, তখন

ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে আচারগত পার্থক্য আছে বলিয়াই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমি এরূপ মনে করি না এবং প্রাণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সহসা তাহার গ্রহণশক্তির অতীত সত্য তাহার সম্বন্ধে প্রচার করিলে তাহার হিত অপেক্ষা অনিষ্টেরই অধিক সম্ভাবনা এবং আমার এই বিশ্বাস যে ঋষিগণও অধিকারি-ভেদে ধর্ম্মগ্রহণের বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

আমি অনন্ত জীবনে অনন্ত সত্য লাভ করিয়া সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, আপনার পদপ্রান্তে বিনীতভাবে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা। 'যোগসাধন' নামে একখানি পুস্তিকা প্রেরিত হইল। কাহারও দ্বারা উহা পড়াইয়া শ্রবণ করিলে আমার মতামত অনেক বিষয় আপনি জানিতে পারিবেন।

ঢাকা
১২৯৪ সন, ২০শে পৌষ

প্রণত
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

## মহর্ষির দ্বিতীয়পত্র

স্নেহাস্পদেষু।

তোমার ২০শে পৌষের পত্র পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বহু অন্বেষণ ও বহু সাধন করিয়াছ। যাহা সত্য বলিয়া তোমার প্রতীতি হইয়াছে, তাহা তুমি চিরদিন ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছ। তুমি অবশ্য অবগত আছ যে, সকল যোগ অপেক্ষা অধ্যাত্মযোগ আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তোমার প্রতি আমার এই অনুরোধ, তুমি ব্রাহ্মদিগকে এই যোগের শিক্ষা দাও, ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন কর।

যদি জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি অপরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হয়, তবে কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হইবে না? এমন কখনই হইতে পারে না। নিপুণরূপে ব্রহ্মজ্ঞান শিখিতে হইলে বিদ্বান্ গুরুর নিতান্ত আবশ্যক। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে এই উপদেশ আছে, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।" সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত তাঁহার পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যের কিছুই মাহাত্ম্য নাই। ইহা কখনও ধর্ম্মসাধনের উপায় নহে। সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করাই একমাত্র উপায়।

পৌত্তলিককে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক করাই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৌত্তলিককে তাহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ কর। কিন্তু এ কথা বলিও না যে, যাহার যাহা বিশ্বাস, তিনি তাহাই সরলভাবে সাধন করুন; কালে সত্যলাভ করিবেন। এ কথা বলিলে কালেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়; আচার্য্যকর্তৃক উপদেশের আবশ্যক থাকে না। এইরূপ বাক্যে নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর চৈতন্যের উদ্রেক করা দূরে থাকুক, বরং তদ্বিরুদ্ধে সাকার দেবদেবীর প্রতিই তাহার সংস্কারকে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হয়। অতএব ইহাতে সাবধান থাকিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় যেরূপ মন প্রাণ দিয়া কর্ম্ম করিতেছ, সেইরূপই করিয়া ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন করিতে থাক। ইতি ২৬শে পৌষ ব্রাহ্মাব্দ ৫৮।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

# উত্তর ভাগ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### ধূলট

ধূলট গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান পর্ব্ব। মাঘ মাসের শুক্লা-সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে ইহা শেষ হয়। পূজ্যপাদ অদ্বৈতপ্রভুর নাম বঙ্গদেশে সকলেই জানেন। মাঘমাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, জননী নাভা দেবী। শ্রীহট্টের অন্তর্গত নবগ্রামে তাঁহাদের বাড়ী ছিল। কুবের পণ্ডিত গঙ্গাবাস করিবার জন্য শান্তিপুরে বাড়ী করিয়াছিলেন। তিনি শেষজীবনে এই শান্তিপুরের বাড়ীতে থাকিয়া গঙ্গাবাস করিতেন। মহাপ্রভু অবতার গ্রহণ করিলে অদ্বৈতপ্রভু নবদ্বীপেও একখানি বাড়ী করিয়াছিলেন। তিনি কখনও শান্তিপুরে, কখনও নবদ্বীপে বাস করিতেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভুও মাঘমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে আবির্ভূত হইয়া বঙ্গভূমিকে পবিত্র করেন। রাঢ়দেশে একচক্রা (বীরচন্দ্র-পুর) গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। নিতাইচাঁদ অল্পবয়সেই এক সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া যান এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া মহাপ্রভু প্রকট হইলে

নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর মাঘী পূর্ণিমাতে কাটোয়া নগরে শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকট শিখাসূত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। এই পবিত্র দিনত্রয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের নিকটে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই পবিত্র দিন তিনটি স্মরণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত সমারোহের সহিত একটি উৎসব করিয়া থাকেন। সেই উৎসবের নাম ধূলট। বৈষ্ণবগণ ধূলটের শেষ দিনে নগরসংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া পরস্পরের গাত্রে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ধূলিবর্ষণ হইতেই উৎসবের নাম ধূলট হইয়াছে।

অদ্বৈত প্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে শান্তিপুরে ধূলট হয়। তাহার পর নিতাইচাঁদের জন্মদিন ত্রয়োদশীতে বীরচন্দ্রপুরে এবং গোরাচাঁদের সন্ন্যাস-গ্রহণের দিবস মাঘী পূর্ণিমাতে নবদ্বীপে ধূলট হইয়া থাকে। এই উৎসবটি বৈষ্ণবদিগের অতিশয় আদরের জিনিস। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর অত্যন্ত সমারোহের সহিত ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

গোস্বামিমহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতে মুক্তভাবে ইচ্ছামত সমস্ত কার্য্য করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে একটু চাপিয়া চলিতে হইত। এখন তাঁহার সে বাধা না থাকাতে তিনি মুক্তভাবে সমস্ত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকার একরামপুর নামক পল্লিতে বাড়ীভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ, বংশপ্রতিষ্ঠাতা অদ্বৈতপ্রভুর জন্মদিন উপলক্ষে মহাসমারোহে ধূলট উৎসব করিলেন। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভুর আসনস্থাপন করিয়া প্রতিদিন পূজা, ভোগ ও আরতি করা হইত। ভোগ ও আরতির সময়ে সংকীর্ত্তন

হইত। ধূলটে সমাগত সাধু মহান্তগণের তানলয়বিশুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ সুমধুর সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনে উৎসবক্ষেত্র আনন্দবাজারে পরিণত হইয়াছিল। গোস্বামিজীও তাঁহার প্রেম, লোকোত্তর শক্তি এবং মহাভাবের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া সাধারণের মধ্যে তাহা সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। যে বিপুল-সলিলা বেগবতী নদীর শৈলকাননবিধ্বংসী বেগ এতদিন ব্রাহ্মসমাজরূপ গণ্ড-শৈলে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা অপগত হওয়াতে সেই স্রোতস্বতী উত্তালতরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া ঢাকা নগর প্লাবিত করিল। ঢাকাবাসী সমুদায় নরনারী তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া হাঁবুডুবু খাইতে লাগিল। মহাভাবের স্রোত ছুটিল। ভক্তিদেবী ভগবানের পাদপদ্ম হইতে প্রেমসুধা আনয়ন করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর শুষ্ককণ্ঠে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। সে অমৃত পান করিয়া সকলেই সুশীতল হইলেন, জুড়াইলেন। ঢাকার লোক গোস্বামিমহাশয়ের অলৌকিক মহাশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

ধূলটে একটি অন্ধ বৈষ্ণব আসিয়াছিলেন; তাঁহার তানলয়বিশুদ্ধ সুমিষ্ট সংকীর্ত্তনে সকলেই অতীব তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ধূলটে যে প্রকার জমাট ও ভাবপূর্ণ গান ও কীর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব; কেহ কখনও সেরূপ অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তন শ্রবণ করে নাই। গোস্বামিমহাশয় যখন কীর্ত্তনানন্দে ও মহাভাবে মাতোয়ারা ও আত্মহারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া হরিনামের উচ্চধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেন, তখন মনে হইত, আবার নবদ্বীপলীলার আবির্ভাব হইয়াছে; চারিশত বৎসর পরে গোরাচাঁদ আবার সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া সংকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহারা সে ধূলট-মহোৎসব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরে তাহা চিরদিনের জন্য দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা কখনও সেই মহাসংকীর্ত্তন, জীবন্ত

ধর্ম্মভাব ও প্রেমের প্রবল স্রোত বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগের শ্রীগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে যে প্রকার সংকীর্ত্তনাদির কথা পাঠ করিয়াছিলেন, এই ধূলটে তাঁহারা স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ধূলটের সেই জীবন্ত ছবি ও জমাট ভাব বর্ণনাদ্বারা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার।

ধূলটের শেষ দিনে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। "হরি বলব মুখে যাব সুখে ব্রজধাম, কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম।" (১) মৃদঙ্গ ও করতালবাদ্যের সহিত এই গান গাইতে গাইতে সকলে গোস্বামি-মহাশয়ের সহিত রাজপথে বাহির হইলেন। দেখিতে দেখিতে রাজপথ লোকারণ্য হইয়া গেল। অনেকগুলি কীর্ত্তনের দল আসিয়া সংকীর্ত্তনের সহিত যোগ দিল। খোলকরতালের শব্দে ও হরিনামের ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভক্তির স্রোতে, ভাবের বন্যায় নগর ভাসিয়া গেল। সেরূপ নগর সংকীর্ত্তন ঢাকার লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। সে প্রকার কীর্ত্তন দেখা ত দূরের কথা, কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। হরিনামে ঢাকা নগর টলমল করিতে লাগিল। নামের তীব্র মদিরা পান করিয়া সকলে এমনই মাতোয়ারা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের বাহ্য-জ্ঞান ছিল না। একটি বালক ভাবে উন্মত্তবৎ হইয়া গিয়াছিল। সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আহারনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাগলের ন্যায় পথে পথে হরিধ্বনি করিয়া বেড়াইত। তাহার অভিভাবকগণ বহুযত্নে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে সমর্থ হন। বালকের মধ্যে এইরূপ আশ্চর্য্য ভাবের

(১) হরি বলব মুখে যাব সুখে ব্রজধাম, কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম।
এ নাম শিব জপিছেন পঞ্চমুখে, নারদ করে বীণায় গান॥
এবার গুরুনামে দিয়া ডঙ্কা, রাধা নামে দাও বাদাম॥

বিকাশ দেখিয়া সকলে যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ধূলটে গোস্বামিমহাশয় যে অলৌকিক ভাব ও প্রবল শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব বহুদিন পর্য্যন্ত লোকের মধ্যে ছিল। এই সংকীর্ত্তনেই অশ্বিনীকুমার মিত্রের জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। কীর্ত্তনের পর সে অনেক দিন পাগলের মত কেবল হরিবোল বলিয়া বেড়াইত। পরে প্রভুপাদের কাছে সাধন পায়।

এই সময়ে ঢাকানগরে একটি হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এক প্রবল ঘূর্ণীবায়ু ( tornado ) উপস্থিত হইয়া ঢাকা লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। যে স্থান দিয়া ঘূর্ণী বায়ু চলিয়া গিয়াছিল, সে স্থান একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল। তথাকার বহু লোকের অপঘাত মৃত্যু ও বহু অট্টালিকা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঘূর্ণীবায়ুর সময়ে কেহ যেন অন্তরীক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিগোলক লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতেছে, এইরূপ দৃষ্ট হইয়াছিল। ঘূর্ণীবায়ু আরম্ভ হইলে গোস্বামিমহাশয় চিৎকার করিয়া মহাবীরজীর স্তব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল স্তব করিবার পর ঘূর্ণীবায়ুর নিবৃত্তি হয়। ঘূর্ণীবায়ু থামিয়া গেলে প্রভুপাদ বলিলেন, মহাবীরজী আগুনের গোলা লইয়া খেলিতে খেলিতে যে দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন, সে দিক্ একেবারে ছারখার হইয়া যাইতেছিল। আমি স্তব করাতে তিনি শান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই ঘূর্ণীবায়ুতে অনেকের গৃহ ভগ্ন, বহুলোকের প্রাণনাশ ও বিস্তর নৌকা ভগ্ন ও জলমগ্ন হওয়াতে বহুলোকের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। বায়ুর প্রবল শক্তিতে বড় বড় নৌকা অট্টালিকার ছাদের উপর উঠিয়া গিয়াছিল। একটি গ্রামে বহু নরনারীকে পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিল। ঢাকার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় নবাব গণি মিঞা সাহেবের বাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে ঢাকার কিছু দূরে ধামরাই গ্রামে দুইটি সাধু বাস করিতেন। এক জনের নাম পরশুরাম আর একজনের নাম সাসাহেব। পরশুরাম জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন। ইহাঁর অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল। পুত্রগুলি সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত ও উপার্জ্জনক্ষম ছিল। কন্যাগুলিও সৎপাত্রে অর্পিত হইয়াছিল। পরশুরামের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু তাঁহার এ সুদিন রহিল না। তিনি ঘোর দুর্দ্দশায় পতিত হইলেন। তাঁহার সমস্তগুলি সন্তানই একে একে কালকবলে পতিত হইল। কিছুদিন পরে তাঁহার সমস্ত অর্থও নষ্ট হইয়া গেল। তখন পরশুরাম অতিশয় দুরবস্থায় পড়িলেন। গ্রামের একটি ব্রাহ্মণ তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। এ আশ্রয়ও পরশুরামের ভাগ্যে অধিক দিন থাকিল না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া গ্রাম্যদেবতা মাধবের দ্বারস্থ হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন। যাঁহারা প্রতিদিন দেবদর্শনে আসিতেন, তাঁহারা দয়া করিয়া নিরাশ্রয় বৃদ্ধকে কিছু কিছু দিতেন, তাহাতেই পরশুরামের কথঞ্চিৎ জীবনরক্ষা হইত। শোকে দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ দুরবস্থায় পড়িয়া গত্যন্তরের অভাবে একান্তভাবে তিনি মাধবের শরণাগত হইলেন। তাঁহার দ্বারে পড়িয়া তিনি দিবানিশি ভক্তিভাবে অনন্যমনে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। ভগবান্ নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি। তিনি নিরাশ্রয় পরশুরামের প্রতি প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। পরশুরাম মাধবকে দর্শন করিয়া ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিলেন। মাধবের কৃপায় তাঁহার অন্ধত্ব ঘুচিয়া গেল।

সাসাহেব মুসলমান ফকির। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁহার একটি শিষ্যের গুরুভক্তি অতুলনীয় ছিল। এরূপ গুরুভক্ত

সচরাচর দেখা যায় না। দিনমজুরী বা কাষ্ঠাদিবিক্রয় করিয়া সেই শিষ্য যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ গুরুসেবায় অর্পণ করিতেন। অপরার্দ্ধদ্বারা তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত। তাঁহার আয় অধিক ছিল না। সেই আয়ের অর্দ্ধাংশদ্বারা অতিকষ্টেই তাঁহাদের খাওয়াপরা চলিত। একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে অতি দীনভাবে তাঁহারা থাকিতেন। বিছানার অভাবে তাঁহারা খড়ের উপর শয়ন করিতেন। শীতকালে খড়ের দ্বারাই তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের শীত নিবারণ হইত। এত কষ্টেও তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। বাজারে গিয়া কোন ভাল বস্তু দেখিলে সেই অল্প পয়সা হইতে গুরুর জন্য তাহা ক্রয় করিয়া গুরুকে প্রদান করিতে সেই গুরুগতপ্রাণ শিষ্য পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। স্ত্রীটিও স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি কখনও স্বামীর গুরুসেবায় বাধা দেন নাই। এ প্রকার গুরুভক্তিদ্বারা তিনি ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের লীলা দর্শন করিতেন। কোন কোন দিন এরূপ ঘটিত যে, তিনি গুরুর নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে "আরে কৃষ্ণ বলরাম গরু চরাইতে যাইতেছেন," এই বলিয়া যষ্টি হস্তে ছুটিতেন।

এক দিন গুরুদেবকে বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইল। তিনি বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সাসাহেব বলিলেন, আমার গুরুদেব আমাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন। গুরুর কথা শুনিয়া শিষ্য বলিলেন, গুরু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ত করিতেই হইবে। সাসাহেব বলিলেন, আমি যে বৃদ্ধ; বৃদ্ধকে কে মেয়ে দিবে? শিষ্য কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কেহ বৃদ্ধকে মেয়ে দিবে না। আচ্ছা তবে এক কাজ কর। তুমি আমার স্ত্রীকে নিকা কর। সাসাহেব বলিলেন, পাগলা, তুই জীবিত থাকিতে তাহা কিরূপে হইবে? শিষ্য বলিলেন—তবে আমি মরি, তুমি আমার বিধবা স্ত্রীকে নিকা কর।

তাহার কথা শুনিয়া সাসাহেব বলিলেন, কি বলিস তার ঠিক নাই। তোর স্ত্রী যে আমার মেয়ে। গুরুর কথা শুনিয়া শিষ্য বলিলেন, তা যেন হ'ল। কিন্তু গুরুআজ্ঞা ত তোমাকে পালন করিতেই হইবে। ঘটনাটি প্রভুপাদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, লিপিবদ্ধ করিলাম।

গোস্বামিমহাশয় ধামরাই গিয়া এই দুই মহাপুরুষ ও মাধবকে দর্শন করিলেন। এই ধামরাই গ্রামে গোস্বামিপাদের কয়েকজন শিষ্যের বাড়ী। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মল্লিক, ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরী, ইনিও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ইনি কিছুকাল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে সন্ন্যাসী হইয়া সচ্চিদানন্দ স্বামিনামে অভিহিত হন। অপর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দাস, ইনি তন্তুবায়। ইনি বাঁকিপুরের উকীল ছিলেন, শেষ জীবনে বৃন্দাবনে বাস করেন। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺মনোমোহন দাসও প্রভুপাদের কৃপাপাত্র। ইনি পশ্চিমাঞ্চলে সরকারী ডাক্তার ছিলেন। শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগছি (বিশ্বাস) মহাশয়ের বাড়ীও ধামরাইতে ছিল। ইনিও গোস্বামিপাদের শিষ্য এবং বরাবর প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## জ্ঞানবাবুর বিবাহ
## ও
## দাতামাইসম্মিলন

ধুলট হইবার পর গোস্বামিমহাশয় একটি বিবাহ উপলক্ষে হুগলি জেলার অন্তর্গত বৈঁপাড়া গ্রামে গমন করেন। দ্বারাভাঙ্গানিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্তের জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্তের সহিত ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন বসু মহাশয়ের কন্যা শৈবলিনীর বিবাহ হয়। গোস্বামিপাদ এই বিবাহের বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা দুইই ছিলেন। তাঁহার আদেশে ও উদ্যোগে এই উদ্বাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

বিবাহান্তে এক দিন মধ্যাহ্নে আহারের পর সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটা প্রবল ভাবের স্রোত সকলের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই সময়ে গোস্বামিমহাশয় সমাধিস্থ ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি বলিতে লাগিলেন, একটি ভাবনা গেল, নিশ্চিন্ত হইলাম। পরে তাঁহার বাহ্যদশা হইলে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? গোস্বামিপাদ বলিলেন, আজ সমস্ত মহাপুরুষ একত্র হইয়া ভারতবর্ষের দুঃখদুর্গতি দূর করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ অতিশয় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার প্রকাশে নক্ষত্রসকল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সমুদ্র উদ্বেলিত হইল, পর্ব্বত সকল কাঁপিতে লাগিল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া কেহ নামসংকীর্ত্তন, কেহ নৃত্য, কেহ স্তব করিতে লাগিলেন। কেহ ভাবে বিভোর হইয়া অজ্ঞান হইলেন। ইহার পর শীঘ্রই দেশের দুর্গতি দূর হইবে" ভগবানের

এই বাণী শুনিতে পাওয়া গেল। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে জ্ঞানবাবুর বিবাহের দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য গোস্বামিমহাশয় কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র-বাবু সমুদায় দ্রব্য ক্রয় করিয়া অপরাহ্নে থৈপাড়া যাইবার পথে বড় বাজারের এক দোকানে কিছু দুধ কিনিতে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল চারিটি পয়সা ছিল। তাহা দিয়া দুধ কিনিয়া খাইবেন, মনে করিয়াছিলেন। এমন সময়ে এক জন সন্ন্যাসী দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিলেন। মহেন্দ্রবাবু দুধ না কিনিয়া পয়সা চারিটি সাধুকে দিলেন। সাধু পয়সা কয়টি লইয়া প্রস্থান করিলেন। মহেন্দ্রবাবু থৈপাডায় চলিয়া গেলেন। তিনি উপনীত হইবামাত্র গোস্বামিমহাশয় সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংবাদ কি? সাধুকে পয়সা দিলেন? মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, হাঁ, দিয়াছি। ইহার ভিতরে কিছু রহস্য আছে কি? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, "আপনাকে দুধ কিনিতে দেখিয়া আমার এক জন সতীর্থকে পয়সা কয়টি লইবার জন্য আপনার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি সে সময়ে কলিকাতায় গঙ্গাতীরে ছিলেন। আমার ইঙ্গিতে তিনি আপনার নিকট যাইয়া পয়সা কয়েকটি চাহিয়া লইলেন। বাস্তবিক তাঁহার পয়সার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। সে সময়ে দুধ খাইলে আপনার ওলাউঠা হইত। আপনাকে পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছে।"

জ্ঞানের বিবাহের পর গোস্বামিপাদ সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া ১৮ নং কৃষ্ণদাস পালের লেনে বাস করেন। হুগলি জেলা ম্যালেরিয়া জ্বরের কেল্লা। তাঁহার পরিবারগণ থৈপাড়া হইতে

ম্যালেরিয়ার বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহাদিগকে ঐ জ্বরে কিছুদিন অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই বাড়ীতে থাকাসময়ে বহু লোক গোস্বামিমহাশয়ের নিকট দীক্ষা পাইয়াছিলেন। সাধনপ্রাপ্ত সেই সকল লোকমধ্যে পঞ্চাননতলানিবাসী স্বর্গীয় নন্দলাল দের পত্নী অন্যতমা। নন্দবাবুর স্ত্রীকে সাধন দিবার জন্য গোস্বামিপাদ নন্দবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। নন্দবাবুর স্ত্রীর দীক্ষার পর শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরীর প্রার্থনামত প্রভুপাদ তাঁহাকে সন্ন্যাসপ্রদান করেন। (১) সন্ন্যাস দিবার সময়ে হরিমোহনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এখানে দিলাম :—

১। ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিও না। থালা, ঘটি, বাটী প্রভৃতি ধাতুপাত্রে আহার বা জলপান করিও না। কেহ ধাতুপাত্রে খাদ্যবস্তু ও পানীয় প্রদান করিলে, খাদ্যদ্রব্য পাতা অথবা কোঁচোড়ে ঢালিয়া লইবে, পানীয় দ্রব্য হাতে করিয়া পান করিবে। নদীপার হইতে হইলে পয়সার অভাবে নদীতীরে বসিয়া থাকিবে, তথাপি পয়সা স্পর্শ করিবে না। সন্তরণদ্বারা নদীপার হওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রশস্ত নহে। করঙ্গব্যবহার করিলে লাউ, কাঠ বা নারিকেলের করঙ্গ ব্যবহার করিবে।

২। স্ত্রীলোকস্পর্শ করিবে না। যদি কোন সাধুরমণী দয়া করিয়া স্পর্শ করেন, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু নিজে কদাচ

(১) শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরীর বাড়ী ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের মাষ্টার ছিলেন। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৎকালে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে তিনি সুন্দরী যুবতীভার্য্যা ও বালকপুত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের কথা যে, তিনি তাঁহার এই পবিত্র সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করেন নাই; সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।

স্পর্শ করিবে না। কোন নারীকে প্রণাম করিতে হইলে দূরে থাকিয়া প্রণাম করিবে। মৃত্তিকার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে।

৩। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে এক রাত্রির অধিক বাস করিবে না। বৃষ্টি প্রভৃতি অনিবার্য্য কারণে থাকিতে বাধ্য হইলে সেই গ্রামের অন্য গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিবে। কোন সাধুর আশ্রমে গমন করিলে তথায় দীর্ঘকাল বাস করিতে পারিবে। কিন্তু এক দিন মাত্র তাঁহাদের অন্নভোজন করিয়া পরে নিজে ভিক্ষা করিয়া খাইবে। তাঁহাদিগের গৃহে বাস করিতে বাধা নাই। গুরুভাইদিগের গৃহে যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পারিবে। তাঁহাদিগকে গৃহস্থ মনে করিবে না। গৃহস্থ হইলেও তাঁহারা উদাসীন। খাদ্যবস্তু ভিন্ন অন্য দ্রব্য ভিক্ষা করিবে না। তিন বাড়ী পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিবে। কিন্তু এক বাড়ীতে উপযুক্ত খাদ্য পাইলে, অন্য বাড়ীতে ভিক্ষা করিবে না। তিন বাড়ীতে ভিক্ষা না পাইলে উপবাস করিয়া থাকিবে। উচ্ছিষ্ট রাখিবে না এবং কাহাকেও দিবে না।

৪। শ্রাদ্ধের অন্ন কখনও ভোজন করিবে না। এই কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে।

৫। তিন চারি ক্রোশের অধিক পথ চলিবে না। আড্ডা না পাইলে অধিক পথ চলিতে পারিবে।

৬। সদানন্দ, নিরহংকার ও নির্ব্বৈর হইবে।

তুমি যে পথে পদার্পণ করিতেছ, তাহা রাজপদ হইতেও শ্রেষ্ঠ। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, শুকদেব, মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের বংশে আজি তুমি জন্মগ্রহণ করিলে। সাবধান যেন পথের গৌরব নষ্ট না হয়।"

এই সময়ে কলিকাতার কলিঙ্গা অঞ্চলে লক্ষ্মীমাই নাম্নী এক জন

মুসলমান রমণী বাস করিতেন। তাঁহার সিদ্ধি ছিল বলিয়া প্রবাদ ছিল। তিনি লোকের ভবিষ্যৎ কথা এবং দূরবর্ত্তী আত্মীয়গণের সংবাদ বলিতে পারিতেন। এজন্য অনেক লোক তাঁহার কাছে আসিয়া বিদেশবাসী আত্মীয়গণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনিও খবর বলিয়া দিতেন। অনেক ইংরাজমহিলাও তাঁহার নিকট আসিয়া বিদেশবাসী আত্মীয়বন্ধুগণের সংবাদ জানিয়া যাইতেন।

গোস্বামিমহাশয় দাতামাইএর নাম শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দাতামাই গোস্বামিমহাশয়কে আদর করিয়া তাঁহার আসনের এক পাশে বসাইলেন। সে সময়ে তিনি পাটালী খাইতে ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত দন্তাবলির রন্ধ্রপথনিঃসৃত লালারসে পাটালী আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। দাতামাই সেই পাটালী গোস্বামিপাদের মুখে পূরিয়া দিলেন। প্রভুপাদ কামড়াইয়া পাটালীর কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। অবশিষ্ট অংশ দাতামাইএর হাতে রহিয়া গেল। দাতামাই সেই পাটালীখণ্ড গোস্বামিমহাশয়ের শিষ্যগণকে দিতে উদ্যত হইলে প্রভুপাদ তাঁহাকে বাধা দিয়া নিজের মুখের পাটালী শিষ্যদিগকে দিলেন। তিনি জানিতেন, দাতামাইএর লালারসে আর্দ্র পাটালী ভক্ষণ করিতে শিষ্যদিগের রুচি হইবে না। তিনি অনেক মিষ্টান্ন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা দাতামাইকে দেওয়া হইল; দাতামাইও অনেক মিষ্টান্ন আনাইয়া সকলকে ভোজন করাইলেন। অনন্তর তিনি খানিকটা গাঁজা গোস্বামিমহাশয়ের মুখে পূরিয়া দিলেন। প্রভুপাদের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া গাঁজা গজায় পরিণত হইল। ভোজনসময়ে তিনি গাঁজার পরিবর্ত্তে গজার আস্বাদন পাইলেন। আসিবার সময়ে পথে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

তৎপরে দাতামাই গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন যে, তোমার শিষ্যদিগের ভক্তিপরীক্ষা করিব। ইহাদিগকে বিষ্ঠা খাইতে বলিয়া দেখিব যে, ইহারা তাহা খায় কি না? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, ইহারা আপনার আদেশপালন করিতে পারিবে না। ইহারা জন্মাবধি কখনও এইপ্রকার বীভৎসকার্য্য করে নাই। ধর্ম্ম করিতে হইলে যে বিষ্ঠা খাইতে হয়, ইহারা সেরূপ শিক্ষাও পায় নাই। আর বিষ্ঠাভক্ষণের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? তাঁহার কথা শুনিয়া দাতামাই তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন। অনন্তর গোস্বামিমহাশয় দাতামাইকে বলিলেন, আমার কন্যাটি § বড় হইয়াছে, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। তুমি তাহার বিবাহ দিয়া দাও। দাতামাই বলিলেন, বর ত সঙ্গেই রহিয়াছে। ব্যস্ত হইও না, শীঘ্রই বিবাহ হইবে। এইরূপে দাতামাইএর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করিয়া গোস্বামিমহাশয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ইহার কিছুদিন পরে তিনি সপরিবারে ঢাকায় গমন করেন।

§ শ্রীমতী শান্তিসুধা।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## গেণ্ডারিয়ায় আশ্রমস্থাপন

গোস্বামিপাদ পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া একরামপুরের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। পরে তাঁহার ঢাকার শিষ্যগণ তাঁহার জন্য একটি আশ্রমনির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া স্থির করিলেন যে, এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা প্রত্যেকে এক মাসের আয় দিবেন। এই প্রকার পরামর্শ করিয়া তাঁহারা এ বিষয় গোস্বামিজীকে জানাইলেন। তিনি তাঁহাদিগের প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে এবং তিনি স্বয়ং স্থাননির্ব্বাচন করিলে তাঁহারা গেণ্ডারিয়াতে তিন বিঘা জমি ক্রয় করিয়া আশ্রমনির্ম্মাণ করিলেন। আশ্রমে চারি খানি খড়ের ঘর, একটি পাকা কোঠা এবং গোস্বামিমহাশয়ের সাধনের জন্য মৃত্তিকাপ্রাচীরে বেষ্টিত খড়ের চালযুক্ত একটি ভজনকুটীর নির্ম্মিত হইল। ভজনকুটীরের দুইটি প্রকোষ্ঠ; একটি প্রকোষ্ঠে প্রভুপাদের ভজনের জন্য আসন প্রতিষ্ঠিত হইল; দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটি পাঠ, কীর্ত্তন এবং লোকের সহিত আলাপাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। কুটীরের সম্মুখস্থ উন্মুক্তস্থানে একটী আম্রবৃক্ষ ছিল। মধ্যাহ্নের আহারের পর ইহার নীচে বসিয়া গোস্বামিপাদ ভজন করিতেন।

১২৯৫ সালের জন্মাষ্টমীতে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সপরিবারে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক কুটীরে বসিয়া চা খাইতেন। পরে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ চৈতন্যচরিতামৃত ও নরোত্তমদাসের প্রার্থনা পাঠ

করিতেন। কুঞ্জবাবুর পাঠ শেষ হইলে প্রভুপাদ নিজে গুরুনানকের 'গ্রন্থসাহেব,' তুলসীদাসকৃত হিন্দি রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থসকল পাঠ করিতেন। * বেলা এগারটার সময়ে পাঠশেষ করিয়া তিনি স্নানাহার করিতেন। আহারান্তে কুটীরের নিকটবর্ত্তী আম গাছের নীচে বসিয়া ভজন করিতেন। এই সময়ে তাঁহার নিকট বহু লোক উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। সন্ধ্যাকালে সংকীর্ত্তন হইত। কীর্ত্তনান্তে তিনি তাঁহার বাসগৃহে আগমন করিয়া শিষ্যগণের সঙ্গে কিছুকাল সাধন করিতেন। পরে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে আহার করিতেন। তিনি মধ্যাহ্নে ভাত ও রাত্রিতে রুটী খাইতেন। এইরূপে তিনি তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যসকল নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিতেন। এক মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা নষ্ট করিতেন না। তিনি দিবারাত্রি ঘড়ি ধরিয়া সমস্ত কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বাহ্নে পাঠ করা ভিন্ন দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি ভগবানে যুক্ত হইয়া সমাধিস্থ থাকিতেন। রজনীতে কখনও সমাধিযোগে ভগবানের সত্তাসাগরে নিমজ্জিত, কখনও বা সূক্ষ্মদেহে লোকলোকান্তরে পর্য্যটন করিতেন। স্বেচ্ছায় আপন দেহ পীড়াগ্রস্ত করিয়া লিঙ্গদেহে গোলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস প্রভৃতি অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে যাইয়া অবস্থান করিতেন। লোকে মনে করিত, তাঁহার পীড়া হইয়াছে। তিনি দেহে ফিরিয়া আসিলে শরীর সুস্থ হইত। শরীরে প্রবেশ করিবার পর পীড়ার গূঢ়রহস্য

* অযোধ্যার নানকপন্থী মহাত্মা মাধোদাস বাবাজি গোস্বামিমহাশয়কে গ্রন্থসাহেব পাঠ করিতে বলেন। বাবাজির কথায় তিনি প্রতিদিন গ্রন্থসাহেব পাঠ করিতেন। গুরুদেবের নিকট সর্ব্বদা বাস করিবার সংকল্প করিয়া বাবু রাধারমন গুহ, বাবু কুঞ্জ-বিহারী ঘোষ, ৺শশীমোহন বসু ও ৺সতীশচন্দ্র গুহ আশ্রমের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে জমি কিনিয়া বাড়ী করিয়াছিলেন। কুঞ্জবাবু গোস্বামিপাদের যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন।
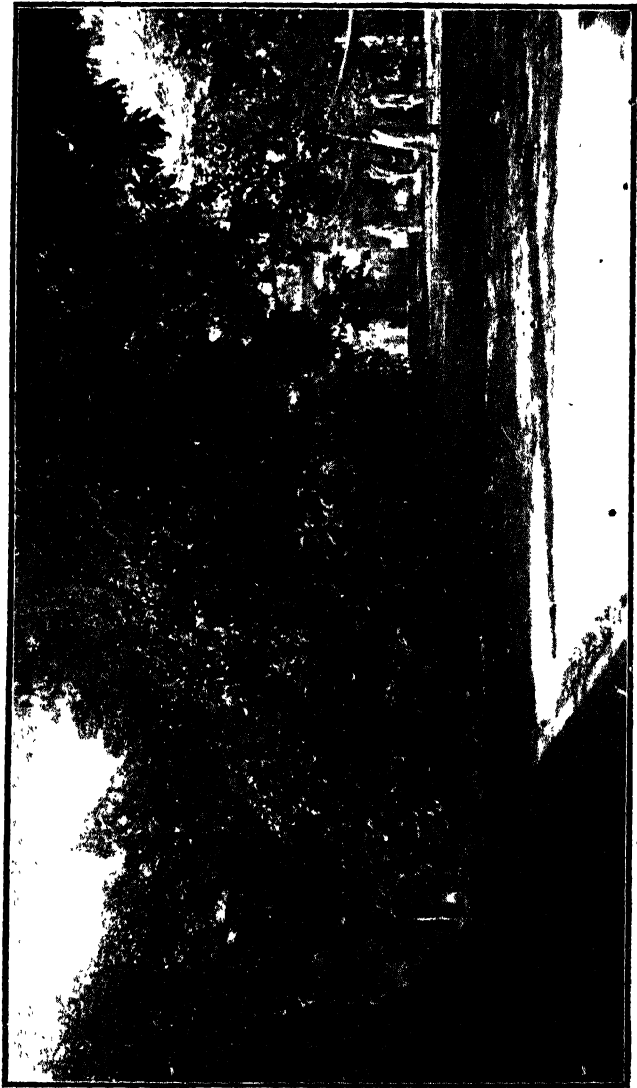
ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রম

প্রকাশ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি এইরূপ নিয়মে চলিয়াছেন। কখনও ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। পূর্ব্বাহ্নে অধিক পাঠ করিতে দেখিয়া এক দিন তাঁহার অন্যতম শিষ্য বাবু অভয়নারায়ণ রায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি এত বেশী সময় পাঠ করেন কেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "বাহিরের সহিত যোগ রাখিবার জন্য আমাকে এত অধিক সময় পাঠ করিতে হয়। তাহা না করিলে আমাকে ভিতরে টানিয়া লইয়া যায়। সেই আকর্ষণে আমাকে এমন আত্মস্থ করিয়া ফেলে যে, আমি কিছুতেই বাহিরের সহিত যোগ রাখিতে পারি না।

এক দিন আমতলায় বসিয়া ভজন করিবার সময়ে শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, আমরা বর দিতেছি যে, তোমার নিকট সমস্ত শাস্ত্র প্রকাশিত হউক। তাঁহাদিগের বরে তৎক্ষণাৎ সমুদায় শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইল। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন। তখন সমস্ত শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব ও গূঢ় রহস্য করতলগত আমলকের ন্যায় তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল। সূর্য্য উদিত হইলে সমস্ত বস্তু যেমন লোকলোচনের গোচরীভূত হয়, কিছুই অপ্রকাশিত থাকে না, শাস্ত্রসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হওয়াতে তিনি সমস্ত শাস্ত্রতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, শাস্ত্রের প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক মন্ত্র, প্রত্যেকবর্ণ অভ্রান্ত ও সজীব। তাহারা তাঁহার সহিত কথা বলিত। শাস্ত্রের মধ্যে বিন্দুমাত্রও কল্পনা বা ভ্রমপ্রমাদ নাই। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য নাই। আর শাস্ত্রে বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মের যে উল্লেখ আছে, তাহা সমস্তই সত্য।

বিভিন্ন অধিকারীর জন্য শাস্ত্রকর্ত্তাগণ বিভিন্নধর্ম্মের উপদেশপ্রদান করিয়াছেন। স্থূলদৃষ্টিতে এই সকলের মধ্যে পার্থক্যবোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও অমিল বা অসামঞ্জস্য নাই। তবে শাস্ত্রে যে সকল প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, তাঁহা সজীব ও অভ্রান্ত নহে।

অধ্যয়নদ্বারা যে শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না, শাস্ত্রেও এ কথার উল্লেখ আছে। মহাভারতে উপমন্যু ও আরুণির বিবরণ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের সেবায় গুরু প্রসন্ন হইয়া যাই বর দিলেন যে, তোমাদিগের মধ্যে সমুদায় শাস্ত্র স্ফূর্ত্তিলাভ করুক, অমনি তাঁহারা সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হইলেন। শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হওয়াতে তাঁহারা শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলেন।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমেও তিনি সমারোহের সহিত ধূলট করিয়াছিলেন। এ ধূলটেও পূর্ব্ববর্ত্তী ধূলটের ন্যায় ভাব ও প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## শান্তিপুর হইয়া কলিকাতায় আগমন

১২৯৫ সালের কার্ত্তিক মাসে জননীকে দেখিতে এবং আমার সঙ্গে তাঁহার কন্যা শান্তিসুধার বিবাহ স্থির করিবার জন্য গোস্বামিপাদ শান্তিপুরে আগমন করিলেন। তিনি ঢাকা হইতে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমি শান্তিপুরে যাইতেছি, তুমি সেখানে আমার

সহিত দেখা করিও।" তাঁহার পত্র পাইয়া আমি শান্তিপুরে গিয়া তাঁহার চরণদর্শন করিলাম। সে রাসযাত্রার সময়। শান্তিপুরের রাসযাত্রা বিখ্যাত। অতি সমারোহের সহিত ইহা অনুষ্ঠিত হয়। নানাপ্রকার আমোদ, যাত্রা প্রভৃতি এই উপলক্ষে হইয়া থাকে। এক-দিন আমরা গোস্বামিপাদের সহিত রাস দেখিতে যাইয়া দেখিলাম যে, কয়েকজন লোক রাস্তার ধারে কানাত (কাপড়ের ঘেরা) টাঙ্গাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া প্রস্তরীভূত একটি মানুষ দেখাইতেছে। তাহার দর্শনী এক পয়সা। গোস্বামিমহাশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পয়সা দিয়া ভিতরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গেলাম। গিয়া দেখি যে একটি অর্দ্ধ প্রস্তরীভূত মানুষ শুইয়া আছেন। তাঁহার পিঠের দিক্‌টা শক্ত, পাথরের মত হইয়া গিয়াছে। কেবল পেট হাত পায়ের উপরদিক্ ও মুখ স্বাভাবিক আছে। তিনি নড়িতে চড়িতে, পাশ ফিরিতে, বসিতে, দাঁড়াইতে একেবারেই পারেন না। কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট, কিছুই বুঝা যায় না। গলার স্বর পাখীর স্বরের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিলাম, তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিয়ত অনামিকার মূলদেশ স্পর্শ করিয়া ইষ্টমন্ত্রজপের সাহায্য করিতেছে। সে কার্য্যের বিরাম নাই। আপনা হইতে সে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। গোস্বামিমহাশয় হিন্দীতে বলিলেন, আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি কপাল দেখাইলেন। সঙ্গের লোকেরা বলিল, নেপালের পাহাড়ে তাহারা ইহাঁকে পাইয়াছে। ইনি প্রতিদিন একটিমাত্র কলা আহার করেন। সপ্তাহে দুদিন দুইবার মাত্র অতি অল্প মলত্যাগ করেন। বাহিরে আসিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, ইহাঁর ভজনের অবস্থা উচ্চ। অপরাধবশতঃ এই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। এদেহে আর কিছুই হইবে না। পরজন্মে ইনি সিদ্ধিলাভ করিবেন।

গোস্বামিপাদের কাছে কয়েকদিন থাকিয়া আমি রাসদর্শন করিলাম। এই স্থানেই তিনি আমার সহিত শান্তিসুধার বিবাহ স্থির করিলেন। অতঃপর আমি কলিকাতায় আসিলাম। আমি আসিবার কয়েকদিন পরে গোস্বামিপাদও কলিকাতায় আসিলেন। * তিনি যখনই কলিকাতায় আসিতেন, তখনই নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে থাকিতেন। এবারেও নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে উঠিলেন। এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি আহার করিতেছিলেন। আমি ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু গোস্বামী তাঁহার সহিত খাইতে বসিয়াছিলাম। তাঁহার

* গোস্বামিপাদের এই সময়কার একটী ক্ষুদ্র কার্য্যের কথা এখানে না বলিয়া পারিলাম না। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হইলেও আমার জীবনে ইহা অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছিল। এজন্য আমার কাছে ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। রাসের দিন সন্ধ্যার পর আমরা গোস্বামিপাদের সহিত রাস দেখিতে বাহির হইলাম। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া অনেক বাড়ীতে যাইয়া ঠাকুরদর্শন ও যাত্রাগান শুনিলেন। বাড়ীতে, ফিরিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইল। আমরা বাড়ীতে আসিলে তিনি বলিলেন, তোমাদের কাহারও কাছে দেশলাই থাকিলে দাও, আলো জ্বালি। আমার কাছে দেশলাই ছিল, তাঁহাকে দিলাম। তিনি আলো জ্বালিয়া আমাদিগকে শুইতে বলিলেন। আমরা শয়ন করিলাম, তিনি ভজনে বসিলেন। ইহার পর দিন আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। আমার আসিবার আট দশ দিন পরে গোস্বামিপাদ কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার আগমনসংবাদ শুনিয়া আমি তাঁহার কাছে গেলাম এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার পরই তিনি দেশলাইটি পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, সেদিন রাত্রে তুমি আমাকে এই দেশলাইটি দিয়াছিলে; তোমার আসিবার সময় ইহা তোমাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি দেশলাইটি হাতে লইয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, ক্ষুদ্র বিষয়েও ইহাঁর কত তীক্ষ্ণদৃষ্টি। যিনি সর্ব্বদা সমাধিতে মগ্ন হইয়া আছেন, ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া রহিয়াছেন, এরূপ ক্ষুদ্র বিষয় ত তাঁহার ভুলিয়া যাইবারই কথা। এরূপ না হইলে কি মহাপুরুষ হওয়া যায়?

অন্যতম শিষ্য শান্তিপুরবাসী লালবিহারী বসু রোয়াকে বসিয়া প্রভুপাদের ভোজন দেখিতেছিলেন। আহার করিতে করিতে গোস্বামিপাদ ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, রাম, কৃষ্ণ, অজ, ভব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীগণ আমার সঙ্গে ভোজন করিতেছেন। এ অন্ন মহাপ্রসাদ, পরম পবিত্র। তোরা মহাপ্রসাদ খাবি! খা, খা! এই বলিয়া আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে একত্র খাইতে ডাকিলেন। আমরা পরমানন্দে তাঁহার সহিত ভোজনে বসিয়া গেলাম। এক পাতা হইতে তাঁহার মাখা অন্ন তিনি ও আমরা খাইতে লাগিলাম। সকলের মধ্যে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। সকলেই ভাবের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবুর পত্নী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবী এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং ভাবে বিভোর হইয়া এক থালা ভাত ও এক গামলা ডাল আনিয়া পাতায় ঢালিয়া দিলেন। গোস্বামিপাদ ডাল, ভাত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন এক সঙ্গে মাখিয়া নিজে খাইতে লাগিলেন ও সকলের মুখে দিতে লাগিলেন। ভাবের এই প্রবল তরঙ্গে নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী আত্মহারা হইয়া গোস্বামিমহাশয়ের পাতা হইতে প্রসাদ আনিতে গিয়া অবশ হইয়া পাতার উপরে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অন্নব্যঞ্জনে মাখামাখি হইল। পাতার উপরে তিনি অবশ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহার মহাপ্রভুদর্শন হইল। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিছুকাল প্রবল ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিল। ভাবে বিহ্বল হইয়া সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া প্রসাদ খাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ প্রসাদ লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মাটিতে লুটাইতে লাগিলেন। প্রেমের জোয়ার

বহিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সকলে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এক দিন বিকাল বেলা গোস্বামিপাদ আসনে বসিয়া আছেন, অকস্মাৎ তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া যেন কোন বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া কাহারও অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সিঁড়িতে কোন লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই পরমহংসদেবের শিষ্য ভূপতিবাবু (ভূপতি চক্রবর্ত্তী) এক ঠোঙা খাবার লইয়া প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। গোস্বামিপাদ তাড়াতাড়ি ভূপতিবাবুর হাত হইতে খাবারের ঠোঙাটি লইয়া সমস্তই খাইয়া ফেলিলেন। পরে হাত ধুইয়া জল খাইয়া ভূপতিবাবুর সহিত কথা কহিলেন। ভূপতিবাবু বলিলেন, আজি আপনাকে খাওয়াইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা হইবা-মাত্র দুইটি টাকা লইয়া কলিকাতার যেখানে যাহা ভাল পাওয়া যায় সেখান হইতে তাহা ক্রয় করিয়া এই আপনার কাছে আসিতেছি। গোস্বামিপাদ তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, আমারও অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল। আপনার এই খাবার খাইয়া আমার অতিশয় তৃপ্তি হইয়াছে। অতঃপর তিনি তাঁহাকে কাছে বসাইয়া তাঁহার সহিত অনেক মিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## পুত্র ও কন্যার বিবাহ

১২৯৫ সালের ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবারে গোস্বামিমহাশয়ের পুত্র যোগজীবন ও কন্যা. শান্তিসুধার বিবাহ হয়। বহুস্থান হইতে শান্তি-সুধার সম্বন্ধ আসিয়াছিল, কিন্তু কোনটিই প্রভুপাদের মনঃপুত হয় নাই। পরে তিনি আমাকেই তাঁহার কন্যার বররূপে মনোনীত করেন। আমার সহিত শান্তিদেবীর বিবাহ হয়, তাঁহার পরিবারস্থ কাহারও সে ইচ্ছা ছিল না, কারণ আমি গ্রাজুয়েট নহি। আর আমার আর্থিক অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না। তাঁহারা নানা আপত্তি তুলিয়া অমত প্রকাশ করিলেন। তাহাতে গোস্বামিপাদ বলিলেন:—"মানুষ মানুষের ভরণপোষণ করে না। ভগবান্‌ই সকলের প্রভু। তিনিই সকলকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া থাকেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত, শান্তিসুধার ভারও সেই ভগবানের হাতে। তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহাই হইবে। আর আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, জগদ্বন্ধুই শান্তিসুধার উপযুক্ত ভর্ত্তা। তাহার সহিত বিবাহ হইলেই শান্তি সুখী হইবে। অন্য স্থানে বিবাহ হইলে তাহার কষ্টের অবধি থাকিবে না। জগদ্বন্ধুর সহিত তাহার বিবাহ হইলে তাহাকে সৌভাগ্য-শালিনী মনে করিতে হইবে। আমি পরিষ্কার দেখিতেছি যে, জগদ্বন্ধুর ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল। আর তাহার সহিত আমাদের কেবল এই জন্মের সম্বন্ধ নহে। জন্ম জন্ম তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ। তোমরা

কিছুতেই এ বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে না। গুরুদেব, মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভুর আদেশে আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সমস্ত পৃথিবী বিরুদ্ধ হইলেও আমি এ কার্য্য হইতে বিরত হইব না। তবে যদি এ কার্য্য করিতে তোমাদের নিতান্তই অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমরা তোমাদিগের মনোমত স্থানে কন্যার বিবাহ দাও। আমি চলিলাম। আজি হইতে আমি তোমাদিগের সহিত পৃথক্ হইলাম।” এই সময়ে তিনি আমার অতীত জন্মের কথা এমন কি মহাপ্রভুর সময়ে আমি কে ছিলাম, তাহাও বলিয়াছিলেন। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া সকলকে এই বিবাহে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

গোস্বামিমহাশয়ের পুত্রবধূর নাম বসন্তকুমারী। এক দিনেই দুই বিবাহ হয়। গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে সমারোহের সহিত এই উদ্বাহকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। বিবাহে গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ের রঘুবরদাস বাবাজি ও ধামরাইএর ভক্ত সাধু পরশুরাম আগমন করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর দিন সকাল বেলা যে প্রকার মহাসংকীর্ত্তন হইয়াছিল, সেরূপ কীর্ত্তন আমরা জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। মহাভাবের বৈদ্যুতিক শক্তিতে উপস্থিত নরনারীবৃন্দকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। গোস্বামিমহাশয় ভগবৎপ্রেমে বিভোর ও মাতোয়ারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য ও হরিনামের উচ্চনিনাদে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে মহাভাবের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইল। সমস্ত নরনারী ভাবের স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। জননী যোগমায়া দেবী ভাবে বিভোর ও অবশ হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার জননী (দিদিমা) সেই অবস্থায়

তাঁহাকে প্রভুপাদের বামপার্শ্বে স্থাপন করিলে সকলেরই কৈলাস-ধামের কথা মনে হইল। যেন কৈলাসপতি ভগবান্ শূলপাণির বামে-নগেন্দ্রনন্দিনী মা পার্ব্বতী বিরাজিতা। সে অপূর্ব্ব শোভা বর্ণনাতীত। সে সময়ের জন্য গেণ্ডারিয়া আশ্রম যেন কৈলাসধামে পরিণত হইল। সমস্ত নরনারী সে অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন। ভক্ত পরশুরাম গোস্বামিপাদের মধ্যে মাধবকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং "গোঁসাই তুমি মাধবকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াও" এই বলিতে বলিতে নানাপ্রকার স্তব ও দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ গোস্বামিমহাশয়ের পবিত্র পদরেণু মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অকিঞ্চনভক্ত ৺ শ্রীধর ঘোষ গোস্বামিমহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি কখনও আমাকে আপনার সঙ্গছাড়া করিবেন না, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্তকাল আমাকে আপনার নিকটে রাখিবেন—এই প্রার্থনা আমি আপনার মনুষ্যত্বের নিকট করিতেছি না, আঁপনার ব্রহ্মত্বের নিকট করিতেছি। আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন কি না বলুন। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন যে আমি ব্রহ্মরূপে তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, অনন্তকাল তুমি আমার সঙ্গে বাস করিবে। কখনও আমার সহবাসে তোমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

সে দিন মধ্যাহ্নকালে আহারের সময়ে নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, গোঁসাই! আমাদিগকে দই দিবেন না? গোস্বামিমহাশয় নগেন্দ্রবাবুর কথা শুনিয়া জননী যোগমায়া দেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইহাঁদিগকে দই দাও। তাঁহার কথা শুনিয়া মাতা যোগমায়া অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া বলিলেন, কেবল এক হাঁড়ি

দই আছে, তাহাতে ত সমস্ত লোকের কুলাইবে না। সেইজন্য আমি তাহা বাহির করি নাই। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, দইএর হাঁড়ি আমাকে দাও। মাতাঠাকুরাণী দই লইয়া আসিলেন। প্রভুপাদ তাঁহার নিকট হইতে দধির পাত্র লইয়া সকলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং এক হাঁড়ি দধিতে পঞ্চাশ ষাট জন লোককে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। তাঁহার এই কার্য্যে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানবাবু ও শৈবলিনীর বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই শৈবলিনীর সহিত শান্তিসুধার অতিশয় প্রণয় ছিল। জ্ঞানবাবু ধূলট দেখিবার জন্য মাঘমাসে ঢাকায় যান। ধূলট শেষ হইয়া গেলে গোস্বামিমহাশয় জ্ঞানবাবুকে বলিলেন, তুমি যাইবার সময়ে শৈবলিনীকে লইয়া যাইও। এখানে কদাচ রাখিয়া যাইও না। তাঁহার এই আদেশে সকলেই অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। শৈবলিনী শান্তিসুধার প্রিয়সখী। সে দূরদেশে থাকিলে তাহাকে বিবাহে আনিবার কথা। কিন্তু সে নিকটে রহিয়াছে, তাহাকে কি না দূরদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। সকলেই ইহার কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, কোন গুরুতর রহস্য ইহার মধ্যে আছে। সেইজন্যই শৈবলিনীকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইতেছে। সকলেই অতীব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গোস্বামিমহাশয়কে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, শৈবলিনীর ঢাকাতে থাকা নিরাপদ নহে। সে যদি ঢাকায় থাকে, তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত অমঙ্গল হইবে। কতকগুলি প্রেত তাহার অনিষ্ট করিবার সংকল্প করিয়াছে। কুঞ্জবাবু ( নাগ ) যে স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে ঐস্থানে

কয়েকটি বিদ্রোহী সিপাহীকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা প্রেত হইয়া ঐস্থানে বাস করিতেছে। শৈবলিনীর কোন কার্য্যে তাহারা অতিশয় বিরক্ত হইয়া এক দিন আমার নিকটে আসিয়া বলিল যে আপনি শৈবলিনীকে স্থানান্তরিত করুন, নতুবা আমরা তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিব। কাজেই ওবাড়ীতে শৈবলিনীর থাকা হইবে না। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া সকলেই ভীত হইলেন। শৈবলিনীর গমনসম্বন্ধে কেহই বাধা দিলেন না। জ্ঞানবাবু তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ইহার পর শৈবলিনী পুনরায় সেই বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। এখান হইতেই তিনি পীড়িত হইয়া পুনরায় পতিগৃহে গমন করেন। পরে সেই পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## শান্তিপুর ও কলিকাতায় অবস্থান

পুত্রকন্যার বিবহান্তে গোস্বামিমহাশয় কয়েক দিনের জন্য রামপুর-হাটে গমন করেন। পরে মাতাঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য তিনি তথা হইতে শান্তিপুরে আসিলেন। শান্তিপুরে আসিবার কয়েক দিন পরে তাঁহার পরিবারগণ তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন।

শান্তিপুরে প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান অতিশয় প্রীতিপ্রদ। সেখানে স্নান করিয়া যেরূপ আরাম হয়, কলিকাতায় সেরূপ হয় না। মহানগরের মহা-কোলাহলে এখানে গঙ্গাদেবী যেন একটু রাজসিকভাবাপন্ন হইয়াছেন। সহস্র সহস্র তরণী, বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পীয় পোত, সুবিশাল সেতু অঙ্গে ধারণ করিয়া মা যেন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া-

ছেন। শান্তিপুরের গঙ্গায় ঐ সকলের কিছুই নাই। নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়া জননী জহ্নুকন্যা সাগরসম্মিলনে গমন করিতেছেন। সেখানে নগরের কোলাহল ও আবিলতার লেশমাত্রও নাই। বিশেষতঃ শেষ রাত্রির নিস্তব্ধ সময়ে নির্জ্জন গঙ্গাতীরে গমন করিয়া ভগবতী ভাগীরথীর এবং নিসর্গসুন্দরীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিলে প্রাণে পবিত্র শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। গঙ্গায় অবগাহন করিলে সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায় যে, শারীরিক মলিনতার সহিত মনোমালিন্য চলিয়া গিয়াছে। স্নান করিবামাত্র সত্বগুণের প্রকাশ অনুভূত হইয়া থাকে। গোস্বামিপাদ প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সশিষ্যে গঙ্গাতীরে যাইয়া শিষ্যদের সহিত কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করিতেন। পরে সকলে মিলিয়া আনন্দ করিয়া স্নান করিতেন। স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া চাপানান্তে তিনি শাস্ত্রপাঠে নিযুক্ত হইতেন। অনন্তর মধ্যাহ্নে আহারের পর ভাগবতপাঠ করিতেন। অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেন। রজনীতে আহারাদির পর শয়ন করিতেন। এক দিন মধ্যাহ্নে তিনি ভাগবত পড়িতেছেন, ৺ মহেন্দ্রনাথ মিত্র পার্শ্বে শয়ন করিয়া পাঠ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। দারুণ গ্রীষ্ম; মহেন্দ্রবাবুর গায়ে অত্যন্ত ঘর্ম্মনিঃসৃত হইতে লাগিল। গোস্বামিপাদ মহেন্দ্রবাবুকে অত্যন্ত ঘামিতে দেখিয়া পাঠ বন্ধ করিলেন এবং এক-খানি পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। গুরু শিষ্যের ঘাম দেখিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন, ইহা বস্তুতঃই অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার।

এক দিন শুক্লপক্ষের রাত্রিতে গোস্বামিপাদ ছাদে বসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু গোস্বামী সেই সময়ে ছাদে যাইয়া দেখেন যে, এক প্রকাণ্ড গোক্ষুরা সাপ প্রভুপাদের মাথার উপরে ফণা-

বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া জগবন্ধু গোস্বামী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবতী যোগমায়া দেবীর কাছে আসিয়া বলিলেন, খুড়িমা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কাকার মাথার উপরে ভয়ংকর সাপ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। কি হবে খুড়ি মা? ভাসুরপোর কথা শুনিয়া ভগবতী যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই, যোগিন্! ওঁর মাথায় গায়ে অনেক সময়ে সাপ উঠিয়া থাকে। তাহারা উহঁার সহিত খেলা করে। কখনও কামড়ায় না। তাহারা উহঁার কথা শোনে, উহঁার আদেশমত চলে। তুমি আর কখনও দেখ নাই, তাই ভয়ে কাতর হইয়াছ। ভয়ের কোন কারণ নাই। কিছুক্ষণ পরে সাপ আপনিই চলিয়া যাইবে। খুড়িমাতা ও ভাসুর পোএর কথা গোস্বামিপাদ শুনিতে পাইয়া সাপকে বলিলেন, যোগিন্ ভয় পাইয়াছে, এখন যাও। তাঁহার কথা শুনিয়া সাপ চলিয়া গেল।

কয়েক মাস শান্তিপুরে জননীর নিকট থাকিয়া প্রভুপাদ সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন এবং সুকিয়া ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই বাড়ীতে অনেক লোক তাঁহার নিকট সাধন পায়। পূর্ব্বে তিনি সন্ন্যাস লইলেও কৌপীনবহির্ব্বাস গ্রহণ করেন নাই। এই বাড়ীতে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন।

এক দিন তিনি অনেকগুলি শিষ্য সঙ্গে লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে যান। মহর্ষি তখন সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া নির্জনে ভজন করিবার জন্য তাঁহার ভদ্রাসন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পার্ক ষ্ট্রীটে, বাস করিতেছিলেন। গোস্বামিপাদ তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনিও প্রভুপাদকে প্রতি নমস্কার করিয়া তাঁহাকে নিজের কাছে বসাইলেন। গোস্বামিপাদের শিষ্যগণ তাঁহাকে নমস্কার করিলে তিনি সকলকে

আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতঃপর তিনি সহাস্যবদনে গোস্বামিপাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোমাকে দেখিয়া আমার পূর্ব্ব কালের ঋষিদের কথা মনে হইতেছে। তাঁহারা যেমন সশিষ্যে কোথাও গমন করিতেন, তুমিও সেইরূপ আমার কাছে আসিয়াছ। তুমি যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলে, তোমার তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তুমি পূর্ণকাম হইয়াছ। ইহাঁরাও (শিষ্যগণ) ভগবান্‌কে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। তুমি অতি সুপাত্র, উচ্চ অধিকারী। তোমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? যে সকল যোগ্যতা থাকিলে তিনি সহজলভ্য হন, তোমাতে সে সকলই বর্ত্তমান আছে। সৎ বংশ, সৎশিক্ষা, সৎসঙ্গ, সৎবৃত্তি, সৎশাস্ত্রপাঠ ও সদ্‌গুরু লাভ ব্রহ্মপ্রাপ্তির অব্যর্থ উপায়। তোমার এ সমস্তই লাভ হইয়াছে। তুমি উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছ। তোমার ত ব্রহ্মলাভ হইবেই। মহর্ষির কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, আপনিই ত আমার প্রথম পথপ্রদর্শক, আদিগুরু। আমি আপনার নিকটেই ত প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের সমাচার পাইয়াছিলাম। প্রভুপাদের কথা শুনিয়া মহর্ষি বলিলেন, হাঁ, আমি তোমার পাঠশালার গুরু। অতঃপর দুই মহাপুরুষ অনেকক্ষণ ধর্ম্মালাপ করিলেন। সৎপ্রসঙ্গের স্রোত বহিয়া গেল। এইরূপে অনেকক্ষণ গত হইলে গোস্বামিপাদ মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়সময়ে উভয়েই উভয়কে অভিবাদন করিলেন। পরে প্রভুপাদের শিষ্যগণ মহর্ষিকে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তোমরা ধর্ম্মার্থী হইয়া ইহাঁর আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছ। এ আশ্রয় কখনও ত্যাগ করিও না। ইহাঁর সহিত তোমাদের অনন্ত কালের সম্বন্ধ। কখনও এ সম্বন্ধ

বিচ্ছিন্ন হইবে না। ইনি অনন্তকাল হাতে ধরিয়া তোমাদিগকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবেন।*

অতঃপর তিনি প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে বলিলেন; বোলপুরের শান্তি-নিকেতনের জন্য যে নিয়মাবলী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা গোসাঁইকে পড়িয়া শুনাও। শাস্ত্রিমহাশয় গোস্বামিপাদকে নিয়মাবলী পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিবার পর প্রভুপাদ বলিলেন, এ যাহা হইয়াছে, ইহাতে ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কোন সাধু শান্তিনিকেতনে বাস করিতে পাইবেন না। যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তগণ আশ্রমে থাকিয়া নিজের বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, এইরূপ নিয়ম হইলে ভাল হয়। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া মহর্ষি বলিলেন, অতি সুন্দর কথা। কিন্তু গোস্বামিপাদের সে সুন্দর কথা প্রতিপালিত হয় নাই। প্রভুপাদের কথামত কাজ করিবার ইচ্ছা মহর্ষির ছিল না। সেই জন্যই তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার সময়ে ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া প্রভুপাদকে বলিলেন, শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তদুপলক্ষে আমি নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, দূরস্থান হইতে বহু দরিদ্র লোক উৎসব দেখিবার জন্য আসিয়াছে। ভাণ্ডারে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য থাকাসত্ত্বেও সেই সমস্ত লোককে অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া যাইতে হইল। তাহারা পুনঃ পুনঃ চাহিয়াও খাইতে পায় নাই। এই কথা শুনিয়া প্রভুপাদ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ভাণ্ডারে খাদ্যবস্তু থাকিতে লোক উপবাস করিয়া চলিয়া গেল; তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইল না। আমি

* লেখকও গোস্বামিপাদের সহিত মহর্ষির নিকট গমন করিয়াছিল।

থাকিলে ভাণ্ডার লুটাইয়া দিতাম। ভাণ্ডারে খাদ্যবস্তু থাকিতে লোকে খাইতে পাইবে না, এ কি কথা। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, অপরের ভাণ্ডার আপনি লুটাইয়া দিতেন! গোস্বামিমহাশয় তেজের সহিত বলিলেন, দিব না! লোক অনাহারে ক্লেশ পাইবে, আর আমি চুপ করিয়া তাহা দেখিব, কখনই না।

গোস্বামিমহাশয় এক দিন তাঁহার কন্যা শান্তিসুধাকে বলিলেন, তুই ঐশ্বর্য্য চাস্ না ফকিরী চাস্। ঐশ্বর্য্যকামনা করিলে আমি তোকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিতে পারি; কিন্তু তাহাতে তোমার ধর্ম্মলাভের কিছু বিলম্ব হইবে। তুমি যে অবস্থা চাও, তাহা পাইতে বার বৎসর বিলম্ব হইবে। শান্তিসুধাকে তিনি তিন বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শান্তি তিন বারই বলিলেন, আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না। ফকিরীই চাই। তখন গোস্বামিপাদ বলিলেন, তোমার নাম ফকিরীখাতায় লেখা হইল।

এক দিন রবিবারে আহারাদির পর গোস্বামিমহাশয় পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের সমাধিদর্শন করিবার জন্য কাঁকুড়গাছিতে গমন করেন। পরমহংসদেবের শিষ্য ৺রামচন্দ্র দত্ত পরম সমাদরে প্রভুপাদকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবা করিলেন। প্রভুপাদ মনে করিয়াছিলেন যে অদ্য সমাধিদর্শন করিয়া একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গমন করিব। তখন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে তুমি সাধারণ সমাজে না যাইয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যাও। সেখানে আজ প্রভাসমিলন নাটক অভিনীত হইবে। তাহা দেখিয়া প্রচুর আনন্দ পাইবে। পরমহংস-দেবের কথা শুনিয়া তিনি সশিষ্যে বঙ্গ রঙ্গভূমিতে গমন করিলেন এবং অভিনয় দর্শন করিয়া প্রভূত আনন্দলাভ করিলেন। অভিনয় দেখিয়া তিনি ভাবে অবশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই চক্ষু জবাফুলের মত লাল

হইয়া উঠিল। হাত পায়ের আঙ্গুলি সকল বাঁকা হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি অতিশয় চেষ্টা করিয়া ভাবসংবরণ করিতে লাগিলেন। আর এক দিন স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহাকে ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দর্শন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান এবং সেই সঙ্গে কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট প্রেরণ করেন। গোস্বামিজী অভিনয়দর্শন করিয়া পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হন। অভিনয়ের সময় যখন রঙ্গমঞ্চে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, তখন তিনি ভাবে মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। অভিনেতা ও দর্শকগণের মধ্যে তাঁহার ভাব ও শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। অভিনেতাগণ ভাবে অনুপ্রাণিত ও মাতোয়ারা হইয়া হরিসংকীর্ত্তনের উচ্চনিনাদে রঙ্গভূমি নিনাদিত করিতে লাগিল। ভাব ও প্রেমের জোয়ার বহিতে লাগিল। রঙ্গভূমি দেবভূমিতে পরিণত হইল। অভিনয় শেষ হইলে ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু গোস্বামিমহাশয়ের নিকট আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, প্রভো! চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সংকীর্ত্তনের প্রবল তরঙ্গে ভারতভূমি তরঙ্গায়িত হইয়াছিল, গোস্বামিদিগের গ্রন্থে ইহা পাঠ করা যায়। কিন্তু আজি সেই লীলা আপনার প্রসাদে প্রত্যক্ষ করিলাম। আমরা ধন্য হইলাম, আমাদিগের রঙ্গভূমি পবিত্র হইল।

এক জন নানকপন্থী সাধু সময়ে সময়ে গোঁসাইজীর নিকট আগমন করিতেন। ইনি বাঙ্গালী ছিলেন। করকোষ্ঠি ভাল দেখিতে জানিতেন। শান্তিসুধার করকোষ্ঠি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন যে, তোমার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইয়া তোমার শ্বশুরের বংশরক্ষা করিবে। সন্ন্যাসীর বাক্যে শান্তি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, আমি সন্তান চাহি না। পুত্রে আমার কোন প্রয়োজন নাই। শান্তির কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, মা! ও কথা বলিলে চলিবে কেন? তোমার সন্তান না হইলে

কি চলে? এবার দৌহিত্রদ্বারা আমার বংশরক্ষা হইবে। তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর গোস্বামিমহাশয় রাসদর্শন করিবার জন্য সপরিবারে শান্তিপুরে গমন করেন। রাসদর্শনের পর গুরুদেবের আদেশে একাকী কাশী চলিয়া যান। তাঁহার এই প্রকার আকস্মিক গমনে মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং অবিলম্বে যোগজীবনকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে গোস্বামিপাদের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

গোস্বামিমহাশয়ের কাশীঅবস্থান সময়ে তাঁহার অন্যতম শিষ্য ময়মনসিংহের বিখ্যাত মোক্তার স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ রায় সেই স্থানে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"আমি যখন কাশীতে যাই, সে সময়ে তথায় স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ স্বামীর অত্যন্ত প্রতিপত্তি। আমাদের গ্রামবাসী শ্রীনাথ বাবু তখন কাশীবাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত স্বামিজীর অত্যন্ত প্রণয় ছিল। আমি তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে স্বামিজীর আশ্রমে যাইতাম। এক দিন বিকালবেলা আমি আশ্রমে বসিয়া স্বামিজীর সহিত আলাপ করিতেছি, এমন সময়ে সেখানে কয়েক জন নব্য উকীল ও বি এ ক্লাশের কয়েকটী ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা সকলেই স্বামিজীর শিষ্য। তাঁহারা স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ইহার কিছুকাল পরে আর একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কাশীতে আসিয়াছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া উকীল ও ছাত্রবাবুগণ একটু বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ করিয়া ঈষৎ অবজ্ঞার ভাবে বলিলেন, তিনি ত প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে ব্রাহ্ম হন; এখন আবার পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন! তাঁহাদের এই বিদ্রূপবাক্য শুনিয়া আমি প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইলাম। কিন্তু কিছু বলিলাম না। পরে ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া গুরুদেবের ঠিকানা জানিয়া লইলাম

এবং তখনই তাঁহার নিকট চলিয়া গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী, যোগজীবনভার্য্যা, শ্রীধর, হরিমোহন, মাণিকতলার মা ও তাঁহার স্বামীকেও তথায় দেখিলাম। আমি তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিলাম, তাঁহারাও আমাকে যথেষ্ট আদর করিলেন। মাতাঠাকুরাণীর পুত্রবৎ স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে বড়ই আরামবোধ হইল। মাণিকতলার মাকে আমি পূর্ব্বে দেখি নাই, তবে তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। তিনি কিছুই আহার করেন না। আহার করিলেই বমি হইয়া যায়। স্বামীর অনুরোধে তাঁহাকে কিছু ভোজন করিতে হয়। কিন্তু আহারের পরই তাহা উঠিয়া যায়। আহার না করাতে তাঁহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ। কিন্তু সেই শীর্ণ শরীরে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাইলাম। তিনি অত্যন্ত কর্ম্মঠ। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিবেশনপূর্ব্বক জননীর ন্যায় সকলকে ভোজন করাইতেন। ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ হইতে দেখি নাই। *

"কিছু দিন পরে কাশীর ধর্ম্মসভার বাৎসরিক উৎসব উপস্থিত হইল। দেখিলাম কৃষ্ণানন্দ স্বামীই সভার কর্ত্তা ও উৎসবের সর্ব্বে-সর্ব্বা। উৎসবে গুরুদেবের নিমন্ত্রণ হইল। সে দিন তাঁহার শরীর একটু অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনুরোধে তিনি সভায় গমন

* মানিকতলার মা মানিকতলাবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। তিনি কিছুই খাইতেন না। কিছু খাইলে সঙ্গে সঙ্গে বমি হইয়া উঠিয়া যাইত। তাঁহার সমাধি হইত। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার অবস্থা বেশ উচ্চ ছিল। ব্রজবাবু পত্নীর এইরূপ বমি হওয়াকে পীড়া মনে করিয়া অনেক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। তাঁহাকে যখন কোন উপকার হইল না, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা পীড়া নহে। মানিকতলার মায়ের এখন আর সে অবস্থা নাই।

করিলেন। সন্ন্যাসিদিগের বসিবার জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্বামিজী ও আর সকলে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া গুরুদেবকে সন্ন্যাসিদিগের মধ্যে বসাইলেন। সভার কার্য্য শেষ হইলে গুরুদেব উঠিবার উপক্রম করিতেই স্বামীজি তাঁহাকে কীর্ত্তনে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গুরুদেব শরীর অসুস্থ বলিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন আমি তাঁহার নিকট যাইয়া কীর্ত্তনে থাকিবার জন্য কাতরভাবে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলাম। তিনি দয়াময়, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। দুই একটি গান হইতেই গুরুদেব মহাভাবে মাতোয়ারা হইয়া মত্তসিংহের ন্যায় উদ্দণ্ড নৃত্য ও হরিনামের মধুর ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল পূর্ণ করিতে লাগিলেন। অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব সকল তাঁহার অপ্রাকৃত লাবণ্যমণ্ডিত দেহে প্রকটিত হইয়া অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভাবিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহার এই অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। ভক্তির পূতরসে সকলেরই হৃদয়ক্ষেত্র আর্দ্র হইয়া গেল। কৃষ্ণানন্দস্বামীর সভায় যাঁহারা গুরুদেবকে উপহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও গুরুদেবের এই অভূতপূর্ব্ব মহাভাব দর্শন করিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। গুরুজীর মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, কে ঐ লোকটি বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় সকলের মধ্যে হরিনাম প্রবেশ করাইয়া দিতেছেন। এমন হরিনাম ত কখনও শুনি নাই। এমন অদ্ভুত ব্যাপারও ত কখনও দেখি নাই। তাঁহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া এবং তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হইল। কৃষ্ণানন্দস্বামীর আশ্রমে ইহাঁদের বিদ্রূপপূর্ণ বাক্য শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত ক্লেশ

হইয়াছিল। সেই ক্লেশের অপনোদন ও গুরুদেবের মাহমা প্রচারের জন্যই আমি প্রভুপাদকে কীর্ত্তনে থাকিবার জন্য নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে তিনি যদি একবার সংকীর্ত্তনে মহাভাব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সকলকেই ভক্তির স্রোতে হাবুডুবু খাইতে হইবে, সকলকেই তাঁহার চরণে পড়িয়া লুটাইতে হইবে। তাঁহার মনমুগ্ধকর নৃত্যদর্শন ও তাঁহার মুখে মর্ম্মস্পর্শী মধুমাখা হরিনাম শ্রবণ করিলে সকলকেই ভক্তিভরে তাঁহার পাদপদ্মে অবনত হইতে হইবে। বস্তুতঃ হইলও তাহাই। সমস্ত নরনারী ভক্তিতে একেবারে গলিয়া গেলেন। সেই উকীল ও ছাত্রবাবুদিগের প্রাণেও ভক্তির বিমল লহরী খেলিতে লাগিল। অতঃপর গুরুদেবের সমাধি হইল। তখন কৃষ্ণানন্দস্বামী, সন্ন্যাসিবৃন্দ ও অপর সকলে তাঁহার চরণে পড়িয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উকীল এবং ছাত্রবাবুগণও বাদ গেলেন না। তাঁহারাও গুরুদেবের চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে কাশীর সমস্ত লোক গুরুদেবকে মহাপুরুষজ্ঞানে অত্যন্ত ভক্তি করিতে লাগিলেন।

"এক দিন বিশ্বনাথের শিঙ্গার হইয়াছিল। গুরুদেব আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া শিঙ্গার দেখিতে গেলেন। অসম্ভব ভিড়; মন্দিরে প্রবেশ করে, কাহার সাধ্য। আমি দুই জন পাণ্ডাকে একটি টাকা দিয়া তাঁহাদের সাহায্যে গুরুদেবকে লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন বিশ্বেশ্বরের আরতি হইতেছিল। রসানচৌকীর সুমিষ্ট বাদ্যের সহিত পুরোহিতগণের সুমধুর স্তোত্রগান ও ডমরুধ্বনি মিলিত হইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরকে অপ্রাকৃত কৈলাসধামে পরিণত করিয়াছিল। দর্শকগণ পাপতাপময় পৃথিবীর কথা ভুলিয়া

গিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্রে ভক্তির সুবিমল মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে অনাবিল স্বর্গীয় সুখে নিমজ্জিত করিতেছিল। গুরুদেব বিশ্বনাথের সুসজ্জিত শ্রীবিগ্রহের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "বম্ ভোলা, বম্ ভোলা, বম্ ভোলা" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিশ্বনাথকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হইল। স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোচনদ্বয় হইতে ফোয়ারার ন্যায় সলিলরাশি নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া পাণ্ডাগণ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। আরতি শেষ হইলে সকলেই ভক্তিভাবে গুরুদেবের চরণে প্রণত হইলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালীটোলার লোকেরা গুরুদেব কবে মন্দিরে যাইবেন, তাহার সন্ধান লইতেন। যে দিন কোন মন্দিরে যাইতেন, সে দিন সেখানে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। পাণ্ডাগণ পরম সমাদরে গুরুদেবকে মন্দিরের ভিতরে লইয়া গিয়া ঠাকুর ও আরতি দেখাইতেন।

"কাশীর বিশুদ্ধানন্দস্বামী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। ভারতবর্ষের অনেক স্বাধীন নরপতি তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্বও স্বীকার করিয়াছিলেন। এক দিন গুরুদেবের সহিত এই মহাপুরুষকে দেখিতে গেলাম। স্বামিজী গুরুদেবকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রালাপ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ আলাপের পর গুরুদেব স্বামিজীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া বাসস্থলে আগমন করিলেন। পর দিন আমার পরিচিত ঢাকা জেলার অন্তর্গত বোলঘরনিবাসী

তারকনাথ খাসনবীশনামক স্বামিজীর এক জন শিষ্য আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি কি কাল কোন সাধুকে লইয়া স্বামিজীর নিকট গিয়াছিলে? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, কে সেই সাধু? আমি বলিলাম, আমার গুরুদেব। তুমি আমাকে এ সকল কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি বলিলেন, তোমরা যখন গিয়াছিলে, আমি তখন আশ্রমে ছিলাম না। আশ্রমে আসিবামাত্র স্বামিজী বলিলেন, আজ এক বাঙ্গালী সাধু আয়া, হাম বহুত সাধু দর্শন কিয়া, পরন্তু অ্যায়সা সাধু কভি নাহি দেখা। তোম উনকো খবর কর।" স্বামিজী আরও বলিলেন, চসমাধারী এক জন যুবক তাঁহার সঙ্গে ছিল। আমার মনে হইল, তুমিই কোন সাধুকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলে। কেননা তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে আমি এক দিন স্বামিজীকে দেখিতে যাইব। অতঃপর তিনি গুরুদেবকে দর্শন করিলেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার পবিত্র পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন।

"পূজ্যপাদ ভাস্করানন্দস্বামীকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। তিনি যে স্থানে থাকিতেন, সে স্থানে কাহারও যাইবার আদেশ ছিল না। ইহা জানাসত্ত্বেও আমার প্রবল দর্শনাকাঙ্ক্ষাকে আমি সংযত করিতে পারি নাই। গুরুদেবের চরণে তাঁহার দর্শনের অভিলাষ জানাইলাম। তিনি বলিলেন, সাধু যখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন না, তখন তাঁহাকে বিরক্ত করিতে যাওয়া উচিত নহে। কিন্তু আমার প্রবল দর্শনাভিলাষ জানিয়া শেষে বলিলেন, আচ্ছা, আগামী কল্য যাওয়া যাইবে। পর দিন তাঁহার সঙ্গে আমরা স্বামিজীর আশ্রমে গেলাম। আশ্রমটি দুই মহলে বিভক্ত। স্বামিজী ভিতর মহলে থাকেন। আমরা

বাহির মহলে গিয়া উপস্থিত হইলে দ্বারবান আমাদিগকে ভিতরে যাইতে নিষেধ করিল। আমরা গমনে ক্ষান্ত হইলাম। গুরুদেব একটি বৃক্ষ দেখাইয়া দ্বারবান্‌কে বলিলেন, ঐ বৃক্ষতলে বসিতে নিষেধ আছে কি? দ্বারবান্ বলিল, না মহারাজ; বৃক্ষতলে বসিতে নিষেধ নাই। গুরুদেব তথায় উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে অকস্মাৎ শীর্ণকায় এক জন সাধু সেইস্থানে আগমন করিলেন এবং অত্যন্ত প্রেমের সহিত গুরুদেবের পৃষ্ঠদেশে দুই তিন বার চাপড় মারিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, "বাবা! আনন্দে রহ।" গুরুদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। স্বামিজীও প্রেমবাহু বিস্তার করিয়া গুরুদেবকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রেমের বন্যা, ভাবের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। আমি অবাক হইয়া দুই মহাপুরুষের এই অপূর্ব্ব মিলনব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলাম। স্বামিজীকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, সুতরাং চিনিতে পারি নাই। কিন্তু গুরুদেব যখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইল, যাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলে, ইনিই তিনি, দয়া করিয়া দর্শন দিয়া ধন্য করিলেন। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে ইনিই সেই বারাণসীধামের ভূষণ, আরাধ্য ভাস্করানন্দস্বামী। সে সময়ে আমার মনের অবস্থা যে কি হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বহু চেষ্টা করিয়াও যাঁহার দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, আজ গুরুদেবের কৃপায় আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার দর্শনলাভ হইল, এই কথা মনে করিয়া আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমরা সকলে ভক্তিভাবে স্বামিজীর চরণে প্রণিপাত করিলাম।

"এক দিন গুরুদেব বলিলেন, অনেক দিন দ্বারকাদাস বাবাজীকে

দর্শন করি নাই, চল, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি।
তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সাধুদর্শনে বাহির হইলেন।
অতিক্রম করিয়া আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। কিছু দূর
হইলে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যান আমাদিগের দৃষ্টিপথে
হইল। উদ্যানের ভিতরে একটি সুন্দর একতলা অট্টা
গুরুদেব বলিলেন, বাবাজী ঐ অট্টালিকায় বাস করেন। বা
মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন মানুষের সাড়াশব্দ পাইলাম না,
লোকও দেখিলাম না। গুরুদেব তথায় উপবেশন করিলেন। কিছু
পরে তথায় একটি লোক আসিল। দেখিয়া বোধ হইল, সে উদ্যা
মালী। তাহাকে বাবাজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, বাব
দিনের বেলায় এখানে থাকেন না। বহু লোক আসিয়া ঔষধার্
জন্য বিরক্ত করে, এজন্য তিনি দিনের বেলায় গভীর জঙ্গলে গি
ভজন করেন। রাত্রিকালে এখানে আইসেন। তখন গুরুদে
অট্টালিকার কপাটে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া চলিয়া আসিলেন।
পর দিন আমরা গুরুদেবের নিকট বসিয়া আছি, এমন সময়ে উন্নতকায়,
তেজঃপুঞ্জকলেবর, আলখাল্লাপরিহিত এক জন সাধু আগমন করিলেন।
তাঁহাকে দেখিবামাত্র গুরুদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে উভয়ে
উভয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া মাথায় মাথা ঠেকাইয়া পড়িয়া
রহিলেন। অতঃপর পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া
প্রেমভরে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই অপূর্ব্বভাব দেখিয়া
আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। বুঝিলাম, ইনিই দ্বারকাদাস বাবাজী; *
যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গুরুদেব গতকল্য গমন করিয়াছিলেন।

* দ্বারকাদাস বাবাজীর পূর্ব্ব নাম দ্বারকানাথ পাল। ইনি কায়স্থবংশসম্ভূত।
হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ইহাঁর বাড়ী ছিল। ইনি কমিসেরিয়েটে

স্বর্গীয় অকিঞ্চন ভক্ত শ্রীধর ঘোষ একখানি কম্বলমাত্র সম্বল করিয়া গৃহের একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বাবাজী বলিলেন, বাবা, তুমিই ধন্য যে সাংসারিক সুখে পদাঘাত করিতে পারিয়াছ। অনন্তর তিনি পাশ্চাত্য ও হিন্দুদর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে গভীরপাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তিনি ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের সহিত হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইলেন যে হিন্দুদর্শন হইতেই পাশ্চাত্যদর্শন গৃহীত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায়, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যদর্শনশাস্ত্রে, এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর গভীর জ্ঞান ও প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া আমি যারপরনাই বিস্মিত হইলাম। বাবাজীর উপর আমার অত্যন্ত ভক্তি হইল। আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি চলিয়া গেলে গুরুদেব বলিলেন, বাবাজীর ইংরাজী ও সংস্কৃতশাস্ত্রে যেমন গভীর পাণ্ডিত্য, সাধনভজনের অবস্থাও সেইরূপ উচ্চ। ইহাঁর ন্যায় সাঁচ্চা সাধু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।"

গোস্বামিমহাশয় সপরিবারে কিছুদিন কাশীবাস করিয়া ফয়জাবাদ গমন করেন। তখন এই স্থানে তাঁহার অন্যতম শিষ্য ভক্তশ্রেষ্ঠ

চাকরী করিতেন, এজন্য তাঁহাকে রাওলপিণ্ডিতে অবস্থিতি করিতে হইত। একবার তাঁহার অত্যন্ত আমাশয়ের পীড়া হইয়াছিল। সেজন্য ছুটি লইয়া স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি কোন পাহাড়ে গিয়াছিলেন। তথায় একজন সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুকে পীড়ার কথা জানাইলে, তিনি কিছু ধুনির ভস্ম দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ইহা খাইলেই তোমার রোগ ভাল হইবে। পালমহাশয় সাধুর কথা বিশ্বাস করিয়া ভস্মটুকু খাইলেন। তাহাতেই তাঁহার পীড়া আরোগ্য হইল। এই ঘটনায় সাধুদের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তির উদয় হইল। অতঃপর তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। পত্নীবিয়োগের পর তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল। তখন তিনি সংসার ও চাকরী পরিত্যাগপূর্ব্বক উদাসীন হইলেন।

ডাক্তার হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিষয়কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন। গোস্বামিমহাশয় হরকান্ত বাবুর বাড়ীতে কয়েক দিন অবস্থান করেন। এক দিন তিনি মাতাঠাকুরাণী, মানিকতলার মা, যোগজীবন, শ্রীধর প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বিখ্যাত ল্যাঙ্গাবাবাকে দর্শন করিতে যান। ল্যাঙ্গাবাবা শবসাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা শবসাধনে সিদ্ধ হন, তাঁহারা প্রভূত শক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। ল্যাঙ্গাবাবারও যথেষ্ট শক্তি ছিল। ল্যাঙ্গাবাবা গোস্বামিমহাশয়কে অত্যন্ত সমাদর করিলেন। স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার সময় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। যোগজীবন, শ্রীধর প্রভৃতি গোস্বামিপাদের সঙ্গে ল্যাঙ্গাবাবার আশ্রমে রহিলেন। রাত্রিতে ল্যাঙ্গাবাবা সকলকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া ভোজন করাইলেন। তখন শীতকাল; সবযূর উন্মুক্ত চড়াতে সকলে এক এক খানি কম্বলমাত্র সম্বল করিয়া রজনীযাপন করিলেন। কিন্তু সেই দুরন্ত শীত ও হিমে তাঁহাদের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় নাই। একটা উষ্ণ বায়ুর কুণ্ডলী সমস্ত রাত্রি তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়াছিল। গরম বাতাসের বেষ্টনে থাকাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র শীতবোধ হয় নাই। রজনী অনুমান দুই ঘটিকার সময় গোস্বামিমহাশয় হরগৌরীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।

ফয়জাবাদ হইতে গোস্বামিমহাশয় সপরিবারে অযোধ্যাগমন করেন। এই স্থানে অবস্থান সময়ে তাঁহার গুরুদেব পরমহংসজী তাঁহাকে আদেশ করেন—"তোমাকে তৈলধারার ন্যায় এক বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে হইবে। আর প্রতিদিন অন্ততঃ একটি লীলাতত্ত্ব দর্শন না করিয়া তুমি কদাচ আসনপরিত্যাগ করিবে না।" তিনি বৃন্দাবনে গমন করিবার পর গুরুদেবের কৃপায় প্রত্যহই, অনন্ত ভগবানের অনন্ত লীলাতত্ত্বের দুই একটি দর্শন

করিতেন। লীলাদর্শনের পর তিনি ঠাকুরদর্শন ও পরিক্রমায় বাহির হইতেন। যতক্ষণ লীলাদর্শন না হইত, ততক্ষণ তিনি আসনত্যাগ করিতেন না।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## শ্রীবৃন্দাবনে বাস

১২৯৬ সালে গোস্বামিপাদ বৃন্দাবনধামে উপনীত হইয়া গোপীনাথের বাগে দাউজীর মন্দিরে এক বৎসরকাল বাস করেন। তথায় যাইবার কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া সেই আদর্শসতীর ঢাকায় যাইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কেবল স্বামীর আদেশ লংঘন করা অনুচিত মনে করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে ঢাকায় যাইতে হইয়াছিল।

এই সময়ে গৌরকিশোরদাস নামে এক জন গৌড়ীয় বৈষ্ণব বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি এক জন মহাপুরুষ। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম গৌরচন্দ্র শিরোমণি। কাটোয়ায় তাঁহার বাড়ী ছিল। তিনি এক জন সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ভাগবতপাঠ করিয়া তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। লোকে আগ্রহসহকারে তাঁহার নিকট ভাগবতশ্রবণ করিত। এই ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট আয় হইত। বৃন্দাবনে ইহাঁর বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। সেই সময়ে বৃন্দাবনে আর একটি বৈষ্ণব বাস করিতেন। লোকে

তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ মনে করিত। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের শিরোভূষণ ছিলেন। শিরোমণিমহাশয় একদা এই মহাপুরুষের নিকট আগমন করেন। মহাপুরুষ শিরোমণিমহাশয়কে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা প্রকার সদালাপ ও সৎপ্রসঙ্গ হইল। অবশেষে বাবাজিমহাশয় বলিলেন, "শিরোমণিমহাশয়! আপনি অতি সুন্দর ভাগবতপাঠ করেন। আপনার নিকট ভাগবত শুনিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি কাল আমাকে কিছুক্ষণ ভাগবত শুনাইতে পারিবেন কি ?"

শিরোমণি। আগামী কল্য আমাকে অন্য স্থানে ভাগবত পাঠ করিতে হইবে। তাঁহারা পূর্ব্বেই আমাকে অর্থদ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং আপনার আদেশ পালন করিতে পারিলাম না, এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। এই বলিয়া শিরোমণি-মহাশয় বাবাজীমহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিরোমণিমহাশয় চলিয়া গেলে বাবাজী নিকটবর্ত্তী একটি শিষ্যকে বলিলেন, শিরোমণি যেস্থানে বসিয়াছিলেন, জল ও গোময় দিয়া তাহার সংস্কার কর। বাবাজীর এই কথা শিরোমণি মহাশয় শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বাবাজীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আমার বসিবার জায়গা আপনি শোধন করিতে বলিলেন কেন? কিসে সেস্থান অপবিত্র হইল?

বাবাজী। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা পতিত। তাঁহারা যেস্থানে উপবেশন করেন, যেস্থানে বাস করেন, সেস্থান অপবিত্র। তুমি ভাগবতব্যবসায়ী। ভাগবত বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ কর, এইজন্য তুমি পতিত হইয়াছ। সেই কারণেই তোমার বসিবার জায়গা শোধন করিতে বলিয়াছি।

মহাপুরুষের বাক্য শিরোমণি মহাশয়ের অন্তরে সুতীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি যে এত দিন শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। সেই দিন হইতে উক্ত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন এবং সংসারত্যাগ করিয়া সেই মহাপুরুষের নিকট ভেকগ্রহণ করিলেন। তাঁহার জীবন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি দিবারাত্রি ভজন করিয়া অচিরেই ভগবানের কৃপালাভ করিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থান সময়ে এই শিরোমণি মহাশয়ের সহিত গোস্বামিপাদের অত্যন্ত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। দুই মহাজনের মিলনে যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। গোস্বামি-মহাশয় সর্ব্বদা শিরোমণি মহাশয়ের নিকট গমন করিতেন। শিরোমণি-মহাশয়ও নিয়ত তাঁহার কাছে আসিতেন। দুই জনের সম্মিলনে প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হইত। গোস্বামিপাদ শিরোমণিমহাশয়ের নিকট হৃদয়ের কপাট উদ্‌ঘাটন করিয়া সমস্ত মনের কথা বলিতেন। শিরোমণিমহাশয়ও তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভুবনসুন্দর তনু অপ্রকট করিবার কিছু দিন পরেই তাঁহার প্রিয়লীলাভূমি ব্রজমণ্ডলের তীর্থস্থানসকল লুপ্ত হইয়া যায়। কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকট হইয়া ব্রজমণ্ডলে যাইয়া তীর্থস্থান প্রকাশ করেন। তিনি অধিক দিন তথায় অবস্থান করেন নাই; সুতরাং সমস্ত তীর্থ তাঁহাদ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কৃপাপাত্র শ্রীমৎ রূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ তদীয় আদেশে শাস্ত্র এবং প্রাচীন লোকদিগের সাহায্যে অবশিষ্ট তীর্থ আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমান বৃন্দাবন নগর তাঁহাদিগেরই স্থাপিত। তাঁহারা এখানে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন ইত্যাদি বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবাপূজার

ব্যবস্থা করেন। বৃন্দাবনের অধিকাংশ দেবালয়ই তাঁহাদিগের স্থাপিত। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের আধিপত্য অত্যন্ত অধিক। বৃন্দাবন পশ্চিমদেশীয় তীর্থ হইলেও বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামিগণ আবার বৈষ্ণবসমাজের নেতা। কেননা তাঁহারা বৈষ্ণবসমাজের গুরু। কাজেই বৈষ্ণবসমাজে তাঁহাদিগের প্রবল আধিপত্য। যে সকল অদ্বৈত ও নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামী বৃন্দাবনে বাস করেন, তথাকার বৈষ্ণবসমাজ ও দেবালয় সকল তাঁহাদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয়। অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামিগণ প্রভুপাদের উপর বরাবরই অসন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জাতি ও সমাজভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে আচারভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ মনে করিয়া অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সুবিধা পাইলেই তাঁহারা তাঁহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেন। এত দিন তাঁহারা বৈরসাধন করিবার সুযোগ পান নাই। এইবার আপনাদিগের অধিকারে পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে জব্দ করিবার সংকল্প করিলেন। তাঁহারা যাঁহাকে পতিত মনে করেন, সেই পাষণ্ড সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছেন, সমস্ত লোক তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করে, ইহা তাঁহাদের নিতান্তই অসহ্য বোধ হইল। যেমন করিয়া হউক তাঁহাকে অপমান [illegible]তই হইবে। প্রভুপাদ মধ্যে মধ্যে গোবিন্দদর্শনে যাইতেন। [illegible]স্থানে তাঁহাকে জব্দ করিবার পরামর্শ হইল। তাঁহারা [illegible] করিলেন, গোবিন্দের মন্দিরে যাইবাব পথে তাঁহার মাথায় গোবর গুলিয়া ছাদ হইতে ঢালিয়া দিবেন। অদ্বৈতবংশীয় এক জন গোস্বামি এই দলের চাঁই ছিলেন। তিনিই এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়াছিলেন। কিন্তু এই মহান্ সংকল্প তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে

পারিলেন না। ভগবান্ তাহা সম্পূর্ণ বিফল করিয়া তাঁহাকেই জব্দ করিয়া দিলেন। রাত্রিতে তিনি যখন ঘুমাইতেছিলেন, সেই সময়ে এক প্রকাণ্ড বরাহ তাঁহার বুকে বসিয়া মেঘগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা। তাকে তোরা অপমান করবি। জানিস্ সে কে? সে আর আমি এক। যে গোবিন্দজীকে তোরা পূজা করিস্ সেই গোবিন্দজী ও সে অভিন্ন। যদি মঙ্গল চাস্, তবে এখনি তাহার কাছে যাইয়া পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চা। আর আমি তোকে বিশেষ করিয়া বলিয়া যাইতেছি যে কাল যখন সে মন্দিরে যাইবে, তখন আমারই দ্বিতীয় স্বরূপ গোবিন্দজীর গলার মালা যেন তাহাকে দেওয়া হয়। আর তাহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের বিন্দুমাত্র ত্রুটি যেন না হয়। আমার কথার অন্যথা হইলে আমি তোর সর্ব্বনাশ করিব।" এই বলিয়া বরাহদেব অন্তর্হিত হইলেন। প্রভু ত ভয়ে আড়ষ্ট। জাগিয়া দেখেন বক্ষঃস্থলে নখাঘাতের চিহ্ন। ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া তখনই তিনি শিরোমণিমহাশয়ের নিকট গেলেন এবং রজনীর ঘটনা বিবৃত করিয়া কর্ত্তব্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শিরোমণিমহাশয় শুনিয়া বলিলেন, প্রভো! আপনাদিগের এরূপ করা ভাল হয় নাই। আপনারা তাঁহাকে চেনেন না, তাঁহার মহিমা ও প্রভাব জানেন না। এই জন্যই এই গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি তাঁহার নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর যাহা করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহা হইতে বিরত হউন।

গোস্বামিপ্রভু। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া ক্ষমা চাহিতে পারিব না। তবে যে সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহা হইতে বিরত হইলাম।

শিরোমণিমহাশয়। তাঁহার কাছে যাইয়া ক্ষমা চাহিলেই ঠিক হইত।

যদি নিতান্তই তাহা না পারেন, তবে কাল যাহাতে তাঁহার দর্শনের সুবিধা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে ভুলিবেন না।

গোস্বামিপ্রভু শিরোমণিমহাশয়ের কথায় সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন এবং গোবিন্দজীর মন্দিরে যাইয়া দর্শনের সুব্যবস্থা করিলেন। গোস্বামিপাদ দর্শনে গমন করিলে অতি সমাদরের সহিত গোবিন্দের গলার মালা তাঁহাকে পরাইয়া ঠাকুরদর্শন করান হইল।

এক দিন এক স্থানে গোস্বামিপাদ ও শিরোমণিমহাশয় পাশাপাশি বসিয়া ভাগবত শুনিতেছিলেন, উপর হইতে কে একজন গোবরগোলা জল ঢালিয়া দিল। জল প্রভুপাদের মাথায় না পড়িয়া শিরোমণির মাথায় পড়িল। ইহাতে শিরোমণিমহাশয় বিরক্ত হইয়া প্রভুপাদকে বলিলেন, দেখিলেন, প্রভো! ইহাদের ব্যবহার দেখিলেন। আর এখানে থাকা নয়, চলুন, এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া আসিলেন।

এই স্থানে বৃন্দাবনধামের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলে বোধ হয় তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমস্ত মথুরা-মণ্ডলের পরিমাণফল চৌরাশী ক্রোশ। এই চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে বৃন্দাবন, কাম্যকবন, মহাবন প্রভৃতি দ্বাদশটী বন আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া এই চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলে বিবিধ লীলা করিয়াছিলেন। দ্বাদশবনের অন্যতম শ্রীবৃন্দাবনের পরিমাণফল বিংশতি ক্রোশ। আজকাল যেস্থান বৃন্দাবননামে খ্যাত, তাহার পরিমাণ পাঁচ ক্রোশ। যমুনাস্রোতে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বৃন্দাবনের পরিমাণ তিন কি সাড়ে তিন ক্রোশে পরিণত হইয়াছে। এখনকার লোকে এই সাড়ে তিন ক্রোশ স্থানকেই বৃন্দাবন বলিয়া জানে। কিন্তু কেবল এই স্থানটুকুই বৃন্দাবন নয়। বিংশতি ক্রোশ বৃন্দাবনধামের ইহা একটী অংশ। ভগবান্ গোপিকাদের সহিত এই স্থানে রাসক্রীড়া

করিয়াছিলেন। এই পঞ্চ ক্রোশ স্থান ভগবানের রাসস্থলী। গোস্বামিপাদগণ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া এই স্থান বাসস্থান মনোনীত করিয়া মদনমোহন, গোবিন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহাদিগের সেবা স্থাপন করেন। ক্রমে এই স্থান সহর হইয়া উঠে। শ্রীমদ্রূপগোস্বামী গোবিন্দজীকে, সনাতনগোস্বামী মদনমোহনকে, গোপালভট্টগোস্বামী রাধারমণকে এবং জীবগোস্বামী রাধাদামোদরকে স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন মধুপণ্ডিতদ্বারা গোপীনাথ, লোকনাথ-গোস্বামীদ্বারা গোকুলানন্দ এবং শ্যামানন্দগোস্বামীদ্বারা শ্যামসুন্দর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। লালাবাবু, বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি বঙ্গদেশের আরও অনেকে বহু দেবালয় স্থাপন করিয়াছেন। ব্রজবাসি-দিগেরও অনেক দেবালয় আছে। তাহার মধ্যে বঙ্কবিহারী, রাধাবল্লভ ও কিশোরীবল্লভ প্রধান। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসী অনেক ঐশ্বর্য্যশালী লোকের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবালয় আছে। সাহাজীর কুঞ্জ ও ব্রহ্মচারীর কুঞ্জ তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। জয়পুরের রাজা অধুনা এক পরম সুন্দর দেবালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহা মহামূল্য মর্ম্মর প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। সাহাজীর দেবমন্দিরও মর্ম্মর-নির্ম্মিত। মথুরার শেঠদিগের দেবালয় বৃন্দাবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী। শেঠের কুঞ্জে স্বর্ণময় একটী স্তম্ভ আছে। গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রতিষ্ঠিত রাধারমণ ঠাকুরের প্রকটবৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। ভট্টগোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে একটি শালগ্রামের সেবা করিতেন। একদা এক জন ঐশ্বর্য্যশালী ভক্তলোক শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গোবিন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবালয়ে অনেক মূল্যবান অলঙ্কার প্রদান করেন। গোপালভট্ট গোস্বামীকেও তাঁহার ঠাকুরের জন্য অলঙ্কার দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি অলঙ্কার লইয়া কি করিবেন?

তাঁহার ঠাকুরের ত হাত পা নাই যে, গহনা পরাইয়া সুখী হইবেন। তাঁহার মনে বড়ই ক্লেশ হইল। ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি গোস্বামীর এই সংকল্প অপূর্ণ রাখিলেন না। রাত্রিতে শালগ্রাম হইতে এক পরমসুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। পর দিন গোস্বামী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তখন তিনি মনের সাধে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়া অতুল আনন্দলাভ করিলেন। বিগ্রহের নাম রাধারমণ রাখা হইল। রাধারমণের পৃষ্ঠদেশে এখনও সেই শালগ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে ছয় গোস্বামীর মধ্যে রূপ, সনাতন, গোপালভট্ট ও জীব গোস্বামীর সমাধি আছে। এতদ্ভিন্ন বঙ্কবিহারীর স্থাপনকর্ত্তা, আকবর সাহের প্রধান গায়ক তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর (১), শ্রীনিবাস আচার্য্যের, রামচন্দ্র কবিরাজের এবং চৌষট্টি মোহান্তের সমাধিস্থানও বৃন্দাবনে আছে।

কালীদহে একটী কদম্ববৃক্ষ আছে। বৃক্ষটী বহু প্রাচীন। প্রাচীনেরা বলেন, ভগবান্ কালীয় সর্পকে দমন করিবার জন্য এই বৃক্ষ হইতেই ঝম্পপ্রদান করিয়া যমুনায় পতিত হইয়াছিলেন। সেই বৃক্ষটীর গাত্রে অসংখ্য রাধানাম প্রকটিত হইয়াছে। অনেকে এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন।

নিধু ও নিকুঞ্জনামে দুইটী ক্ষুদ্র উপবন শ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমান

(১) সম্রাট আকবর তানসেনের সহিত বৃন্দাবনে গিয়া হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত শ্রবণে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তানসেনকে বলিলেন, তোমার গান ত এত মিষ্ট হয় না। তানসেন হাসিয়া বলিলেন, স্বামিজী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরকে গান শুনান, আমি দিল্লির ঈশ্বরকে গান শুনাই। এই কথায় বাদশা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আছে। নিকুঞ্জবনে রাত্রিতে কোন প্রাণী থাকিতে পায় না। যদি কেহ লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু ঘটে। দুই বার দুইটী লোক রাত্রিতে নিকুঞ্জবনে লুকাইয়া ছিল, সকাল বেলা ললিতাকুণ্ডের জলে তাহাদিগের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সমস্ত দিন তথায় অসংখ্য বানর বিচরণ করে, কিন্তু সায়ংকাল উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা অন্যত্র চলিয়া যায়।

আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা এখনও বৃন্দাবনে দেখা যায়। পূর্ব্বাহ্নে বহুসংখ্যক গরু যমুনাতীরে একত্র হইয়া সাঁতরাইয়া যমুনার পরপারে গমন করে এবং সারাদিন চরিয়া সায়ংকালে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগত হয়। তাহাদিগের সঙ্গে রাখাল বা কোন রক্ষক থাকে না। কিন্তু কখনও একটি গরু যূথভ্রষ্ট অথবা হিংস্রজন্তুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় নাই।

শিঙ্গারবটে নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামিগণ বাস করেন। তাঁহাদিগের ঠাকুরবাড়ীর আঙ্গিনার মধ্যে দুইটী বকুল গাছ আছে। বৃক্ষ দুইটীর মধ্যে যেটি বৃহৎ তাহাতে ফল হয় না। ছোটটিতে ফল হয়। আঙ্গিনার মাঝখানে বৃক্ষ থাকাতে যাত্রাদির সময় অতিশয় অসুবিধা হয়। এজন্য গৃহস্বামী বৃক্ষ দুইটীকে কর্ত্তন করিবার সংকল্প করেন। গাছ কাটিবার জন্য লোকও নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু গাছ কাটা হইল না, গৃহস্বামী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণদম্পতি তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া কাতরভাবে বলিতেছেন, প্রভো! আমাদিগের বৃন্দাবনবাস ঘুচাইবেন না। আমরা আপনার ঠাকুরবাড়ীর অঙ্গনস্থ বকুলবৃক্ষ। আমরা পূর্ব্বে ৺কাশীধামে বাস করিতাম। ভগবান্ বিশ্বনাথের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। আপনি এই ব্রাহ্মণদম্পতীর বৃন্দাবনবাস

উচ্ছেদ করিবেন না। গোস্বামিপ্রভু এই স্বপ্ন দেখিয়া বৃক্ষকর্ত্তনের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। বৃক্ষদুইটি এখনও বর্ত্তমান আছে।*

এখন মূলবিষয়ের অনুসরণ করা যাক্। গোস্বামিমহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া অদ্বৈত প্রভুর আদেশে মালা ও তিলক ধারণ করেন। শাস্ত্রে বৈষ্ণবদিগের তিলক করিবার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, বৃন্দাবনে গিয়া তিনি প্রথমে সেরূপ তিলক করিতেন না।

বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, যীশুর ক্রশ এবং মহম্মদের অর্দ্ধচন্দ্র এই সকল মিলাইয়া তিনি এক নূতন তিলকের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাকে শাস্ত্রছাড়া নূতন তিলক করিতে দেখিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইল। শিরোমণিমহাশয় প্রভুপাদকে বলিলেন, প্রভো! আপনি শাস্ত্রবহির্ভূত তিলক করেন কেন? এরূপ তিলক কোন হিন্দুসম্প্রদায়ে নাই। গোস্বামিপাদ বলিলেন, আমি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি। এজন্য সকল সম্প্রদায়ের চিহ্ন একত্র করিয়া আমি এই অসাম্প্রদায়িক তিলকের সৃষ্টি করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া শিরোমণিমহাশয় বলিলেন, আপনি কি আর একটি নূতন সম্প্রদায় গড়িতে চান? আপনি যাহা করিবেন, আপনার শিষ্যেরা তাহারই অনুসরণ করিবেন। তাহাতে আর একটি নূতন দলের সৃষ্টি হইবে। আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন, আপনি আর একটা নূতন দল প্রস্তুত করিবেন না। আমার একান্ত ইচ্ছা যে আপনি শাস্ত্রের অনুগত হইয়া শাস্ত্রোক্ত তিলক করেন। তাঁহার কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, আমি বিবেচনা করিয়া আপনার কথার উত্তর দিব। ইহার পরই অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া যেরূপে তিলক করিতে হইবে, নিজে তাহা করিয়া গোস্বামিপাদকে দেখাইয়া দিলেন।

* এই বিবরণটি শিঙ্গারবটের গোস্বামিগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।

প্রভুপাদ সেই হইতে অদ্বৈত প্রভুর উপদেশমত তিলক করিতে আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে যথাশাস্ত্র তিলক করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

গোস্বামিমহাশয় পদ্মবীজ, তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিতেন। তাঁহার রুদ্রাক্ষধারণ লইয়া বৈষ্ণবগণ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, বৈষ্ণবের রুদ্রাক্ষমালা ধারণকরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় তাঁহাদিগেরই গোস্বামিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাস ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে বচন তুলিয়া দেখাইলেন যে, বৈষ্ণবের রুদ্রাক্ষমালা ধারণকরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, বরং না করাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। (১) গোস্বামিমহাশয়ের গৈরিকবস্ত্র পরিধান লইয়াও বৈষ্ণবগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাবা বলিলেন, বৈষ্ণবদিগের গৈরিকবস্ত্র ব্যবহার করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এস্থলেও গোস্বামিমহাশয় শাস্ত্র হইতে বচন তুলিয়া প্রমাণ করিলেন যে, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গৈবিক বস্ত্র শাস্ত্রে বৈষ্ণবলিঙ্গ নামে উক্ত হইয়াছে। এই বৈষ্ণবলিঙ্গ—দণ্ড, কমণ্ডলু ও গৈরিক, বৈষ্ণবমাত্রেরই ধারণ করা কর্ত্তব্য। গৈরিকধাবণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে মহাপ্রভু

(১) যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ॥
যে বাহুমূলে পরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥

হরিভক্তিবিলাস ৪র্থ বিলাস ১২৩ শ্লোক তথা ভক্তিরসামৃত সিন্ধুধৃত নারদসংহিতা বচন।

পদ্মাক্ষৈশ্চাপি রুদ্রাক্ষৈর্বিদ্রুমৈর্ম্মণিমৌক্তিকৈঃ।
পুত্রবীজমণীমালা সা শস্তা জপকর্ম্মণি॥

হরিভক্তিবিলাস, ১৭ বিলাস, ৩৬ শ্লোক।

কদাচ ধারণ করিতেন না। বৈষ্ণবদিগের বর্ত্তমান ভেকগ্রহণপ্রণালীই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ নিরুত্তর হইলেন।

প্রভুপাদ এক দিন শুইয়া আছেন, অসংখ্য ছারপোকায় তাঁহার বিছানা ছাইয়া গেল। অনেক ছারপোকা আসিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। কোথাও ছারপোকা নাই; পার্শ্বে শ্রীধর শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার বিছানায় একটিও ছারপোকা নাই, আমার বিছানায় এত ছারপোকা কেন? অকস্মাৎ কোথা হইতে এত ছারপোকা আসিল? প্রভুপাদ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। ছারপোকা তাঁহাকে ক্রমাগত কামড়াইতে লাগিল। কামড়ে তাঁহার শরীর অসাড় হইয়া গেল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। সকালবেলা উঠিয়া দেখেন যে তাঁহার কাম সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার পরই তিনি ঊর্দ্ধরেতা হইলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে রাধাবাগনামে একটী উপবন আছে। লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত হওয়াতে এ স্থান অত্যন্ত নির্জ্জন। এজন্য প্রভুপাদ প্রতিদিন অপরাহ্ণে এই রাধাবাগে গিয়া নির্জ্জনে বসিয়া ভজন করিতেন। একদা তিনি একটী বৃক্ষের দিকে চাহিয়া আছেন, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষটি এক জন জটাজুটধারী মহাপুরুষের আকার ধারণ করিলেন। গোস্বামিমহাশয় এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া প্রণাম করিলেন। ইনি আর কেহ নহেন, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রভুপাদ তাঁহার সহিত অনেক ধর্ম্মালাপ করিলেন। তিনি প্রতিদিন তথায় যাইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন ও তাঁহার সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। এক দিন তিনি এই ব্যাপার শিরোমণিমহাশয়কে বলিলেন। তাঁহার

কথা শুনিয়া শিরোমণিমহাশয় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, প্রভো! আপনি তাঁহাকে দর্শন করিবেন, এ আর আশ্চর্য্য কি? তিনি ত এই ধামেই আছেন।

সেইস্থানে বঙ্গদেশীয় দুই জন বৈষ্ণববৈষ্ণবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনী। ভগিনী গোস্বামিপাদের বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া ভ্রাতাকে বলিল, ইনি কি বলেন? ইহাও কি হয়? ভ্রাতা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, এ সকল পাগলের কথা। এ কথায় বিশ্বাস করিতে নাই। তাহাদিগের কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ ও ও শিরোমণিমহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। অবিশ্বাসীদিগকে কিছুই বলিলেন না। পরদিন গোস্বামিমহাশয় রাধাবাগে গেলে মহাপ্রভু প্রকাশিত হইয়া ভ্রাতাভগিনীর অবিশ্বাস ও বিদ্রূপের কথা উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন, সেই অবিশ্বাসী পাষণ্ড তৃতীয় দিনে শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়া মারা যাইবে। গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, প্রভো! সে অজ্ঞ, আপনার মহিমা কি জানিবে? কি বুঝিবে? তাহাকে ক্ষমা করুন। মহাপ্রভু বলিলেন, পাষণ্ড ও ধর্ম্মদ্রোহীকে ক্ষমা করিতে নাই। তাহাতে ধর্ম্মের অমর্য্যাদা হয়। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই হইবে। গোস্বামিমহাশয় একথাও শিরোমণি মহাশয়কে বলিলেন। বৈষ্ণবটি শূলব্যথায় অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়া তৃতীয় দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। (প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত)।

এক দিন গোস্বামিমহাশয় রাধাবাগে বসিয়া ভজন করিতেছিলেন হঠাৎ সর্ সর্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটি বৃক্ষ অত্যন্ত কম্পিত হইতেছে। ঝড় নাই, বাতাস

নাই, গাছ কাঁপে কেন? অকস্মাৎ বৃক্ষটি অদৃশ্য হইয়া গেল এবং একটি বৈষ্ণব তথায় প্রকাশিত হইলেন। তখন গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি এখানে বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছিলেন? বৈষ্ণব বলিলেন, হাঁ, আমি বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতেছি। অতঃপর তিনি পুনর্ব্বার বৃক্ষরূপ ধারণ করিলেন। গোস্বামিমহাশয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুলদা বলিলেন, এখানকার সমস্ত বৃক্ষলতাই কি মহাপুরুষ? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, হাঁ! পরে তিনি নিম্নলিখিত বিবরণটি বিবৃত করিলেন। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে এক কুঞ্জে একটি বৃক্ষ ছিল। কুঞ্জের বৈষ্ণব বাবাজি গাছটিকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন। এক দিন একটি যুবতী বৈষ্ণবী কামে মত্ত হইয়া রজঃস্বলা অবস্থায় বৃক্ষটিকে বার বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। রজনীযোগে বাবাজি স্বপ্ন দেখিলেন, এক জন বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী তাঁহাকে বলিতেছেন, আমি বহু দিন তোমার কুঞ্জে বৃক্ষদেহধারণপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে বাস করিতেছিলাম। আমাকে অশুচি করিয়াছে। এক জন কামোন্মত্তা বৈষ্ণবী গতকল্য আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। আমি এস্থানে আর থাকিব না, অন্যস্থানে চলিলাম। বাবাজি সকাল বেলা দেখিলেন বৃক্ষটি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

গোস্বামিপাদের নিকট প্রতিদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ হইত। একটী বানর প্রতিদিন অদূরে স্থিরভাবে বসিয়া পাঠ শুনিত। প্রভুপাদ বানরটিকে কৃষ্ণদাস বলিয়া ডাকিতেন। কৃষ্ণদাস প্রতিদিন তাঁহার নিকট নানাপ্রকার খাদ্যবস্তু প্রাপ্ত হইত। একদিন আর একটি বানর এক জন বৈষ্ণবীর একখানি বাসন লইয়া অদৃশ্য হইল। বৈষ্ণবী বাসনের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল। কৃষ্ণদাস অদূরে বসিয়াছিল, গোস্বামিমহাশয় তাহাকে বলিলেন, কৃষ্ণদাস! দেখ ত কি অন্যায়!

গরিবের বাসনখানি লইয়া গেল। তুমি বাসনখানি আনিয়া দাও। প্রভুপাদের কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস চলিয়া গেল এবং কিছুকাল পরে বাসনখানি লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবী বাসন পাইয়া আনন্দিত হইল।

বৈষ্ণববেশধারী কতকগুলি প্রেত শেষরাত্রিতে পরিক্রমার পথে অনেকের দৃষ্টিপথে পতিত হইত। লোকপরম্পরায় গোস্বামিপাদ একথা শুনিয়া শিরোমণিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে শিরোমণি বলিলেন, আমি একথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু দেখি নাই। ঘটনাটি দেখিবার জন্য প্রভুপাদের ইচ্ছা হইল। তিনি এক দিন শেষ রাত্রিতে গিয়া দেখিলেন যে সত্যসত্যই কয়েক জন বৈষ্ণব তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া গোস্বামিমহাশয় প্রথমে মনে করিলেন যে, ইহাঁরা বৈষ্ণব, পরিক্রমা করিতে বাহির হইয়াছেন। পরে নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, তাহারা মানুষ নহে, প্রেত। বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গোস্বামিমহাশয়কে দেখিয়া তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে?

বৈষ্ণববেশী। আমরা প্রেত।

গোস্বামিপাদ। তোমরা প্রেত হইয়াছ কেন?

বৈষ্ণববেশী। দেবসেবার বস্তু অপহরণ করাতে। আমরা গোবিন্দের সেবক ছিলাম। ঠাকুরের সেবার জন্য যে সকল বস্তু আসিত, আমরা তাহা সেবায় না দিয়া রক্ষিতা বৈষ্ণবীদিগকে দিতাম। সেই অপরাধে আমরা প্রেত হইয়াছি।

গোস্বামিপাদ। এ অবস্থায় তোমাদিগকে কি কোন ক্লেশভোগ করিতে হয়?

বৈষ্ণববেশী। ক্লেশের কথা কি বলিব। দিবারাত্রি সহস্রবৃশ্চিক-দংশনের যাতনা অপেক্ষাও তীব্র যাতনা আমরা ভোগ করিতেছি।

গোস্বামিপাদ। তোমরা হরিনাম করিতেছ, মালাজপ করিতেছ, ইহাতে কি তোমাদিগের যন্ত্রণার লাঘব হইতেছে না? হরিনামেও কি প্রেতত্ব ঘোচে না?

বৈষ্ণববেশী। আজ্ঞা না। আমরা যে হরিনাম করিতেছি, ইহা আমাদিগের অভ্যাসবশতঃ আপনাআপনি হইতেছে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের যাতনার তিলমাত্রও হ্রাস হইতেছে না এবং প্রেতত্বও দূর হইতেছে না।

গোস্বামিপাদ। তবে এ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি?

বৈষ্ণববেশী। আমরা যে পরিমাণ দেবসম্পত্তি অপচয় করিয়াছি, কেহ তাহা পূরণ করিয়া দিলে আমরা এ দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারি। দেশে আমাদিগের সম্পত্তি আছে। আপনি যদি কৃপা করিয়া আমাদের উত্তরাধিকারীদিগকে আমাদের এই দুরবস্থার কথা জানাইয়া আমাদিগের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে দেবালয়ের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করেন এবং তাহারা যদি ক্ষতি পূরণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারি।

গোস্বামিপাদ। তোমরা তোমাদিগের উত্তরাধিকারিগণের নাম, ঠিকানা ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বলিয়া দাও; আমি পত্র লিখিব।

এই বলিয়া তিনি প্রেতদিগের নিকট হইতে তাহাদের উত্তরাধিকারীগণের নামধাম জানিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিলেন। পত্রের উত্তর আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে প্রভুপাদের বৃন্দাবন-

বাস শেষ হওয়াতে তিনি হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন ; কাজেই শেষফল কি হইল, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। আর এক দিন তিনি যখন যমুনায় স্নান করিতেছিলেন, সেই সময়ে আর কতকগুলি প্রেত তাঁহার নিকট আসিয়া অতি কাতরভাবে বলিল, প্রভো! আমাদের বড়ই ক্লেশ। আপনি দয়া করিয়া আমাদের দুঃখমোচন করুন। গোস্বামিপাদ তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি কি করিয়া তোমাদের কষ্ট দূর করিব? কিসে তোমাদের দুঃখ ঘুচিবে? প্রেতগণ বলিল, আপনার জটা হইতে যে জল পড়িবে, তাহা পান করিলেই আমাদের এই কষ্ট দূর হইবে। আপনি স্নান করিয়া উঠুন। তাহাদের কাতরতা দেখিয়া প্রভুপাদ যমুনায় ডুব দিয়া উঠিলেন। প্রেতগণ হাত পাতিয়া তাঁহার জটা হইতে যে জল পড়িতেছিল তাহা ধরিয়া পান করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব কাণ্ড, জলপানমাত্র তাহাদের কালিমামাখা, মলিন দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। তাহাদের প্রেতত্ব ঘুচিয়া গেল। তখন তাহারা আনন্দে প্রভুপাদকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

একদিন পথে নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। কীর্ত্তনের দল যখন প্রভুপাদের বাটীর নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তিনি শৌচাগারে। কীর্ত্তন শুনিবামাত্র সেই স্থানেই তাঁহার ভাবাবেশ হইল। তিনি সেই ভাবাবেশে তথা হইতে ছুটিয়া গিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিলেন এবং নাচিতে নাচিতে কীর্ত্তনের সঙ্গে চলিলেন। গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলে কীর্ত্তন থামিল। কীর্ত্তনান্তে হরির লুট হইল। হরিলুট খাইয়া বাড়ী আসিবার পথে প্রভুপাদের মনে হইল যে, তাঁহার শৌচাদি ক্রিয়া করা হয় নাই। তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া শৌচক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন এবং বিকালে শিরোমণিমহাশয়ের নিকট যাইয়া তাঁহাকে

একথা বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া শিরোমণি বলিলেন, প্রভো! এ ত ঠিকই হইয়াছে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে ত শৌচাশৌচ কিছুই থাকে না। তখন ত সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। বিষ্ঠাচন্দন এক। এই জ্ঞানকেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান বলে। যাঁহার এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তিনিই ভক্তিলাভ করিবার অধিকারী হন। ভক্তিদেবী তাঁহাকেই কৃপা করিয়া থাকেন। ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, সাধক প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, পরে যোগে পরমাত্মারূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, শেষে ভক্তিযোগে ভগবান্‌রূপে তাঁহাকে পাইয়া অনন্ত লীলাসাগরে নিমগ্ন হন। 'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ং ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে'। আপনার ভাগবতের এই অবস্থা লাভ হইয়াছে। কাজেই আপনার শৌচাশৌচাদি ভেদজ্ঞান চলিয়া গিয়াছে। শিরোমণিমহাশয়ের কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ হাসিতে লাগিলেন।

একদিন শিরোমণি মহাশয় নির্জ্জনে গোস্বামিপাদকে বলিলেন, প্রভো! আপনি যে বস্তু লাভ করিয়াছেন, জগতে এ জিনিষ দেখা যায় না। কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে ইহা দেখি না। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীতে এ বস্তু ছিল। তাঁহা হইতে ঈশ্বরপুরী এবং তাঁহার নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু এ বস্তু কেবল চারিজনকে দিয়াছিলেন। আপনি পতিতপাবন হইয়া সেই বস্তু দুই হাতে বিলাইয়া দিতেছেন। যাঁহারা পাইতেছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়া যাইতেছেন। সেই সকল নরনারীর সৌভাগ্যের সীমা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমার ভাগ্যে কি এ বস্তু ঘটিবে না। আমি কি এই অমূল্য ধনে বঞ্চিত থাকিব? আপনি আমাকে কৃপা করুন। শিরোমণিমহাশয়ের কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, আপনি কি বলেন? আমি আপনাকে কৃপা করিব? দয়াভিখারী হইয়া আমিই আপনাদের কাছে আসিয়াছি।

কোথায় আপনারাই আমাকে দয়া করিবেন, তাহা না করিয়া উল্টা কথা। আপনারা একথা বলিলে আমি দাঁড়াই কোথায়? এইরূপ বিবিধ বিনয়-বাক্যে শিরোমণির কথা চাপা দিলেন। শিরোমণিমহাশয় আর উচ্চ-বাচ্য করিলেন না। পরে তাঁহার দেহত্যাগ হইলে তিনি একদিন গোস্বামিপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বস্তু লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরেন। সেই সময়ে প্রভুপাদ শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাকে এই বস্তু (প্রেমভক্তি) দেন। এই কথা গোস্বামিপাদ পুরীতে কথায় কথায় একদিন বলিয়াছিলেন।

গোস্বামিপাদের অন্যতম ভক্ত শিষ্য ৺ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমাস্তি-পুরে চাকরী করিতেন। পিতৃবিয়োগের সংবাদে শোকে উন্মাদবৎ হইয়া এই সময়ে পদব্রজে সমাস্তিপুর হইতে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। পথে এক সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া তিনি যারপরনাই ক্লেশ পাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে সিদ্ধাই দেখাইয়া ভুলাইয়া তাহার দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিল। সতীশ প্রথমে তাহাকে সিদ্ধপুরুষ ভাবিয়া তাহার দাসত্ব করা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিয়াছিলেন। পরে যখন জানিলেন সাধু সিদ্ধপুরুষ নহে, কেবলমাত্র তাহার ভূতসিদ্ধি আছে, তখন আর তিনি তাহার দাসত্ব করিতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে সাধুর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বচসা হয়। সাধু ক্রুদ্ধ হইয়া মারিবার জন্য প্রকাণ্ড চিম্‌টা লইয়া তাড়া করাতে সতীশ অনন্যগতি হইয়া এক কূয়ার ভিতর লাফাইয়া পড়েন। কূয়ায় জল ছিল না, তাই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। সতীশকে কূয়ায় পড়িতে দেখিয়া সাধুর অত্যন্ত ভয় হইল, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পলাইল। কতকগুলি লোক দূর হইতে সতীশকে কূয়ায় পড়িতে দেখিয়াছিল; তাহারা আসিয়া তাঁহাকে কূয়া হইতে তুলিল। কয়েকদিন অত্যন্ত ক্লেশভোগের পর সুস্থ হইয়া সতীশচন্দ্র গুরুদেবের

নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি একটু ছিট্‌গ্রস্ত ছিলেন। দেখিলে আধপাগ্‌লা বলিয়া মনে হইত। বাহিরে অর্দ্ধপাগল হইলে কি হয়, তাঁহার ভিতর যে অপূর্ব্ব। তাঁহার ন্যায় ভক্ত, বিশ্বাসী, ঈশ্বরানুগত ও গুরুগত-প্রাণ লোক কোটিতে একটী মিলে কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি পৈতা ফেলিয়া দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে আসিলে গোস্বামি-পাদ তাঁহাকে বলিলেন, সতীশ তোমার পিতার প্রেতাত্মা তোমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। তুমি যথাশাস্ত্র পিতার শ্রাদ্ধ কর। সতীশ বলিল আমি উপবীতত্যাগী, হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করিব কিরূপে? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, উপবীতগ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ কর।

সতীশ। গ্রহণ করিব ত ত্যাগ করিলাম কেন? আমি উপবীত-গ্রহণের কোন আবশ্যকতা স্বীকার করি না।

গোস্বামিপাদ। তুমি স্বীকার কর বা না কর, কিন্তু পৈতা গ্রহণ ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রকৃত ব্রাহ্মণ উপবীত দিলে তাহা কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না।

সতীশ। পৈতা নাকি আবার ত্যাগ করিতে পারা যায় না? এইত আমি পৈতা ত্যাগ করিয়াছি।

গোস্বামিপাদ। যথার্থ ব্রাহ্মণ পৈতা দিলে কখনই ত্যাগ করিতে পারিতে না। আচ্ছা, আমি তোমার গলায় পৈতা দিয়া দি, তুমি তাহা ফেল্‌ দেখি?

এই বলিয়া গোস্বামিপাদ তাঁহার গলায় পৈতা দিয়া দিলেন। সতীশ বহু চেষ্টা করিয়াও সে পৈতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। যখনই পৈতা-ত্যাগের সংকল্প তাঁহার মনে হইত, তখনই তাঁহার শরীরে এক প্রকার তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। পৈতাত্যাগের সঙ্কল্প ছাড়ার সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হইত। তিনি কিছুতেই উপবীত ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

একদা গোস্বামিপাদ ও শিরোমণি মহাশয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে কথা হইতেছিল; কথাপ্রসঙ্গে শিরোমণিমহাশয় প্রভুপাদকে বলিলেন, "প্রভো! শুনিতে পাই, বঙ্গদেশে নাকি মহাপ্রভু অবতার হইয়াছেন? কতকগুলি লোক নাকি—

"আরও দুই জন্ম সংকীর্ত্তনারম্ভে
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।"

মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করিয়া সেই অবতারকে সমর্থন করিয়া সরলপ্রকৃতি লোকদিগকে প্রতারিত করিতেছে। চৈতন্যদেব এই কলিযুগে আরও দুইবার অবতার গ্রহণ করিবেন, চৈতন্যভাগবতের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর এরূপ অর্থ নহে। এই কলির পরবর্ত্তী আরও দুই কলিযুগে মহাপ্রভু শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রচার করিবেন,এই কথাই জননীকে বলিয়াছিলেন। এখন যাহারা মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া পরিচয় দেয়, অথবা ভবিষ্যতে দিবে, তাহারা সকলেই ভণ্ড ও প্রতারক। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চৈতন্যভাগবতের কথা বলিয়া অজ্ঞ লোকদিগকে প্রতারিত করে।"

কেশীঘাটে নারায়ণস্বামী নামে একজন সাধু থাকিতেন। তাঁহার প্রেতসিদ্ধি ছিল। তিনি এই প্রেতের সাহায্যে লোকদিগকে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ও অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতেন। ইহাতে বৃন্দাবনে তাঁহার অতিশয় প্রভাবপ্রতিপত্তি হইয়াছিল। সাধারণ লোক অতিশয় হুজুগপ্রিয়। তাহারা যথার্থ সাধুতা, ভক্তি, ভগবৎপ্রেম বুঝে না। এসকলের দিকে তাহাদের চিত্ত সেরূপ আকৃষ্ট হয় না, যেরূপ অলৌকিক কার্য্য, অদ্ভুত কোনকিছু দ্বারা হয়। যে সাধু আজগুবি কিছু দেখাইতে পারেন, করিতে পারেন, তাঁহাকেই তাহারা বড় সাধু বলিয়া ভক্তি করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। গোস্বামিপাদের নিকটে অনেকে আসিয়া

শ্রীশ্রী যোগমায়া দেবী

( তিরোভাবের পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন গমন সময়ে )

নারায়ণস্বামীর অত্যন্ত সুখ্যাতি করিত। লোকের কথা শুনিয়া প্রভুপাদ একদিন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। স্বামিজী তাঁহাকে খাতির করিয়া বসাইলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিলেন। অতঃপর গোস্বামিপাদ বলিলেন, অনুমতি করুন এখন যাই। স্বামিজী তাঁহাকে সম্মানের সহিত বিদায় দিয়া বলিলেন, আপনি আগামী কল্য সন্ধ্যার পর একবার অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন, আমি আপনাকে কিছু আশ্চর্য্য দেখাইব। গোস্বামিপাদ চলিয়া আসিলেন। পর দিন যথাসময়ে তিনি স্বামিজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলে স্বামিজী আদর করিয়া তাঁহাকে ঘরের বারান্দায় বসাইলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কিছুকাল ঘরের ভিতরের দিকে চাহিয়া থাকুন ত।

স্বামিজীর কথায় গোস্বামিমহাশয়ের কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইল। যাহা হউক তিনি ঘরের ভিতরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক সজীব বিষ্ণুমূর্ত্তি ঘরের ভিতরে প্রকাশিত হইল। হঠাৎ জীবন্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়া গোস্বামিপাদ একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হইল। তখন তিনি স্থিরভাবে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। জপ আরম্ভকরা মাত্র বিষ্ণু কাঁপিতে লাগিল। ইহাতে গোস্বামিমহাশয়ের মনে এ যথার্থ বিষ্ণু কিনা সন্দেহ হওয়াতে তিনি তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি একটু দেখিতেই বুঝিতে পারিলেন যে এ যথার্থ বিষ্ণু নহে। ইহার শ্রীবৎসচিহ্ন নাই। আর ইহাকে দেখিয়া মনে সাত্বিক ভাবের উদয় হইতেছে না। এদিকে বিষ্ণুও কাঁপিতে কাঁপিতে "আমাকে কোথায় আনিয়াছিস্, আমাকে কার কাছে আনিয়াছিস্, পুড়িয়া মরিলাম, মন্ত্রতেজ সহিতে পারিতেছি না, আমার দেহ জ্বলিয়া গেল," বলিতে বলিতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বিষ্ণুকে পলাইতে দেখিয়া স্বামিজী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তিনি একটু বিরক্তির সহিত প্রভুপাদকে বলিলেন আপনি কি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, হাঁ। স্বামিজী বলিলেন, আপনার এ কাজটা ভাল হয় নাই। আমি ত জানিতাম না যে আপনি এ কার্য্য করিবেন, জানিলে নিষেধ করিতাম। স্বামিজীর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, কেন ইহাতে কি দোষ হইয়াছে? আমি ত ইহাতে কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না। আপনার বিষ্ণু ভগবানের নাম সহিতে পারে না কেন? ভগবান্ ভগবানের নাম সহিতে পারে না, ভয় পায়, এ ত অতি অদ্ভুত কথা। যাহা হউক আমি সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। প্রেতকে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা কিছু অদ্ভুত দেখাইয়া আপনি অজ্ঞ লোকদিগকে বশীভূত করেন। ইহাতে তাহাদের মধ্যে আপনার যথেষ্ট পসারপ্রতিপত্তি হয়। আমাকেও সেইরূপ দেখাইতে গিয়াছিলেন। আপনার প্রেত ত বিষ্ণু হইল, কিন্তু তাহার শ্রীবৎসচিহ্ন কৈ? ইহা বোধ হয় আপনার জানা নাই যে প্রেত কোন দেবতার মূর্ত্তি ধরিলেও সেই দেবতার বিশেষ চিহ্ন যাহা—যেমন বিষ্ণুর শ্রীবৎসচিহ্ন, লক্ষ্মীর অম্লান পদ্মের মালা, হরপার্ব্বতীর ললাটস্থ চক্ষু ইত্যাদি, তাহা ধরিতে পারে না। ইহা জানা থাকিলে বোধ হয় আপনি আমার সহিত এইরূপ প্রতারণা করিতেন না। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া স্বামিজী লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলেন না। পরে গোস্বামিমহাশয়ের হাতে ধরিয়া অনেক অনুনয়ের সহিত ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। আর এ কথা যাহাতে প্রকাশ না হয়, তাহার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া গোস্বামিপাদকে বিদায় দিলেন। আসিবার সময়ে প্রভুপাদ স্বামিজীকে এই কার্য্যের অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া ইহা ত্যাগ করিতে বলিয়া চলিয়া আসিলেন।

গোস্বামিমহাশয়ের পত্নী ভগবতী যোগমায়া দেবী পতির আদেশে ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। পুত্র যোগজীবন এবং

কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমসখীকে (কুতুবুড়ি) লইয়া তিনি আষাঢ় মাসে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিবার পথে তিনি দ্বারভাঙ্গায় গিয়া কয়েক দিন ছিলেন। আমি তখন দ্বারভাঙ্গায় থাকিতাম। শান্তিসুধা আমার কাছে ছিলেন। তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা। গোস্বামিমহাশয়ের ভায়রা-ভাই (দিদিমায়ের ছোট জামাই) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বাগ্‌ছি, তখন দ্বারভাঙ্গায় ডাকঘরে চাকরী করিতেন। তিনি সেই সময়ে ছুটি লইয়া দেশে আসিতে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে শান্তিসুধাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া জননী যোগমায়া পুত্রকন্যার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে যান। গোস্বামিমহাশয় এই সময়ে তাঁহার গুরুদেবের আদেশে বিশেষ ব্রত লইয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন। এই কারণে তিনি পত্নী হইতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার জন্যই তাঁহাকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে তিনি আবার তাঁহার কাছে যান। প্রভুপাদ তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইতে নিষেধ করিয়া পত্রও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি না যাইয়া থাকিতে পারিলেন না। পতিই সতীর একমাত্র গতি। পতির সঙ্গচ্যুতি সতীর মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর। পতিবিচ্ছেদে সতীর জীবনধারণ বিষম কষ্টদায়ক হয়। পতিকে ছাড়িয়া আসিয়া যোগমায়া দেবীর জীবন অতিশয় দুঃখময় হইয়া উঠিল। তিনি আহারনিদ্রা একরূপ পরিত্যাগ করিয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি বিছানায় শুইতেন না। ঢাকার দুরন্ত মশাতেও মশারি ব্যবহার করিতেন না। পতিবিরহে তিনি একেবারে জীবন্মৃত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার সে সময়কার অবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আসিত। এইরূপে কয়েকমাস কাটাইলেন, শেষে আর পারিলেন না। কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকার ন্যায় উন্মাদিনীর মত তিনি বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জননী তাঁহার বৃন্দাবনগমনে শত বাধা দিলেন, তিনি তাহা মানিলেন না। নদী যখন প্রাণের

আবেগে ছুটিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিতা হয়, তখন কোন বাধাই তাহার গতি রোধ করিতে পারে না। সেইরূপ যোগমায়াকেও কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি সমস্ত বাধা ঠেলিয়া তাঁহার হৃদয়দেবতার চরণতলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে সুখের আশা করিয়া বৃন্দাবনে আসিলেন, তাহা হইল না। বিধাতা বাদ সাধিলেন। তাঁহার সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। গোস্বামিপাদ তাঁহাকে কাছে রাখিতে সম্মত হইলেন না। তখন তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গোস্বামিমহাশয় এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। স্বামীর এইরূপ উপেক্ষা তাঁহার প্রাণে বড়ই বাজিল। তাঁহার মর্ম্ম ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। একদিন তিনি শ্রীধরকে ডাকিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন"শ্রীধর আমার অবস্থা কেহ বুঝিল না। গয়াতে যখন ইনি (গোস্বামি মহাশয়) সাধন পাইলেন, তখন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে তিনি সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি মাকে লইয়া গয়ায় গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি যে তিনি সন্ন্যাসীর মত বেশ করিয়া আকাশগঙ্গার পাহাড়ে বাস করিতেছেন। স্ত্রীজাতির স্বামীই একমাত্র আশ্রয়। সেই স্বামী সন্ন্যাসী হইলে স্ত্রীর যে কি অবস্থা হয়, তাহা পুরুষে বুঝিতে পারে না। গয়াতে বাস করিতেছি হঠাৎ একদিন আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার একত্র সাধন করিতে হইবে। অতএব তোমাকে আমি ত্যাগ করিতে পারিব না। এই বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। সেই হইতে আমরা দুইজনে একত্র হইয়া সাধন ভজন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আবার উনি যে প্রকার ভাব দেখাইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, যেন আমাকে উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। আমাকে ছাড়িয়া

সন্ন্যাসী হইলে উহাঁর কোন ধর্ম্ম হইবে না।" এই প্রকার বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইল; চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে উনি যে অবস্থা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহা লাভ করিতে পারিবেন না; এমন কি আবার সংসারে আসিয়া জন্ম লইতে হইবে।" একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি পতির নিকট যাইয়া বলিলেন, আমি তোমার কাছে আসিলাম। তুমি ত আমার সহিত কথাই বল না। আমি এখন কি করি? গোস্বামিপাদ বলিলেন, একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে গিয়া থাক। আমার কাছে তোমার থাকা হইবে না। স্বামীর এই নিদারুণ কথা শুনিয়া যোগমায়া দেবী কাতরভাবে বলিলেন, আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমি তোমার কাছেই থাকিব। এই কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি যে আশ্রম গ্রহণ করিয়াছি এবং যে ভাবে চলিতেছি, তাহাতে এখানে তোমার থাকা হইবে না। তুমি ঢাকায় ছিলে, এখানে আসিলে কেন? তুমি আমাকে আর বিরক্ত করিও না। স্বামীর এই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগমায়া দেবী অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। তিনি পতির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিব না। এই তোমার ঘর হইতে বাহির হইলাম। এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রি তিনি ভিন্ন ঘরে থাকিয়া পরদিন সকালবেলা যোগজীবনকে বলিলেন, তুই কুতুকে লইয়া ঢাকায় চলিয়া যাস্। এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। অনেকবেলা পর্য্যন্ত তাঁহাকে না দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সকলেই মনে করিলেন, তিনি কোথাও চলিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে কুলদার হরিবংশের ভিতরে একখণ্ড কাগজ

পাওয়া গেল। তাহাতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, আমি চলিলাম; আমার অনুসন্ধান করিও না। এই কাগজখানি পড়িয়া সকলেই অত্যন্ত ভীত হইলেন। সকলেই মনে করিলেন হয়ত তিনি যমুনায় ডুবিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। কচ্ছপে তাঁহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত বৃন্দাবনে এ কথা রাষ্ট্র হইল। সকলেই খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেলনা। এই ভাবে তিন দিন গত হইল। সকলেই একরূপ নিরাশ হইলেন; সকলেই মনে করিলেন, তিনি নাই। তখন প্রভুপাদ যোগজীবনকে বলিলেন, তুই কুতুকে লইয়া ঢাকায় যা। একটি বারেন্দ্রশ্রেণীর ছেলের সহিত কুতুর বিবাহ দিস্। আর একটি মন্দির করিয়া তাহাতে তোর জননীর বস্ত্রাদি যাহা আছে রাখিয়া পূজা করিস্ ও ভোগ দিস্। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে দাউজীর সেবাইত দামোদর পূজারি ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া বলিল, মা ঠাকুরাণীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তিনি গোবিন্দের ঘেরায় অলঙ্গবৈষ্ণবীর আখড়ায় আছেন। এই কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় দামোদর পূজারি, শ্রীধর, সতীশ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া অলঙ্গের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাঠাকুরাণী একখানি ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। শ্রীধর ও সতীশ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িলেন এবং বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গোস্বামিপাদ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মাঠাকুরাণী তাঁহার কাছে আসিলেন। গোস্বামিপাদ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে চলিলেন। তিনি অগ্রে, জননী যোগমায়া তাঁহার পশ্চাতে। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে লইয়া আসন গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের আহারের জন্য দাউজীর প্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। গোস্বামিপাদ প্রসাদ পাইয়া মাতৃদেবীকে খাইতে বলিলেন।

মাতা ঠাকুরাণী খাইতে সম্মত হইলেন না। প্রভুপাদ অনেক বলিয়াও রাজি করিতে পারিলেন না। তখন অত্যন্ত নরম হইয়া বলিলেন, তোমার কাছে আমার যে অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা কর; প্রসাদ পাও। স্বামীর এই কথায় মাতা ঠাকুরাণীর মন প্রসন্ন হইল। তিনি প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি প্রভুপাদের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আমি গোস্বামিমহাশয়ের নিকট আরও একটু শুনিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে মাতা ঠাকুরাণী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সমস্ত দিন এক জায়গায় লুকাইয়া ছিলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি যমুনায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলেন। তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিবেন এমন সময় পরমহংসজী আসিয়া বাধা দেন। পরে তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া ফিরাইয়া দেন। পরমহংসজীর কথায় আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তিনি অলঙ্গ বৈষ্ণবীর আখড়ায় গিয়া ছিলেন। সন্ধান পাইয়া সেইস্থান হইতে তাঁহাকে আশ্রমে আনা হয়।*

মাতাঠাকুরাণী গোস্বামিমহাশয়ের সহিত একত্রে বাস করাতে সাধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ গোস্বামিপাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেন, এই গৌড়ীয় বাবাজি সাধুর ভেক গ্রহণ করিয়া পত্নীর সহিত বাস করেন কেন? তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া পূজ্যপাদ কাঠিয়া রামদাস বাবাজি বলিতেন, মহারাজ সামর্থী পুরুষ, তাঁহার ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। তেজিয়ান্ ব্যক্তি সকলই করিতে

* ঘটনাটি প্রভুপাদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপই লিখিলাম। এই সময়ে পরমহংসজী মাঠাকুরাণীকে মুক্তিনাথে লইয়া গিয়াছিলেন এইরূপ একটা কথা রটিয়াছিল, আমি প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন "আমি তাঁহার মুক্তিনাথ যাওয়ার কথা জানিনা।"

পারেন। হুতাশন সমস্তই ভক্ষণ করিতে পারেন। মহাদেব বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তেজস্বীর নিকট কিছুই দোষাবহ নহে। বাবাজি (গোস্বামি মহাশয়) ঊর্দ্ধরেতা নিষ্কাম পুরুষ, তিনি নিষ্কামভাবে পত্নীর সহিত একত্র বাস করেন"।

পতির নিকটে অবস্থান করিয়া জননী যোগমায়া মনের আনন্দে পতিসেবায় নিযুক্ত হইলেন। গোস্বামিপাদ যতদিন একাকী ছিলেন, ততদিন দাউজীর প্রসাদ খাইতেন। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ হইত। আহারের কষ্টে তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল। ইহা দেখিয়া ভগবতী যোগমায়া তাঁহার আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিলেন। রন্ধনকার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত দক্ষতা ছিল। নানাপ্রকার উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া তিনি পতি পুত্র প্রভৃতিকে পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করাইতেন। দাউজী তাঁহার হাতের অন্নব্যঞ্জন আহার করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন, তোমরা ভাল ভাল দ্রব্য খাও, আর আমাকে দেওনা। আমাকে দিও। সেই দিন হইতে মাতাঠাকুরাণী তাঁহার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন দাউজীকে ভোগ দিতেন।

তিনি একটি ছোট বগুনায় একবার মাত্র অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন, অর্থাৎ এক বগুনা ভাত, এক বগুনা দাল, এক বগুনা তরকারী। এক বস্তু একবার বই দুইবার পাক করিতেন না। কিন্তু যত লোকই আহারের জন্য উপস্থিত থাকুক না কেন তিনি তাহা দ্বারাই সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। সে অন্নব্যঞ্জন যেন অফুরন্ত। যতক্ষণ তিনি ভোজন না করিতেন, ততক্ষণ যতলোক ভোজনার্থী হইয়া উপস্থিত হইত সকলেরই সংকুলন হইত। তিনি ভোজন করিলে নিঃশেষ হইয়া যাইত। মহাভারতে দ্রৌপদীর সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিন প্রেমসখী পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন, বাবা! একটি সুন্দর ছেলে হামা দিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায় এবং আমার দিকে চাহিয়া হাসে। এ কে? এ বাড়ীতে ত কোন ছেলে নাই!

গোস্বামিপাদ। দাউজী তোমার সঙ্গে খেলা করেন। তিনি ছেলেদের সঙ্গে খেলিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। তুই একটি গোপাল আনিয়া পূজা কর্। পিতৃআদেশে প্রেমসখী একটি গোপাল আনিয়া সেবা করিতে আরম্ভ করে। সে যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন নিজেই সেবা করিত। তাঁহার মৃত্যুর পর গোপালকে তাহার মাতাঠাকুরাণীর সমাধিমন্দিরে রাখা হইয়াছে। সেখানে তাঁহার প্রত্যহ সেবা হয়।

একদিন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক গোস্বামিপাদের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, মহাশয়, আমি দেশে থাকিতে বৃন্দাবনধামের কত মহিমা, রজের কত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম! কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানের বিশেষত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, রজের মহিমা নিশ্চয়ই আছে। একবার রজে গড়াগড়ি দিয়া দেখুন দেখি। এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি প্রথমে জামা ইত্যাদি না খুলিয়াই রজে গড়াগড়ি দিলেন, কিন্তু তাহাতে রজের মহিমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন বলিলেন, কই যেমন তেমনই ত। কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না। তখন গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, জামাটি খুলুন, ভাল করিয়া সমস্ত শরীরে রজ লাগাইয়া গড়াগড়ি দিন দেখি। ভদ্রলোকটি তাহাই করিলেন। খালি গায়ে রজে গড়াগড়ি দিবামাত্র তাঁহার প্রাণ গলিয়া গেল। নয়ন অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তখন তিনি

গোস্বামিপাদের দিকে চাহিয়া বাষ্পপূর্ণনেত্রে বলিতে লাগিলেন, আজ আমি ধন্য হইলাম, আপনার কৃপায় ব্রজের অপার মহিমা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার বৃন্দাবন আসা সার্থক হইল। এই বলিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ দৈন্যপ্রকাশ ও সর্ব্বাঙ্গে রজলেপন করিয়া গোস্বামিমহাশয়কে অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

কুতুবুড়ি একদিন গোস্বামিমহাশয়কে বলিল, বাবা আমরা যখন তোমার সঙ্গে যমুনাতীরে বসিয়াছিলাম, তখন তুমি বলিতেছিলে, ডুব্‌বে না, ডুব্‌বে না। এ কথা কাকে বল্‌ছিলে? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, আর কারে বল্‌ব। বসে আছি এমন সময়ে কৃষ্ণ নৌকা লইয়া আসিয়া বলিলেন, নৌকায় ওঠ্‌। চল্‌ যমুনায় বাচ্‌ খেলিয়া আসি। নৌকায় উঠিলাম। দুষ্টের শিরোমণি, মাঝ যমুনায় নৌকা ডুবায় আর কি। গোপীরা সকলে ভয়ে আড়ষ্ট। আমার মনে হইল কৃষ্ণ কখনই নৌকা ডুবাইবে না। নৌকা ডুবাইলে সেও যে ডুবিয়া যাইবে। তাই গোপীদিগকে বলিলাম, ডুবাবে না।

এই সময়ে যমুনার চড়ায় এক খানি অস্থি পাওয়া যায়। গোস্বামিপাদই বালির ভিতর হইতে তাহা বাহির করেন। অস্থিখানি হরেকৃষ্ণ নামে অঙ্কিত ছিল। ইহা কোন ভজনশীল বৈষ্ণবের অস্থি মনে করিয়া বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তন করিয়া তাহা সমাধিস্থ করেন। সাধক যখন ভগবানের নাম করেন তাহার ছাপ সাধকের সমস্ত দেহে অঙ্কিত হইয়া যায়।

অতঃপর গোস্বামিমহাশয় একজন পণ্ডিতের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করেন।

ভাদ্র মাসে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করা হিন্দুদিগের নিকট মহাপুণ্যজনক কার্য্য। শাস্ত্রে লেখা আছে ভগবান্ দ্বাপরের শেষে দেবকী-

গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার পর, দেবগণ সমস্ত ব্রজমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হইয়া আসিতেছে। মাঝে যখন তীর্থসকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন বনযাত্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরে গোস্বামিপাদগণ শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া বনযাত্রার পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। জন্মাষ্টমীর পরবর্ত্তী একাদশী তিথিতে পরিক্রমা আরম্ভ হইয়া তৎপরবর্ত্তী একাদশীতে শেষ হয়। যাত্রীগণ বৃন্দাবন হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ দিনে সমস্ত ব্রজমণ্ডল প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হন। এতদ্ভিন্ন রামানুজ, নিম্বাদিত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধুগণ এই পরিক্রমাব্যাপার দেড় মাসে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বনযাত্রাব্যাপার মহাসমারোহে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বহু সহস্র লোক এক সঙ্গে গমন করেন। হাটবাজার, দোকান-পসার সমস্তই যাত্রীদিগের সঙ্গে সঙ্গে যায়। যাত্রীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুলিসের বন্দোবস্ত থাকে। বনযাত্রার সময় উপনীত হইলে গোস্বামিমহাশয় সস্ত্রীক শিষ্যগণকে লইয়া পরিক্রমায় বাহির হইলেন। ব্রজমণ্ডলের বনভূমি পরম রমণীয় স্থান। যাত্রীগণ বনপরিক্রমায় গমন করিয়া বনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা দেখিয়া সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর বনে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ও ভগবানের লীলা-খেলার অনেক চিহ্ন তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইয়া থাকে। ভগবান্ যখন ব্রজমণ্ডলে প্রকটলীলা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা দুগ্ধ ও জলপান করিবার জন্য বৃক্ষের নিকট হইতে দোনা এবং পায়ে পরিবার জন্য নুপুর চাহিয়া লইতেন। বৃক্ষগণ ভগবানের আদেশে দোনা ও নুপুর প্রদান করিত। সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত বনভূমিতে বৃক্ষে দোনা ও নুপুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। বনযাত্রীগণ বনযাত্রায় যাইয়া এখনও বৃক্ষে দোনা ও নুপুর দেখিয়া থাকেন। যে বনে দোনার

গাছ আছে, সেই বনে উপনীত হইয়া প্রভুপাদ দোনা দেখিবার অভিলাষে গাছের কাছে প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা করিবার পর আকাশে যেমন এক একটি করিয়া নক্ষত্র প্রকাশিত হয়, সেইরূপ গাছে একটির পর একটি দোনা প্রকাশিত হইয়া বৃক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গোস্বামিমহাশয় এইরূপ হইতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইলেন। ভগবান্-পর্ব্বতের উপর গোচারণ করিতেন। পর্ব্বতের গায়ে গোরু ও বাছুর সকলের খুরের যে চিহ্ন হইয়াছিল তাহা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবান কৃষ্ণবলরাম ও রাখালগণের পদচিহ্নও অঙ্কিত আছে। চরণচিহ্নের জন্য পর্ব্বতটী চরণপাহাড়ী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবান্ শৈশবে যে স্থানের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সে স্থানের মৃত্তিকাকে লোকে "মাখনমাটী" বলে। সে মাটীর এক প্রকার অপূর্ব্ব সৌরভ। লোকে তাহা ভক্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহা খাইতেও বেশ স্বাদু। এই মৃত্তিকা দেখিতে অন্য মৃত্তিকা হইতে পৃথক্‌বিধ।

গোস্বামিমহাশয় যাত্রীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বনের অতুল সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা সন্দর্শন করিতে করিতে পনর দিনে পরিক্রমা শেষ করিয়া ও লীলাস্থল সকল প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর শিরোমণিমহাশয় কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বৃন্দাবনপ্রাপ্তি উপলক্ষে অতি সমারোহের সহিত মহোৎসব ও সংকীর্ত্তন হয়। গোস্বামিমহাশয় সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয় দেহত্যাগ করিবার কয়েকদিন পরে একদিন গোস্বামিমহাশয়ের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, প্রভো! আমার শ্রীবৃন্দাবন লাভ হইয়াছে। আপনি আমাকে কৃপা করুন।

শান্তিসুধার জ্যেষ্ঠপুত্র বৃন্দাবন (দাউজী) এই সময়ে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করে। দাউজী ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোস্বামিমহাশয় নিকটবর্ত্তী সকলকে বলিলেন, মহাপুরুষের জন্ম হইল, তোমরা শংখধ্বনি কর। তখন কেহই তাঁহার এই বাক্যের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরদিন যখন তাঁহারা তারের সংবাদে শান্তিসুধার পুত্রপ্রসবের সংবাদ অবগত হইলেন, তখন গোস্বামিমহাশয়ের বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন। গোস্বামিমহাশয়ও বলিলেন, শান্তির ঘরে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, এজন্য আমি কাল শাঁখ বাজাইতে বলিয়াছিলাম। (১২৯৭ সালের ২২শে পৌষ সোমবারে জন্ম হয়)।

১২৯৭ সালের মাঘ মাসের প্রথমভাগে একদিন রাত্রিতে কয়েকজন মহাপুরুষ গোস্বামিপাদের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, আজ হিমালয়ে মুক্তিনাথ তীর্থে উৎসব হইবে, আমরা সেখানে যাইতেছি; তুমি আমাদিগের সঙ্গে চল। গোস্বামিমহাশয় তাঁহাদের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলে মাতাঠাকুরাণী গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব; আমাকে লইয়া চল।

গোস্বামিমহাশয়। তুমি আমাদিগের সঙ্গে কিরূপে যাইবে? আমরা সূক্ষ্মদেহে যাইব।

পত্নী। তোমরা ইচ্ছাকরিলে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পার।

এই বলিয়া যাইবার জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। সহধর্ম্মিণীর আগ্রহ দেখিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, তোমার এখন যে অবস্থা তাহাতে ত তুমি সূক্ষ্মদেহে যাইতে পারিবে না। অবস্থা না খুলিলে স্থূলদেহ হইতে লিঙ্গ শরীরে বাহির হওয়া যায় না। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া মা বলিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলেই

আমার অবস্থা খুলিয়া দিতে পার। আমার অবস্থা খুলিয়া দাও। তাঁহার কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইলে আর সংসারে এবং শরীরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিবে না। সে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তুমি মায়ামোহ হইতে মুক্ত হইবে। এমন এক রাজ্য তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে, যাহা দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইয়া যাইবে, ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া যাইবে। ভগবানের নিত্য-লীলা দর্শন করিয়া বিভোর হইয়া পড়িবে। তোমার অবস্থা খুলিয়া দিলে তুমি শরীরে বদ্ধ থাকিতে চাহিবে না। তোমার বৃদ্ধা মাতা ও বালিকা কন্যা রহিয়াছেন। তুমি কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের কি শোচনীয় অবস্থা হইবে!

গোস্বামিমহাশয়ের একথা শুনিয়াও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না! পুনঃ পুনঃ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন!

তাঁহার এইরূপ কাতরতা দেখিয়া পরমহংসজী বলিলেন, ইঁহার অবস্থা খুলিয়া দিবার সময় হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার অবস্থা খুলিয়া দিলেন। তখন তাঁহার সম্মুখ হইতে মায়ার আবরণ অপসারিত হইয়া যাওয়াতে অধ্যাত্ম সমস্ত তত্ত্ব তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল। তিনি ভগবানের নিত্যলীলা দর্শনের অধিকার লাভ করিয়া সেই লীলার অঙ্গীভূত হইলেন।

অতঃপর তিনি তাঁহাদের সহিত সূক্ষ্মদেহে মুক্তিনাথে গমন করিলেন এবং তথাকার উৎসব দর্শন করিয়া পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। *

* শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগ্‌চি তাঁহার বিজয়কথামৃতে এই ঘটনা ১২৯৫ সালে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিয়া গুরুতর ভুল করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থলে এইরূপ ভুল রহিয়াছে।

গোস্বামিমহাশয়ের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান সময়ে তথায় কুম্ভমেলা হয়। কুম্ভমেলা কি, তাহা আমাদিগের দেশের অনেকে জানেন না। মেলা বলিলে আমাদিগের দেশের লোক প্রদর্শনী বুঝিয়া থাকেন। দেশের উৎকৃষ্ট কৃষি অথবা শিল্পজাত দ্রব্য এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী খোলা হয় এবং প্রেরিত পদার্থের অধিকারীদিগকে গুণানুসারে পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদপ্রমোদও হইয়া থাকে।

কুম্ভের মেলা ইহার কিছুই নহে। কুম্ভের মেলা সাধুদিগের সম্মিলনী। ভারতবর্ষের সকল স্থানের, সকল সম্প্রদায়ের সাধু মোহান্তগণ দ্বাদশ বৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও পঞ্চবটী এই চারিস্থানে সমবেত হইয়া থাকেন। অন্য মেলার উদ্যোগী এবং আয়োজনকর্ত্তা আছে; ইহার তাহা কিছুই নাই। কেহ কাহাকেও আহ্বান করে না। ইহা সকলের মেলা। নানা সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ সাধু প্রাণের টানে মেলায় উপনীত হইয়া পাশাপাশি, ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া মাসাবধি বাস করেন; কিন্তু কিছুমাত্র গোলমাল হয় না। অন্যান্য মেলায় আট আনা লোক হইলে ষোল আনা গোল হয়; কিন্তু এ মেলায় অধিকাংশ লোকই কথা বলে না। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী, অঘোরপন্থী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ সাধু একত্র সম্মিলিত হন। পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্মমত ও আচারব্যবহার লইয়া যথেষ্ট প্রভেদ। এমন কি এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থ ব্যবহার্য্য বস্তু অন্য সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্য। কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ সাকার উপাসক, কেহ নির্গুণ ব্রহ্মবাদী। কোন কোন সম্প্রদায়ের সাধনের বস্তু পঞ্চ মকার ও নরমাংস। কোন সম্প্রদায় মকার স্পর্শ করা মহাপাপ মনে করেন।

কিন্তু ইহাঁদিগের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের আদর থাকাতে পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, পন্থা ভিন্ন হইলেও তাঁহাদিগের সকলেরই গম্যস্থান এক, প্রাপ্য বস্তু এক। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার পন্থা অনেক, তাহা তাঁহারা বুঝেন, সেই জন্যই এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট মনে না করিয়া পরস্পরকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পন্থাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকেন। সংসারে কিন্তু আমরা ইহার বিপরীত আচরণ দেখিতে পাই। খৃষ্টান মনে করেন, তাঁহার ধর্ম্মই সত্য; আর সকল ধর্ম্ম কাল্পনিক ও ভ্রমপূর্ণ। মুসলমান বলেন, মুক্তি কেবল তাঁহারই ধর্ম্মে; অন্য ধর্ম্মে মুক্তি হয় না। কুম্ভমেলায় ইহার বিপরীত ভাব দর্শন করিয়া প্রাণ শীতল হয়।

কুম্ভমেলায় সমাগত সাধুমণ্ডলীর মধ্যে নানাশ্রেণীর সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ উলঙ্গ, কেহ কৌপীনধারী, কেহ কুটীরবাসী, কাহারও বাসস্থান অনন্ত আকাশের নীচে, কেহ লোকের সহিত কথা বলেন, কেহ মৌনী, কেহ অন্ন ভোজন করেন, কেহ ফলাহারী। এক এক মহান্তের অধীনে সহস্র সহস্র সাধু বাস করেন, ইহাকে জমায়েত বলে। জমায়েতের সমস্ত সাধুদিগের ভরণপোষণের ভার মহান্তদিগের উপর ন্যস্ত। মহান্তগণের অনেকের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলেন। প্রতিদিন ভগবান্ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যাহা বিধান করেন, তাঁহারা সন্তুষ্টমনে, অবনতমস্তকে তাহারই অনুগামী হইয়া চলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই লক্ষ লক্ষ সাধুর গ্রাসাচ্ছাদনব্যাপার নীরবে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই

কৃপাতে মহান্তগণ সহস্র সহস্র সাধুর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেছেন। সংসারে কোথাও একটা অনাথআশ্রম স্থাপিত হইলে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কিন্তু এই ভারতভূমিতে এখনও লক্ষলক্ষসাধুসেবারূপ বৃহৎ ব্যাপার প্রতিদিন নীরবে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে ?

অতি প্রাচীনকাল—ঋষিদিগের সময় হইতে চারিস্থানেই কুম্ভমেলা হইত। তখন বৃন্দাবনে ইহার অধিবেশন হইত না। শ্রীমৎ রূপ সনাতনের সময় হইতে বৃন্দাবনে কুম্ভমেলা আরম্ভ হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায় বৃন্দাবনে যান না। বৈষ্ণবগণ হরিদ্বারে যাইবার সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার চড়াতে সমস্ত মাঘ মাস বাস করিয়া থাকেন। রূপসনাতনপ্রমুখ বৈষ্ণবদিগের যত্নে শ্রীবৃন্দাবনে এই সাধুসমাগমের ব্যবস্থা হয়। প্রায় চারিশত বৎসর হইতে বৃন্দাবনে কুম্ভমেলা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৃন্দাবনের কুম্ভমেলা, রূপসনাতনের অক্ষয় কীর্ত্তি।

গোস্বামিমহাশয়ের বৃন্দাবনে বাসসময়ে তথায় কুম্ভমেলা হয়। গোস্বামিমহাশয় একমাসকাল কুম্ভমেলাদর্শন ও সাধুসঙ্গ করেন। তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আহার করিয়া মেলাস্থানে গমন করিতেন এবং সাধুদর্শন ও তাঁহাদিগের সহিত আলাপাদি করিয়া সন্ধ্যাকালে আসনে প্রত্যাগমন করিতেন। যতদিন মেলা ছিল, ততদিন তিনি এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম করেন নাই। এক মাস অতীত হইলে মেলা ভাঙ্গিয়া গেল। সাধুগণ হরিদ্বারে গমন করিলেন।

গোস্বামিমহাশয় তাঁহার গুরুদেবের আজ্ঞায় এক বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিলেন। এক বৎসর পূর্ণ হইলে, তিনি তাঁহার পত্নীকে বলিলেন, গুরুদেব আমাকে এক বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিবার জন্য

আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এখন এক বার আমার হরিদ্বার যাইবার ইচ্ছা। সেখানকার কুম্ভমেলা দেখিয়া ঢাকায় যাইব। তুমি তদুপযোগী আয়োজন কর। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া মা বলিলেন, তোমাদিগের হরিদ্বার যাইবার ইচ্ছা হয় যাও। আমি যাইব না। আমি এখানেই থাকিব।

গোস্বামিমহাশয়। আমরা এস্থান হইতে চলিয়া গেলে তুমি কাহার নিকট থাকিবে?

পত্নী। আমি বৃন্দাবনে থাকিব। এই দেহটা লইয়াই ত যত গোল। দেহটা ছাড়িয়া দিলেই ত সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। আমি শরীরত্যাগ করিয়া নিত্যলীলার অঙ্গীভূত হইয়া এই ধামে বাস করিব।

গোস্বামিমহাশয়। তোমার বৃদ্ধা জননী ও বালিকা কন্যা বর্ত্তমান; তুমি এ সময়ে কলেবর পরিত্যাগ করিলে, তাঁহারা শোকে অতিশয় কাতর হইবেন। ইহা তোমার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

পত্নী। সংসারের কেহ কাহারও নহে। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম ভোগ করিতেছে। "স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্।" কে কার মা, কে কার সন্তান? যত দিন মায়া তত দিনই সম্বন্ধ। মায়া ছুটিয়া গেলে আর কাহার সহিত সম্বন্ধ? আমি কাহারও জন্য বদ্ধ নহি।

এই বলিয়া তিনি পঞ্জিকা দেখিয়া ১০ই ফাল্গুন দেহত্যাগের দিন স্থির করিলেন। সে দিন ত্রয়োদশী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের দিন। সেই দিন সকাল বেলা তাঁহার ভেদবমি হইতে আরম্ভ হইল। পরে সেই ভেদবমি বিসূচিকায় পরিণত হইল। গোস্বামিমহাশয় পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে অদ্য ইনি কলেবর পরিত্যাগ করিবেন।

তিনি আহারান্তে প্রতিদিন যেমন সাধুদর্শনে বাহির হন, সেদিনও সেইরূপ চলিয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে যোগমায়া দেবী দেহত্যাগ করিলেন। তিনি ঠিক্ সন্ধ্যার সময় দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিত্যালীলায় প্রবেশ করিলেন। গোস্বামিমহাশয় তাড়াতাড়ি আশ্রমে আসিয়া পত্নীর দেহ সৎকার করিতে বলিলেন। আবির, কুঙ্কুম, পুষ্প, চন্দন দ্বারা মাএর অপ্রাকৃত পবিত্র দেহ সুসজ্জিত করিয়া যমুনাতীরে যথারীতি অগ্নিসাৎ করা হইল।

সৎকারান্তে তাঁহার অস্থি চয়ন করিয়া আনা হইল। গোস্বামি-মহাশয় সেই অস্থির কিয়দংশ হরিদ্বারে গঙ্গাসাৎ করেন এবং অবশিষ্ট ঢাকায় লইয়া গিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহাতে স্থাপন করেন। গোস্বামিমহাশয় একাদশ দিবসে তাঁহার দেহত্যাগ উপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবনে মহোৎসব করিয়া হরিদ্বারে গমন করিলেন। গোস্বামিমহাশয় তাঁহার পত্নীর শ্রীবৃন্দাবন লাভ হইলে, ঢাকাতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

ওঁ হরিঃ।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম,
দাউজীর মন্দির,
গোপীনাথের বাগ।

কল্যাণবরেষু।

গত ১০ই ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে, শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী তাঁহার চিরপ্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে মৃত্যু বলে, কিন্তু একবার বিশ্বাসনয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজি সখীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব্ব শোভাসৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে, সে যেন শোক না করে। ইহা শোকের ব্যাপার নহে, অতি আনন্দের কথা। বহুভাগ্যে মনুষ্য ইহা প্রাপ্ত হয়। আগামী ২১এ ফাল্গুন এখানে তাঁহার নামে উৎসব হইবে। তাহার পর ঢাকায় যাত্রা করিব।

শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায়, তবে আনন্দ উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে খাওয়াইয়া দেয়।

মা শান্তি! শোক করিও না, আনন্দ কর। যত শীঘ্র পারি, আমরা যাইতেছি। (১)

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(১) গোস্বামিপাদের অন্যতম জীবনীলেখক বাবু অমৃতলাল গুপ্ত ভগবতী যোগমায়া দেবীর যে এক খানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার কলেবরত্যাগসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"গোস্বামিপ্রভু—( যোগমায়াদেবীকে বলিতেছেন ) দেখ, শ্রীবৃন্দাবনে নেড়ানেড়ী দিগের ( ভ্রষ্টাচারী বৈষ্ণববৈষ্ণবীদিগের ) অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। আমাদের দৃষ্টান্তে উহারা আরও প্রশ্রয় পাইতে পারে। বিশেষতঃ শিষ্যদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তোমার ভাব বুঝিতে না পারিয়া অপরাধে ডুবিতেছে। এতদবস্থায় তোমার সরিয়া পড়া ভিন্ন ( পরলোকে গমন করা ভিন্ন ) অন্য উপায় দেখিতেছি না। যোগমায়াদেবী—তবে তাহাই হউক।" অন্য স্থানে তিনি লিখিয়াছেন :—

"সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ! আপনারা ইতিহাস পুরাণে অনেক স্বার্থত্যাগ, অনেক আত্মবলিদানের বিষয় পাঠ করিয়াছেন। পতিবিয়োগবিধুরা অনেক সতী নারীর মৃত পতির সহিত চিতারোহণের কথা অবগত আছেন। অক্ষয়পুণ্যকামনায় অথবা পরবর্ত্তী জন্মে পূর্ণকাম হইবার অভিপ্রায়ে অনেক সাধকের পুণ্যতোয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে অথবা তীর্থরাজ সাগরগর্ভে আত্মবিসর্জ্জনের কথাও শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু অনন্ত সুখৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সীতাদেবীর পাতালপ্রবেশের ন্যায় কতিপয় অবোধ শিষ্যের গুরুশক্তিঅবজ্ঞারূপ অপরাধ হইতে নির্মুক্ত রাখিবার জন্য জননী যোগমায়ার মত নিঃস্বার্থ

ণ। প্রবলিদানের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কখনও দেখিয়াছেন কি? খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মতে মহামতি যিশুখৃষ্ট পাপীর পাপভার মোচনের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাও বিরুদ্ধ পক্ষের চক্রান্তে পড়িয়া, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নহে। কিন্তু জননী যোগমায়া তাঁহার বহুকষ্টলব্ধ সুখৈশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া, তাঁহার অনন্ত স্নেহের পুতলী পুত্রকন্যার মমতাপাশ ছিন্ন করিয়া এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ন্যায় সতীনারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য ধন এমন সর্ব্বগুণাধার গুরুদেব স্বামির পার্থিব সঙ্গসুখ চির-কালের জন্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একমাত্র শিষ্যদিগের মঙ্গলকামনায় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ত্যাগের এমন উজ্জ্বল চিত্র আর কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি?" গুপ্ত মহাশয়ের কথাগুলি সম্পূর্ণ অমূলক। কল্পনা বা দলাদলির ভাব হইতে এই অলীক কথার উৎপত্তি। শিষ্যদের মধ্যে কেহই তাঁহার নিকট এমন উৎকট অপরাধ করে নাই, যাহার জন্য জননী যোগমায়ার কলেবর পরি-ত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। শিষ্যগণ সকলেই তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার পরলোকগমনে সকলেই মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন, সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার অভাবক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। অমৃত বাবু শিষ্যদিগের উপরে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। সতীর্থগণের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ আনিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। তাঁহার দুই চারি জন কল্পনাপ্রিয় বন্ধু যাঁহারা সে সময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহাদের কাল্পনিক অলীক কথার উপর নির্ভর করিয়া সতীর্থগণের প্রাণে দারুণ ক্লেশ দেওয়া নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। কেবল অন্যায় নহে, তিনি এই দারুণ অসত্য এবং অপ্রিয় কথা লিখিয়া তাঁহাদের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। একথা সত্য হইলেও লেখা উচিত ছিল না। মাতাঠাকুরাণীর শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তির অনেক বৎসর পরে অমৃত বাবু গোস্বামিপাদের কৃপা লাভ করেন। তিনি জননী যোগমায়া দেবীকে কখনও দেখেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে তিনি যাহাকিছু লিখিয়াছেন সে সমস্তই পরের নিকট শুনিয়া।

জননী যোগমায়ার দেহত্যাগের পর আমি গোস্বামিমহাশয়কে তাঁহার দেহত্যাগের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "অবস্থালাভ করিবার পর যখন তিনি (যোগমায়াদেবী) নিত্যলীলার অন্তর্ভূত হইলেন, তখন আর তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ

করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি আমার নিকট দেহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি পুত্র, কন্যা ও বৃদ্ধা জননীর কথা বলিয়া দেহ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম; তাহাতে তিনি বলিলেন, কে কার পুত্র কে কার মাতা, এ ত সব মায়ার খেলা। আমার ভিতরে কিছুমাত্র মায়া বা মমত্ববুদ্ধি নাই। আমি দেহত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিব।" শিষ্যদের জন্য তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে এ কথা এতদিন কেহই জানিতেন না। যাঁহারা সে সময়ে গোস্বামিপাদের সহিত বৃন্দাবনে ছিলেন, তাঁহাদের মুখে কখনও এ কথা শুনা যায় নাই। এত বড় একটা ব্যাপার হইল, অথচ কেহই তাহা জানিল না,এত দিন সে কথা কেহ শুনিল না,ইহা কি সম্ভবপর? এ কথা সত্য হইলে কখনই তাহা গোপন থাকিত না। অমৃত বাবু মাতাযোগমায়ার সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছেন, "তিনি মায়া মোহের অতীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের বৃন্দাবনবাস শেষ হইলে তিনি জননী যোগমায়া দেবীকে যখন হরিদ্বারে যাইবার আয়োজন করিতে বলিলেন, তখন তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, হরিদ্বারে যাইতে হয় তোমরা যাও আমি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না। এই কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে মায়া হইতে মুক্ত হইলে তুমি আর দেহে থাকিতে চাহিবে না।" আবার ইহার পরেই লিখিতেছেন, জননী যোগমায়া তাঁহার বহুকষ্টলব্ধ সুখৈশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া তাঁহার অনন্ত স্নেহের পুত্তলি পুত্রকন্যার মমতাপাশ ছিন্ন করিয়া এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ন্যায় সতীলক্ষ্মীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্যধন এমন সর্ব্বগুণাধার গুরুদেব স্বামির পার্থিব সঙ্গসুখ চির কালের জন্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একমাত্র শিষ্যদিগের মঙ্গলকামনায় সম্পূর্ণ সেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।" মায়ামুক্ত যিনি, তাঁহার পুত্র কন্যার উপর মমতাপাশ কোথায়? আর পতির সঙ্গসুখ হইতেই বা তিনি বঞ্চিত হইবেন কেন? তাঁহারা দুই জনেই ত মুক্ত। দুই জনের নিকটেই ত ইহপরকাল এক। তবে আর তাঁহাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কোথায়? তাঁহার কথা গুলির মধ্যে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। পূর্ব্বাপর মিল নাই। এক কথা আর এক কথার প্রতিদ্বন্দ্বী।

কাহারও, বিশেষতঃ মহাজনদের, জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া সত্য গোপন বা রূপান্তরিত করা যেমন দোষ, কাল্পনিক অমূলক কথা প্রচার করাও সেইরূপ অন্যায়।

অমৃত বাবু যে লিখিয়াছেন প্রভুপাদ জননী যোগমায়াকে বলিতেছেন যে তুমি আমার কাছে থাকিলে সেই দৃষ্টান্তে বৈষ্ণব সমাজের ক্ষতি হইবে, তিনি এতদিন প্রভুপাদের সঙ্গ করিয়াও কি তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিলেন না? তিনি কি জানেন না যে গোস্বামিপাদের ভিতরে লোকাপেক্ষার ছিটাফোঁটাও ছিল না। তিনি ব্যক্তি বা সমাজবিশেষের ক্ষতি, লাভ গণনা করিয়া কোন কার্য্য কখনও করিতেন না। তিনি ঠিক সত্য ধরিয়া চলিতেন। গুরুদেবের আদেশ ভিন্ন তিনি কোন কার্য্য করিতেন না। লৌকলৌকিকতার দিক্ দিয়াও তিনি যাইতেন না।

—o—

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## হরিদ্বারে কুম্ভমেলা

বৃন্দাবনবাস শেষ ও পত্নীর তিরোভাবমহোৎসব সমাপন করিয়া গোস্বামিপাদ সশিষ্যে হরিদ্বারে গমন করিলেন। তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া গঙ্গাস্নান ও কুম্ভমেলায় সমাগত সাধু দর্শন করিলেন। হরিদ্বারের সুপ্রশস্ত গঙ্গাতীরে চারি পাঁচ লক্ষ সাধু এই মেলা উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গুজরাট প্রদেশের এক জন প্রাচীন সাধু একদিন গোস্বামিমহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে আমি তোমাদিগের দেশের নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিয়াছি। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে তিনি গুজরাট প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। আমার বয়স তখন পনর ষোল বৎসর ছিল। তাঁহার কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে আপনি এই দীর্ঘ জীবন লাভকরিয়াছেন?

সাধু। হঠযোগের দ্বারা আমি এই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছি। হিঙ্গলাজে আমা অপেক্ষাও এক জন অতি প্রাচীন সাধু আছেন, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি ভগবান্ কৃষ্ণবলরামকে দর্শন করিয়াছেন। এখন আর তিনি আসন হইতে উঠিতে পারেন না। সর্ব্বদাই বসিয়া থাকেন। তাঁহার জটা এত দীর্ঘ হইয়াছে যে দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাঁহার চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিয়া গিয়াছে। কিছু দেখিতে হইলে হস্ত দ্বারা চক্ষুর পাতা তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে হয়।

গোস্বামিপাদ। যে সাধনের দ্বারা আপনি এই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহা দেখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। বাধা না থাকে ত আমাকে দেখান।

সাধু। তোমাকে দেখাইতে কোন বাধা নাই। তুমি শেষ রাত্রে আমার নিকট আসিও; তোমাকে দেখাইব।

গোস্বামিপাদ শেষ রাত্রিতে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সাধু তাঁহাকে এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া সাধনের সমস্ত ক্রিয়া দেখাইলেন। সমস্তগুলি ক্রিয়া শেষ করিতে তাঁহার প্রায় সাত আট ঘণ্টা সময় লাগিল।

হরিদ্বারে পূর্ব্বপরিচিত একটি সাধুর সহিত গোস্বামিপাদের সাক্ষাৎ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সাধুর সহিত তিনি কৈলাস পর্ব্বত দর্শনে বাহির হন। তাঁহারা উভয়ে আলমোড়া হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, একটা পুলিসের থানা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তথায় উপনীত হইলে পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে তথায় আগমন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা কৈলাসপর্ব্বতে যাইবার অভিলাষে বাহির হইয়াছি। আপনি আমাদের পথ বলিয়া দিন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া থানাদার বলিল, আপনারা এ সংকল্প হইতে বিরত হউন। আপনারা কৈলাসপর্ব্বতে যাইতে পারিবেন না। পথ অতিশয় দুর্গম, বরফে আবৃত। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই বরফে আপনাদের শরীর জমিয়া রক্তসঞ্চালনক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন আপনারা অবধারিত মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। কৈলাসগামী অনেক যাত্রী এইরূপে মারা গিয়াছে। সরকার বাহাদুর এই প্রকার লোকক্ষয় নিবারণ করিবার অভিপ্রায়েই এই থানা করিয়াছেন। এই পথে কেহ কৈলাসে যাইতে না পারে, সরকার বাহাদুর এইরূপ আদেশ

দিয়াছেন। আমরা আপনাদিগকে আর অগ্রসর হইতে দিব না। আপনারা প্রতিনিবৃত্ত হউন।

থানাদারের এই কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় কৈলাসগমনের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারী সাধু কিছুতেই বিরত হইলেন না। থানার লোকেরা সাধুকে কৈলাসগমনে স্থিরসংকল্প দেখিয়া তাঁহাকে অন্য একটি পথের সন্ধান বলিয়া দিল এবং আগুন জ্বালাইবার জন্য চক্‌মকি, শোলা এবং প্রচুর দিয়াসালাই তাঁহাকে প্রদান করিল। সাধু সেই সকল দ্রব্য সঙ্গে লইয়া থানার লোকদিগের নির্দ্দিষ্ট পথে কৈলাসযাত্রা করিলেন। গোস্বামিমহাশয় দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সাধু হিমালয় পর্ব্বতের উপরিস্থ বরফময় অত্যন্ত দুর্গমস্থান সকল অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সেখানে অতি শীত। হঠযোগের ক্রিয়া অভ্যস্ত না থাকিলে, সে শীত সহ্য করা কঠিন। সাধু হঠযোগের ক্রিয়াতে সিদ্ধ,সুতরাং বরফময় শীতপ্রধান স্থান সকল অক্লেশে অতিক্রম করিলেন। গমনসময়ে তিনি হিমালয়ে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগের শাস্ত্রে তপোবনের যে বর্ণনা পাঠ করা যায়, হিমালয়ে সেই প্রকার তপোবন তিনি দেখিয়াছিলেন। নরমাংসভোজী অসভ্য জাতিসকলও তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। এইরূপে কিছু দিন গমন করিবার পর তিনি একটি হ্রদের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন, অনেক মহাপুরুষ ও সাধু নানাবিধ পূজার উপহার হস্তে লইয়া হ্রদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সকলে তাঁহাকে শীঘ্র স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাদিগের পূজোপকরণ হইতে তাঁহাকে কিছু দিয়া বলিলেন,এখনই এই সরোবর হইতে ভগবান কৈলাসপতির রথ উত্থিত

হইবে। আমরা সেই রথের প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রথ উত্থিত হইলে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে। এইরূপে সকলে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে সরোবরের মধ্যস্থানে জলের ভিতর হইতে এক অপরূপ স্বর্ণময় রথ উত্থিত হইল। রথ উঠিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। সকলে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন এবং পূজার উপহার প্রদান করিলেন। রথ কিছুক্ষণ জলের উপরে স্থিরভাবে রহিল। সকলের পূজা শেষ হইলে ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। এই রথ দেখিতে না পাইলে কৈলাসে গমন অথবা হরগৌরীকে দর্শন করিতে পারা যায় না। অনন্তর সকলে একত্র হইয়া কৈলাসে চলিলেন। শিবরাত্রির দিন তাঁহারা কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে কৈলাস পর্ব্বতের আকার অবিকল শিবলিঙ্গের ন্যায়। তাঁহারা তথায় স্বর্ণময় এক পুরী দর্শন করিলেন। সন্ধ্যার সময় পুরীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সে পুরীর অপূর্ব্ব শোভা। শাস্ত্রে কৈলাসের যে সুন্দর বর্ণনা আছে তাহার এক বর্ণও অলীক নহে। এক সুপ্রশস্ত গৃহের মধ্যস্থলে বিচিত্র হিরণ্ময় সিংহাসন। তাহাতে ভগবান্ ভবানীপতি জগজ্জননী ভবানীদেবীকে অঙ্কে ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। সমাগত সাধু মহাপুরুষগণ তথায় উপনীত হইয়া জগতের আদি পিতামাতাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি পূজাঅর্চ্চনা স্তবস্তুতিতে অতিবাহিত হইল। প্রত্যূষে ভগবান্ ও ভগবতী সকলের প্রতি শুভদৃষ্টি ও শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা তিরোহিত হইলে নন্দিকেশ্বর সকলকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। সকলে বাহির হইলে দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। তখন সকলে আপন আপন গম্যস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাধু ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত

হইলেন। তিনি গোস্বামিমহাশয়কে কৈলাসগমনবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে কৈলাসের পথ এতই দুর্গম এবং শীতল যে হঠযোগ জানা না থাকিলে কিছুতেই সেখানে যাওয়া যায় না। ইংরাজেরা যাহাকে কৈলাস পর্ব্বত বলেন, বাস্তবিক তাহা কৈলাস নহে। কৈলাস পর্ব্বত এখনও সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত। কৈলাস পর্ব্বত ত দূরের কথা, হিমালয় পর্ব্বতেরও বহু স্থান এখন পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। শীতের আধিক্যবশতঃ এবং অতিরিক্ত বরফের জন্য লোক তথায় যাইতে পারে না। (১)

গোস্বামিমহাশয় একদিন সাধুদর্শনে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় একজন মহাপুরুষ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জনতা ভেদ করিয়া প্রফুল্লবদনে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং চীৎকার করিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ মিলারে মিলা।" তিনি পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নাচিতে নাচিতে গোস্বামিমহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। আনন্দে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। লোচনদ্বয় হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে তিনি অকস্মাৎ তিরোহিত হইলেন। বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

(১) পোষ্টাফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ৺আনন্দগোপাল সেনের নিকট শুনিয়াছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একজন মহাপুরুষের সঙ্গে কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া শিবপার্ব্বতীকে দর্শন করিয়াছিলেন। মহর্ষি আনন্দ বাবুকে আরও বলিয়াছিলেন যে হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থানসময়ে জনৈক মহাত্মার নিকট তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দীক্ষা-প্রভাবেই মহর্ষি উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহর্ষি গোস্বামিপাদের নিকটও তাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদের কাছে তিনি একথা গোপন করিয়া গিয়াছেন।

আর একজন মহাপুরুষ গোস্বামিমহাশয়কে দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দরদরধারে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল। শরীরে কম্প পুলক প্রভৃতি হইতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ দর্শন করিয়া গদগদবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "আজ মর ধন্য হুয়া, আজ হাম কৃতার্থ হোগয়া।" ঠাকুর মহাত্মার চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন, আশীর্ব্বাদ কীজিয়ে মহারাজ। সাধু বলিলেন, "অহো ভাগ তুমলোগনকো, ভগবানকো সঙ্গ লাভ কিয়া। দর্শনহি দুর্লভ হ্যায়, তানেশা পিছু পিছু রহনা, সঙ্গ মত্ ছোড়না। কভি নেহি ছোড়না, ধন্য হো গয়া।" গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, ইহারা মহাপুরুষ, কখনও লোকালয়ে আইসেন না, পাহাড়েই থাকেন। এঁদের দর্শনমাত্র বোধ হইল, যেন কত কালের পরিচিত। প্রাণের যোগ যাঁদের সঙ্গে, বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হইলেও তাঁহাদিগকে চেনা যায়, কত আত্মীয় বলিয়া বোধ হয়।

মেলা দর্শনান্তে প্রভুপাদ ঢাকায় প্রত্যাগত হইলেন।

— —০——

# নবম পরিচ্ছেদ

## গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বাস

জননী যোগমায়া যখন বৃন্দাবনে কলেবর ত্যাগ করেন, শান্তিসুধা তখন গেণ্ডারিয়ায় পীড়িত ছিলেন। নিদারুণ মাতৃবিয়োগসংবাদ তাঁহার রোগক্লিষ্ট শীর্ণ শরীরে সহ্য হইবে না মনে করিয়া তাঁহাকে সে সংবাদ জানান হয় নাই। গেণ্ডারিয়ায় থাকিলে সে সংবাদ তাঁহার অজ্ঞাত থাকিবে না, সেই জন্য ৺ প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। মাতৃবিয়োগ সংবাদ শান্তিসুধার নিকট গোপন করা হইলেও তিনি তাহা কতক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণ এক অজ্ঞাত দুঃখে সর্ব্বদা হু হু করিত। মনে হইত যেন কোন প্রিয় ব্যক্তি তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এক একবার এ কথাও মনে হইত যে মার কি কোন অমঙ্গল হইয়াছে? তাঁহার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে কেন? এইরূপ অনিশ্চিত দুঃখে যখন তিনি ছটফট করিতেছিলেন, সেই সময়ে গোস্বামিপাদ ঢাকায় আসিলেন। তিনি গেণ্ডারিয়ায় উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে কাছে আনাইলেন এবং মাতৃবিয়োগের সংবাদ দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। মহাপুরুষের লোকোত্তর শক্তির প্রভাবে শান্তিসুধা শোকের জ্বালা তাদৃশ অনুভব করিলেন না। গোস্বামিপাদ তাঁহাকে সর্ব্বদা নিজের কাছে রাখিতেন। রাত্রিতে একাকী থাকিলে শোকে ক্লেশ হইবে মনে করিয়া তিনি রাত্রিতেও তাঁহার সহিত একঘরে থাকিতেন এবং নানা প্রকার গল্প ও উপদেশ দিয়া তাঁহার মনের ক্লেশ

নিবারণ করিতেন। সে সময়ে তিনি তাঁহার জনক ও জননী হইয়া বাৎসল্যরসসিঞ্চনে তাঁহার শোকের জ্বালা দূর করিয়াছিলেন।

গেণ্ডারিয়ায় দাউজীর যেদিন জন্ম হয়, গোস্বামিমহাশয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী সেই দিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে গৈরিকবস্ত্রপরিহিত, প্রৌঢ়-বয়স্ক জনৈক ব্রাহ্মণ গঙ্গাজলপূর্ণ একটি তামার ঘটি লইয়া গোস্বামি-পাদের সহিত সূতিকাঘরে প্রবেশপূর্ব্বক বলিলেন যে আমাদের বংশে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমরা তাহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত ও অর্ঘদান করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া হরিদ্বারের গঙ্গাজল বালকের সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিলেন। গোস্বামিপাদ ঢাকায় আসিলে শান্তিসুধা তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে প্রভুপাদ বলিলেন, এই ঘটনা বাস্তবিকই ঘটিয়াছিল। দাউজী ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার পিতা-মহ সত্যলোক হইতে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, চলুন, ঢাকায় যাই। যে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অশীর্ব্বাদ করিয়া আসি। তখন আমরা দুইজনে ঢাকায় আসিয়া বালককে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিলাম। পরে আমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলাম, তিনি সত্যলোকে প্রস্থান করিলেন।*

গোস্বামিমহাশয় এক দিন তাঁহার ভজন কুটিরে বসিয়া ভজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জন মুসলমান মহাপুরুষ সর্পদেহ আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, আমি একজন সাধক; পূর্ব্বে মুসলমান ফকীর ছিলাম। কালবশে আমার সেই দেহ নষ্ট হইয়া গেলে আমি এই সর্পদেহ আশ্রয় করিয়াছি। এই দেহে থাকিয়া কিছুদিন সাধন করি আমার এই ইচ্ছা। কিন্তু মনের মত

* দাউজী এক্ষণে জীবিত নাই। ১৩১৭ সালের ২৫শে পৌষ সোমবার শুক্লানবমীতে তাহার দেহত্যাগ হয়।

একটি আসনের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। আপনি যদি দয়া করিয়া আপনার আসনটি আমাকে দেন, তাহা হইলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়। আমি নিরুদ্বেগে কিছুদিন ভজন করিতে পারি। সাধুর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিলেন। মহাপুরুষ আসন অধিকার করিলেন এবং এক রাত্রির মধ্যে এক প্রকাণ্ড বল্মীক স্তূপদ্বারা আসন ঢাকিয়া ফেলিলেন। দিন দিনই স্তূপ বাড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কুঞ্জবাবু একদিন গোস্বামিপাদকে বলিলেন, বল্মীকস্তূপ যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে ইহা চাল ভেদ করিয়া উঠিবে। কুঞ্জবাবুর কথায় প্রভুপাদ স্তূপের উপরে হাত দিলেন। সেই অবধি স্তূপের বাড়া বন্ধ হইল। গোস্বামিপাদ ইহাঁর আহারের জন্য প্রতিদিন দুগ্ধ প্রদান করিতেন। সাধু অনেক সময় তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহার গায়ে উঠিতেন। একদিন কুঞ্জবাবু প্রভুপাদকে একটি সুন্দর পদ্মফুল আনিয়া দিয়াছিলেন। প্রভুপাদ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রন্থের উপরে ফুলটী রাখিয়াছিলেন। রাত্রিতে সেই সাপ গোস্বামিমহাশয়ের নিকট আসিয়া সেই ফুলটি বেষ্টন করিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে গোস্বামিপাদ পুষ্পটি দেখিয়া বলিলেন, কাল সন্ধ্যাবেলা কুঞ্জ(১)এই সুন্দর ফুলটি আমাকে আনিয়া দিয়াছিল। আমি ইহা গ্রন্থের উপর রাখিয়াছিলাম। রাত্রিতে সেই সাপ আসিয়া ইহার চারিদিকে কুণ্ডলী করিয়া বসিয়াছিল। তাহার তীব্র বিষে লাল ফুলটি একেবারে কাল হইয়া গিয়াছে।

গোস্বামিপাদ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, সেই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে কুঞ্জ বাবুর (ঘোষের) বাড়ীতে রক্তবৃষ্টি হইত। এ ঘটনা রাত্রিতে ঘটিত। সকালে বাড়ীর নানা স্থানে রক্ত দেখিতে পাওয়া

(১) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

( গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে )

যাইত। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত ভীত হইলেন। গোস্বামিপাদ গেণ্ডারিয়ায় উপস্থিত হইলে কুঞ্জ বাবু এ ঘটনা তাঁহাকে জানাইলেন। কুঞ্জ বাবুর কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কালীকে অপমান করাতে এইরূপ ঘটিতেছে। শীঘ্র কালিপূজা কর; নতুবা তোমাদের অতিশয় অমঙ্গল হইবে। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া কুঞ্জ বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী কালীকে কিরূপে অপমান করিলেন? তদুত্তরে গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, তোমার শাশুড়ী যখন ভজন করিতেন, সেই সময়ে কালী তাঁহাকে দেখা দিতেন। তোমার শাশুড়ীর বিশ্বাস কৃষ্ণই ভগবান্, কালী নহেন। এজন্য তিনি কালীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বিরক্তই হইতেন। জগজ্জননী তোমার শাশুড়ীর বিরক্তিতেও তাঁহাকে দর্শন দিতে বিরত হইলেন না। একদিন তিনি প্রকাশ হইলে তোমার শাশুড়ী রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্মার্জ্জনী ছুঁড়িয়া মারেন। তাহাতে মাএর সহচরীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রক্তবর্ষণ করিতেছে। তুমি শীঘ্র কালীপূজা কর। গুরুআজ্ঞায় কুঞ্জবাবু সাত্বিকভাবে কালিপূজা করিলেন। পূজার পর রক্তবর্ষণ বন্ধ হইয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে প্রভুপাদ আশ্রমে পায়চারি করিতে করিতে 'হরিবোল' বলিতেছিলেন। দাউজীর বয়স তখন তিন চারি মাস। তাহাকে কোলে লইয়া একজন শিষ্য গোস্বামিমহাশয়ের সঙ্গে বেড়াইতেছিলেন। দাউজী মাতামহের মুখে হরিনাম শুনিয়া স্পষ্ট কথায় 'হরিবোল' বলিতে লাগিল। চারি মাসের বালকের মুখে হরিনাম শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। গোস্বামিপাদ দাউজীর দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

একদিন মধ্যাহ্নকালে গোস্বামিমহাশয় ভোজন করিতেছিলেন। শান্তিসুধা দাউজীকে ক্রোড়ে লইয়া কাছে বসিয়া তাঁহার আহার দেখিতেছিলেন। ইতিমধ্যে দাউজী তথায় বাহ্যে করিল। পিতার ভোজনস্থানে পুত্র মলত্যাগ করাতে শান্তিদেবী অতিশয় অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে প্রভুপাদের আহারের বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি পুত্র লইয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন গোস্বামিমহাশয় সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলিলেন। কি, দাউজী বাহ্যে করেছে, সেজন্য ব্যস্ত হইতেছিস্ কেন? তুই মনে করিতেছিস্ বিষ্ঠা দেখিয়া আমার ঘৃণা হইবে। ভগবান্ কি আমার ঘৃণা লজ্জা কিছু রাখিয়াছেন? না বিষ্ঠাচন্দনে আমার ভেদদৃষ্টি আছে? তোমার পুত্রের বিষ্ঠা ও এই অন্ন আমার নিকট এক বস্তু। সর্ব্বত্র আমার সমজ্ঞান। সমস্ত বস্তুতেই আমি সেই অদ্বয়তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থেই আমার এক ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি হইতেছে। অতঃপর সজলনয়নে বলিলেন, আমার কি লোকালয়ে বাস করিবার কথা? কেবল গুরুদেবের আদেশে থাকিতে হইয়াছে।

গোস্বামিমহাশয়ের নিকট প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইত। একদিন পাঠের সময়ে শান্তিসুধা দাউজীকে ক্রোড়ে করিয়া পাঠশ্রবণ করিতেছিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইয়া গেল। দাউজীর মাতা স্থানান্তরে গমন করিবার অভিপ্রায়ে পুত্রকে তুলিতে গিয়া দেখেন, বালক সংজ্ঞাহীন। বালক নিদ্রিত হইয়াছে মনে করিয়া তিনি তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও বালককে জাগাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ভীত হইয়া গোস্বামিমহাশয়কে

বলিলেন, বাবা! দেখ আমার খোকা কেমন হইয়া গিয়াছে। স্তন্যপান করিতে করিতে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই জাগাইতে পারিতেছি না। গোস্বামিমহাশয় ধ্যানস্থ ছিলেন; কন্যার কথায় তিনি বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ইহার সমাধি হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর। নাম ভিন্ন সমাধি ভঙ্গ হইবে না। তখন বালকের কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম দেওয়া হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ নাম শুনাইবার পর বালকের চৈতন্য হইল। এত ছোট্ট শিশুর সমাধি দর্শন করিয়া সকলেরই অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে (১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে) গোস্বামিপাদের কঠিন পীড়া হয়। প্রথমে সামান্য একটু সর্দ্দি হইয়া পরে তাহা নিউমোনিয়ায় পরিণত হয়। ডাক্তারেরা বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, দুই দিকের ফুস্‌ফুস্‌ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রভুপাদের অন্যতম শিষ্য প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু নবীন চন্দ্র ঘোষ বৃন্দাবন চন্দ্র মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া ছুটিয়া ঢাকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও বুক পরীক্ষা করিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাশিবার পর থানা থানা রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সকলেই যারপরনাই ভীত ও বিমর্ষ; কখন কি হয়! এইরূপে পনর ষোল দিন কাটিয়া গেল। একদিন সকাল বেলা গোস্বামিপাদ বলিলেন, আমার শরীর দই চাহিতেছে। আমাকে দই আনিয়া দাও। আমি দই খাইব। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। নিউমোনিয়ার রোগী দই খাইলে কি আর রক্ষা আছে? নবীন বাবু হায় হায় করিতে লাগিলেন; বলিলেন, এইবার সর্ব্বনাশ হইল। তিনি নিষেধ করিলেন, কিন্তু গোস্বামি-

মহাশয় কাহারও কথা না শুনিয়া দই খাইলেন। দধিভক্ষণের কিছুকাল পরেই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। পরদিন অন্ন পথ্য করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া নবীনবাবু একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। গোস্বামিপাদ পূর্ব্বে রাত্রিতে শয়ন করিতেন, এই হইতে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। সমস্ত রাত্রি আসনে বসিয়া থাকিতেন। কেবল ভোরের একটু পূর্ব্বে আধ ঘণ্টার জন্য একবার শুইয়া হাত পা ছড়াইতেন। প্রভুপাদ সন্ধ্যার সময় বরাবরই করতাল বাজাইয়া ভজন গাইতেন ও কীর্ত্তন করিতেন। এই সময় হইতে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তনের পর হরির লুট দিতে আরম্ভ করেন। সায়ংকালে তাঁহার আসন ঘরে যে পাঁচটি গান হইয়া হরিলুট হইত, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল :—

ললিত—ঠুংরি

হরি ছে লাগি রহ রে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই ॥
ওঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই।
শুয়া পড়ায়কে গণিকা তরে, তরে মীরাবাই ॥
দৌলত দুনিয়া মাল খজানা, বেনিয়া বয়েল চড়াই,
এক বাতমে ঠাণ্টা লাগে, খোঁজ খবর নাহি পাই ॥
ঐছে ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই,
সেবা বন্দন আউর দীনতা, সহজে মিলয়ে গোঁসাই ॥

খাম্বাজ—খং

ঠাকুর ঐছি নাম তোহার।
প্রভুজি ঐছি নাম তোহার॥
পতিত পবিত্র লিয়ে করু আপনার,
সকল করত নমস্কার॥
জাত বরণক পুছত নাহি, যাচত চরণার বার।
সাধু সঙ্গ নানক বুধ পাই, হরিকীর্ত্তন জীয়া ধার

খাম্বাজ—একতালা

সদায় হরিবোল মধুর হরিনামের নাই তুলনা।
যদি বিষয়েতে সুখ হ'ত রে তবে লালাজি ফকির হত না।
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেলরে- ( মধুর হরিনামে )
তারে যম ছুঁতে পেল না।
নামে মহাপাপী তরে গেলরে ( মধুর হরিনামে )
অপার নামের মহিমা॥
( নামে জগাই মাধাই তরে গেল,
রূপসনাতন ফকির হল )॥

নাচে আঁরি হরি বলে গৌর নিতাই।
গৌর নিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই
( হরিবোল ব'লেরে ) এমন দয়াল
ঠাকুর আর দেখি নাই॥
( গৌর নিতাই এর মত রে,
সীতানাথের মত রে )॥

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে
নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
হাটের রাজা নিত্যানন্দ
পাত্র হল শ্রীচৈতন্ত,
মুন্সিগিরি দিল অদ্বৈতেরে।
ওরে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে লুট বিলাল সবারে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তারা ভাবে নিরন্তর,
ধ্যান করিয়া না পেল যাঁহারে।
নারদ মুনি মগ্ন হয়ে বীণাযন্ত্রে গান করে ॥

বৃন্দাবনে অবস্থান সময়ে তিনি শেষ রাত্রিতে মঙ্গল আরতির গান গাইতেন। সেখান হইতে আসিয়াও সে রীতি তিনি বরাবরই রক্ষা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত গান দুইটি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে হইত; ইহা ভিন্ন অন্য গানও হইত :—

বৃন্দাবিপিনে মঙ্গল আরতি হেররে মন আনন্দে।
মঙ্গল আরতি হতেছে নাচিছে সখীবৃন্দে।
কুঞ্জ কুঞ্জ হোতে ধাইছে সবে হেরইতে শ্রীগোবিন্দে ॥

---

বল হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ গাওরে।
গাও শ্রীমধুসূদন যশোদানন্দন গোপীজনবল্লভ প্রাণারামে।

অতঃপর গোস্বামিপাদ সমারোহ করিয়া দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। বালকের নাম তাহার মাতামহীর ইচ্ছানুসারে বৃন্দাবনচন্দ্র রাখিলেন।

১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটের সময় কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। গোস্বামিপাদ তখন ঢাকায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন পরলোক যাত্রা করেন ঠিক সেই সময়ে গোস্বামিপাদ বলিয়া উঠিলেন, এ কি, আকাশ জ্যোতির্ম্ময় হইল কেন? দেবগণের মধ্যে এত আনন্দোচ্ছ্বাস দেখি কেন? এ রথ কিসের? এ কি, রথে যে বিদ্যাসাগর বসিয়া আছেন? সকলে তাঁহাকে কত সম্মান, কত খাতির করিতেছে। রথ বিদ্যাসাগরকে লইয়া স্বর্গে চলিল। দেবতারা আনন্দ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। দেব দুন্দুভি সকল বাজিতেছে। কি আনন্দ! যাঁহারা নিকটে ছিলেন, তাঁহারা প্রভুপাদের কথা শুনিয়া বুঝিলেন, যে পুণ্যাত্মা বিদ্যাসাগর নরলীলা শেষ করিয়া স্বর্গে যাইতেছেন। প্রভুপাদ তাঁহার স্বর্গগমন ব্যাপার দর্শন করিয়া এই কথা বলিলেন। পর দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহত্যাগ-সংবাদ প্রচারিত হইল।

গোস্বামিপাদের অন্যতম শিষ্য, দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃপানাথ মজুমদার গ্রীষ্মাবকাশে গেণ্ডারিয়ায় গুরুদর্শনে আসিলেন। তিনি গোস্বামিমহাশয়কে অভিবাদন করিয়া উপবিষ্ট হইলে প্রভুপাদ তাঁহাকে বলিলেন, গত পৌষ মাসে কোন সাধুর সহিত আপনাদিগের কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তাঁহার কথা শুনিয়া কৃপানাথ বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল সাধুর সহিত সাক্ষাতের বিষয় ইনি কিরূপে জানিতে পারিলেন? আসনে বসিয়া ইনি দেখিতেছি সমস্তই জ্ঞাত হইতে পারেন! পরে বলিলেন, হাঁ একজন সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, তিনি কেমন লোক? কৃপানাথ বাবু বলিলেন, আমি এরূপ সাধু

আর কখনও দেখি নাই।" তাঁহার যেমন সৌম্য মূর্ত্তি সেইরূপ মধুর প্রকৃতি। তখন গোস্বামিমহাশয় সাধুর সমস্ত কথা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কৃপানাথ বাবু বলিলেন, "একদিন অপরাহ্নে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছেলে আমাকে বলিল, 'মাষ্টার মহাশয়! রাজারাম বাবার মঠে * একজন সাধু আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি আপনাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ছেলেদের কাছে এই কথা শুনিয়া আমাদের সাধুদর্শনের প্রবল ইচ্ছা হইল। তখনই আমি, পুরুষোত্তম, গিরিশ বাবু ও হরি বাবু † রাজারাম বাবার মঠে গেলাম। সেখানে যাইয়া শুনিলাম সাধু মঠে নাই; বাহিরে কোথায় গিয়াছেন। আমরা কিছুকাল তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু তিনি আসিলেন না। তখন আমরা মঠ হইতে বাহির হইলাম। বাহিরে আসিয়াই সাধুর দর্শন পাইলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া মঠে প্রবেশ করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে তিনি আমাদিগকে বলিলেন, আপনারা সাধু, মহাপুরুষের আশ্রিত; আপনাদিগকে দর্শন করিয়া আমি পবিত্র হইলাম। সাধুর কথা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম,' আমাদিগের দীক্ষাগ্রহণের বিষয় ইনি কিরূপে জানিলেন। তিনি আমাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক জন নৈয়ায়িক পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক; সাধুকে প্রণামাদি

* দ্বারভাঙ্গার নিম্নস্থ বাগমতি নদীর পরপারস্থ শুভংকরপুর গ্রামে নানকসাহী সম্প্রদায়স্থ রাজারাম বাবার সমাধি আছে।

† ৺ পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, গিরীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও হরিচরণ সেন। ইহাঁরা গোস্বামিমহাশয়ের শিষ্য। দ্বারভাঙ্গা রাজসরকারে চাকরী করিতেন।

কিছুই করিলেন না। উদ্ধতভাবে তাঁহাকে কয়েকটি ন্যায়ের জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধু সহাস্যবদনে মিষ্টবাক্যে ধীরে ধীরে তাঁহার অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন। সাধুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও মিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার প্রতি সকলেরই প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইল। পণ্ডিতের ঔদ্ধত্য দর্শন করিয়া সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। সাধুর সৎব্যবহার, পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের নিকট পণ্ডিতের উন্নত মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। গমনসময়ে তিনি সাধুকে বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন করিলেন।

আমি সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কত দিন এখানে থাকিবেন? তিনি বলিলেন, সাত আট দিন থাকিবার সম্ভাবনা। আমি তাঁহাকে আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কিছু উপদেশ দিতে ও আমার বাড়ীতে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলাম। তিনি আনন্দের সহিত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আহার করেন? তিনি বলিলেন, আপনি যাহা আহার করিবেন, আমিও তাহাই খাইব। তবে তাহা বিশুদ্ধ হবিষ্যান্ন হওয়া প্রয়োজন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম।

যথাসময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া একটি সুন্দর উপদেশ দিলেন। উপদেশের সার মর্ম্ম—"তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণ বাপী তড়াগাদি সরোবরে গিয়া তৃষ্ণা দূর করে। যদি কেহ মনে করে যে আমি অপরের খনিত জলাশয়ের জল পান করিব না; স্বয়ং সরোবর খনন করিয়া পিপাসা নিবারণ করিব; সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তির অধ্যবসায় যেমন কখনও সফল হয় না, ধর্ম্মরাজ্যেও যাঁহারা মনে করেন যে আমরা মহাজনপ্রবর্ত্তিত কোন পন্থাই অবলম্বন করিব না, আপনারা স্বয়ং সাধনপ্রণালী স্থির করিয়া লইব

এবং তদনুসারে চলিব ; তাঁহাদিগের বাসনাও সেইরূপ কদাচ সিদ্ধ হয় না। ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে অবশ্যই কোন মহাপুরুষ প্রবর্ত্তিত পন্থা আশ্রয় করিয়া চলিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় একজন মহাপুরুষ। তিনি বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মোপাসনার যে পন্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে ধর্ম্মলাভ করিতে পারা যায়। তিনি ব্রহ্মোপাসনার যে শাস্ত্রোক্ত সহজ পথ প্রচার করিয়াছেন, ব্রহ্মোপাসকদিগের তাহা আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

উপদেশপ্রদানের পর তিনি আমার সহিত বসিয়া ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে অত্যন্ত ত্বরান্বিত হইয়া বলিলেন, আমাকে এখনই পুরী যাইতে হইবে। আমি বলিলাম, আপনি ত বলিয়াছিলেন, সাত আট দিন এখানে থাকিবেন ? তিনি বলিলেন, ইচ্ছা ত তাহাই ছিল। কিন্তু হইল কই ? আমি ত স্বাধীন নহি। গুরুদেবের আদেশ অনুসারে আমাকে চলিতে হয়। পুরী যাইবার আদেশ আসিয়াছে আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিবার সাধ্য নাই। এই বলিয়া তিনি তখনই চলিয়া গেলেন।"

কৃপানাথ বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, "তিনি আমার গুরুদেব ; দয়া করিয়া আপনাদিগকে দর্শন দিয়াছেন।"

প্রভুপাদ পত্নীর চিতাভস্ম যাহা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, গেণ্ডারিয়া আশ্রমে এক মন্দির করিয়া ১২৯৮ সালের মহাষ্টমীর দিনে সেই মন্দিরে তাহা স্থাপন করিলেন। সেই সঙ্গে নামব্রহ্মও স্থাপিত হইলেন। এই উপলক্ষে তিনি মহোৎসব করিয়াছিলেন। এখনও মহাষ্টমীর দিনে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উৎসব হইয়া থাকে।(১)

(১) একখানি কাগজে "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" নারদীয় পুরাণের এই শ্লোকটি মুদ্রিত করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন ; ইহাই নামব্রহ্ম।

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে জননীকে দেখিবার জন্য গোস্বামিপাদ গেণ্ডারিয়া হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন এবং কয়েকদিন মাতার কাছে থাকিয়া কলিকাতায় আসেন। কলিকাতার শিষ্যগণ তাঁহার বাসের জন্য মস্‌জিদ্‌বাড়ীষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ঠিক্‌ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

গোস্বামিমহাশয় এই বাড়ীতে কিছুদিন বাস করেন। এই স্থানে অবস্থানসময়ে মনীবাবু ও বৃন্দাবন বাবু গোস্বামিমহাশয়ের জন্য একটি ট্রাউজার ক্রয় করিয়া আনেন। গোস্বামিমহাশয় ট্রাউজার দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিলেন এবং মনী ও বৃন্দাবনের তৃপ্তির জন্য একবার পরিধান করিলেন। কিছুকাল পরে ট্রাউজারটি খুলিয়া তিনি বৃন্দাবনকে দিয়া বলিলেন, এটি তুমি পরিও। প্রাপ্তমাত্র বৃন্দাবন ট্রাউজারটি পরিলেন এবং তখনই তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া গোস্বামিমহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, একি? এই অচেতন বস্তুটির মধ্যে এত বৈদ্যুতিক শক্তি কোথা হইতে আসিল? আমার পা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতেছে। আমি ইহা কিছুতেই গায়ে রাখিতে পারিলাম না। এই বলিয়া তিনি বারংবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

একদিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ শীল গোস্বামিমহাশয়ের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত নানা প্রসঙ্গে আলাপ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে? তদুত্তরে গোস্বামি-মহাশয় বলিলেন, স্কুল কলেজের বালকগণই দেশের ভরসাস্থল। তাহাদের উপরই দেশের শুভাশুভ নির্ভর করে। তাহারা যদি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে শিক্ষা করে, তবেই দেশের কল্যাণ হইবে; নতুবা নহে। স্কুল কলেজের সে শিক্ষা নাই। অন্যান্য শিক্ষার সহিত যাহাতে বালকগণের সত্য ও বীর্য্যরক্ষায় শিক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ঋষিদের সময়ে দেশে

ব্রহ্মচর্য্য ছিল বলিয়াই ইহার এত উন্নতি হইয়াছিল। আমি একবার হিমালয়ে একজন মহাপুরুষকে দেশের কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও এই কথাই বলিয়াছিলেন।' শীলমহাশয় গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সর্ব্বোতোভাবে তাঁহার কথার অনুমোদন করিলেন।

একদিন স্বর্গীয় দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রিমহাশয় গোস্বামিমহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনি কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া মহর্ষিমহাশয় আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। দর্শনশক্তি অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর কোথাও যাইবার শক্তি তাঁহার নাই। একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন কি? শাস্ত্রিমহাশয়ের কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। আমি অবশ্যই তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইব।

পরদিনই তিনি সশিষ্যে পার্কষ্ট্রীটে মহর্ষিমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষিও "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায়চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গোস্বামিমহাশয়কে নমস্কার করিলেন। 'গোবিন্দায় নমো নমঃ' শব্দটি বারংবার বলিয়া মহর্ষি শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গোস্বামিমহাশয়ও ভাবে অবশ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। শিষ্যগণও মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন। পরে মহর্ষি অন্যান্য বারে যে সকল কথা বলিয়া গোস্বামিমহাশয়ের আদর ও অভিবাদন করিয়াছিলেন, এবারও সেই

সকল কথা বলিলেন। শিষ্যগণকেও অন্য বারের ন্যায় চিরদিন গুরু-অনুগত হইয়া চলিবার উপদেশ দিলেন।

অতঃপর মহর্ষি বলিলেন, বোলপুরে আমি একটি আশ্রম করিয়াছি শীঘ্রই তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে। তুমি সশিষ্যে প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। আশ্রমের নিয়মাবলি কিরূপ হওয়া উচিত? এসম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় জানিতে চাই। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সাধুদের থাকিবার আশ্রম আছে। তাহাতে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সমস্ত সাধুই আশ্রয় পাইয়া থাকেন। বঙ্গদেশে সেরূপ আশ্রম নাই। আপনার আশ্রমটি সেইরূপ হয় ইহাই আমার ইচ্ছা। সকল সম্প্রদায়ের সাধু আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় পান এবং অবাধে আপনআপন সাধন ভজন করিতে পারেন এইরূপ হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়। মহর্ষি গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার কথার অনুমোদন করিলেন। পরে বলিলেন, শান্তি-নিকেতনের ভার যাঁহাদের উপর প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারা তোমার এই উদার ভাব বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য যে গোস্বামি-মহাশয়ের কথা শান্তিনিকেতনে রক্ষিত হয় নাই।

মহর্ষির নিকট হইতে আসিবার সময় ৺শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী (গোস্বামি-মহাশয়ের জনৈক শিষ্য) গোস্বামিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষির এমন সুন্দর অবস্থা কিরূপে হইল? গুরুর কৃপা ভিন্ন কি এরূপ অবস্থা হয়? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, "গুরুর কৃপা হয় নাই কে বলিল? হিমালয়ে অবস্থান সময়ে জনৈক মহাপুরুষ ইহাঁকে কৃপা করিয়াছেন।"

একদিন একটি দরিদ্র শিষ্য গোস্বামিমহাশয়কে কিছু খাওয়াইবার আকাঙ্ক্ষায় দুই আনা পয়সা লইয়া নিজের পছন্দমত কিছু খাবার লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি নীচে সিঁড়ির কাছে পৌঁছিবামাত্র

গোস্বামিমহাশয় আসন হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দরজার কাছে গেলেন এবং ছলছলনেত্রে কাঁদকাঁদস্বরে শিষ্যটিকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, ওগো, তুমি কি এনেছ শীঘ্র আমাকে দাও। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। গুরুদেবের সস্নেহ আহ্বানধ্বনি শুনিয়া শিষ্য কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং খাদ্যবস্তুর ঠোঙাটি গুরুদেবের হস্তে দিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। গোস্বামিমহাশয় আগ্রহের সহিত প্রায় সমস্ত ভোজন করিয়া অল্প কিছু অবশিষ্ট থাকিতে ঠোঙাটি তাঁহার হাতে দিলেন। অতঃপর তিনি আসনে গিয়া বসিয়া খাদ্যবস্তুর অশেষ প্রশংসা করিতে করিতে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। শিষ্যটিও গুরুদেবের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

প্রতিদিন শেষ রাত্রিতে তাঁহার নিকট কীর্ত্তন হইত। কোনদিন তিনি নিজে করতাল বাজাইয়া মধুর কণ্ঠে সংকীর্ত্তন করিতেন। কোনদিন বা শিষ্যগণ কীর্ত্তন করিতেন, কোনদিন বা গোস্বামিমহাশয় প্রথমে কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন, পরে শিষ্যগণ আসিয়া যোগ দিতেন। প্রতিদিনই ভাবের জোয়ার; প্রেমের বন্যা বহিয়া যাইত। একদিন প্রভুপাদ ভাবাবেশে প্রত্যেক শিষ্যের পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনারা আমাকে কৃপা করুন, আশীর্ব্বাদ করুন। গুরুদেবের এই ভাব দেখিয়া শিষ্যগণ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। গুরুদেব পদধূলি গ্রহণ করিলেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। অনেকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোস্বামিমহাশয় সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া আসনে গিয়া বসিলেন। তদনন্তর কীর্ত্তন শেষ হইল।

অনন্তর শ্যামবাজারে কান্তিঘোষের একটি ত্রিতল বাটী ভাড়া

করিয়া গোস্বামিমহাশয় সেই বাড়ীতে গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের এককণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এক মাসের কিছু অধিক কাল এই বাড়ীতে ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে শত শত মুদ্রা ব্যয়িত হইল। জলস্রোতের ন্যায়, বৃষ্টির ধারার ন্যায় অর্থ ও নানাবিধ বস্তু আসিতে লাগিল; শত শত লোক আহার করিতে লাগিল। অবারিত দ্বার, যাঁহারা গোস্বামিমহাশয়কে দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহারা কেহই অভুক্ত ফিরিয়া যাইতেন না। প্রতিদিনই মহোৎসব, অষ্টপ্রহর আনন্দের বাজার। শিষ্যগণ দেখিয়া অবাক্। তাঁহারা গোস্বামিপাদের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থের এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হইল না, অথচ মাসাধিক কাল রাজসূয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই সময়ে গোস্বামিমহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা স্বামীর কর্ম্মস্থান দ্বারভাঙ্গায় ছিলেন। তথায় তাঁহার কঠিন পীড়া হয়। তাঁহার পুত্র দাউজীও মাতৃপীড়ার অংশভোগ করিতেছিল। অতি কষ্টে মাতা রোগমুক্ত হইলেন; কিন্তু পুত্র পীড়ায় কষ্ট পাইতে লাগিল। গোস্বামি-মহাশয় শান্তিসুধার পীড়া আরোগ্য হইলে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিলেন। দাউজীকে সেই পীড়া দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই সময়ে সংবাদ আসিল যে গোস্বামিপাদের পুত্রবধূ অতিশয় পীড়িতা। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। অসময়ে একটি মৃতপুত্র প্রসব করিয়া পীড়িতা হন। পীড়া জ্বর। যোগজীবন পিতার সহিত কলিকাতায় ছিলেন। গোস্বামিপাদ তাঁহাকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, "তুমি যাইয়া বৌমার চিকিৎসা ও

শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত কর। দেখিও যেন কোন ত্রুটি না হয়। আমি শীঘ্র আসিতেছি। পিতার আদেশে যোগজীবন ঢাকায় আসিয়া চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু রোগ কিছুতেই ভাল হইল না। দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। কয়েকদিন পরে গোস্বামিপাদ ঢাকায় আগমন করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই বসন্তকুমারী দিব্যধামের অধিবাসিনী হইলেন।

মৃত্যুর দিন সকালবেলা গোস্বামিমহাশয় রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক হরিনাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্পর্শে রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। রোগীর মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন তাহার রোগযন্ত্রণা দূর হইয়া গিয়াছে। মুখে শান্তি ও আরামের এক অপূর্ব্ব ছবি প্রকাশিত হইয়া রোগশীর্ণ বদনমণ্ডলকে সৌন্দর্য্যপূর্ণ করিয়া তুলিল। তাহার আভ্যন্তরিক আনন্দ বদনে ফুটিয়া বাহির হইল। এই অবস্থায় সে সমস্ত দিন নামে ডুবিয়া রহিল।

সেই দিন সকাল বেলা গোস্বামিমহাশয়ের অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় প্রসন্নচন্দ্র মজুমদারমহাশয় গোস্বামিপাদকে বলিলেন, আপনি ত ইচ্ছা করিলেই ইহাকে ভাল করিতে পারেন, আপনি ইহাকে সুস্থ করিয়া দিন।

গোস্বামিপাদ। যে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাকে আবদ্ধ কর কেন? এ মুক্তাবস্থা লাভ করিয়া যাইতেছে। এ যে দেবদুর্লভ অবস্থা পাইবে, বহু সৌভাগ্যে মানুষ তাহা পায়। ইহাকে বাঁচাইবার জন্ম অনুরোধ করিও না।

প্রসন্ন বাবু। এ কি মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছে?

গোস্বামিপাদ। একটু অবশিষ্ট আছে। বুড়া ঠাকুরাণীর (গোস্বামি-

মহাশয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর) দারুণ দুর্ব্যবহারে এ মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়াছে। সেই যাতনার সংস্কার বা দাগ এখনও ইহার অন্তর হইতে অপনীত হয় নাই। তিনি ইহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং এ তাঁহাকে ক্ষমা করিলে, ইহার সকল প্রকার সংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে।

প্রসন্ন বাবু। সেরূপ কি ঘটিবে?

গোস্বামিপাদ। এখনই ঘটিবে। এখনই বুড়া ঠাকুরাণী বধূমাতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিবেন এবং বধূমাতাও তাঁহাকে ক্ষমা করিবে।

ইহার কিছুকাল পরেই বুড়া ঠাকুরাণী অনুতপ্তহৃদয়ে রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে করিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রোগীও তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। তখন গোস্বামিমহাশয় প্রসন্নবাবুকে বলিলেন, এখন ইহার মুক্তাবস্থা। অনন্তর রোগী পরলোক গমন করিল। এই ঘটনা ১২৯৮ সালের ২৫শে পৌষ শুক্রবারে সংঘটিত হয়। মৃত্যুর পর বসন্ত গোস্বামিপাদকে বলে, একাদশ দিনে আপনি আমার শ্রাদ্ধ করাইবেন। পতিদত্ত পিণ্ড আমি পাইতে ইচ্ছা করি। গোস্বামিমহাশয় এগার দিনে যোগজীবনের দ্বারা বসন্তের শ্রাদ্ধ করাইয়াছিলেন। তিনি ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া নিজে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ান। বসন্ত শ্রাদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইয়া পিণ্ডগ্রহণ করে। যোগজীবনকে দেখা দিতে তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গোস্বামিপাদ তাহা হইতে দিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে গোস্বামিমহাশয়ের পত্নী, গৌর শিরোমণি মহাশয় ও লাল পরলোক হইতে গোস্বামিমহাশয়ের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে পরলোকে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন যে আমার গুরুদেবের আদেশ

ব্যতীত আমি পরলোকে যাইতে অক্ষম। তাঁহার অনুজ্ঞা ভিন্ন আমার কিছুই করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার এই কথা শুনিয়াও তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহাকে পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোস্বামিপাদ একথা একদিন সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সকলেই যারপরনাই ভীত হইলেন।

একদিন সায়ংকালে আমতলায় সংকীর্ত্তন হইতেছিল। গোস্বামিপাদ ভাবে বিভোর হইয়া কিছুকাল নৃত্য করিলেন, পরে সেই ভাবাবেশের অবস্থাতেই 'যাই যাই" বলিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলেই ভীত হইলেন। সকলেই মনে করিলেন, সকলকে কাঁদাইয়া ইনি পরলোকে চলিলেন। একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শান্তিসুধা ও কুঞ্জ বাবু (ঘোষ) ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, যাইতে দিব না। গোস্বামিপাদ শান্তিকে সহজেই ছাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু কুঞ্জবাবুকে কিছুতেই ছাড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। কয়েক বার আঘাত করাতেই কুঞ্জ বাবু তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার চৈতন্য হইল। চৈতন্যলাভের পর তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলা হইল। সমুদায় কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, লাল, * শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি আমাকে পরলোকে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে আমি "যাই যাই" বলিয়া যেই দেহ হইতে বাহির হইলাম, অমনি শান্তি ও কুঞ্জ আমাকে ধরিলেন। গুরুদেবও ঠিক সেই সময়ে আসিয়া আমার

* ইহাঁর নাম লালবিহারী বসু। শান্তিপুরে ইহার নিবাস। ইনি গোস্বামিমহাশয়ের একজন শিষ্য।

পরলোকগমনে বাধা দিয়া আমাকে দেহে পুনঃপ্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুঞ্জ ও শান্তি আমার দেহ ধরিয়া থাকাতে তাঁহার কাজের বাধা হইতেছিল, এজন্য তিনি তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি আমার দেহ আশ্রয়করিয়া ছিলেন। আমি কিছুই করি নাই। সমস্তই গুরুজী করিয়াছেন। এই ঘটনার পর শিরোমণি মহাশয়েরা তাঁহাদের অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা আর কখনও গোস্বামিপাদকে পরলোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই।

গোস্বামিপাদের গেণ্ডারিয়ায় অবস্থান সময়ে প্রতিবৎসর বালকগণ তাঁহার আসনের নিকটে দোল করিত। একবার দোলযাত্রা উপলক্ষে তাহারা আম্রবৃক্ষের গাত্রে লৌহপ্রেক বিদ্ধ করিয়া তাহাতে ছবি টাঙ্গাইয়াছিল। দোল শেষ হইয়া গেলে ছবি খুলিয়া লওয়া হইল, কিন্তু প্রেক বৃক্ষগাত্রে বিদ্ধ রহিল। ইহাতে বৃক্ষের অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল। পরদিন বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ প্রাণী প্রভুপাদকে বলিল, আপনি আমার ছায়ায় বসিয়া ভজন করেন, আমি আপনাকে আতপ হইতে রক্ষা করি, কিন্তু আপনি আমার সুখদুঃখের প্রতি একটুকুও দৃষ্টিপাত করেন না। বালকগণ আমার গাত্রে লৌহপ্রেক বিদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে আমি অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতেছি। আপনি আমার এ যাতনা দূর করুন। বৃক্ষের কথা শুনিয়া তিনি তখনই প্রেক তুলিয়া ফেলিলেন এবং বৃক্ষের গায়ে প্রেক বিদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বৃক্ষের গাত্রে যে প্রেক বিদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন না।

এই ঘটনায় অনেকের মনে এই সন্দেহ হইবে যে বৃক্ষের কি আত্মা আছে? সুখদুঃখ বোধ করিবার ক্ষমতা বা মনের ভাব

প্রকাশ করিবার শক্তি আছে? পাশ্চাত্যগণ উদ্ভিদের জীবনীশক্তি স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাদিগের আত্মা স্বীকার করেন না এবং সুখ দুঃখ প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে ইহাও তাঁহারা মানেন না। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি মানবেতর প্রাণীদিগের যে আত্মা আছে এবং তাহারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে ইহাও তাঁহারা মানেন না। কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্রকর্ত্তারা বলেন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জন্তু এবং বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ, সকলেরই আত্মা আছে, সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আছে এবং তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা আছে। ইহারা আহার করে, নিদ্রা যায়। মানবগণ চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই চৌরাশী লক্ষ জন্মের মধ্যে তাহাদিগকে বহু লক্ষ বার উদ্ভিদ ও নিকৃষ্ট জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। উদ্ভিদ ও তির্য্যক্‌দেহ লাভ করিবার পর তাহারা মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা যুক্তযোগী, ভগবানের জ্ঞানের সহিত যাঁহাদিগের জ্ঞান নিত্যযুক্ত, তাঁহারা দিব্যদৃষ্টিদ্বারা এ সমস্তই দর্শন করিয়া থাকেন।

আর পিপীলিকা, বানর প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর গতিবিধি মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে ইহাদিগের অন্যের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অধ্যাত্ম জগতের কোন জ্ঞান নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে তপস্যা না থাকাতে অতীন্দ্রিয় বিষয় তাঁহারা কিছুই অবগত নহেন। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা বলেন যে মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর আত্মা নাই; সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি নাই; অন্যের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। আমাদিগের দেশের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশ

চন্দ্র বসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাণীদিগের ন্যায় উদ্ভিদেরও হৃদয় এবং স্নায়ুমণ্ডলী ( **nervous system** ) আছে। তাহাদেরও প্রাণীর ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া হয়, উহাদিগের নাড়ি বহে, উহারা খাদ্যগ্রহণ ও জীর্ণ করিয়া থাকে, বংশবৃদ্ধি করে এবং সুখদুঃখ অনুভব করে। অনুভবশক্তি স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, উদ্ভিদ্‌দেহে স্বতন্ত্র স্নায়ুমণ্ডলী বর্ত্তমান আছে।

এই সময়ে আশ্রমে দুইটি কুকুর ছিল। একটির বর্ণ ছিল হরিদ্রামিশ্রিত শ্বেত; অপরটি কৃষ্ণবর্ণ। হরিদ্রাবর্ণের কুকুরটি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। আশ্রমে গদিযুক্ত এক খানি কেদারা ছিল। কুকুরটি সর্ব্বদা সেই কেদারায় শুইয়া থাকিত; এজন্য কুঞ্জবাবু (ঘোষ) তাহাকে চেয়ারম্যান বলিয়া ডাকিতেন। এইরূপে সে চেয়ারম্যান নামে অভিহিত হইল। সে সময়ে গোস্বামিমহাশয় দক্ষিণের ঘরে সকলের সহিত মধ্যাহ্নে আহার করিতেন। চেয়ারম্যান দক্ষিণের ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় চেয়ারে শুইয়া থাকিত। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, গোস্বামিপাদের ভোজন শেষ হইবামাত্র সে জানিতে পারিত এবং আসন হইতে উঠিয়া মাথা নাড়া দিতে থাকিত। তাহার কর্ণদ্বয়ের ঝটাপট্ শব্দ শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় হাসিয়া বলিতেন, দেখ চেয়ারম্যান জানিতে পারিয়াছে যে আমার আহার শেষ হইয়াছে। তখন তিনি আদর করিয়া তাহাকে খাবার দিতেন। চেয়ারম্যান্ মহাপুরুষের প্রসাদ পাইয়া কুকুর জন্ম সার্থক করিত। তাহার প্রকৃতি কিছু বৈরাগ্যযুক্ত ছিল। অন্য কুকুরের সহিত সে মিশিতে ভালবাসিত না। লোকসঙ্গও তাহার প্রিয় ছিল না। সে সর্ব্বদা একাকী থাকিতে ভাল বাসিত। কেহ তাহার নিকটে গেলে সে মহা বিরক্ত হইত। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে সে কোথায় চলিয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানেও তাহাকে

পাওয়া গেল না।" তখন গোস্বামিপাদ বলিলেন, চেয়ারম্যান কাল আমাকে বলিল, আমি আর থাকিব না। গোস্বামিপাদের ঢাকাত্যাগের পর কখনও কখনও পথে চেয়ারম্যানকে দেখা যাইত। প্রভুপাদের আশ্রিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের দ্বার পর্য্যন্ত আসিত, কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ করিত না। সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আশ্রমে আনা যাইত না। কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনের ন্যায় গোস্বামিজী শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে কিছুতেই তাহার প্রাণ চাহিত না। গোস্বামিপাদ ঢাকা পরিত্যাগ করিবার পর চেয়ারম্যান আর আশ্রমে প্রবেশ করে নাই।

দ্বিতীয় কুকুর কালু। গায়ের রং কাল ছিল বলিয়া তাহার কালু নাম রাখা হইয়াছিল। অতি শৈশবাবস্থায় কালু আশ্রমে আসিয়াছিল। সে আশ্রমেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। যখন সে বড় হইল, তখন তাহার মধ্যে অতি অপূর্ব্ব ভাবাবলির বিকাশ দেখা যাইতে লাগিল। সে অতিশয় সংকীর্ত্তনপ্রিয় হইয়া উঠিল। যখনই সংকীর্ত্তন হইত, যেখানেই থাকুক সেই স্থান হইতে ছুটিয়া আসিয়া কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইত। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তাহার ভাবাবেশ হইত। তখন সে আনন্দে বিভোর হইয়া সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক সকলকে আলিঙ্গন করিত। এবং তাহার ভাষাতে এক প্রকার অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিত। তাহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। গোস্বামিমহাশয়ের নিকটে কুঞ্জবাবু (ঘোষ) প্রতিদিন সকাল বেলা চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন। কালু তাহার একজন নিয়মিত শ্রোতা ছিল; প্রতিদিন পাঠের স্থানে উপস্থিত হইয়া একাগ্রমনে সে পাঠ শুনিত। একদিন পাঠ শুনিতে শুনিতে তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহার দেহ কাষ্ঠবৎ শক্ত হইল। সে মৃতের ন্যায় হাত ছড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। গোস্বামি-পাদ তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, কালুর সমাধি হইয়াছে; উহার কাণে হরিনাম দাও। কুঞ্জবাবু তাহাকে ধরিয়া বাহিরে আনিলেন, এবং তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম শুনাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নাম শুনাইবার পর কালুর চৈতন্য হইল।

গোস্বামিপাদ কালুকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আহার দিবার সময় অন্য কুকুর নিকটে থাকিলে তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাকে খাবার দিতেন। স্থানান্তর হইতে কোন লোক আশ্রমে আসিতেছেন, কালু তাহা জানিতে পারিত। সে তাঁহাকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে যাইত। তাহার পরিচিত কেহ হইলে সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিত এবং পুচ্ছসঞ্চালন এবং অব্যক্ত শব্দ করিয়া হৃদয়ের গভীর আনন্দ প্রকাশ করিত। আগমনকারী পরিচিত না হইলে কেবল আনন্দপ্রকাশমাত্র করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিত। কুঞ্জ বাবু এলাহাবাদ হইতে যখন ঢাকায় আসেন, তখন তিনি দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ি হইতে নামিয়া কিছু দূর আসিয়া দেখেন যে কালু তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। কুঞ্জবাবুকে দেখিবামাত্র সে গমনে ক্ষান্ত হইল এবং সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলন করিয়া কুঞ্জবাবুকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল।

একদিন পুবের ঘরে গোস্বামিপাদ কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছিলেন। কালুও সেস্থানে উপস্থিত হইয়া বিবিধ অপূর্ব্বভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। পরে নাম শুনাইয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইল।

কালুর সমাধি হইলে গোস্বামিপাদ তাহার পায়ের ধুলা লইয়া নিজের মাথায় দিতেন। একদিন সে কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সম্মুখের দুই

পা প্রভুপাদের দিকে বিস্তার করিয়া কাতরভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই সময়কার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, যেন সে নিজের অবস্থা ভাবিয়া দুঃখে অতিশয় ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে এবং হাত জোড় করিয়া প্রভুপাদের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছে। কালুর এই অবস্থা দেখিয়া গোস্বামিপাদের মন দয়ায় গলিয়া গেল। তিনি তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, কালু! কি করিব? তোমাকে সহ্য করিতে হইবে। সহ্য করা ভিন্ন উপায় নাই। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

গোস্বামিপাদ ঢাকা ত্যাগ করিলে গেণ্ডারিয়াবাসিদের মনে যাদৃশ ক্লেশ হইয়াছিল, কালুর তাহা অপেক্ষা কম হয় নাই। প্রভুপাদের বিদেশ গমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সকল আনন্দ, সমুদয় স্ফূর্ত্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে একেবারে মৃতকল্প হইয়া পড়িল। তাহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন সে জীবন্মৃত হইয়া অতিকষ্টে কোনরূপে দুঃখের দিন গুলি অতিবাহিত করিতেছে। জীবন যেন তাহার নিকট ভারবহ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে সে পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার পৃষ্ঠদেশে ঘা হইল। ইহার কিছুদিন পরে কুঞ্জবাবু যোগজীবনের এক পত্র পাইলেন। যোগজীবন লিখিয়াছেন, "ঠাকুর বলিলেন, তিনি ঢাকায় যাইবেন।" কুঞ্জবাবু যখন এই পত্র সকলকে পড়িয়া শুনান, তখন কালু সেইস্থানে উপস্থিত ছিল। সেও শুনিল; কি বুঝিল, তাহা সেই জানে; কিন্তু সেই দিন হইতে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তাহার মধ্যে আবার আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল। সে দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল। পৃষ্ঠদেশের ক্ষত দিন দিন আরোগ্য হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে আর এক খানি পত্র

আসিল। তাহাতে লেখা ছিল যে, গোস্বামিপাদ আর ঢাকায় যাইবেন না। সে পত্রও যোগজীবন লিখিয়াছিলেন। কালু পূর্ব্ববৎ সে পত্রও শুনিল, পত্র শুনিবার পর কালুর পূর্ব্বাবস্থা আবার দেখা দিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাহার পিঠের ঘা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। একদিন সকাল বেলা দেখা গেল যে কালু কুকুরলীলা শেষ করিয়াছে। কুঞ্জ বাবুর আঙ্গিনায় সে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার এই প্রকার মৃত্যুতে সকলেরই অত্যন্ত ক্লেশ হইল। পরে কুঞ্জ বাবু আশ্রমের দক্ষিণ দিকে তাহাকে সমাধি দিলেন। এইরূপে কালুর অপূর্ব্ব জীবনলীলার অবসান হইল আমরা পশুপক্ষিদিগকে অত্যন্ত উপেক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু আমরা তাহাদিগের বিষয় কিছুই জানি না, বুঝি না। মিথ্যা অভিমান ও গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বৃথা দম্ভ করি। ভগবান্ যে কাহার মধ্যে কি ভাবে লীলা করিতেছেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। আর জানেন জীবন্মুক্ত মহাজনগণ। সাধারণ মানবগণ তাহাদিগের বিষয় কিছুই জানে না, বুঝে না।

আশ্রমে একটি গাভী ছিল, সে গর্ভধারণ করে নাই। ডাক্তার প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার তাঁহাদের গাভীর একটি বৎস যোগজীবনকে দিয়াছিলেন। ইহার গায়ের রং ঈষৎ লালবর্ণ ছিল, এজন্য ইহাকে রাঙ্গি বলিয়া ডাকা হইত। পরে রাঙ্গি রাণীনামে অভিহিত হইয়াছিল। গর্ভধারণের সময় হইলেও সে গর্ভধারণ করে নাই। আশ্রমের সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। গোলীলা সংবরণ করিলে তাহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। পুকুরের পূর্ব্ব পারে তাহার পাকা সমাধি বিদ্যমান আছে।

প্রভুপাদের গেণ্ডারিয়ায় অবস্থান সময়ে আশানন্দ বাউল তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছিল। এই বিষ খাদ্যদ্রব্যে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ইহাতে কয়েকদিন প্রভুপাদকে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। পরে তিনি সুস্থ হইলেন। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া বাউল মহাশয় তাঁহার একজন শিষ্য পাঠাইয়া গোস্বামিপাদকে অপমান করেন।

গোস্বামিপাদ একদিন আহারান্তে আমতলায় বসিয়া ভজন করিতেছেন, এমন সময়ে আশানন্দের একজন শিষ্য তথায় আসিয়া বসিল। এবং দুই চারিটি কথার পরই গোস্বামিমহাশয়কে কটুবাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। "তুমি ব্রাহ্ম হইয়াছিলে, তুমি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছ, তুমি ভণ্ড, ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা কিছু কর, সমস্তই তোমার ভণ্ডামি" ইত্যাদি বিবিধ পরুষবাক্য বলিয়া প্রভুপাদকে অপমান করিতে লাগিল। সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই লোকটির প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইলেন। গোস্বামিমহাশয় সকলকে শান্ত করিয়া তাহাকে বলিলেন, আমি কে, তাহা কি তুই জানিস্? জানিলে এরূপ বলিতে তোর সাহস হইত না। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মধ্যে শক্তি জাগিয়া উঠিল। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন, "তুই আমাকে চিনিবি, সে ক্ষমতা তোর কোথায়? ক্ষুদ্র চটক পক্ষী হইয়া অনন্ত আকাশের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে আসিয়াছিস্। জানিস্ আমি কে? এক আমিই আছি। আমি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। আমিই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকি। আমার গলায় পৈতা নাই? তোর যদি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে তুই আমার গলায় সোণার পৈতা দেখিতে পাইতিস্। তুই মূঢ়, তুই আমার তত্ত্ব কি বুঝিবি?" গোস্বামিমহাশয় অত্যন্ত তেজের সহিত এইরূপ বাক্য বলিলে লোকটা একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িল; তাহার কথা বলিবার শক্তি লোপ পাইল। তখন ভয়ে

কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গেল। আশানন্দ* বাহিরে গোস্বামিমহাশয়ের সহিত সদ্ভাব দেখাইয়া গোপনে তাঁহার অনিষ্টচেষ্টা করিতেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে গোস্বামিমহাশয় কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন, এমন সময়ে গৈরিকবস্ত্রপরিহিত এক জন যুবক সেখানে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেলে গোস্বামিপাদ তাঁহার আসনে গমন করিলেন এবং গৈরিকধারী যুবকও তাঁহার কাছে যাইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ অন্য কথা কহিয়া তিনি গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, আপনি আমাকে চিনিতে পারেন? তাঁহার মুখে অকস্মাৎ এই প্রকার কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, আপনাকে ত পুর্ব্বে দেখি নাই, সুতরাং চিনিব কিরূপে?

যুবক। আমি সেরূপ চিনিবার কথা বলিতেছি না; আমি কে, তাহা আপনি জানিতে পারিয়াছেন কি?

গোস্বামিপাদ। আপনি এক জন ব্রাহ্মণসন্তান, আমার এখানে আসিয়াছেন; এই জানিতে পারিয়াছি।

যুবক। ধ্যানের দ্বারা আমার বিষয় কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন কি?

গোস্বামিপাদ। ধ্যানের দ্বারা কি অবগত হইব?

যুবক। আমি অবতার, ইহা আপনি জানিতে পারেন নাই?

* আশানন্দের প্রকৃত নাম আনন্দচন্দ্র সেন। তিনি ঢাকার মুন্‌সেফ্ আদালতে ওকালতী করিতেন। বাউলসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া উক্ত সম্প্রদায়ে বিলক্ষণ প্রতিপত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়েন। অনেক লোককে শিষ্য করিয়া বাউলসম্প্রদায়ের একজন নেতা হইয়া উঠেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে আশানন্দ গোস্বামিমহাশয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার চেষ্টা করিতেন।

গোস্বামিপাদ। না, তাহা ত কিছু জানিতে পারি নাই। আপনি কাহার অবতার?

যুবক। অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি লেখা আছে? কলিযুগে ভগবান্ কিরূপ অবতার গ্রহণ করিবেন?

গোস্বামিপাদ। ভগবান্ কলিযুগে কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইবেন, এই কথা শাস্ত্রে আছে।

যুবক। আমিই সেই কল্কী, তুমি কি ইহা জানিতে পার নাই?

গোস্বামিপাদ। না, তাহা ত জানিতে পারি নাই।

যুবক। তবে তোমার কিছুই হয় নাই। এই দেখ আমার আর দুই-খানি হাত বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বলিয়া তাহার দেহের দুই পার্শ্বস্থ দুইটি ব্রণের চিহ্ন গোস্বামিপাদকে দেখাইলেন। গোস্বামিমহাশয় এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, আর পারিলেন না। তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ইহাতে যুবক মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। সে দিন রাত্রিতে আশ্রমে থাকিয়া পরদিন সকাল বেলা তিনি প্রস্থান করিলেন। এইরূপ মধ্যে মধ্যে অনেক স্ত্রীপুরুষ গোস্বামি-মহাশয়ের নিকট আসিয়া আপনাকে অবতার বলিয়া পরিচয় দিত।

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে একজন লোক গোস্বামিমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল, এবং এক পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, প্রভো! আমি অত্যন্ত দুরাচার, আমার ন্যায় মহাপাপী জগতে নাই। এমন পাপ, এমন অধর্ম্ম নাই, যাহা আমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। এখন কৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। আমার ন্যায় মহাপাপীর উদ্ধারের কোন উপায় আছে কি? অনুতপ্ত পাপীর মুখে সরলভাবে তাহার পাপস্বীকার শুনিয়া গোস্বামিপাদের প্রাণ গলিয়া গেল। অনুতপ্তের প্রতি তাঁহার

গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনার উদয় হইল। তখন তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই আছে। তোমার মত সরল অনুতপ্ত লোকের উদ্ধারের উপায় কি না থাকিয়া পারে? তোমার কোন ভয় নাই। তুমি নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে। যে ব্যক্তি পাপ করিয়া অনুতপ্ত হয় এবং সরল ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলে, তাহার উদ্ধার অদূরবর্ত্তী। এই বলিয়া তিনি তাহাকে আশ্বাস দিলেন। তাঁহার আশ্বাসবাণী শুনিয়া সে ব্যক্তি আশ্বস্ত হইয়া প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া গেলে গোস্বামিপাদ বলিলেন, ইহার সহিত কথা বলিয়া আমি আজি যেরূপ আরাম পাইলাম, বহুদিন সেরূপ আরাম পাই নাই। ইহার সরলতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। যথার্থ সরলতা অতি অপূর্ব্ব পদার্থ। জগতে তাহার বড়ই অভাব। যথার্থ সরল লোক প্রায় দেখা যায় না। আজি একটি যথার্থ সরল ও প্রকৃত অনুতপ্ত লোক দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল। যে ব্যক্তি পাপ করিয়া অনুতপ্ত অন্তরে সরল-ভাবে তাহা প্রকাশ করে, ভগবান্ অচিরে তাহাকে উদ্ধার করেন। তাঁহার এক নাম পতিতপাবন।

বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র প্রভুপাদের নিকট আসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি মিষ্ট বাক্যে তাঁহাদিগের সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া পরে বলিতেন, তোমরা বিদ্যার্থী; শিক্ষা বিষয়ে যাহাতে সফলকাম হইতে পার, প্রাণ-পণে সে বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা। তাহাতে কদাচ অবহেলা করিওনা। আর এই সময়ে তোমাদিগের ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিপালন ও সত্যরক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে বীর্য্য-রক্ষা ও সত্যপালন করিতে পার, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবে। মনুষ্যত্ব, ধর্ম্ম, মহত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই এই দুইএর উপর

নির্ভর করে। 'যে মানব সত্য ও বীর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ না হয়, তাহাদ্বারা কোন মহত্তর কার্য্যই সংসাধিত হইতে পারে না। ধর্ম্মলাভ ত তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত। পূর্ব্বকালে বালকগণ গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিপালন ও সত্যরক্ষা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত। তাহারা গুরুর উপদেশে ও আত্মচেষ্টায় সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া যথার্থ মানব হইত। এই অবস্থায় তাহারা যাহাতে হস্তক্ষেপ করিত তাহাতেই কৃতকার্য্য হইত। ঋষিরা এক এক জন সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি ছিলেন। এই দুই বস্তুর অভাব হওয়াতেই ভারতবর্ষের ঘোরতর অধোগতি হইয়াছে। সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই হিন্দুজাতির শোচনীয় অধঃপতনের সর্ব্বপ্রধান কারণ। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতিকে উন্নত করিতে হইলে দেশে ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। নতুবা কিছুতেই দেশের মঙ্গল হইবে না। এখন তোমরাই দেশের আশাভরসা। উন্নতি অবনতি যাহাকিছু সমস্তই তোমাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য রক্ষা করিয়া নিজেরা মানুষ হইতে পার এবং দেশের শোচনীয় দুর্গতি দূর করিয়া ইহার উন্নতি-সাধন করিতে পার, ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া প্রাণপণে সে চেষ্টা করিও। ভগবানের প্রতি নির্ভরশীল হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা কখনও নিস্ফল হয় না।

**একটি বৃদ্ধ বণিক ফেরি করিয়া মসলা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। পণ্য বিক্রয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে সে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিত। গোস্বামিমহাশয়কে দেখিয়া তাহার অত্যন্ত ভক্তি হয়। সে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। একদিন সে গোস্বামিপাদের নিকট তাহার জীবনের ঘটনা এইরূপ বিবৃত করিয়াছিল। সে বলিল :—**

"আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। নানাপ্রকার চিকিৎসা করিয়াও যখন আমার চক্ষু ভাল হইল না, তখন আমি তারকেশ্বরের নিকট হত্যা দিবার সংকল্প করিলাম। আমি দরিদ্র, কোনরূপে কেবলমাত্র পাথেয়টি সংগ্রহ করিতে পারিলাম। তাহাই লইয়া বাবা তারকনাথের নাম লইয়া একাকী বাহির হইয়া পড়িলাম। আমি একে বৃদ্ধ তাহাতে দুইচক্ষুহীন। এ অবস্থায় একাকী দূরতর স্থানে গমন করা যে কিরূপ ক্লেশ তাহা আর কি বলিব। যাহা হউক কোনরূপে ত তারকেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। এখন হত্যা দিবার উপায় কি? আমার হাতে একটি পয়সা নাই। হত্যা দিতে হইলে কিছু খরচ চাই। তারকনাথের গদিতে কিছু জমা দিতে হয়। পূজাতেও কিছু ব্যয় আছে। তাহার পর একজন জামিন চাই। সেই অপরিচিত স্থানে কে আমার জামিন হইবে। আমি নিরুপায় হইয়া নানা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি যে ঘরে থাকিতাম তাহার পাশেই ফরাসডাঙ্গার একজন সম্পন্নঘরের রমণী ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোকজন। সেই সকল লোকের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাহারা আমার দুঃখের কাহিনী তাহাদের কর্ত্তৃঠাকুরাণীকে বলিল। সেই করুণাময়ীর আমার উপর দয়া হইল। হত্যা দিবার সমস্ত ব্যয় তিনি দিলেন এবং তাঁহার একজন কর্ম্মচারী আমার জামিন হইলেন। আমি হত্যা দিলাম। হত্যা দিবার কয়েকদিন পরে আমার উপর আদেশ হইল যে কাশ্মীরের মহারাজকে দর্শন করিলে তোমার চক্ষু ভাল হইবে।' আমি সেই করুণাময়ী রমণীকে একথা বলিলাম। তিনি আমাকে কয়েকটি টাকা দিলেন। আমি সেই টাকায় যতদূর যাওয়া যাইতে পারে ততদূরের টিকিট কিনিয়া বাবা তারকনাথের

নাম লইয়া গাড়িতে উঠিলাম। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া গাড়ি হইতে নামিলাম। তথাকার ষ্টেসনের বাঙ্গালী বাবুরা আমার দুঃখের কথা শুনিয়া দয়া করিলেন। আরও কিছু দূরের একখানি টিকিট কিনিয়া দিলেন। এইরূপে কয়েক স্থান হইতে সাহায্য পাইয়া আমি জম্বুতে উপস্থিত হইলাম। সে সময়ে মহারাজ জম্বুতে ছিলেন। থাকিলে কি হয়? আমার ন্যায় একজন নগণ্য বিদেশী অন্ধের রাজ-দর্শন হওয়া সহজ নহে। আমি কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলাম না। সেই স্থানের একটি বণিকের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে আমার দুরবস্থার কথা সমস্ত বলিলাম। তিনি আমার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং বলিলেন, রাজপুরোহিতের সহিত আমার আলাপ আছে। আমি তাঁহাকে তোমার কথা বলিব। তিনি দয়া করিয়া পুরোহিত মহাশয়কে আমার কথা বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন, এতদিন বল নাই, মহারাজ ত কাল চলিয়া যাইবেন। যাহা হউক অদ্যই আমি তাঁহাকে একথা বলিব। পুরোহিত মহাশয় সেই দিনই রাজাকে আমার কথা বলিলেন। রাজা সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমি কাল যখন রামজীর মন্দিরে যাইব, সেই সময়ে তাহাকে আমার কাছে আনিবেন। পুরোহিত মহাশয় যথাসময়ে একথা আমাকে জানাইলেন। পরদিন মহারাজ রামজীর মন্দিরে উপস্থিত হইলে পুরোহিত মহাশয় আমাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গেলেন। তিনি মহারাজের নিকট গমন করিলেন; কিন্তু আমার ভাগ্যে প্রবেশাধিকার ঘটিয়া উঠিল না। প্রহরীগণ আমাকে যাইতে দিল না। পুরোহিত রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া আমার কথা বলিলেন। সে কথা শুনিয়া মহারাজ আমাকে দেখিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন

পুরোহিত মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, মহারাজ তোমাকে দেখিতেছেন, তুমি তাঁহাকে দর্শন কর। আমি তাঁহার স্বর শুনিয়া সেই দিকে চাহিলাম। চাহিবামাত্র আমার দৃষ্টি খুলিয়া গেল। আমি দেখিলাম, দুই জন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছেন। আমি বলিলাম, দুই জনকে দেখিতেছি, ইহার মধ্যে মহারাজ কে? পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, যাঁহার পাগড়ীতে পালক তিনিই মহারাজ। পার্শ্বে মন্ত্রী মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন। এইরূপে ভগবান্ তারকনাথের কৃপায় অলৌকিকভাবে আমি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলাম। আমার অন্ধত্ব ঘুচিল। বাবা তারকনাথকে মনে মনে অভিবাদন করিয়া বাসায় আসিলাম। কিছুকাল পরে পুরোহিত মহাশয় আমার কাছে আসিলেন এবং আমার চক্ষু দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিলেন। পরে বলিলেন, একটি কাজ বড়ই ভুল হইয়াছে। মহারাজকে তোমার পাথেয়ের কথা বলিলে তিনি দিতেন। ইহা দ্বারা তুমি অক্লেশে দেশে যাইতে পারিতে। পুরোহিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, দেবতা, সে জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। যিনি নিঃসম্বল অন্ধকে এত দূর আনিয়া চক্ষু ভাল করিয়া দিলেন, তিনিই আমাকে দেশে লইয়া যাইবেন। এই বলিয়া আমি তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম এবং যে ভাবে গিয়াছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই আবার দেশে আসিলাম।" এই বলিয়া সেই বণিক বাবা তারকনাথের অদ্ভুত দয়ার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রভুপাদও এই আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, যাঁহারা দেবতা মানে না, তাহাদের এই ঘটনাটি শুনা নিতান্ত প্রয়োজন।

বরিশালের অন্তঃপাতী বানরীপাড়া গ্রামের শ্রীনারায়ণ ঘোষ ও তাঁহার সহোদরগণ সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন লোক। শ্রীনারায়ণ ঘোষের অন্যতম পুত্র

নরেন্দ্র অত্যন্ত সুশীল, সরলস্বভাব ও ধর্ম্মপিপাসু ছিল। এই অল্প বয়সেই তাহার জীবনে ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তি বেশ ফুটিয়াছিল। তাহার সুকুমার বদনমণ্ডল হইতে পবিত্রতা ও সরলতার মনোহর আভা বিচ্ছুরিত হইয়া সকলের চিত্ত হরণ করিত। তাহাকে দেখিলে ভারতের ভক্তবালক ধ্রুব ও প্রহ্লাদের কথা মনে হইত। সুন্দর স্বভাবের জন্য সে সকলেরই স্নেহ-ভাজন ছিল। পিতৃপিতৃব্যগণ তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। নরেন্দ্র গোস্বামিপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার এই কার্য্য তাহার পিতা ও পরিবারস্থ সকলের প্রীতিকর হয় নাই। গোস্বামিমহাশয় এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ জন্য তাঁহার প্রতি ঘোষ মহাশয়দিগের শ্রদ্ধা ছিল না। গোস্বামিপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করাতে বাড়ীর সকলেই নরেন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরিবারস্থ অনেকের কাছে নরেন্দ্রকে এ জন্য নিগ্রহভোগ করিতে হইত। সে গুরুর একখানি ছবি রাখিয়াছিল; পরিবারস্থ একজন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার মনে এমন গুরুতর ব্যথা লাগিয়াছিল যে সে সজলনয়নে ভগবানের নিকট "আমাকে এ স্থান হইতে উদ্ধার কর" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল।

নরেন্দ্র বরিশালে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িত। তথায় বিসূচিকা পীড়ায় তাহার মৃত্যু হয়। নরেন্দ্র যখন বরিশালে মারা যায় ঠিক সেই সময়ে বানরীপাড়ায় তাহাদের বাড়ীতে রক্তবৃষ্টি হইয়াছিল।*

* শ্রীনারায়ণ ঘোষের ভাগিনেয় গোস্বামিমহাশয়ের ভক্তশিষ্য শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ গুহ রায় রক্ত-বৃষ্টির সময়ে বানরীপাড়ায় মাতামহগৃহে উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম বৃষ্টিধারার ন্যায় শোণিত ধারা বর্ষিত হইয়াছিল। সে সময়ে যাঁহারা উক্তস্থানে ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই পরিধেয় বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। হেমেন্দ্রের কাপড়েও রক্তের দাগ লাগিয়াছিল। এই আকস্মিক রক্ত-বৃষ্টি

নরেন্দ্রের পরলোকগমনের কয়েক দিন পরে তাঁহার শোকার্ত্ত পিতৃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ গোস্বামিমহাশয়কে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে মহাশয়! আমরা আপনকার নিকট শত অপরাধে অপরাধী। আমাদিগের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। আমাদিগের সকলেরই নয়নমণি নরেন্দ্র আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার বিচ্ছেদে আমরা জীবন্মৃত হইয়া আছি। আমাদিগের বিশ্বাস আপনিই তাহাকে এই পাষণ্ডদের নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন। সে আপনার কাছেই আছে। ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাকে দেখাইতে পারেন। কৃপা করিয়া একবার তাহাকে আমাদিগকে দেখান। আপনি মহাপুরুষ এ বিশ্বাস পূর্ব্বে আমাদিগের ছিল না। থাকিলে আমরা এতরূপ বিপন্ন হইতাম না। নরেন্দ্রের মৃত্যুতে আমাদিগের এই বিশ্বাস হইয়াছে। আমরা আপনার মহিমা বুঝিতে পারিনাই। হায়! নরেন্দ্র জীবিত থাকিতে যদি আমাদের এই বিশ্বাস হইত তাহা হইলে আমাদের হৃদয়নিধি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিত না।

যোগেন্দ্র বাবুর এই পত্র আমি গোস্বামিপাদকে পড়িয়া শুনাইলে তিনি আমাকে বলিলেন যে তুমি লিখিয়া দাও, নরেন্দ্রকে এখন আর দেখাইবার সুবিধা নাই। এখন সে গর্ভস্থ হইয়াছে। তাহাকে গর্ভ হইতে আনিতে হইলে গর্ভস্থ ভ্রূণের জীবন রক্ষার জন্য আর একটি আত্মাকে গর্ভে প্রবেশ করাইতে হয়। ইহা সাধ্যায়ত্ত হইলেও এত করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। নরেন্দ্রকে একবার দেখিয়া তাঁহাদের কি লাভ হইবে? এই প্রকার সাক্ষাৎ তাঁহাদের সান্ত্বনার কারণ না হইয়া অধিকতর ক্লেশের

দর্শন করিয়া বাড়ীর সকলেই যারপরনাই উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়াছিলেন। বিপৎপাতের আশঙ্কায় সকলের মনই অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পরেই নরেন্দ্রের নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ উপস্থিত হইল।

কারণই হইবে। তাঁহারা ত আর তাহাকে পাইবেন না। তাহার ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের এখন সংসারের অনিত্যতা চিন্তাদ্বারা শোক সংবরণ করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। গোস্বামিপাদের আদেশে আমি যোগেন্দ্র বাবুকে এই সকল কথা লিখিয়া দিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীনারায়ণ ঘোষমহাশয় ঝালকাঠিতে নৌকা-ডুবিতে জলমগ্ন হইয়া পরলোকগত হন।

গোস্বামিজী যে আমগাছের তলায় বসিয়া ভজন করিতেন, সেই গাছ হইতে মধুক্ষরণ হইয়াছিল। বৃক্ষের প্রতি পত্র হইতে মধু নিঃসৃত হইয়া দুই পাশ ভিজিয়া গিয়াছিল। দুই তিনবার এই আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক আসিয়া এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়াছিলেন। সকলেই সেই মধু খাইয়াছিলেন। বৃক্ষ হইতে মধু বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন।

অনন্তর গোস্বামিমহাশয় তাঁহার গুরুদেবের আদেশে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। ১২৯৯ সালের রাসপূর্ণিমার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া

* ভগবান্ রসস্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ" সংসারে যাহাকিছু সুমিষ্ট, যাহাকিছু মধুময়, তৎ সমস্তেরই উৎপত্তিস্থান রসস্বরূপ ভগবান্। পার্থিব ষড়্রস ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা যে সকল সুস্বাদুবস্তু ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হই, যে মিষ্ট রস আস্বাদন করিয়া রসনার পরম পরিতোষ সম্পন্ন হয়, রসস্বরূপ ভগবানই সে সকলের আকর। সেই সর্ব্ব রসের আকর, সমস্ত স্বাদুতার উৎপত্তিস্থল, রসময়বিগ্রহ, ভগবানের মধুময় নাম যে স্থানে কীর্ত্তিত হয়, তথাকার বৃক্ষলতা, বায়ুমণ্ডল, পার্থিব রজঃ, সমস্ত মধুমাখা হয়। ভগবানের নামে বৃক্ষ মধুময় হইয়া তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? বৃক্ষ গোস্বামিমহাশয়ের কৃপায় এতই নামামৃত পান করিয়াছিল যে তাহা তাহার গা দিয়া মধুরূপে উপ্‌ছাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

ভাগবতেও বৃক্ষ হইতে মধুক্ষরণের কথা আছে। উপনিষদেও আছে। শ্রীবৃন্দাবনে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল।

দশ এগার মাস তিনি মৌনী ছিলেন। মৌনী হইবার কিছু দিন পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তাঁহাকে উক্ত সমাজের অধ্যক্ষসভার সভাপদে বরণ করিবার ইচ্ছা করিয়া এক খানি পত্র লেখেন। গোস্বামি-মহাশয় পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া আমাকে পত্রের উত্তর দিতে আদেশ করিলেন এবং যাহা লিখিতে হইবে, তাহা তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন। নিম্নে সেই পত্র উদ্ধৃত করিলাম। গোস্বামিমহাশয় স্বয়ং কাহারও পত্র পাঠ বা পত্রের উত্তর প্রদান করিতেন না। (১)

পত্র।

"তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মতে নাই। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম; সত্য জানিবার জন্য সকল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নিজে করিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং যাগযজ্ঞ, মালাতিলক, জটাজুট, ভস্ম, ব্রত, উপবাস কিছুকেই অবজ্ঞা করা যায় না। এজন্য তিনি সকল দলেই যোগ দিতে পারেন। সাধারণ বাহ্যবস্তু জানিতে কত শিক্ষার প্রয়োজন। ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি মৌনী হইয়াছেন, তীর্থাদি ভ্রমণ করেন, সর্ব্বভূতে ভগবৎঅধিষ্ঠান দেখিয়া প্রতিমার নিকটে প্রণাম করেন। ভগবান্ বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন, বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; এজন্য তিনি বলেন, "তফাৎ থাকাই সার কথা।"

অতঃপর ওঁকারনাথবাসী মৌনীবাবা (প্যারিলাল ঘোষ) গোস্বামি-মহাশয়কে এক পত্র লেখেন। "পত্রের মর্ম্ম এই যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আমি সাধনপথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি; মৌনী হইয়াছি; নিদ্রা জয়

(১) পূর্ব্বে তিনি অপরের পত্র নিজে পড়িতেন এবং নিজে তাহার উত্তর দিতেন। পরে তাঁহার গুরুদেবের আদেশে তাহা বন্ধ করিয়াছিলেন।

করিয়াছি; আহারের পরিমাণ নিতান্ত হ্রাস করিয়াছি; আসন স্থির করিয়াছি; কিন্তু যাহা লাভ করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিলাম, তাহা ত পাইতেছি না। আমার এখনও ব্রহ্মদর্শন হয় নাই। কি উপায়ে তাঁহার দর্শন পাইব কৃপা করিয়া আমাকে সেই উপদেশ প্রদান করুন। আমি এই পত্র গোস্বামিপাদকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি ইহার উত্তর স্বহস্তে লিখিয়া আমাকে বলিলেন, তোমার নাম দিয়া প্যারিবাবুর নিকট এই পত্র পাঠাইয়া দাও। আমি তাহাই করিলাম। প্রভুপাদলিখিত পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"বাহিরে ধর্মলাভের জন্য যাহা প্রয়োজন, সমস্তই হইয়াছে। সাক্ষাৎ-ভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে পিতার দর্শনে অধিকার জন্মে না। ধ্রুব পঞ্চম বৎসরের শিশু, বনে বনে পদ্মপলাশলোচন বলিয়া কাঁদিলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন পাইলেন না। ঈশা জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্টের নিকট দীক্ষিত; চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, গুরুকরণ ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন হয় না।

"আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনী হইবেন, লোকে সাধু বলিয়া ভক্তি করিবে, উহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হইবে না। যদি ব্রহ্মদর্শন করিতে চান, তবে অন্তরের সমস্ত পূর্ব্বসংস্কার দূর করুন।

"কি সত্য কি অসত্য তাহা আপনি জানেন না। এখনও পূর্ব্ব শিক্ষাকে সত্য মনে করিতেছেন। উহা সত্য নহে। ব্রহ্মদর্শনে যখন প্রকৃত জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, তখন এক একটী সত্য জানিতে পারিবেন। গুরুকরণ করিয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়, তখনই দর্শন পাওয়া যায়।

"অন্তরে যে বাসনা আছে, তাহা পাইবেন; ব্রহ্ম পাইবেন না। ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়িতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিবেন না। যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ ব্রহ্মসহবাস অনেক দূর।

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করিতে পারে, আপনি তাহা করিয়াছেন। এখন গুরুকরণ ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। ভগবান্ সমস্ত কার্য্য নিয়মে করেন। বাহ্য জগতে কোন কার্য্য যেমন অনিয়মে চলে না, সেইরূপ অন্তর্জ্জগৎও নিয়ম ভিন্ন চলে না। ব্রহ্মদর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালবাসি, এজন্য এত লিখিলাম।"*

* ১২৬৩ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী আজুদিয়া গ্রামে গোপ জাতীয় এক বৈষ্ণব বংশে প্যারিলাল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শিবনাথ ঘোষ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অনাসক্ত পুরুষ ছিলেন। প্যারিলালের সংসারত্যাগের পর তিনিও গৃহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্যারিলাল প্রথমে বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাবনা ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি রাজসাহী কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি অধিক দিন পড়িতে পারেন নাই। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া কিছুদিন জলপাইগুড়ী ও পরে রংপুরের অন্তর্গত সপ্তপুষ্করিণীতে ছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। স্বভাবসাধু প্যারিলালের প্রকৃতি স্বতঃই বৈরাগ্যপ্রবণ ও সংসারে অনাসক্ত ছিল। পত্নীবিয়োগে তাঁহার সেই বৈরাগ্য প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বরাবরই নির্জ্জনে থাকিয়া ধ্যানধারণা প্রভৃতি কার্য্য করিতে ভালবাসিতেন। কর্ম্মবহুল কোলাহলময় জীবন অপেক্ষা ধ্যানধারণাযুক্ত নীরব জীবনই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পর তিনি কিছুকাল ধর্ম্মপ্রচার করিয়া পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে অগ্রে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ, পরে প্রচার। অসিদ্ধ অবস্থায় ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলে সমূহ ক্ষতি হয়। অন্তরে প্রবল অহংকার উৎপন্ন হইয়া মানবকে ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির প্রথমে কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়া আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। পরে প্রয়োজন হইলে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বতন সিদ্ধ মহাজনগণ এইরূপই করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব, গুরুনানক, তুলসীদাস এবং প্রাচীন ঋষিগণ এই পন্থারই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ইহার অন্যথা

১২৯৯ সালের বর্ষাকালে গোস্বামিপাদের জননী পুত্রের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার পিতা এক ফকিরের বরে তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। সেই ফকির সময়ে সময়ে স্বর্ণময়ী দেবীতে আবিষ্ট হইতেন। ফকিরের আবেশ হইলেই স্বর্ণময়ী উন্মাদবৎ হইতেন। সে সময়ে তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়াই বোধ হইত। গেণ্ডারিয়ায় আসিবার কিছুদিন পরে তাঁহার সেই পীড়া উপস্থিত হইল। তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত উপদ্রব করিতেন।

করিয়া অসিদ্ধ অবস্থায় ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অ... করেন। প্যারিলাল এইরূপ চিন্তা করিয়া তপস্যা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়েই তিনি গোস্বামিমহাশয়ের সহিত হিজলীকাঁথিতে গমন এবং তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া তাঁহার কৃপালাভ করেন। এই কৃপালাভ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট তিনি আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তপস্যার্থ চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন। এখানে তিনি দুইবৎসরকাল ঘোরতর তপস্যা করিয়া নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী ওঙ্কারনাথ পর্ব্বতে যান। তথায় এক পর্ব্বতগুহায় থাকিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। গুরুকরণ ও দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, কাজেই তিনি কাহারও নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সাধনে ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। এজন্য একজন মহাত্মা কৃপা করিয়া সূক্ষ্মদেহে তাঁহাকে সাধন বিষয়ে উপদেশপ্রদান ও সাহায্য করিতেন। এ কথা তিনি ব্রাহ্ম কুঞ্জবিহারী সেনের নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল মৌন থাকিয়া যেরূপ উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষাপ্রভাবে তিনি প্রথমে গুরুকরণের আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন নাই; পরে তাঁহার এইমতের পরিবর্ত্তন হয়। দীর্ঘকাল কঠোর সাধন করিয়াও তাঁহার অভিলষিত অবস্থালাভ হইল না। "আহারসংকোচ, নিদ্রাজয়, স্থির আসন, লোকসঙ্গবর্জ্জন প্রভৃতি সমস্তই হইল, কিন্তু ব্রহ্মদর্শন হইল না। ইহাতে তিনি সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অন্তরে নিরাশার উদয় হইল। এই সময়েই তিনি গোস্বামিপাদকে পত্র লেখেন। তাঁহার পত্র পাইয়া প্রভুপাদ তাঁহাকে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন,

এজন্য রাত্রিতে তাঁহাকে গোস্বামিপাদের ভজনকুটীরে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। সেই সময়ে কুটীরে সর্পরূপী ফকির বাস করিতেন। ইহা একটী কৃষ্ণবর্ণ গোক্ষুরা সাপ। এই সাপটি সর্ব্বদা গোস্বামিপাদের নিকট আসিয়া তাঁহার গায়ে মাথায় উঠিত। কখনও তাঁহার পায়ে জড়াইয়া থাকিত। একদিন রাত্রিতে স্বর্ণময়ী দেবী কুটীরে আবদ্ধ হইয়া ভয়ংকর উপদ্রব করিতেছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে উপদ্রুত হইয়া ভয় দেখাইবার জন্য সেই সাপ গর্ত্ত হইতে বাহির হইল এবং ফণা উচ্চ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। যাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য এত আয়োজন তিনি কিন্তু কিছুমাত্র ভয় পাইলেন না। সাপকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া স্বর্ণময়ী তাঁহার মস্তকে এক প্রকাণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, কি আমার সঙ্গে চালাকি করিতে আসা হয়েছে?

তাহা পাঠ করিয়া তিনি গুরুকরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন এবং গোস্বামিমহাশয়ের নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হন। ইহার পর গোস্বামিপাদ যখন প্রয়াগে গিয়াছিলেন সেই সময়ে তিনি একদিন বলিলেন, "প্যারিলাল ঘোষকে দীক্ষা দিবার জন্য আমাকে একবার ওঁকারনাথে যাইতে হইবে।" ইহার কয়েক দিন পরে তিনি বলিলেন, "আমার আর তথায় যাইতে হইবে না, সে কাজ হইয়া গিয়াছে।" তাঁহার কৃপালাভ করিবার পর প্যারিলাল তাঁহার অভিলষিত অবস্থালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অবস্থার কথা তিনি এক খানি পত্রে এই প্রকার লিখিয়াছেন :—

"দয়াময় অপার করুণা করিয়া আমার সমস্ত উপাধি বিনাশ করিয়াছেন। আমি এবং আমার এখন কিছুই নাই। সমস্ত জগৎই সেই একমাত্র পরাৎপর পরমাত্মারই প্রকাশ। আমার কোন সমাজ নাই, জাতি নাই, কুল নাই, মানঅপমান, ঘৃণা ও আদর কিছুই নাই। আমার নিকট সমস্ত সমাজ এবং সর্ব্ব লোক এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার শত্রু মিত্র কেহ নাই। আমার ভাইভগিনী, মাতাপিতা কিছুই নাই। এক ব্রহ্মই সর্ব্বভূতে চরাচরে সুন্দররূপে জাগ্রত জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত। আমি কাহাকে আপনার এবং কাহাকে পর বলিব এবং কাহার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিব?

আমি কি তোর চোখরাঙ্গানিতে ভয় করি? চড় খাইয়া সাপ মহাশয় ধীরে ধীরে গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। সকাল বেলা বাহিরে আসিয়া দেবী স্বর্ণময়ী পুত্রকে বলিলেন, বিজয়, তোর ঐ ঘরে একটা সাপ আছে। সে কাল রাত্রিতে আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছিল। জননীর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, মা তুমি কি করিলে? "আমি তাহার ফণায় এক চড় বসাইয়া দিলাম। চড় খাইয়া সাপ মাথা হেঁট

এখন সর্ব্বজীবে ও সমস্ত লোকে আমার সমভাব এবং অতি পবিত্র ভাব। আমার মস্তক শঙ্কর, কৃষ্ণ এবং যিশু প্রভৃতি মহাত্মাগণ হইতে একটি কীটানুকীটের নিকট আমার অন্তরাত্মা দয়াল হরি প্রকৃত পক্ষে এবং ভক্তির সহিত অবনত করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এখন আমি সর্ব্বলোকসহিত সেই অখণ্ড অব্যয় পুরুষকে মস্তকে ধারণ করিতেছি। এখন আমি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম পাইয়াছি। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এবং ব্রাহ্ম আমার নিকট এক হইয়াছে; পাপী ও পুণ্যাত্মা এক হইয়াছে। আহা, আমার অন্তরাত্মা দয়াল হরির কতই দয়া! আমি ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি যে সকল মিথ্যা উপাধি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সমূলে বিনাশ করিয়া আমাকে কচি খোকা করিয়াছেন। সদ্গুরুর অনুসরণ কর শান্তি পাইবে।"

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কুঞ্জলাল ঘোষকে এক পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি গোস্বামিপাদকে গুরু বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন।

প্যারিলাল এইরূপে সাত বৎসর কঠোর তপস্যা দ্বারা অভিলষিত অবস্থা লাভ করিয়া ১৩০১ সালের মাঘী শুক্লাষ্টমীতে কলেবর পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ নর্ম্মদা-তীরে প্রস্তর মধ্যে সমাহিত করা হইয়াছিল। ওঁকারনাথের এইরূপ প্রবাদ আছে যে প্রকৃত সাধু মহাত্মাদিগের মৃত কলেবর সমাধিস্থ করিবার পরদিনই সমাধিস্থান নর্ম্মদা সলিলে প্লাবিত হইয়া যায়। মৌনীবাবার সমাধি স্থানেরও এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। সমাধি প্রদানের পরদিনই সমাধিস্থান নর্ম্মদার জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

(শ্রীমতী নির্ঝরিনী প্রণীত "মৌনী বাবা" নামক পুস্তক হইতে সংকলিত)।

করিয়া গর্ত্তে ঢুকিল।" জননীর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ হাসিয়া বলিলেন, সাপ শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়াছিলেন। আচ্ছা শিক্ষা হইয়াছে। আর গর্ত্ত হইতে বাহির হইতে সাহস পাইবে না।

একদিন অপরাহ্নে আমার মনে হইল যে গোস্বামিপাদের ক্ষুধা হইয়াছে। এই ভাবটা এতই প্রবল হইল যে আমি কিছুতেই আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। কিছু খাবার লইয়া কুটীরে গেলাম। আমার হাতে খাবারের পাত্র দেখিয়া তিনি ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া তাহা লইলেন। যেন তিনি খাবারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। খাদ্য বস্তু লইয়াই অতি আগ্রহের সহিত তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইলে ভোজনপাত্র আমার হাতে দিয়া বলিলেন, একটী পরলোকবাসী ক্ষুধায় কাতর হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুজ্জনিত ক্লেশ আমার ভিতর সংক্রামিত হইয়া আমাকে ক্ষুধায় কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। তুমিও ঠিক সেই সময়ে খাবার লইয়া আসিলে। আমি খাওয়াতে পরলোকবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার কষ্ট চলিয়া গেল। আমি বলিলাম, পরলোকেও কি জীবের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে? তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন, যতদিন জীবের সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ থাকে ততদিন তাহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা ও শীতাতপজনিত সুখদুঃখ থাকে। এই জন্যই শ্রাদ্ধ ও তর্পণের ব্যবস্থা। তর্পণ ও শ্রাদ্ধে জল, পিণ্ড, দেওয়া হয়. যে বস্তু দান করা যায় পরলোকবাসিগণ তাহারই সূক্ষ্ম অংশ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা, দূর হয়। প্রদত্ত বস্ত্রাদির সূক্ষ্ম অংশে তাঁহাদের শীতাতপজনিত ক্লেশের শান্তি হয়। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাদের অধিক তৃপ্তি হয় ব্রহ্মজ্ঞব্রাহ্মণভোজনে, কারণ দেহধারী জীব ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের মুখে আহার করিয়া থাকেন। খাদ্য ও পানীয় দর্শন

করিলেই সূক্ষ্ম দেহের ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। স্থূল দেহ না থাকাতে তাঁহারা স্থূল বস্তু খাইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে তাঁহাদের ভোজন করা হয়। এই জন্যই শ্রাদ্ধে যত্ন করিয়া সুব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার বিধি। এখন এনিয়ম আর পালন করা হয়না। অনেক সময়ে পরলোকগত অনেক লোক ক্ষুধায় কাতর হইয়া গোস্বামিপাদের নিকট আসিতেন এবং প্রভুপাদ নিজে আহার করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণার যাতনা হইতে রক্ষা করিতেন।

প্রতিদিন মধ্যাহ্ন সময়ে কুলদা ব্রহ্মচারী কুটীরে যাইয়া প্রভুপাদের কাছে ৺কালিপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিত। গোস্বামিপাদ সে সময়ে কুটীরে থাকিতেন। একদিন পাঠের পর তিনি কুলদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সন্ধ্যা কর ত? কুলদা বলিল, না, আমি ত সন্ধ্যা করি না। গোস্বামিপাদ বলিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে, সন্ধ্যা কর না, এ কি কথা। ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন তিন বার সন্ধ্যা করিতে হয় ইহা কি জান না? কাল হইতে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা করিও। সন্ধ্যামন্ত্র মুখস্থ করিয়া লইও। কুলদা চলিয়া গেলে আমি প্রভুপাদকে বলিলাম, ব্রাহ্মণ মাত্রে সন্ধ্যা করা উচিত; তাহা হইলে আমাকেও ত সন্ধ্যা করিতে হয়। প্রভুপাদ বলিলেন, না। গুরুমন্ত্র জপ করিলেই তোমার হইবে।

গোস্বামিমহাশয়ের জননীর এই পীড়া ভাল হইল না। এই পীড়া হইতেই ১২৯৯ সালের চৈত্র মাসে তিনি কলেবর ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, বিজয়, তুই ত সন্ন্যাসী, আমার শ্রাদ্ধ করিতে পারিবি না। তুই গঙ্গাতীরে যোগজীবনের দ্বারা আমার শ্রাদ্ধ করাইয়া তিন অঞ্জলি গঙ্গাজল আমাকে দিস্। তোর হাতের গঙ্গাজল পাইলে আমার অক্ষয় তৃপ্তি হইবে।

মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর গোস্বামিমহাশয় কলিকাতায় যাইয়া গঙ্গাতীরে যোগজীবনের দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধ করান এবং নিজে তাঁহাকে তিন অঞ্জলি গঙ্গাজল প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত জল স্বর্ণময়ী দেবী হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে অভয়নারায়ণ রায়ের বাড়ীতে মহোৎসব ও কীর্ত্তন হয়। মুকুন্দঘোষ কীর্ত্তন গাহিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধান্তে গোস্বামিমহাশয় ঢাকায় গমন করিলেন। * অতঃপর তিনি তিন চারি মাস ঢাকায় বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার কুটীরের গায়ে এই কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন :—

(ক) কুটিরের উত্তর দেওয়ালের বহির্গাত্রে——

ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

( এইখানে একটী পতাকা অঙ্কিত ছিল )

(খ) কুটীরের অভ্যন্তরে উত্তর দেওয়ালের গাত্রে——

এইছা দিন নাহি রহেগা।

১। আত্মপ্রশংসা করিও না।

২। পরনিন্দা করিও না।

৩। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

৪। সর্ব্বজীবে দয়া কর।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

৭। নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ।

* গোস্বামিপাদের জননী সর্ব্বদা পরলোক হইতে আসিয়া পুত্রকে নানা সংবাদ প্রদান করিতেন। গোস্বামিমহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন, মা প্রায়ই আমার কাছে আসিয়া পরলোকের সংবাদ দেন। আমি তাঁহার নিকট অনেক খবর পাই।

# দশম পরিচ্ছেদ

## কলিকাতায় আগমন

১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসে গোস্বামিমহাশয়ের গলার ভিতরে ঘা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে গলায় ক্যানসার হইয়া ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারও কি তাহাই হইল? এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কলিকাতায় যাইয়া ভাল চিকিৎসকদিগকে দেখাইবার সংকল্প করিলেন। শ্রাবণ মাসের শেষভাগে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতা আসিবার পথে ষ্টীমারে একজন পরলোকগত কবিরাজ তাঁহাকে বলেন, আপনার গলায় যে ক্ষত হইয়াছে, তাহা সাধারণ ক্ষত। শীঘ্রই তাহা সারিয়া যাইবে। গলার যেস্থানে ব্যথা সেই জায়গায় কালকচুর রস লাগাইবেন, তাহাতেই ভাল হইবে। কলিকাতায় আসিয়া কয়েক দিন কাল কচুর রস ব্যবহার করাতে প্রভুপাদের গলার ঘা ভাল হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও শিষ্য লাখুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে বাস করেন।

কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া কোথাও যাইতে নিষেধ করিলেন। গোস্বামিমহাশয় গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে ভবানীপুরের স্বর্গীয় উমাচরণ দাস তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যখন আপনার মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন যে

এক দিন আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন। আমি সেই সময় হইতে আশা করিয়া রহিয়াছি। একদিন আমার বাড়ীতে গেলে বহুদিনের আশা পূর্ণ হয়। উমাচরণ বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। এক দিকে সত্যরক্ষা অন্য দিকে গুরুআজ্ঞা। উমাচরণ বাবুর বাড়ীতে না গেলে সত্য রক্ষা হয় না; গেলে গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। তিনি কি করিবেন, কোন্ দিক রক্ষা করিবেন? সত্য রক্ষা করাই স্থির করিলেন। উমাচরণ বাবুর বাড়ীতে যাওয়াই ঠিক হইল। উমাচরণ বাবু তাঁহার আগমন উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। সংকীর্ত্তন ও সতীর্থদিগের ভোজনের উদ্যোগ হইল। গোস্বামিমহাশয় উপস্থিত হইলে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দঘোষ মান পালা গাইলেন। অন্যান্যস্থলে যেমন হয়, এখানেও সেইরূপ হইল। গোস্বামিপাদ ভাবাবেশে নৃত্য করিলেন। ভাবের উচ্ছ্বাসও যথেষ্ট হইল। সকলেই প্রচুর আনন্দ সম্ভোগ করিলেন। শেষে কিন্তু একটী বড়ই মনস্তাপের কারণ ঘটিল। কীর্ত্তন শেষ হইবামাত্র গোস্বামিমহাশয় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। জ্বর হইবামাত্র তিনি গাড়ী করিয়া আসনে চলিয়া গেলেন। অকস্মাৎ এইরূপ অপ্রিয় ঘটনা হওয়াতে উমাচরণ বাবু ও তাঁহার পরিজনবর্গের মনে মর্ম্মান্তিক যাতনা হইল। তিনি মনকষ্টে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। ভগ্নহৃদয়ে সতীর্থদিগের সেবা করিলেন। তৃতীয় দিনে গোস্বামিমহাশয় জ্বরমুক্ত হইয়া অন্নপথ্য করিলেন।

আরোগ্যলাভের পর তিনি বলিলেন, গুরুআজ্ঞা লঙ্ঘনের ফল হাতে হাতে ফলিল। মায়ের শ্রাদ্ধের সময় যখন আমি এখানে আসিয়াছিলাম, সেই সময়ে তিনি তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য আমাকে অত্যন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। তখন আমি বলিয়াছিলাম

যে এবারে সুবিধা হইবেনা, পুনরায় যখন আসিব তখনই যাইব। এদিকে কলিকাতায় আসিবামাত্র, গুরুজী আসনত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। উমাচরণ বাবু আমাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি উভয়সঙ্কটে পড়িলাম। কি করা যায়? শেষে সত্যরক্ষা করাই স্থির করিলাম। উমাচরণ বাবুর বাড়ীতে গেলাম। গুরুআজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার শাস্তি হাতে হাতে ভোগ করিতে হইল। জ্বরে ক্লেশভোগ করিলাম।

এই বাড়ীতে অবস্থান সময়ে প্রভুপাদ কুলদাব্রহ্মচারীকে শালগ্রাম পূজা করিতে বলিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে ব্রহ্মচারী অনেকদিন একটি শালগ্রাম পূজা করিয়াছিলেন। পূজান্তে তিনি যখন শালগ্রামের আরতি করিতেন, গোস্বামিপাদ তখন আনন্দ করিয়া কাঁসর বাজাইতেন। একদিন উল্টাডিঙ্গির মনোহর দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ গোস্বামিমহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া চৌদ্দ মাদল অর্থাৎ চৌদ্দটি খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদিগের আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া অতিশয় উৎসাহের সহিত অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনে ভাবের স্রোতে ও প্রেমের উল্লাসে সকলেই অতিশয় আনন্দভোগ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ ভাবাবেশে খুব নাচিয়াছিলেন। পরে হরির লুট হইয়া কীর্ত্তন শেষ হয়।

এই সময়ে গোস্বামিমহাশয়ের দৌহিত্র দাউজীর বয়স আড়াই বৎসর। গোস্বামিমহাশয় একদা সশিষ্যে গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন। দাউজীকেও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল, স্নানান্তে গঙ্গাগর্ভ হইতে ফিরিবার সময় দাউজী হঠাৎ উর্দ্ধদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিল, বাবা? ঐ দেখ কিরে। বালকের তখনও সুস্পষ্ট

বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। দাউজীর এই কথা গোস্বামিপাদ শুনিতে পাইয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং আহ্লাদপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন "ঠিক বলেছ দাউজী মহারাজ? ঐ ত কৃষ্ণ দাড়াইয়া আছেন। তুমি সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ। তিনি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, কখনও কাছছাড়া হন না।"

আর একদিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর দাউজী আমাকে বলিল, বাবা? তোমরা ছোট আলো জালাও। কাল রাত্রিতে কৃষ্ণ খুব বড় আলো জালিয়া আমাদের ঘরে আসিয়াছিলেন। তোমার মুখচুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন যে তোমাকে তিনি অতিশয় ভালবাসেন। তিনি আরও বলিলেন যে তোমাকে আর কর্ম্ম করিতে হইবে না। সকাল বেলা গোস্বামিমহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, দাউজীর কথা কখনও মিথ্যা হয় না, উহা সম্পূর্ণ সত্য। এই কথার পর তিনি আরও বলিলেন, আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, সেই সময়ে একদিন দাউজী (বলরাম) আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। কখনও কাছছাড়া হইব না। আমি তখন তাঁহার কথা বুঝিতে পারি নাই। পরে ঢাকা আসিয়া তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম বস্তুতঃই তিনি দাউজী (শান্তিসুধার পুত্র) হইয়া আমার সঙ্গে রহিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক দিন প্রভুপাদের নিকট আসিয়া নিজের দৈন্য জানাইয়া কিছু অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গোস্বামিপাদ তাঁহাকে জানিতেন। তিনি তাঁহাকে কিছু অর্থ দিলেন। অর্থ পাইয়া বাবুটি গোস্বামিপাদকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে রাখাল বাবু বলিলেন, মহাশয়

এ লোকটি ভয়ংকর মাতাল, ইহাকে আপনি টাকা দিলেন, ও এখনই ঐ টাকায় মদ খাইবে। উহাকে, টাকা দিয়া আপনি ত উহার মদ খাওয়ার প্রশ্রয় দিলেন। এ কথার উত্তরে প্রভুপাদ হাসিয়া বলিলেন, প্রয়োজন হইলে মদ্যপের মদের পয়সাও দিতে হয়। ও লোকটি যে মাতাল তাহা আমি জানি এবং এই পয়সায় যে মদ খাইবে তাহাও জানি। আমি জানিয়া শুনিয়াও উহাকে পয়সা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম। ও যখন মদ খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে, তখন যেমন করিয়া হউক উহাকে মদ খাইতেই হইবে। মদ না খাইয়া ও কিছুতেই পারিবে না। যেমন করিয়া হউক উহাকে মদের পয়সা সংগ্রহ করিতেই হইবে। সৎ উপায়ে সংগ্রহ না হইলে চুরি করিয়াও উহাকে মদের পয়সা যোগাড় করিতেই হইবে। আমি যদি উহাকে পয়সা না দিতাম, তাহা হইলে ও চুরি করিত। আমি পয়সা দিয়া উহাকে চুরিকরারূপ পাপকার্য্য হইতে রক্ষা করিলাম। একে ত সুরাপান করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিতেছে, তাহার উপর চুরি করিয়া কি এ পাপের মাত্রা আরও বাড়াইতে দিতে আছে? দেখ লোকের প্রয়োজন বুঝিতে হয়। যাহার যাহা যথার্থ প্রয়োজন তাহাকে তাহা দিতে হয়, ভগবান্ বেশ্যার উপপতি জুটাইয়া দেন।

মনোহর দাস বাবাজী প্রায়ই ভিক্ষার্থী হইয়া গোস্বামিপাদকে গান শুনাইতে আসিত। প্রভুপাদ তাহার গান শুনিতে ভাল বাসিতেন। কখনও কখনও তাহার গানে তাঁহার অতিশয় ভাবাবেশ হইত। সেই অবস্থায় তিনি যেন এক প্রবল শক্তি দ্বারা অবশ হইয়া যাহা সম্মুখে পাইতেন দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহাই দিয়া ফেলিতেন। অন্য শক্তিদ্বারা অবশ হইয়া তিনি যখন দান করিতেন তখনকার তাঁহার সেই অবস্থাটি বড়ই সুন্দর। সে অবস্থাটি দেখিলে মুগ্ধ হইয়া যাইতে

হইত। অতি বড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও তাহা দেখিলে বিষয়াসক্তি ভুলিয়া যাইত। দান ত অনেকেই করে, কিন্তু এ ভাবে কাহাকেও দান করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার দানের এই অবস্থাটিই দেখিবার জিনিস। ইহা দেখিলে কৃপণ লোকের হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া যাইত। কার্পণ্যদোষ দূর হইয়া প্রাণটা উদার হইয়া পড়িত। কেবল মনোহর দাসকেই তিনি এই ভাবে দান করিতেন এমন নহে সকলকেই এই ভাবে দান করিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে একস্থানে লিখিয়াছেন, "যেমন পিপাসা হইলে ব্যগ্রতার সহিত জলপান করে, সেইরূপ যিনি প্রকৃত দাতা, তিনি দানের পাত্র দেখিলে দান করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি দুঃখ দূর করিতে পারেন, তাহাতে কুণ্ঠিত হন না। দান করিলে আনন্দের সীমা থাকে না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দাতা বলিয়া মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন।"

এই সময়ে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ সপরিবারে ভবানীপুরে বাস করিতেন। এই স্থানে তাঁহার একটি পুত্রের অন্নপ্রাশন হয়। এই উপলক্ষে তিনি সশিষ্য গোস্বামিপাদকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। একজন বামাচারী তান্ত্রিক সাধকও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বদাই গোস্বামিপাদের কাছে আসিতেন। তাঁহাকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, আমার ক্রিয়া করা হয় নাই। ক্রিয়া না করিয়া আমি খাই না। তাঁহাকে ক্রিয়া করিতে বলা হইল। তাহাতে তিনি বলিলেন, কারণ (সুরা) ভিন্ন আমার ক্রিয়া হয় না। এখানে ত তাহা পাইবার কোন সুবিধা নাই। তান্ত্রিকের কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় মনোরঞ্জন বাবুকে বলিলেন, ইনি অভ্যাগত। অভ্যাগত ব্যক্তিকে দেবতার মত সেবা করিতে হয়। তাঁহার যাহা প্রয়োজন তাঁহাকে তাহাই দিতে

হইবে। আপনি এখনই এক বোতল মদ আনাইয়া দিন। মনোরঞ্জন বাবু তৎক্ষণাৎ গুরুআজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। মদ্য আনীত হইলে তান্ত্রিক সুরাপান করিয়া তাঁহার ক্রিয়া শেষ করিলেন। পরে সকলের সহিত বসিয়া ভোজন করিলেন। কয়েকজন ব্রাহ্মও নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই ঘটনা লইয়া তাঁহাদের সমাজে খুব ঘোঁট করেন। চারিদিকে গোস্বামিপাদের ও মনোরঞ্জন বাবুর অনেক নিন্দা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

অতঃপর ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে গোস্বামিপাদ কুম্ভমেলা দেখিবার জন্য পুত্র, কন্যা, শাশুড়ী, জামাতা ও দৌহিত্রদ্বয় (দাউজী ও পুটুকু) এবং বহু শিষ্যসহ প্রয়াগযাত্রা করেন। গমন পথে বাঁকিপুরে, তিনি কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে তিনি তাঁহার জননীর শ্রাদ্ধ করিবার জন্য যোগজীবনকে গয়ায় পাঠাইয়া দেন। যোগজীবন গয়ায় গিয়া বিষ্ণুপদে পিতামহীর শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন। অতঃপর গোস্বামিপাদ সশিষ্যে হরিহর ছত্রের মেলা দেখিবার জন্য শোণপুরে গমন করিয়াছিলেন। শোণপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রয়াগে যান।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## প্রয়াগে কুম্ভমেলায় অবস্থান

গোস্বামিমহাশয় প্রয়াগধামে উপনীত হইয়া সাগঞ্জ নামক পল্লিতে বাটীভাড়া করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি একে একে তথাকার সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিলেন। অক্ষয়বট, বেণীমাধব, ভরদ্বাজ আশ্রম, কোটীশ্বর মহাদেব, আরাইল গ্রাম, সোমেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি সমস্তই তিনি দেখিলেন।

গোস্বামিমহাশয় যে বাড়ীতে বাস করিতেন, তাহার নিকটে একটি শিবমন্দির ছিল। প্রতিদিন সায়ংকালে যখন শিবের আরতি হইত, তখন একটি কুকুর সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার অব্যক্ত ভাষায় স্বর করিয়া গান করিত। গোস্বামিপাদ এই কুকুরটি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বজন্মে ইনি একজন সাধক ছিলেন। কোন অপরাধে কুকুর হইয়াছেন।

* ভরদ্বাজ আশ্রম এলাহাবাদের উত্তরে অবস্থিত। এইস্থানে মহর্ষি ভরদ্বাজের তপোবন ছিল। তাঁহার সময়ে ভারতখণ্ডের সমস্ত ঋষি মাঘমাসে একত্র সমবেত হইয়া একমাস কাল কল্পবাস, ত্রিবেণীস্নান, বেণীমাধব ও অক্ষয়বট দর্শন করিতেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ গোস্বামিমহাশয়ের গোত্রপতি। ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণ বধের পর অযোধ্যায় আসিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে এককোটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রয়াগের কোটিশ্বর মহাদেব তাঁহাদেরই অন্যতম। এলাহাবাদ সহর হইতে কিছুদূরে গঙ্গাতীরে এই শিবলিঙ্গ স্থাপিত থাকিয়া রঘুবর রামচন্দ্রের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন।

আরাইল গ্রাম যমুনার পরপারে অবস্থিত। এখানে সোমেশ্বর নামে মহাদেবের মন্দির আছে। বল্লভভট্ট এই গ্রামে বাস করিতেন। মহাপ্রভু যখন প্রয়াগে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি বল্লভভট্টের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন।

এইরূপে সমস্ত অগ্রহায়ণ মাস ও পৌষের অধিকাংশ অতীত হইলে গোস্বামিমহাশয় চড়ায় গমন করিলেন। গঙ্গাগর্ভস্থিত বিস্তীর্ণ চড়াতে কুম্ভমেলায় সমাগত সাধুদিগের অবস্থান নির্ণীত হইয়াছিল। তথায় নানা মতাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় দুই লক্ষ সাধুর আসন স্থাপিত হইয়াছিল। চড়া ব্যতীত গঙ্গার পরপারস্থ ঝুসি নামক স্থানে সাধুদিগের আশ্রমেও বহু সাধু অবস্থান করিয়াছিলেন। গোস্বামিপাদ বৈষ্ণব সাধুমণ্ডলীর মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্যার দিনকর রাও বাহাদুর তাঁহাকে একটি উৎকৃষ্ট তাম্বু দিয়াছিলেন, তিনি এক মাসকাল তাহাতে পরম সুখে বাস করেন।

কল্পবাসে যাইবার সময়ে বাটী হইতে সশিষ্যে শকটারোহণে যাইয়া সেখান হইতে পদব্রজে সেতুপার হইয়া তিনি চড়ায় উপনীত হন। সেতু হইতে চড়ায় উঠিবার সময় এক জন পরমহংস অকস্মাৎ তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া প্রফুল্লবদনে প্রেমবাহুবিস্তারপূর্ব্বক বলিলেন, "মেরে প্রাণ, আও"। গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শিষ্যদিগকে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। খোল করতাল সঙ্গেই ছিল। বিধুভূষণ ঘোষপ্রমুখ কয়েকজন শিষ্য কীর্ত্তন ধরিলেন; সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ খোল বাজাইতে লাগিলেন। ত্রিতাপহারী মধুমাখা হরিনামের উচ্চনাদে প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রভুপাদ উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ করিল; ভাবের প্রবল বন্যা বহিতে লাগিল। কীর্ত্তনের শব্দ শুনিয়া সাধুগণ ছুটিয়া আসিলেন; এবং অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ত্রিবেণী ক্ষেত্রে এরূপ সংকীর্ত্তন আর কখনও হয় নাই। পশ্চিম দেশীয় সাধুগণ এরূপ কীর্ত্তন কখনও শুনেন নাই। ইহা তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। তাই তাঁহারা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। গোস্বামিমহাশয়

ভাবে বিভোর ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নৃত্য করিতে করিতে তাম্বুতে উপনীত হইলেন। তাম্বুতে আসিলে সংকীর্ত্তন শেষ হইল। সকলে আপন আপন আসন স্থির করিয়া উপবিষ্ট হইলে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র গোস্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেতুর নিকট যিনি বাহুবিস্তার করিয়া আপনাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তিনি কে?

গোস্বামিপাদ। গুরুজী।

শিষ্য। তিনি আপনাকে এভাবে অভ্যর্থনা করিলেন কেন?

গোস্বামিপাদ। তিনি ভিন্ন আমার আর আছে কে? তিনি ব্যতীত এখানে কে আমাকে আদর করিবে?

শিষ্য। তাঁহার আকৃতি কি এই প্রকার? শুনিয়াছি তিনি নাকি গৌরবর্ণ? ইনি ত গৌরবর্ণ নহেন।

গোস্বামিপাদ। তিনি নিজের দেহে আইসেন নাই, অন্য শরীরে আসিয়াছিলেন।

শিষ্য। যে দেহে আসিয়াছিলেন, তাহা স্থূল না সূক্ষ্ম?

গোস্বামিপাদ। স্থূলদেহ। গুরুদেব নূতন দেহ সৃষ্টি করিতে পারেন। অদ্য তাহা করেন নাই; অন্য একজন সাধুর শুদ্ধদেহ আশ্রয় করিয়া আসিয়াছিলেন।

গোস্বামিমহাশয় চড়ায় উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মৃন্ময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদিগের সেবাস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যত দিন চড়ায় ছিলেন, ততদিন প্রত্যহ বিগ্রহদ্বয়ের পূজা ভোগ ও আরতি হইত এবং সন্ধ্যাকালে বিগ্রহদ্বয়ের সম্মুখে কীর্ত্তন ও আরতি হইত। কীর্ত্তনে গোস্বামিপাদ নৃত্য করিতেন। কুম্ভমেলা শেষ হইলে তিনি যখন নগরে প্রত্যাগমন করেন, তখন বিগ্রহদ্বয়কে ত্রিবেণী সলিলে বিসর্জ্জন করা হয়।

চড়ায় উপস্থিত হইয়া গোস্বামিপ্রাদ শিষ্যদিগকে কার্য্যভাগ করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমিও একটি কাজের ভার লই। আমার কাজ ভিক্ষা করিয়া তোমাদিগকে খাওয়ান। আমি তোমাদের খাওয়াইবার ভার লইলাম। একদিন আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, কোথা হইতে কোথায় আসিলাম। ব্রাহ্ম সমাজের বেঞ্চিতে বসিয়া টানা পাখার বাতাস সেবন করিতে করিতে ধর্ম্ম করিতাম। আর এখানে গঙ্গার চড়ায় কম্বল সার করিতে হইল। আমার কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ হাসিয়া বলিলেন, আরও কোথায় যাইতে হয় দেখ। ধর্ম্ম কি সহজে হয়? এক বিন্দু বিষয় রস থাকিতে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্ম পাইতে হইলে পথের ভিখারী হইতে হয়। ভগবান্ যাহাকে ধর্ম্ম দেন, তাহার যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া পথের ভিখারী করেন। যাহার এই অবস্থা হয়, তাহার বড়ই সৌভাগ্য। তাহার উপর ভগবানের বড়ই কৃপা।

পতিতপাবনী সুরতরঙ্গিণীর উদরস্থ সুবিস্তীর্ণ চড়াতে এবং তাঁহার পশ্চিমতীরবর্ত্তী সুপ্রশস্ত ময়দানে কুম্ভমেলার মহাধিবেশন হইয়াছিল। দক্ষিণবাহিনী জহ্নুনন্দিনী পূর্ব্ববাহিনী রবিসুতার সহিত যেস্থানে মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থানকে ত্রিবেণী বলে। পূর্ব্বকালে সরস্বতী নাম্নী আর একটি পবিত্র স্রোতস্বতী গঙ্গা ও যমুনার সহিত সম্মিলিত ছিল। কালক্রমে তাহার তিরোধান হইয়াছে। পুণ্যসলিলা নদীত্রয়ের একত্র সম্মিলন হওয়াতে মিলনস্থান ত্রিবেণী নামে অভিহিত হইয়াছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে ত্রিবেণীতে স্নান ও সমস্ত মাঘ মাস ত্রিবেণীতীরে বাসা করা হিন্দুশাস্ত্রমতে মহা পুণ্যজনক। এইরূপ বাস করাকে কল্পবাস বলে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন যে স্নান হয়, তাহাকে মকরের স্নান বলে। প্রতি বর্ষেই এই স্নান হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক নরনারী প্রয়াগে সমবেত হইয়া মকরস্নান ও সমস্ত মাঘ মাস কল্পবাস করিয়া থাকেন। ঋষিদিগের

সময় হইতে এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।" গোস্বামী শ্রীমৎ তুলসীদাসকৃত হিন্দি রামায়ণে লিখিত আছে :—

ভরদ্বাজ মুনি বসহি প্রয়াগা।
জিনহি রামপদ অতি অনুরাগা॥
তাপস শম দম দয়ানিধানা।
পরমারথ পথ পরম সুজানা॥
মাঘমকরগত রবি যব হোই।
তীরথপতিহি আব সব কোই॥
দেব দনুজ কিন্নর নরশ্রেণী।
সাদর মজ্জহি সকল ত্রিবেণী॥
পূজহি মাধবপদজলজাতা।
পরশি অক্ষয় বট হর্ষিত গাতা॥
ভরদ্বাজ আশ্রম অতিপাবন।
পরমরম্য মুনিবরমনভাবন॥
তঁাহা হোয় মুনিঋষয়সমাজা।
জাঁহি জে মজ্জন তীরথরাজা॥
মজ্জহি প্রাত সমেত উছাহা।
কহহি পরস্পর হরিগুণগাহা॥
ব্রহ্মনিরূপণ ধর্ম্মবিধি বর্ণহি
তত্ত্ববিভাগ।
কহহি ভক্তি ভগবন্তকী
সংযুতজ্ঞানবিরাগ॥
ইহি প্রকার ভরি মকর নহাহি।
পুনি সব নিজ আশ্রম যাহি॥
প্রতি সংবত অস হোয় অনন্দা।
মকর মজ্জ গবনহি মুনিবৃন্দা॥

শ্রীমৎ তুলসীদাসকৃত রামায়ণ, বালকাণ্ড।

এ বৎসর কুম্ভমেলা হওয়াতে লোকসংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় দুই লক্ষ সাধু এবং বহুসংখ্যক গৃহস্থ কল্পবাস করিয়াছিলেন। গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রয়াগ, পূর্ব্ব পারে ঝুসি। মধ্যস্থলে গঙ্গাগর্ভে প্রশস্ত চড়া। গঙ্গাযমুনার সংযোগস্থলের কিছু উত্তরে গঙ্গা হইতে একটি অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র জলস্রোত বহির্গত হইয়া ঝুসির নিম্ন দিয়া বহিয়া সংযোগ স্থানের কিছুদূরে গিয়া গঙ্গা যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছিল। ইহাতে চড়াটি এক ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হইয়াছিল। সাধুরা এই চড়াতে তাঁহাদিগের আসন স্থাপন করিয়া মাসাধিক কাল যাপন করিয়াছিলেন। ঝুসিতে সাধুদিগের যে সকল আশ্রম আছে, তাহাতেও বহুসংখ্যক সাধু

বাস করিয়াছিলেন। হাট, বাজার, দোকান প্রভৃতি গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল। এলাহাবাদ নগর হইতে যে রাজপথ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে গঙ্গাতীর হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত সারি সারি বিপণিশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গৃহস্থ কল্পবাসিদিগের বহুসংখ্যক কুটীর ও খৃষ্টান, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রচারনিবাস গঙ্গার পশ্চিমতীরে স্থাপিত হইয়াছিল। সাধুদিগের বাসস্থানের নিকট কিছুমাত্র বিষয়ের কোলাহল ছিল না। গবর্ণমেণ্ট গঙ্গার উপরে এক প্রশস্ত নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। যাইতে হইলে এই সেতু পার হইয়া চড়ায় যাইতে হইত। সরকার বাহাদুরও মেলায় সমাগত সাধু ও কল্পবাসী নরনারীর সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য অতি সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুবন্দোবস্তে সকলেই আরামে ছিলেন। এজন্য সাধুগণ ইংরেজ রাজের শুভ কামনা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, নানক পন্থী, দাদুপন্থী, কবীরপন্থী, গরিবদাসী, অঘোরপন্থী, গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ভুক্ত কাণফাট্টাযোগী, আচারী, বিহারবৃন্দাবন প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ভুক্ত তিন, চারি লক্ষ সাধু কুম্ভে সমাগত হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও নানকপন্থীগণের সংখ্যাই অধিক। উত্তরদিকে সন্ন্যাসিদের মধ্যস্থলে নানকপন্থীগণের এবং দক্ষিণদিকে বৈষ্ণব সাধুগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ ইহাঁদিগের পার্শ্বে এবং নানাস্থানে আসন মনোনীত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণ শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গগিরি (শিঙ্গারী) জ্যোতি (জোসি), গোবর্দ্ধন ও সারদা এই মঠচতুষ্টয়ের অধীন গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, বন, পর্ব্বত, অরণ্য প্রভৃতি দশনামা সম্প্রদায়ভুক্ত। বৈষ্ণবগণ শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র, ও সনক এই চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। নানকপন্থীগণ দুই ভাগে

বিভক্ত, উদাসী ও নির্ম্মলা। দশমগুরু গোবিন্দ সিংহের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়কে নির্ম্মলা ও গুরুনানকের, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে উদাসী বলে। কুম্ভমেলায় বহুসংখ্যক মহাপুরুষ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সকলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অনেকেই ছদ্মবেশে ছিলেন। যাঁহাদিগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিলাম। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে, মৌনীবাবা, ভোলানন্দ গিরি ও অমরেশ্বরানন্দ পুরী। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কাঠিয়া রামদাস বাবাজী; ছোট কাঠিয়া বাবা, নরসিংহদাস বাবাজী বা পাহাড়ি বাবা এবং ক্ষেপাচাঁদ বা অর্জ্জুন দাস বাবাজী। * শেষোক্ত দুই মহাপুরুষ গোস্বামিমহাশয়ের নিকটেই থাকিতেন। গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের গম্ভীরানাথ বাবাজী। গোস্বামিমহাশয় বরাবরপাহাড়ে

* খ্যাপাচাঁদ ( বাবা অর্জ্জুন দাস ) সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার The Soul of India নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এখানে প্রদত্ত হইল :—

"১৮৯৪।৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগের কুম্ভে অর্জ্জুন দাস বাবা নামক বর্ত্তমান সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ সাধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে তিনি সর্ব্বদাই পরমাত্মাতে বাস করিতেন। তিনি বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। তিনি প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে তাঁহার ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রকে দর্শন করিতেন। একবার গ্রীষ্মকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমার একটী বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সেদিন অত্যন্ত গরম। আমার বন্ধু বাবাজীর বাসভবনের উপর গেলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর হইতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। বাবাজী তাঁহাকে এই অবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহাকে আরতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর একখানি তালবৃন্ত লইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত এক ঘণ্টার অধিক কাল তাঁহাকে ব্যজন করিলেন। ব্যজন করিবার সময় তিনি সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় নানা ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অনেক শ্লোক

যে চারিজন মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছিলেন, গম্ভীরানাথ বাবাজী তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। নানকপন্থী সম্প্রদায়ের মধ্যে রঙ্গীয়া বাবা। তিনি নানা বর্ণের বস্ত্রখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত আলখেল্লা পরিধান করিতেন, এজন্য সকলে তাঁহাকে রঙ্গীয়া বাবা বলিত। গরিবদাসী সম্প্রদায়ের দয়ালদাস বাবা। ইনি একজন বিখ্যাত মহাপুরুষ। প্রসিদ্ধ বক্তা ৺কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় ইঁহার শিষ্য। এতদ্ব্যতীত প্রায় দেড় সহস্র নগ্ন (নাগা) আগমন করিয়াছিলেন।

পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বঘটে তাঁহার ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রকে দর্শন করিতেন এবং রামচন্দ্রের মধ্যে সমস্ত মানবজাতি দেখিতে পাইতেন।

"আর একদিন আমার একজন বন্ধু বাবা অর্জ্জুন দাসের সহিত রাজপথ দিয়া গমন সময়ে একজন ইয়ুরোপবাসীকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধু বাবাজির বিশ্ববাসীমানবপ্রেমের পরিমাণ জানিবার জন্য বলিলেন, ও একজন ম্লেচ্ছ। ম্লেচ্ছগণ সকল পদার্থ ও সকল জাতির পান ভোজন করিয়া থাকে। এই কথা শুনিয়া বাবাজীর বদনমণ্ডল বিশ্ববাসীমানবপ্রেমের আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, আমার প্রিয়তম দেবতা রামচন্দ্র,' ইহাদের কি অপ্রমের ভালবাসা! ইহারা সকল নর নারীর সহিত ভোজন করে।

"প্রয়াগে কুম্ভমেলায় আমার এক বন্ধু একদিন দেখিলেন, "পুলিশ আমাকে অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে" এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে বাবাজী (অর্জ্জুন দাস) পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। বাবাজীর এই অবস্থা দর্শন করিয়া আমার বন্ধু অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া-তাঁহাকে বলিলেন, যে পুলিশ আপনাকে প্রহার করিয়াছে, আপনি তাহাকে দেখাইয়া দিন। এই বলিয়া তিনি বাবাজীর সঙ্গে চলিলেন। কিছুদূর গমন করিলে বাবাজী একজন পুলিশ প্রহরীকে দর্শন করিয়া রোদন হইতে বিরত হইলেন। তখন "এই ব্যক্তিই কি আপনাকে প্রহার করিয়াছে" আমার বন্ধু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, হাঁ, এই ব্যক্তিই প্রহার করিয়াছে বটে; কিন্তু এই আমাকে (বাবাজীর নিজের দেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) নহে, অন্য আমাকে"।

দয়ালদাস্ বাবার সাধুসেবা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। তাঁহার আশ্রমে প্রতিদিন বিবিধ উপচারে চারি পাঁচ সহস্র সাধুর সেবা হইত এবং বহুসংখ্যক কাঙ্গালীও ভোজন করিত। তিনি প্রয়াগে উপস্থিত হইলে কানপুর অঞ্চলের এক ধনবান বণিক তাঁহার আশ্রমের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। তিনি যতদিন প্রয়াগে ছিলেন, এই সৌভাগ্যবান্ বণিক তাঁহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ইহাতে বণিকের লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। দয়ালদাসের চড়ায় অবস্থান

"তিনি সর্ব্বভূতে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিতেন। সমস্ত নরনারীর মধ্যে তাঁহার আরাধ্য দেবতা পরমাত্মরূপী ভগবান্ রামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন এবং ভক্তিতে গদগদ হইয়া "রামজী হ্যায়" বলিয়া মুখের নিকট হাত ঘুরাইয়া সকলকে আরতি করিতেন। কুম্ভের স্নানের দিন নাগা সন্ন্যাসিগণ যখন ত্রিবেণীস্নানে গমন করেন, তখন এলাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব অশ্বারোহণে তাঁহাদিগের অনুগমন করিতেছিলেন। খ্যাপাবাবা সাহেবের মধ্যে তাঁহার প্রিয়তম ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে হস্তদ্বারা আরতি করিতে লাগিলেন। সাহেব মহাপুরুষের এই মহৎভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য চাবুক উত্তোলন করিলেন। কিন্তু বাবাজী তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত সাহেবকে আরতি করিতে লাগিলেন। সাহেব তখন বাবাজীর মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিলেন। মহাত্মার এই অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইল। তিনি শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়নে বাবাজীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "আব সাধু হ্যায়, আব মহাত্মা হ্যায়।"

"তিনি বিশ্ববাসী জীবের সুখদুঃখ নিজের সুখদুঃখের ন্যায় অনুভব করিতেন। গোস্বামিমহাশয়ের ন্যায় তাঁহার মহানাত্মাও বিশ্ববাসী সমস্ত প্রাণীর আত্মার সহিত অদ্বয়ত্ব লাভ করিয়াছিল। অপরের দেহে কোন প্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাঁহার নিজের দেহে তাহা অনুভূত হইত।

সময়ে আর একজন ধনবান্ বণিক ষষ্ঠ সহস্র মুদ্রা তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া করোজোড়ে নিবেদন করিল, মহারাজ! আমার এই অর্থগুলি লইয়া সাধুসেবায় ব্যয় করুন। দয়ালদাস বলিলেন, আমার আশ্রমের ব্যয়ভার এক জন গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং আমার এখানে অর্থের কোন প্রয়োজন নাই। এই অর্থ তুমি নিজেই সাধু-সেবায় ব্যয় কর।

দাতা। আমার একান্ত ইচ্ছা যে আমার এই অর্থগুলি আপনি কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। আপনার হাত দিয়া আমার অর্থগুলি ব্যয় হইলে আমি ধন্য হইব।

"তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র বাবাজীর কণ্ঠস্থ। কোন শাস্ত্রের কোন স্থানের একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলে তিনি তাহার পর হইতে আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। এরূপ ঘটনা আমরা বহুবার দেখিয়াছি।

"ভারতের এ ঘোর দুর্দ্দিনেও এই মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও ভারতে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী, পরমহংস রামকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনদাস (খ্যাপাবাবা) বাবাজীর ন্যায় ব্রহ্মকল্প মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া ইহার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। এই স্থানেই ভারতের বিশেষত্ব; অন্যান্য দেশের সহিত ইহার পার্থক্য। ইহাঁর দ্বারাই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভারত কর্ম্মভূমি এবং ভারত ভিন্ন সমস্ত স্থান ভোগভূমি।'

"বাবা অর্জ্জুনদাস গোস্বামিপাদকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার আসনের নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বাবাজী মহাশয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। এইরূপে দর্শন করিতে করিতে তিনি ভাবে গদগদ হইয়া, সাক্ষাৎ রামজী হ্যায়, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহা-প্রভু হ্যায়, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন এবং প্রভুপাদের মুখের কাছে হাত লইয়া তাঁহাকে আরতি করিতেন। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, মহারাজ! আপনি চৈতন্যদেবকে কিরূপে জানিলেন? তিনি বলিলেন—ধ্যানমে! তিনি প্রায়ই গোস্বামিমহাশয়ের প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন।

দয়ালদাস কিছুতেই অর্থ গ্রহণ করিলেন না। ইহারই নাম নিষ্কামভাব। অন্তরে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিলে এরূপ নিষ্কাম ভাব আসিতে পারে না।

আজকালকার শিক্ষিতদলের অনেকে এপ্রকার দানকে অপব্যয় মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ইহাদ্বারা সংসারের কোন স্থায়ী উপকার হয় না। একদিন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় (স্যার পি সি রায়) মহাশয় আমার নিকট দয়ালদাস বাবার আশ্রমের সাধুসেবার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এই অর্থদ্বারা কোন আশ্রম স্থাপন করিয়া নিঃস্ব লোকদিগকে পরিশ্রমের বিনিময়ে ভরণপোষণ করিলে জনসমাজের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইত। এতগুলি অর্থ বৃথা ব্যয় হইল। সংসারের কোন কল্যাণই হইল না। এই প্রকার কথা ঠিক কি না, তাহা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু এ কথা ঠিক যে এই প্রকার সাত্ত্বিক দানদ্বারা দাতার যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়, আশ্রম-স্থাপন করিয়া পরিশ্রমের বিনিময়ে অন্নদানরূপ সকাম রাজসিক দানদ্বারা কদাচ সেরূপ হইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে প্রভুপাদ আশাবতীর উপাখ্যানে বলিতেছেন :—

"যোগী। মা আশাবতী! গঙ্গাতীর দিয়া উত্তরে দৃষ্টি কর; ঐ যে আশ্রম দেখিতেছ, ঐটি মাজীর আশ্রম। চল বরুণা পার হইয়া ঐ আশ্রমে গমন করি।

"আশাবতি—ইহারা তৎপারের পয়সা চাহিল না। তবে ইহাদের কিরূপে সংসার চলে?

যোগী—মা! ইহারা পারের পয়সা লইয়া থাকে। কিন্তু ফকির, বৈষ্ণব, দণ্ডী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগের নিকট পয়সা গ্রহণ করে না। ভারতের যে এত দুর্দ্দশা, রোগ, শোক, দরিদ্রতায় দেশে হাহাকার

উঠিয়াছে, তথাপি প্রাণসম ধর্ম্মকে ছাড়িতে পারিতেছে না। এখনও মুষ্টিভিক্ষা করিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবন ধারণ করিতেছে। শুনিয়াছি ইংরাজেরা এই মুষ্টিভিক্ষা দান করাকে অসভ্যতা বলেন। কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি, এই অসভ্য রীতির অভাবে ইংরাজদের প্রধান সহর লণ্ডন নগরেই দশসহস্রেরও অধিক দুঃখী নিরাশ্রয় ভিক্ষুক পথে পথে রাত্রিদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাক্ষাৎ ভাবে দয়া না করিয়া লোকের প্রাণ নিষ্ঠুর হইয়া যায়। সকলে চাঁদা করিয়া দুঃখীর জন্য দাতব্য আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইল; দুঃখী দেখিলে বলা হইল, দাতব্য আশ্রমে যাও। কিন্তু সেখানকার কর্ম্মচারিদিগের হৃদয়হীন ব্যবহারে দুঃখী সেখানে যাইতে চায় না। সে গেল না, আর আশ্রয় পাইল না। ক্রমে পথে পথে দস্যুতস্কর হইয়া দিনযাপন করে। এরূপ প্রণালীতে লোকের প্রাণ দয়াশূন্য হয়। দুঃখীও নিরাশ্রয় হয়। তথাপি চাঁদাদান সভ্যতা আর সাক্ষাৎভাবে মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা দুঃখীকে আশ্রয়ে রাখা অসভ্যতা; এ দুঃখের কথা বলি কাকে, শুনে কে? ইংরাজ আজ দেশের রাজা, গুরু, আদর্শ। যাহা ইংরাজ বলিবে তাহাই সত্য—বেদবাক্য। এই সকল নৌকার মাঝিমাল্লারা ইংরাজী অনুকরণ শিক্ষা করে নাই, তাই আমরা বিনা পয়সায় পার হইলাম।"

চড়ায় উপস্থিত হইবার পর একদিন শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার গুহ গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, সাধুদিগের নিকট গেলে তাঁহারা আমাদিগের সম্প্রদায় জিজ্ঞাসা করেন। আমরা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারি না। সাধুরা আমাদিগের পরিচয় জানিতে চাহিলে আমরা কি বলিব? তদুত্তরে গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, বলিবে আমরা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়।

গোস্বামিমহাশয় চড়ায় সমুপস্থিত হইয়া প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে সাধুদিগকে পরিক্রমা করিতে বাহির হইতেন। কোন কোন দিন অপরাহ্নেও সাধুদর্শনে যাইতেন। তিনি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে শাস্ত্রালাপ শুনিতেন। তাঁহার সেই বিনয়-নম্র অপূর্ব্ব ছবি দেখিলে মনে হইত যেন উন্নতগ্রীব দর্পোদ্ধত মানবগণের শিক্ষার জন্য "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এই মহাবাক্য মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া ধরাধামে আগমন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে গোস্বামিমহাশয় শেষ রাত্রিতে অল্প সময়ের জন্য শয়ন করিতেন। চড়ায় যাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি আর কখনও শয়ন করেন নাই। সমস্ত দিনরাত্রি আসনে বসিয়া থাকিতেন।

অদ্য উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, মকরের স্নান। প্রাতঃকাল হইতেই স্নানের আয়োজন হইতে লাগিল। একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই অতিশয় ব্যস্ত। পুলিসের আজ আহার নিদ্রা নাই। পূর্ব্বাহ্ন অনুমান আট ঘটিকার সময় মহা সমারোহে সন্ন্যাসিগণ স্নানে বহির্গত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের ঝাণ্ডা (নিশান)। দুই জন উন্নতকায় বলবান নাগা দুইটি ঝাণ্ডা স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। অপর দুইজন নাগা দুই পার্শ্ব হইতে ঝাণ্ডাকে চামর ব্যজন করিতেছেন। ঝাণ্ডার পশ্চাতে মোহান্তগণ মর্য্যাদানুসারে কেহ পাল্কীতে কেহ অশ্বে গমন করিতে লাগিলেন। (১) মোহান্তগণের

(১) শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহাশয় একটী সুসজ্জিত উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া স্নানে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানেও বহুমূল্য পোষাক ছিল।

পশ্চাতে প্রায় দেড় সহস্র ভস্মাবৃতকলেবর জটাজুটধারী দিগম্বর নাগা শ্রেণীবদ্ধভাবে সামরিক রীতিতে ধীরপদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিলেন। কি স্বর্গীয় গম্ভীর দৃশ্য। ক্ষণকালের জন্য মানস পৃথিবীর কথা ভুলিয়া গেল। কৈলাসধামের পবিত্র স্মৃতি সকলের মনে উদিত হইল। ভগবান্ ব্যোমকেশ পাপভারাক্রান্ত ধরাধামের পাপ লাঘব করিবার জন্য যেন কৈলাসধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক দেড় সহস্র মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া ত্রিবেণীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। যাহারা দেখিল ধন্য হইল, পবিত্র হইয়া গেল। নাগাদিগের পশ্চাতে দশনামা সন্ন্যাসিগণ এবং তৎপশ্চাতে সন্ন্যাসিনীগণ গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে সন্ন্যাসিসম্প্রদায় সেতু পার হইয়া সঙ্গমস্থলে গিয়া স্নান করিলেন। সন্ন্যাসিদিগের পরে বৈষ্ণব সাধুদিগের স্নান হইল। অনন্তর নানকপন্থীগণ স্নান করিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায় ইহার পরে স্নান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক গৃহস্থ নরনারীর স্নান হইয়াছিল। সেদিন প্রায় দশ বার লক্ষ লোক ত্রিবেণীতে স্নান করিয়াছিলেন। সে যে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার, মহান্ দৃশ্য, স্বচক্ষে না দেখিলে তাহা ধারণা করিতে পারা যায় না। গোস্বামিমহাশয় বৈষ্ণবসাধুদিগের সহিত স্নান করিয়াছিলেন।

মকরের স্নান করিবার পর গোস্বামিপাদের গুরুদেব তাঁহাকে কুম্ভমেলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চড়া পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন। কাজেই তিনি কুম্ভের স্নানে ত্রিবেণীতে যাইতে পারেন নাই। ত্রিবেণীঘাটে যাইতে হইলে চড়া ছাড়িয়া গঙ্গার পরপারে যাইতে হয়।

সাধুরা প্রথমে গোস্বামিমহাশয়কে তাদৃশ সম্মান করেন নাই। তাঁহারা প্রথমে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের

মধ্যে অনেকেই, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ, তাঁহার বেশ লইয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় আপত্তি গৌরনিতাই স্থাপন লইয়া। এই দুই বিষয় লইয়া সাধুদিগের মধ্যে অতিশয় আন্দোলন চলিতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, আমরা এতকাল চড়াওতে (মেলায়) আসিতেছি, কখনও কোন বাঙ্গালী সাধুকে দেখি নাই। আর এই গৌড়ীয় বাবার বেশভূষাও অদ্ভুত রকমের। না সন্ন্যাসীদের অনুরূপ, না বৈষ্ণবদের মত। ইহাঁর উপর সঙ্গের শিষ্যগণ সকলেই গৃহস্থ। পুত্র, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্রও সঙ্গে। এ কিরূপ সাধু? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। আশ্রমে যে দুই দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও ত পঞ্চ দেবতার মধ্যে কাহারও মূর্ত্তি নহে। ইহা নাকি গৌরনিতাইএর মূর্ত্তি। গৌর নিতাই কে? কোন দেবতার ত এ নাম নাই। আর তিনি যে গৈরিক ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়াছেন, ইহা কি বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য? এই বিষয় মীমাংসার জন্য মহান্তদের এক সভা হইল।

সেই সভায় অমরেশ্বরানন্দ পুরী স্বামী বলিলেন, শাস্ত্রে গৈরিকবস্ত্র বৈষ্ণবলিঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে। অতএব বৈষ্ণবদিগের গৈরিক-বস্ত্র পরিধান করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ত নহেই, বরং পরিধান করাই উচিত। আর বৈষ্ণবদিগের রুদ্রাক্ষধারণের ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। গৌর-নিতাইএর বিগ্রহস্থাপনসম্বন্ধে তিনি বলিলেন, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ নামক স্থানে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ নামে দুই জন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশবাসিগণ তাঁহা-দিগকে কৃষ্ণ ও বলরামের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অবতারত্বের প্রমাণ শাস্ত্রে আছে। আমি যখন ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য নবদ্বীপে গিয়াছিলাম, তখন ইহাঁদিগের

বিবরণ জানিয়াছিলাম। মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদিগের অতিশয় প্রভাব। তাঁহারা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহাদিগের যথারীতি গুরুপ্রণালী আছে। সুতরাং এই গৌড়ীয় বাবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিছুই করেন নাই। অতঃপর কাঠিয়া রামদাস বাবা বলিলেন, এই গৌড়ীয় বাবার ন্যায় সামর্থী সাধু কখনও দেখি নাই। ইনি একজন যথার্থ মহাপুরুষ, পুরা মহাত্মা। পুত্র কন্যা প্রভৃতি সঙ্গে থাকাতে ইঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। মহাদেব বিষ খাইয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন। ইনিও মহাদেবের ন্যায় সামর্থী পুরুষ। ইনি সবই পারেন। ইঁহার সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ নাই। ইনি তাহার অতীত। অগ্নি সব খা সেক্তা হ্যায়। শ্রীযুক্ত ভোলানন্দ গিরি মহাশয়ও গোস্বামিপাদের ভূয়সী সুখ্যাতি করিলেন। ইঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ সন্তুষ্ট হইলেন। সেই হইতে তাঁহারা গোস্বামিমহাশয়কে ভক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যতই তাঁহার সহিত মিশিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন; ততই তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাভক্তি বাড়িতে লাগিল।

মকরের স্নানের পর ২৪শে মাঘ কুম্ভের স্নান হয়। কুম্ভের স্নানে মকরের স্নান অপেক্ষা অনেক অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। সে দিন অনুমান বিংশতি লক্ষ লোক ত্রিবেণীতে স্নান করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব কুম্ভ রাশিতে গমন করিলে স্নান আরম্ভ হইল। মকরের স্নান যে নিয়মে সম্পাদিত হইয়াছিল, কুম্ভের স্নানও সেই প্রণালীতেই সম্পন্ন হইল। ১৩০০ সালের ২৪সে মাঘ প্রয়াগধামে ত্রিবেণী ক্ষেত্রে লোক সমাগমের যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। সে মহান্ দৃশ্য চিরকাল স্মৃতিপটে হিরণ্ময়

উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত থাকিবে। সে যে কি চমৎকার ব্যাপার, চক্ষে না দেখিলে ধারণা করিতে পারা যায় না। মানবভাষার এমন শক্তি নাই যে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণনা করিতে পারে।

গোস্বামিমহাশয়ের চড়ায় অবস্থান সময়ে কয়েকটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম।

এক দিন মধ্যাহ্নসময়ে আহারান্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গোস্বামিমহাশয়ের অন্যতম শিষ্য ৺মহাবিষ্ণু যতি কীর্ত্তন গাইতে লাগিলেন। প্রভুপাদ ভাবে বিভোর হইয়া খানিকক্ষণ নাচিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; এবং অবধূত! অবধূত! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আহ্বানমাত্র এক জন উন্নতকায় উলঙ্গ মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহাপুরুষের এই প্রকার আকস্মিক আবির্ভাবে আমরা সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলাম। আমরা অনেকেই তাঁহার চরণে মস্তক ঠেকাইয়া প্রণাম করিলাম এবং তাঁহার পদরেণু লইয়া মস্তকে দিলাম। তিনি কীর্ত্তনে উপস্থিত হইলে ভাবের বন্যা ছুটিল। গোস্বামিপাদ ভাবে পাগল হইয়া নাচিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবে মাতোয়ারা হইলেন। মহাপুরুষ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন এবং নিত্যানন্দ বিগ্রহের গলার মালা আনিয়া গোস্বামিপাদের গলায় দিয়া অকস্মাৎ অদৃশ্য হইলেন। কিছুকাল পরে কীর্ত্তন শেষ হইল। কীর্ত্তনান্তে মহেন্দ্র নাথ মিত্র গোস্বামিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কীর্ত্তনের সময়ে যে মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন, তিনি কে? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, দয়াল নিতাই দয়া করিয়া দেখা দিয়া সকলকে ধন্য করিয়াছেন।

একদিন রাত্রিতে খিচুড়ি হইয়াছিল। আমি পরিবেশন করিতে

ছিলাম। দিতে দিতে খিচুড়ি নিঃশেষ হইয়া গেল। পরে অভয় বাবু কিছু খিচুড়ি চাহিলেন। আমি বলিলাম আর খিচুড়ি নাই, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। গোস্বামিপাদ নিকটে বসিয়া ভোজন করিতেছিলেন, এ কথা শুনিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, খিচুড়ি নাই,-তোমরা কি খাইবে ?

আমি। কি আর খাইব ?

গোস্বামিপাদ। তোমাদিগের অংশ রাখিলে না কেন ?

আমি। যাঁহারা আহার করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে না দিয়া কি করিয়া রাখিব ?

তখন গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, খিচুড়ির ডেগ আমার কাছে আন। আমি হাঁড়ি উপস্থিত করিলাম। তিনি আমাকে হাঁড়ির গা চাঁছিয়া খিচুড়ি বাহির করিতে বলিলেন। আমি হাঁড়ি চাঁছিয়া অল্প একটু খিচুড়ি বাহির করিলাম। তিনি সেই খিচুড়ি টুকু তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট দেড়খানি লুচির সহিত একত্র করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কয়জন অভুক্ত ?

আমি। তিন জন।

তখন তিনি সেই অল্প পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সমান তিন অংশে বিভক্ত করিয়া আমাদের তিন জনকে আহার করিতে বলিয়া আসনে গেলেন। আমরা (আমি, ৺সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ৺মহাবিষ্ণু যতি) আহারে বসিলাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার! সেই দুই তিন গ্রাস অন্নে আমাদের উদর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আহার করিয়া আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। তখন মহাভারতের দুর্ব্বাসা-ভোজনের কথা আমাদের মনে হইল।

অর্জ্জুন দাসকে (ক্ষেপাচাঁদ) দেখিলে উন্মাদ বলিয়া বোধ হইত।

শাস্ত্রে আছে মহাপুরুষগণ জড়োন্মত্তপিশাচ ও বালকবৎ ব্যবহারদ্বারা সাধারণের নিকট আত্মগোপন করিয়া থাকেন। মহাত্মা অর্জ্জুনদাসও তাহাই করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই উন্মাদের ভাণ করিতেন। তাহাতে সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিত না, উন্মাদ মনে করিত। বাস্তবিক তিনি উন্মাদ ছিলেন না। তিনি এক জন বিদেহ-মুক্ত মহাপুরুষ। তিনি অপর দুই জন লোকসমভিব্যাহারে ব্যোমমার্গে স্বৈরবিহার করিতে পারিতেন। ইচ্ছা করিলে দুই জন লোককে দুই হস্তে ধারণ করিয়া শূন্যপথে অভিলষিত স্থানে গমনাগমন করিতে পারিতেন। অর্জ্জুনদাসের এই অলোকসামান্য ক্ষমতা ছিল। উন্মাদের ছলনাদ্বারা সাধারণের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিলেও গোস্বামি-পাদের নিকট, তিনি আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। প্রভুপাদের দিব্যদৃষ্টির নিকট তিনি তাঁহার অবস্থা ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই। দর্শনমাত্রই গোস্বামিজী তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন রাত্রিতে নির্জ্জনে গোস্বামিমহাশয় অর্জ্জুনদাস বাব-জীকে বলিলেন, মহারাজ! আমি জানিতে পারিয়াছি যে আপনি বিদেহমুক্ত মহাপুরুষ। আপনি দয়া করিয়া আপনার সেই ক্ষমতা আমাকে দেখান। তাঁহার কথায় বাবাজি প্রথমে অস্বীকার করিলেন। পরে গোস্বামিপাদের পীড়াপীড়িতে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে বৃন্দাবন, কাশী, সেতু-বন্ধ, পুরী, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান শূন্যপথে পর্য্যটন করিয়া চড়ায় প্রত্যাগমন করিলেন।

একদিন [illegible] বাবা গোস্বামিপাদের নিকট আসিয়া হঠযোগের কথা বলিতেছিলেন। খ্যাপা বাবা সেখানে বসিয়াছিলেন। তিনি

অনেকক্ষণ বসিয়া বাবার কথা শুনিলেন, পরে বলিলেন, আপ্ ক্যা কসরত কী বাত বোল্‌তে হেঁয়্? গোস্বামিমহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেখ্‌তে নেই সাক্ষাৎ যোগিরাজ হেঁয়। দিন রাত সমাধি মে রহ্‌তে হেঁয়। সিদ্ধ যোগিরাজকো আপ যোগকী বাত বাৎলাতে হেঁয়। খ্যাপা বাবার কথা শুনিয়া রঙ্গিয়া বাবা চুপ করিলেন।

একদিন একটি অল্পবয়স্ক সাধু গোস্বামিপাদের কাছে আসিয়া কিছু ধুনির কাঠ চাহিলেন। গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে কাঠের মূল্য দিতে চাহিলেন। সাধু তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন, আমি টাকা লইব না; আমাকে কাঠ দিন। এই বলিয়া আশ্রমে যে কাঠ ছিল তাহা হইতে কিছু কাঠ চাহিলেন। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, ও কাঠ এখানকার প্রয়োজনের জন্য আনা হইয়াছে। আপনি উহা পাইবেন না। টাকা লইয়া আপনি কাঠ কিনিয়া লউন। এ কথা শুনিয়াও সাধু পুনঃ পুনঃ কাঠ চাহিতে লাগিলেন। গোস্বামিপাদও 'না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ যখন কিছুতেই কাঠ দিলেন না তখন অগত্যা তাঁহাকে টাকা লইতে হইল। কাঠ লইবার জন্য সাধুর এই প্রকার পীড়াপীড়ি করা শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাল লাগে নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে ইনি সাধু হইয়াছেন বটে, কিন্তু বাসনা জয় করিতে পারেন নাই। সাধু চলিয়া গেলে তিনি তাঁহার মনের কথা প্রভুপাদকে বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, ইহাঁর মধ্যে বাসনার লেশ মাত্রও নাই। ইনি সর্ব্বপ্রকার বাসনা ও আসক্তির অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন। তবে যে কাঠের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন, সাধুর কাছে সাধুরা আব্দার করিয়া থাকেন। প্রভুপাদের কথা শুনিয়া সতীশ বাবু বলিলেন, ইহাঁর বয়স ত অল্প, বিশ বাইশ বৎসরের অধিক

বলিয়া বোধ হয় না। এত অল্প বয়সে ইনি এমন সুন্দর অবস্থা লাভ করিয়াছেন। সতীশ বাবুর কথা শুনিয়া গোসাইজী হাসিয়া বলিলেন, ইহাঁকে দেখিতে অল্প বয়স বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহাঁর বয়স অল্প নহে। সতীশবাবু বলিলেন, কত বয়স, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইবে কি? গোস্বামিপাদ বলিলেন, না, বেশী। সতীশ বাবু বলিলেন, তবে আশি নব্বই? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, না বেশী। এই কথা শুনিয়া সতীশ বাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার আর সাহস হইল না। পরে তিনি বলিলেন, তবে ইহাঁকে এত অল্পবয়স্ক দেখাইতেছে কেন? ইহার উত্তরে গোস্বামিপাদ বলিলেন, ইনি বিশ বাইশ বৎসর বয়সে ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছেন। সেই জন্য অল্পবয়স্ক দেখাইতেছে। ঊর্দ্ধরেতা হইলে আর শরীরের ক্ষয় হয় না। সাধক যে বয়সে ঊর্দ্ধরেতা হয়, শরীর বরাবর তদনুরূপই থাকে।

একদিন দাউজীকে দেখিয়া পাহাড়ী নরসিংহ দাস বাবাজী গোস্বামিপাদকে বলিলেন, মহারাজ! ইস্ লড়কেকো হামকো দীজিয়ে। হাম উস্কো চেলা করকে হামারে গুরুজীকে আসনরক্ষা কামমে নিযুক্ত করেঙ্গে। বাবাজীর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ অত্যন্ত তেজের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, আপনি ইহাঁকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? নিশ্চয়ই পারেন নাই। চিনিতে পারিলে কদাচ এ কথা বলিতেন না। আপনার সে চক্ষু নাই। প্রভুপাদের তেজঃপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বাবাজি ভয়ে জড়সড় হইয়া গেলেন। তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি চুপ্ করিয়া রহিলেন। মুখ তুলিয়া গোস্বামিপাদের দিকে চাহিতেও পারিলেন না। মহৎ চরিত্র বুঝা বড়ই কঠিন। এই বাবাজীকে গোস্বামিপাদ বড়ই সম্মান করিতেন।

কিন্তু এখন অন্যপ্রকার ব্যবহার করিলেন। রামচন্দ্র পুরীর প্রতিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ ব্যবহারের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিবৃত হইয়াছে। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হু বিজ্ঞাতুমর্হতি?

মাঘ মাস অতীত হইলে কুম্ভমেলা শেষ হইল। চাঁদের হাট, আনন্দের বাজার ভাঙ্গিয়া গেল। কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবিপিনের ন্যায়, মৃতবৎসা রমণীর বক্ষঃস্থলের ন্যায়, হিমঋতুর আগমনে কমলশূন্য সরোবরের ন্যায়, চড়াভূমি শূন্য হইয়া নীরবে পড়িয়া রহিল। একমাস যাহা দর্শন করিলাম, যাহা ভোগ করিলাম, কিসের সহিত তাহার উপমা দিব? পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। জগতে তাহা অতুলনীয়। স্বর্গে আছে কি? যে সুখ ভোগ করিলাম, আর তাহা জীবনে ঘটিবে কি?

কুম্ভমেলা ভাঙ্গিয়া গেলে সাধুগণ পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া দেশদেশান্তরে স্ব স্ব আশ্রমে চলিয়া গেলেন। গোস্বামিমহাশয় সহরে প্রত্যাগমন করিলেন। পাহাড়ী বাবাও গোস্বামিপাদের সহিত আসিয়া তাঁহার নিকটে রহিলেন।

প্রয়াগে মাধবদাস বাবাজী নামে এক জন বাঙ্গালী সাধু বাস করিতেন। তিনি একজন মহাপুরুষ। প্রয়াগের আপামর সাধারণ সমস্ত লোক তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিত। তিনি গোস্বামিমহাশয়ের সতীর্থ। তাঁহাকে প্রভুপাদ অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। গোস্বামিপাদ মধ্যে মধ্যে তাঁহার আশ্রমে যাইতেন। বাবাজীর গুরুদেব তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি কোথাও যাইতেন না। চড়ায় গিয়া কুম্ভমেলা দর্শন করিলে গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে, এই কারণে তাঁহার মেলা দেখা হয় নাই। গোস্বামিপাদ তাঁহার আশ্রমে যাইতেন কিন্তু

তিনি প্রভুপাদের আশ্রমে আসিতে পারিতেন না এজন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেন। তাঁহার কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিতেন এজন্য আপনার ক্ষমা চাওয়া কেন? গুরুআজ্ঞা কি করিয়া লঙ্ঘন করিবেন? বাবাজী মহাশয় একদিন সশিষ্য গোস্বামিপাদকে নিমন্ত্রণ করিয়া অতিশয় যত্নপূর্ব্বক বিবিধ উপচারে ভোজন করাইয়াছিলেন।

এই সময়ে সা সাহেব নামে একজন মুসুলমান ফকির প্রয়াগে বাস করিতেন। তিনিও একজন মহাপুরুষ ও গোস্বামিমহাশয়ের সতীর্থ। তাঁহার ধর্ম্মমত অতিশয় উদার ছিল। এক দিন তিনি আমার হাতে একখানি রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন এবং অনেকক্ষণ দর্শন করিয়া মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "দেখ বাবা! যো বৃন্দাবনমে গৌ চরায়া, ওহি" (মহম্মদ) "আরবদেশমে বকরী চরায়া।"

গোস্বামিমহাশয়ের শিষ্যদিগকে গুরুভক্তি বিষয়ে তিনি একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি একটি আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল;—

পারস্যদেশে রহিম ও ছলিম নামে দুইটি যুবক বাস করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অতিশয় সৌহৃদ্য ছিল। একদিন তাঁহারা গুরু-অন্বেষণে বাহির হইলেন। গুরুকরণ সম্বন্ধে রহিমের এই নিয়ম থাকিল যে যিনি তাঁহাকে ধরিবেন, তাঁহাকেই তিনি গুরুপদে বরণ করিবেন। ছলিম নিয়ম করিলেন যে তিনি দেখিয়া শুনিয়া গুরু ঠিক করিয়া লইবেন। এইরূপে দুইবন্ধু চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে এক কুলগাছের কাঁটায় রহিমের কাপড় আটকাইয়া গেল। তিনি সেই কুলবৃক্ষকেই গুরুপদে বরণ করিয়া সেইস্থানে বসিলেন, এবং

বন্ধুকে বলিলেন, ভাই! আমার গুরুলাভ হইয়াছে। ইনি আমাকে ধরিয়াছেন, কাজেই ইনিই আমার গুরু। ছলিম বন্ধুর বাক্য শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তাঁহার মনে হইল এ ব্যক্তির মাথার দোষ হইল নাকি? নতুবা কুলগাছকে গুরু বলিবে কেন? এই মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই বন্ধুকে ফিরাইতে পারিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

রহিম কুলগাছের কাছে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা ও কঠোর তপস্যায় ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি সিদ্ধি লাভ করিলেন।

কিছুদিন পরে কুলগাছটি মরিয়া গেল। গুরুদেব দেহত্যাগ করিলেন মনে করিয়া রহিম বৃক্ষটিকে সমাধিস্থ করিলেন। তথায় এক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। রহিমের তপস্যাপ্রভাবে চতুর্দ্দিক হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় রাশি রাশি অর্থ আসিতে লাগিল। প্রতিদিন সহস্র সহস্র সাধু ও দীনদুঃখী অন্ন পাইতে লাগিল।

এ দিকে ছলিম বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া গুরু অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও মনোমত গুরু খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন তিনি নিরাশ হইয়া ভগ্নচিত্তে রহিমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বহু দিন পরে প্রিয়তম বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া রহিম অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, বন্ধু বহু অনুসন্ধান করিয়াও গুরুলাভ করিতে সমর্থ হন নাই, তখন তাঁহার মনে অতিশয় ক্লেশ হইল।

ছলিম রহিমের অতুল ঐশ্বর্য্য ও অসামান্য প্রভাব দেখিয়া ঈর্ষাযুক্ত হইলেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! তুমি এত ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইলে? রহিম বলিলেন, এ সমস্তই আমার গুরুদেবের প্রসাদাৎ।

ছলিম। সেই কুল গাছ ত তোমার গুরু ?

রহিম। হাঁ, তোমার নিকট তিনি কুলগাছ হইতে পারেন ; কিন্তু আমার নিকট তিনি আমার পরমারাধ্য ইষ্টদেবতা। তুমি আমার ইষ্টদেবতার সম্বন্ধে কোন কথা বলিওনা।

রহিমের এই বাক্য শুনিয়া ছলিম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজার নিকট যাইয়া 'রহিম পৌত্তলিক উপাসনা করিতেছে' বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন। রাজা ছলিমের অভিযোগ শুনিয়া রহিমের আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং গোরস্থান খনন করিতে আদেশ দিলেন। রাজআজ্ঞায় গোরস্থান খনিত হইবামাত্র সেই স্থান হইতে এক মহাপুরুষ বাহির হইয়া রোষারুণনেত্রে রাজাকে বলিলেন, "কি, তোমার এতবড় স্পর্দ্ধা যে ভক্তের অপমান কর ? যাহা হউক আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি অচিরে এই অবিশ্বাসী নাস্তিকের প্রাণবধ কর। রাজা মহাপুরুষের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছলিমের প্রাণদণ্ড করিলেন। গুরুভক্তের জয় হইল।

কুম্ভমেলার অবসানে গোস্বামিমহাশয়ের এলাহাবাদ নগরে আসিবার পর ১৫ই ফাল্গুন নবদ্বীপনিবাসী শ্রীমান্ বাণীতোষ বাগ্‌ছির সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমসখীর বিবাহ হয়। গোস্বামি-মহাশয় যে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বিবাহে তিনি তাহা প্রথমে প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি একথা কাহাকেও বলেন নাই। বিবাহের দিন সকালবেলা পুরোহিত মহাশয় গোস্বামি-মহাশয়ের গৈরিক বসন ও জটাভার দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি মৃত কি জীবিত ? উত্তরে গোস্বামিপাদ বলিলেন, আমি মৃত। তখন পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, তবে ত বিবাহের কোন কার্য্যই আপনার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না। গোস্বামি-

পাদ বলিলেন, না, আমারদ্বারা বিবাহের কোন ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হইবে না। পাত্রীর ভ্রাতা বিবাহের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি মৃত এ কথার অর্থ কি, আর আপনার দ্বারা বিবাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে না কেন? ইহার উত্তরে গোস্বামিপাদ বলিলেন, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। নিজের শ্রাদ্ধ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়, এজন্য সন্ন্যাসিগণ মৃত। তাঁহাদিগের গার্হস্থ্য আশ্রমের কোন ক্রিয়া করিবার অধিকার নাই। তখন শিষ্য বলিলেন, কই আপনার সন্ন্যাসগ্রহণের কথা ত কেহ জানে না। আপনি কবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, গয়াতে পরমহংসজীর কৃপালাভের কিছুদিন পরে তিনি আমাকে কাশীতে যাইয়া পরমহংস হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বলেন। তাঁহার আদেশে আমি কাশীতে যাইয়া স্বামিপাদের নিকট যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করি। এতদিন প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই, তাই প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাজেই প্রকাশ করিতে হইল। এই বিবাহ হিন্দুমতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গোস্বামিপাদের অন্যতম জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর এই বিবাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তাঁহার কোন অনুরাগী উদাসীন শিষ্যের মুখে শুনিয়াছি, যাঁহার সঙ্গে কন্যার বিবাহ স্থির হয় কন্যার তাঁহার প্রতি অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ হওয়ায় এবং কন্যাটি হিন্দুভাবে প্রতিপালিত হওয়ায় গোঁসাই হিন্দু সমাজের ছেলের সঙ্গে এই বিবাহ দিতে সম্মতি দান করেন।" বঙ্ক বাবুর এই কথা সর্ব্বৈব প্রামাদিক। ইহার মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই। উদাসীন শিষ্য তাঁহাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

গোস্বামিপাদ আজীবন ব্রাহ্ম ছিলেন—করমহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে প্রভুপাদের জীবনের অনেক সত্যঘটনা গোপন ও অনেক অসত্য ঘটনার সমাবেশ করিতে হইয়াছে। তিনি যদি সাম্প্রদায়িকতার রঙ্গিল চসমা না পরিয়া নিরপেক্ষভাবে প্রভুপাদের জীবনী লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে এরূপ করিতে হইত না। আমরা কর বাবুকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্ম ষোল আনা প্রতিপালন করিয়া চলেন, তাঁহারা কি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইয়া পরে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শিখাসূত্র ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ করেন? প্রেমসখীর বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। উদাসীন ভক্ত তাঁহাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার সাম্প্রদায়িক মতের পোষক হওয়াতে তিনি অবিচারে ইহা গ্রহণ করাতে সত্যের অপলাপ দোষে তাঁহাকে দুষ্ট হইতে হইয়াছে। কেবল উদাসীন ভক্তের কথায় বিশ্বাস না করিয়া প্রভুপাদের স্বজনগণের নিকট এ বিষয়ে তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত ছিল।

বিবাহান্তে গোস্বামিমহাশয় শ্রীগৌরপাদে কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার কলিকাতা আগমন উপলক্ষে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি শিষ্যগণসহ রেল গাড়ীতে চড়িয়াছেন, এমন সময়ে সা সাহেব ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গাড়ির নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অন্য গাড়িতে চড়িবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। সা সাহেবের কথা শুনিয়া প্রভুপাদ সদলে গাড়ি পরিবর্ত্তন করিলেন। গাড়ি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। হুগলীর নিকটবর্ত্তী মগরা ষ্টেসনে অপর এক গাড়ির সহিত এই ট্রেনের ভয়ানক সংঘর্ষণ হইল এবং

যে গাড়িতে গোস্বামিপাদ প্রথমে উঠিয়াছিলেন, সেই গাড়ি খানি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। প্রভুপাদ যে স্থানে বসিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ-বংশীয় এক জন গোস্বামিপ্রভু সেইস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত বহু লোক আহত হইল। তখন সা সাহেবের নিষেধবাণীর মর্ম্ম পরিগ্রহ করা গেল। গোস্বামিপাদ বলিলেন, সা সাহেব দিব্য দৃষ্টি দ্বারা এই ভাবী বিপদ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই তিনি আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার জন্তই আমরা এই বিষম বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম। প্রভুপাদও এ ব্যাপার পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, কেবল সা সাহেবের প্রভাব প্রচারের জন্তই তিনি যেন কিছু জানেন না এইরূপ দেখাইয়াছিলেন।

বৃন্দাবন ও মণীবাবু প্রভৃতি অনেকগুলি লোক গোস্বামিমহাশয়কে আনিবার জন্ত হাওড়া ষ্টেসনে গিয়াছিলেন। গাড়ি সময় মত আসিল না, অযথা বিলম্ব হইতে লাগিল দেখিয়া তাঁহারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা যখন জানিলেন যে গাড়িতে গাড়িতে সংঘর্ষণ হওয়ায় যথাসময়ে গাড়ি ষ্টেসনে উপস্থিত হইতে পারে নাই, তখন তাঁহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে অস্থির হইয়া তাঁহারা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। যে গাড়ি সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আসিবার কথা, তাহা রাত্রি একটার সময় হাওড়ায় আসিল। মণী বৃন্দাবন প্রভৃতি গোস্বামিপাদ এবং অন্ত সকলকে সুস্থ ও অক্ষত শরীর দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহারাই গোস্বামি-পাদের বাসের জন্ত ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজের বাড়ী ভাড়া করিয়া-ছিলেন। গোস্বামিপাদ সশিষ্যে সেই বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি রাখাল বাবুর বাড়ীতে গমন করেন।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
(প্রয়াগে কুম্ভমেলার পর কলিকাতায় অবস্থানকালে)

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## কালকাতায় অবস্থান, বৃন্দাবন গমন

## ও

## ঢাকায় শেষ ধূলট

রাখাল বাবুর বাড়িতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মমহোৎসব দেখিবার জন্য প্রভুপাদ নবদ্বীপে গমন করেন। কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। ১৩০০ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতেও চন্দ্রগ্রহণ হয়। এই জন্য সে বৎসর নবদ্বীপে অতিশয় সমারোহের সহিত মহাপ্রভুর জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল। গোস্বামিপাদ নবদ্বীপে গেলে স্বর্গীয় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ৺মথুরানাথ পদরত্ন তাঁহাকে তাঁহার টোলবাড়িতে অতি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন।

গোস্বামিমহাশয় নবদ্বীপে যাইয়া শিষ্যগণকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে তোমরা যখন ঠাকুর বাড়ীতে যাইবে তখন মনোযোগ দিয়া ঠাকুর দেখিও। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই দর্শনে গিয়া মনোযোগের সহিত ঠাকুর দেখিতেন। তাঁহারা যখন বিগ্রহের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহারা দেখিতেন যে ক্ষণে ক্ষণে বিগ্রহের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর দেবমূর্ত্তি সকল তাঁহাদের নিকট সজীব বলিয়া বোধ হইত। এ কথা তাঁহারা গোস্বামিপাদকে বলিলে, তিনি বলিতেন এই জন্যই ত তোমাদিগকে মনোযোগ দিয়া ঠাকুর দেখিতে বলিয়াছি।

গোস্বামিমহাশয় একদিন ৺বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু দেখিয়া ৺মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত নূতন মহাপ্রভু দেখিতে যান। তথায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুর দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল। সেই অবস্থায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, "ঐ দেখ্, হাঁপাচ্ছে"। বিগ্রহের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "চুপ কর্, হাঁপাস্‌নে, দেবে আমি বলে দেবো, সোনার বালা ও নূপুর দেবে"। তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলে বিগ্রহের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে যথার্থই বিগ্রহ নাড়তেছে। চক্ষুতে পলক পড়িতেছে এবং বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতেছে। বুক কাঁপার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মালা নড়িতেছে। অনন্তর গোস্বামি-মহাশয় ঝাড়লণ্ঠনশোভিত নাট্যমন্দিরে আসিয়া সেইরূপ ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন, "ভেঙ্গে ফেল্ সব ঝাড় লণ্ঠন। তোরা ধন্য হয়ে গেলি, এখানে যারা উপস্থিত, তাহারাও ধন্য হয়ে গেল। সোনার নূপুর বালা দিবি ত দে, যে ছেলে এনেছিস্ হাঁড়িকুঁড়ি সব ভেঙ্গে ফেল্‌বে"। এই বলিয়া তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। পথে চলিতে চলিতে ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন, "আমরা দর্শন করিয়া যেমন বাহির হইয়াছি, অমনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়াছে। তপ্ত বালি, তাই ছুটে ছুটে লাফাতে লাফাতে এসেছে।" এই বলিয়া তিনিও কিছুদূর লাফাতে লাফাতে গমন করিলেন।

উৎসবান্তে তিনি শান্তিপুরে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার অন্যতম শিষ্য সাধুচরিত্র সত্যকুমার গুহ উদরাময় রোগে দেহত্যাগ করেন। শান্তিপুরে কয়েক দিন থাকিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন।

ইহার কয়েক দিন পরে প্রেমসখী শ্বশুরালয় হইতে আইসে। কলিকাতায় আসিবার পরই তাহার জ্বর হয়। সেই জ্বর ক্রমে ঘোরতর জ্বরবিকারে পরিণত হয়। সুযোগ্য ডাক্তার নবীনচন্দ্র ঘোষ চিকিৎসা

করিতেছিলেন। নবীন বাবুর অজ্ঞাতসারে প্রেমসখীর ভাসুর রাম যাদব বাগ্‌ছি অধিক মাত্রায় এণ্টিফেব্রিন্ নামক ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন। তাহাতে রোগীর অত্যন্ত ঘাম হইতে লাগিল। সে ঘাম কিছুতেই বন্ধ হইল না। তাহাতেই প্রেমসখীর মৃত্যু হইল। অনেকের বিশ্বাস রাম যাদব বাবু মন্দ অভিসন্ধিতে অধিক মাত্রায় এণ্টি-ফেব্রিন্ সেবন করাইয়াছিলেন।

প্রেমসখীর যখন আসন্নকাল উপস্থিত, মৃত্যু তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহুবিস্তার করিয়াছে, সেই সময়ে গোস্বামিমহাশয় আসন হইতে তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগীর গৃহে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলে তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। কিছুকাল নৃত্য করিয়া তিনি রোগীর মস্তকে চরণ অর্পণ করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অলক্ষিত কোন ব্যক্তিকে প্রেমসখীর আত্মা লইয়া যাইবার জন্য হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গোস্বামিমহাশয়ের প্রতি লোমকূপ দিয়া জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া গৃহ আলোকিত করিল। অনন্তর গোস্বামি-মহাশয় কন্যার দেহ সংকার করিবার আদেশ দিয়া আসনে গেলেন। আসনে বসিয়া বলিলেন, 'আমি ভজনকরিতে ছিলাম, এমন সময়ে প্রেমসখীর গর্ভধারিণী আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, কুতু যাইতেছে তুমি একবার তাহার কাছে যাও। আমি যাইয়া দেখি কুতু দেহ হইতে বাহির হইয়া শরীরের উপরিভাগে অবস্থান করিতেছে। তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য ভগবান্ গোবিন্দ, রাধারাণী ও সখীগণকে সঙ্গে লইয়া আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রেমসখীকে লইয়া যাইবার জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করিলে আমি

হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া অনুমতি প্রদান করিলাম। তখন প্রেমসখীর জননী তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। গোবিন্দজী তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রেমসখীর পীড়ার সময় গোস্বামিমহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, এবার কুতুবুড়ী বাঁচিবে না। এই পীড়াতেই মারা যাইবে। তবে তোমরা চিকিৎসার ত্রুটী করিও না।

একদিন বৈকালবেলা আমরা সকলে গোস্বামিপাদের ঘরে বসিয়া আছি। নানা কথা হইতেছে। রাখাল বাবু তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছেন। ইহলোক ও পরলোকের কথা উঠিলে তিনি পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, "তোমরা দেখিতেছ আমি তোমাদের মধ্যে বসিয়া কথা বলিতেছি। আমি কিন্তু সর্ব্বদাই পরলোকে থাকি। পরলোকের সহিতই আমার যোগ। ইহলোকের সহিত আমার যোগ নাই বলিলেও চলে। পরলোকবাসিগণ এবং দেবতারা সর্ব্বদাই আমার কাছে আসিয়া আলাপ, আমোদপ্রমোদ করেন।" এই বলিয়া তিনি রাখাল বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই এতক্ষণ তোমার পরলোকগতা পত্নী ও দুই কন্যা আমার কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। এই মাত্র তাহারা চলিয়া গেল। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া রাখাল বাবুর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পরে পরলোকগত শিষ্য সত্যকুমার গুহের পত্নী কলিকাতায় আসিলেন। পতিশোকে তিনি তখন একান্ত কাতর। গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। তাঁহার প্রবোধবাক্যে শোকবিধুরা বিধবার শোকভার যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। অতঃপর সত্যকুমারের স্ত্রী গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, আপনি যদি

অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার একখানি ছবি তুলিয়া কাছে রাখি। আপনার ছবি দেখিলে আমার শোকজ্বালা অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। শোকার্ত্তা রমণীর কাতর প্রার্থনায় তিনি অসম্মত হইতে পারিলেন না। তখন বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নীলমাধব দে গোস্বামিমহাশয়ের বাসস্থানে আসিয়া তাঁহার ছবি তুলিয়া লইলেন। সত্যকুমারের স্ত্রী তাহার একখানি লইয়া নিজের কাছে রাখিলেন। অতঃপর তিনি আর তাঁহার ছবি তুলিতে দেন নাই। ছবি তুলিবার কথা তুলিলে তিনি বলিতেন, আমি তৃণ হইতেও হীন; আমার ছবি আবার তুলিতে হয়। ছি! ছি! ছি!! দেশে সহস্র সহস্র মহাপুরুষের চিত্র রহিয়াছে। তাহা দেখ, ঘরে রাখ। একবার রাখাল বাবু তাঁহার অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারের দ্বারা তাঁহার মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইতেছিলেন। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং রাখাল বাবুকে নির্ম্মিত মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলিলেন। এই জন্য পরবর্ত্তী সময়ের তাঁহার আর কোন প্রতিমূর্ত্তি রাখিতে পারা যায় নাই।

তিনি লিখিয়াছেন, "অত্যন্ত লজ্জাজনক, ধূলি, কীট অপেক্ষাও এই নশ্বর দেহের এত গুমান কেন? পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া পাঁচ জনের পরামর্শে যে ছবি উঠান হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে অপরাধ বলিয়া বোধ হইতেছে। মুখে বিনয় করিয়া ফটোগ্রাফ্ তোলা ঘোর কপটতা।"

রাখাল বাবুর বাড়ীতে কয়েকমাস বাস করিবার পর তিনি কম্বলীটোলায় একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় উঠিয়া যান। যে জন্য তিনি এই বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম। দাউজীর জ্বর হইয়াছিল। জ্বরের সময় তাহার গায়ে এক-

খানি লাল কাপড় ছিল। জ্বর ছাড়িবার সময় যখন তাহার ঘাম হয়, তখন লাল কাপড়ের রং তাহার গায়ে লাগিয়া যায়। তাহার গা লাল দেখিয়া তাহার হাম হইয়াছে বলিয়া রাখাল বাবুর সন্দেহ হয়। এইজন্য তিনি ভীত হইয়া গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, দাউজীর হাম হইয়াছে, আমার ইচ্ছা যে সে তাহার মাতার সঙ্গে কিছু কাল অন্য বাড়ীতে থাকুক; পরে ভাল হইলে আবার এ বাড়ীতে আসিবে। তাহাদিগের স্বতন্ত্র থাকিবার বন্দোবস্ত আমি করিয়া দিতেছি। গোস্বামিমহাশয় রাখাল বাবুর এ কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে থাকিব না। উহারা স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিবে, আর আমি এখানে থাকিব, ইহাতে আমি সম্মত নহি। দাউজীর পীড়ায় আপনাদের ভয় হইয়াছে, এ অবস্থায় আর এখানে আমাদের থাকা উচিত নহে। এই বলিয়া তিনি সেই দিনই কম্বলীটোলায় চলিয়া গেলেন।

কম্বলীটোলায় অবস্থানসময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি লোক প্রভুপাদকে বিষ খাওয়াইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া হিন্দু হওয়াতে ব্রাহ্মগণ সকলেই অত্যধিক তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করাতে সমাজের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। এজন্য কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহার উপর জাতক্রোধ হন। তাঁহারাই পরামর্শ করিয়া বিষপ্রয়োগ করেন। গোস্বামিপাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে একজন ব্রাহ্মের বাড়ী ছিল। নিকটে থাকেন বলিয়া বিষপ্রদান কার্য্যের ভার ইহারই উপর পড়ে। ইনি সন্দেশের সহিত বিষ মিশাইয়া দাসীর হস্তে প্রভুপাদের কাছে পাঠাইয়া দেন। গোস্বামিপাদ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে চাকরাণী সেই সন্দেশ লইয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্তে দিল।

প্রভুপাদ সন্দেশ খাইলেন। পরে প্রস্রাব করিবার জন্য বারান্দায় গিয়া তিনি এই ব্যাপার জানিতে পারিলেন। সন্দেশ দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেলে ব্রাহ্ম বাবু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধুকে সন্দেশ দিয়াছিস্? ঝি বলিল, দিয়াছি। ব্রাহ্ম বলিলেন, সাধু সন্দেশ খাইয়াছে? ঝি বলিল, খাইয়াছেন: ঝির কথা শুনিয়া ব্রাহ্মপুঙ্গব দন্তবিকাশ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, এইবার ঠিক হইয়াছে। এইবার চাঁদকে আর বাচিতে হইবে না। যেমন কর্ম্ম তার উপযুক্ত ফল হইয়াছে। যেমন আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এইবার তার উচিত শাস্তি হইল। বাবুর এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ঝি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, তুমি এ কথা বলিতেছ? সন্দেশ খাইয়া মরিবে কেন গো? তবে কি সন্দেশের সঙ্গে বিষ দিয়াছ?

বাবু। দিব না? বেটা আমাদের সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। উহার মৃত্যু না হইলে আমাদের গায়ের জ্বালা মিটিবে না।

বাবুর এই ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া ঝি কাঁদিতে লাগিল। পরে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিল, তোমরা সর্ব্বদা ধর্ম্মের কথা বল, ঈশ্বর ঈশ্বর কর, আর তোমাদিগের এই কাজ? তোমরা ত অতি ভয়ঙ্কর লোক? তোমরা কসাই, নরহন্তা দস্যু। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। তুমি আমার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিলে। তিনি সাক্ষাৎ মহাদেব, আমি তাঁহাকে বিষ প্রদান করিলাম। আমার ত নরকেও স্থান হইবে না। তোমার মনে এই ছিল! তবে এ কথা নিশ্চয় জানিও, তুমি তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি যদি সতীমায়ের গর্ভে জন্মিয়া থাকি, তাহা হইলে বিষ তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। তোমারই, সর্ব্বনাশ হইবে। তোমার ন্যায় নরহন্তা দস্যুর বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও আমি থাকিব না। এই বলিয়া

পরিচারিকা প্রস্থান করিল। প্রস্রাবে বসিয়া গোস্বামিমহাশয় এই ব্রাহ্মপরিচারিকাসংবাদ সমস্তই শুনিলেন। প্রস্রাব করিয়া উঠিয়া দাড়াইবামাত্র তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল। সমস্ত শরীরে তখন বিষের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে আসনে আনা হইল। শয্যাগত হইয়া তিনি ১৪।১৫ দিন অতিশয় ক্লেশ পাইলেন। এই সময়ে আমানি ভিন্ন তিনি আর কিছুই খাইতে পারিতেন না। অতঃপর তিনি সুস্থ হইলেন। অর্জ্জুনদাস বাবাজী (ক্ষেপাচাঁদ) এই সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় গোস্বামিপাদ সহজে ও সত্বরে আরোগ্য-লাভ করেন। এইরূপে ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রাণ-বিনাশের জন্য অনেকবার চেষ্টা করিয়াও ভগবানের কৃপায় সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। যাহারা সাম্প্রদায়িকতার কুহকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য ভুলিয়া নরহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হয়, তাহারা মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক। হিংস্রপ্রকৃতি ব্যাঘ্র ও বিষধর সর্পও সেই সকল নরাধম অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। তপস্যা ও সাধুতার প্রভাবে সাপ বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকলও তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ হিংসা ভুলিয়া গিয়া সাধু, ভক্ত মহাপুরুষদিগের অনুগত হয়। পূর্ব্বকালে ঋষিদিগের আশ্রমে অহিনকুল, ব্যাঘ্রহরিণ, বিড়ালমূষিক প্রভৃতি প্রাণিগণ আপনা-দিগের স্বভাবসিদ্ধ হিংসা ভুলিয়া গিয়া বন্ধুভাবে একত্রে বাস করিত, শাস্ত্রে বহু স্থানে এ কথা লিখিত আছে। গোস্বামিপাদের তপস্যা ও সাধুতার প্রভাবেও হিংস্র জন্তুসকল তাঁহার অনুগত হইয়াছে। হিংস্র কৃষ্ণসর্প তাহার স্বভাবসিদ্ধ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া কখনও তাঁহার স্কন্ধে, পৃষ্ঠদেশে, ক্রোড়ে ও মস্তকে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিয়াছে এবং কখনও আবার পদতলে পড়িয়া দৈন্য প্রদর্শন করিয়াছে।

কিন্তু নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ, মতপার্থক্যের জন্য নির্বৈর মহাপুরুষের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না।* এই ঘটনার অল্প দিন পরেই গোস্বামিপ্রভু কম্বলীটোলা পরিত্যাগ করিয়া সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ১৪।২ নং বাড়ীতে আগমন করেন।'

এই বাড়ীতে তিনি অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীর ঠিক দক্ষিণের বাড়ীতে একজন মদ্যপায়ী বাস করিত। সে ব্যক্তি কলিকাতার কোন বড় জমীদারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। বাবু অতিশয় হরিনামবিদ্বেষী ছিল; হরিনাম শুনিলে তাহার গাত্রদাহ উপস্থিত হইত। গোস্বামিমহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিদিন সায়ংকালে হরিসংকীর্ত্তন হইত; ইহাতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। হরিনামের পবিত্র ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহার দুঃসহ কর্ণপীড়া উপস্থিত হইত। বাবু কয়েক দিন বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, হরিনামের কোলাহলে তাহার বড়ই ক্লেশ ও নিদ্রার অতিশয় ব্যাঘাত হইতেছে। অতএব কীর্ত্তন যেন বন্ধ করা হয়। তাহার এই অন্যায় প্রস্তাব গোস্বামি-মহাশয় শুনিলেন না। ইহাতে সে মহাক্রুদ্ধ হইয়া বাড়ীওয়ালাকে বলিল যে আপনি পাশের বাড়ীতে যে ভাড়াটিয়া বসাইয়াছেন, তাহার অত্যাচারে আমার অত্যন্ত অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা সর্ব্বদাই চীৎকার ও গোলযোগ করে; ইহাতে আমার অতিশয় উদ্বেগ বোধ হয়; রাত্রিতে আমরা ঘুমাইতে পারি না।

বাড়ীওয়ালা। তাঁহারা কি গোলযোগ করেন? তাঁহারা ত

* এই বিষপ্রয়োগব্যাপারে সাধারণ সমাজের প্রধান ব্যক্তিদের কেহ কেহ লিপ্ত ছিলেন। প্রভুপাদ পুরীতে এ কথা বলিয়াছিলেন।

গোল করিবার লোক নহেন। গোস্বামিমহাশয় পরম ধার্ম্মিক—মহাপুরুষ।

ভদ্রলোক। ভারি ধার্ম্মিক! হরি বলিয়া চীৎকার করিলেই বুঝি ধার্ম্মিক হয়, মনে মনে হরিনাম করিলে বুঝি হওয়া যায় না। ও কেবল ব্যবসা ফাঁদিবার ফিকির। ধর্ম্ম করিতে হয়, মনে মনে করিলেই পারে। চীৎকার করিয়া পাড়ার লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করা কেন? যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে গণ্ডগোল করিতে নিষেধ করিয়া দিবেন।

বাড়ীওয়ালা। মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি হিন্দুসন্তান হইয়া তাঁহাদিগকে হরিনাম করিতে নিষেধ করিতে পারিব না।

ভদ্রলোক। তাহা হইলে আমি উহাদিগের উপর অত্যাচার করিব। উহাদিগের বাড়ীতে গোহাড় ফেলিব।

বাড়ীওয়ালা। বটে! আপনি কি মনে করেন যে দেশ অরাজক? আপনি অত্যাচার করিলে তাহার কোন প্রতীকার হইবে না?

ভদ্রলোক। তবে আর এক কাজ করুন। আপনি উহাদিগকে উঠাইয়া দিয়া ওবাড়ীটাও আমাকে ভাড়া দিন।

বাড়ীওয়ালা। আপনার অসুবিধা হইলে আপনি উঠিয়া যাইতে পারেন। আমার বাড়ী খালি থাকিবে না। অনেক ভাড়াটিয়া জুটিবে। আপনার ব্যবহারে আমি অবাক্ হইয়াছি। হিন্দুর সন্তান, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ছেলে, হরিনাম শুনিতে পারে না, ইহা ত কখনও শুনি নাই। যাহা হউক, আপনি গোস্বামিমহাশয়ের উপর কোন অত্যাচার করিবেন না। বাড়ীওয়ালার কাছে সুবিধা না পাইয়া লোকটি প্রকাশ্যভাবে গোস্বামিপাদের উপর অত্যাচার করিতে

সাহস পাইল না; কিন্তু গোপনে উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাহাদের এবং প্রভুপাদের রান্নাঘরের ধূম নির্গত হইবার পৃথক চিম্‌নি ছিল না, এক চিম্‌নি দিয়াই দুই রান্নাঘরের ধূম বাহির হইত। বাবুর দশএগার বৎসরের একটি কন্যা ছিল। বাবু প্রভুপাদের রান্না ঘরে কুল্‌কুচা জল ফেলিতে কন্যাটিকে শিখাইয়া দেন। পিতার উপদেশে বালিকা গোস্বামিপাদের রান্নাঘরে কুল্লোল, নিক্ষেপ করে। সে সময়ে রান্না হইতেছিল। জল পাকের স্থালীতে পড়িয়াছিল। গোস্বামিপাদের পাচক ইহা জানিতে পারে নাই। কাজেই প্রভুপাদ ও তাঁহার আশ্রমের সকলকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হইয়াছিল। ভগবান্ অচিরে এই দুষ্কর্ম্মের দণ্ডপ্রদান করিলেন। মনিবের কাজে বাবুকে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে অতিরিক্ত সুরাপান করাতে তাহার মৃত্যু হয়। বাবুর মণিব তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাহার শব বাক্সে বন্ধ করিয়া কলিকাতায় আনিতে আদেশ দেন। মণিবের আদেশে অস্পৃশ্য জাতীয় লোকে সেই শব কলিকাতায় আনয়ন করিল। পরে তাহা দাহ করা হইল। মহদ্‌ব্যতিক্রমের ফল সদ্য সদ্য ফলিল। বাড়ীওয়ালার স্ত্রীর কাছে মৃত বাবুটির স্ত্রী, জল ফেলার কথা বলাতে ইহা জানিতে পারা যায়।

ইহার কিছুদিন পরে ইহারই অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। এরাক্কি কোম্পানির জনৈক কর্ম্মচারী অকারণে গোস্বামিপাদের নিন্দা করিত। লোকটি কখনও প্রভুপাদকে দর্শন করে নাই। তাঁহাকে নিন্দা করিবার কোন হেতু না থাকিলেও সে সর্ব্বদা প্রভুপাদের নিন্দা করিত। গোস্বামিপাদের একান্ত ভক্ত ৺হরিনারায়ণ রায় সেই আফিসে কার্য্য করিতেন। হরিনারায়ণ বাবু প্রভুপাদকে ভক্তি করেন, লোকটি তাহা জানিত, তাই সে হরিনারায়ণ বাবুকে ক্লেশ দিবার

জন্য তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার সাক্ষাতে গোস্বামিপাদের কথা তুলিয়া নানা অকথাকুকথা বলিত। নিয়ত ইহাঁর সাক্ষাতে নিষ্ঠুরভাবে প্রভুপাদের নিন্দা করিত। এক দিন সেই লোকটি হরিবাবুর কাছে অতি স্ফূর্ত্তির সহিত গোস্বামিপাদের নিন্দা করিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে বড় সাহেব তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। এই আকস্মিক বিপদবার্ত্তায় সে ব্যক্তি একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। কি অপরাধে তাহার কর্ম্মচ্যুতি ঘটিল, ইহা জানিবার জন্য সে বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলে সাহেব ত তাহার সহিত দেখা করিলেনই না, অধিকন্তু দ্বারবান্ দিয়া আফিস হইতে বাহির করিয়া দিলেন। এ ক্ষেত্রেও ভগবান্ মহৎলংঘনের ফল সদ্য সদ্য প্রদান করিলেন।

ক্ষমাসর্ব্বস্ব, সর্ব্বভূতসুহৃৎ মহাজনগণ কাহারও অপরাধ গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের কাছে কেহ উৎকট অপরাধ করিলেও তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ আশ্রিত ভক্তগণের প্রতি অত্যাচারকারীকে কখনই ক্ষমা করেন না। ভক্তদ্রোহীকে তিনি কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মরাজ্যে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়। শাস্ত্রে এই প্রকার ঘটনা অনেক আছে। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থে ঈদৃশ অনেক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহৎলংঘনজনিত অপরাধে কুষ্ঠ ব্যাধিতে গোপালচাপালের উন্নত নাসিকা ও হস্তপদের অঙ্গুলীসকল খসিয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রমে দস্যুবৃত্তি করিতে আসিয়া দস্যুগণকে দেবতা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। হরিনদী গ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ হরিদাস ঠাকুরকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাঁহার নাসিকা ছেদন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই অপরাধে বসন্ত রোগে তাঁহার

নাক খসিয়া গিয়াছিল। গোস্বামিপাদের মুখে শুনিয়াছি, মহাত্মা যীশুর প্রাণবধ করাতেই ইহুদি জাতির শোচনীয় অধোগতি হইয়াছে। তাঁহারা যে দেশভ্রষ্ট ও ছিন্নভিন্ন হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে পরাধীন জীবন যাপন করিতেছেন, যীশুর পবিত্র শোণিতপাতই তাহার প্রধান কারণ। ক্ষমার অবতার যীশু ত মৃত্যুকালে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ভগবান্ ইহুদি জাতিকে দণ্ড দিতে ছাড়িলেন কি? তিনি তাঁহাদিগকে দেশচ্যুত ও ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। এত বড় একটা জাতির আপনার বলিবার একটি দেশ নাই। তাঁহারা যাযাবরের ন্যায় নানা স্থানে বাস করিতেছেন। মোগলসম্রাট্ প্রবলপ্রতাপ আরাঞ্জেব শিখগুরু টেগ্ বাহাদুরের প্রাণবধ করিয়া বিশাল মোগলসাম্রাজ্যকে ধ্বংসমুখে নিপাতিত করিলেন। মহাজনহত্যার উৎকট অপরাধে মোগলরাজের বিপুল রাজত্ব অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া শরতের মেঘের ন্যায় লয়প্রাপ্ত হইল।

অনেকে বলেন, মহাজনগণ যখন অত্যাচারীদিগকে ক্ষমা করেন, তখন তাহাদিকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে কেন? মহাপুরুষেরা ক্ষমা করিলেও ধর্ম্মের সেতু ভগবান্ ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কখনও অপরাধীকে ক্ষমা করেন না। অপরাধীর শাস্তি না হইলে ধর্ম্মের মর্য্যাদাহানি হয়, এ জন্য তিনি অপরাধীর দণ্ড দিয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। সামান্য কীটপতঙ্গের প্রতি অত্যাচার করিলেও তিনি তাহার দণ্ড দিতে ছাড়েন না। আর যিনি তাঁহার আশ্রিত, নিজজন, তাঁহাকে লংঘন করিলে, তাঁহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে অত্যাচারীকে তিনি বিনাশাস্তিতে নিষ্কৃতি দিবেন, ইহার পর অযৌক্তিক কথা আর কি হইতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"আয়ুঃশ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥"

মহাজনদিগের অতিক্রমে পুরুষের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি লোক, আশীর্ব্বাদ ও সর্ব্ববিধ শ্রেয় বিনষ্ট হইয়া যায়।

গোস্বামিপাদের শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছিল, এজন্য তিনি সকাল বেলায় চা-পানান্তে ইডেন বাগানে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং স্থিরদৃষ্টিতে এক দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ দেখিবার পর তিনি বলিলেন, কি আশ্চর্য্য, জগতে কিছুরই বিনাশ নাই। পূর্ব্বে কোন সময়ে একজন সাহেব একজন মেমকে চুম্বন করিয়াছিলেন, প্রকৃতিতে তাহার ছাপ এখনও অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই ছবি অতি পরিস্কারভাবে আমার দৃষ্টিতে পতিত হইল।

এক দিন একজন ব্রাহ্ম আসিয়া গোস্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি নাকি ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া মানেন এবং কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? ইহার উত্তরে প্রভুপাদ বলিলেনঃ—আমি ঈশ্বরকে নিরাকার ও সাকার দুই বলিয়াই মানি। কারণ তিনি দুইই। তাঁহার কোন জড়ীয় রূপ নাই, এইজন্য তিনি নিরাকার এবং তাঁহার চিন্ময় রূপ আছে, যাহা ভক্তগণ দেখিয়া থাকেন, সেই জন্য সাকার। ভগবান্ নিরাকার, একথার অর্থ ইহা নহে যে তাঁহার কোন স্বরূপ বা বিগ্রহ নাই। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার হাত, পা, মুখ সমস্তই আছে, কিন্তু সে সকল জড়ীয় নহে, চিন্ময়। ব্রাহ্মগণ নিরাকারের যে অর্থ করেন, নিরাকার বলিলে যাহা বুঝেন, তাহা ঠিক নহে। ভগবান্ বস্তুতঃ সেরূপ নিরাকার নহেন। ব্রাহ্মদের নিরাকার ঈশ্বর মানুষের ধারণায় আসে

না। সেরূপ ঈশ্বরের দর্শন স্পর্শন হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাকে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, তাঁহার সহিত কথা বলা, আমোদ-আহ্লাদ করা, সমস্তই ঘটে। ভক্তগণ তাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। বিগ্রহ না থাকিলে তাঁহারা তাঁহার সহিত এসকল করেন কিরূপে? আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে তিনি সাকার নিরাকার দুইই।

একদিন সন্ধ্যাকালে গোস্বামিমহাশয় ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছিলেন। একটি লোক দেখাদেখি কপটভাবে ভাব দেখাইয়া তাঁহার সঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিল। গোস্বামিমহাশয় তাহার এই কপটতা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং 'ভাবের ঘরে চুরি?' এই কথা বলিতে বলিতে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তাহাকে কীর্ত্তন হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

কীর্ত্তন শেষ হইলে বাবু মণীন্দ্রমোহন মজুমদার গোস্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনি নৃত্যকারী লোকটিকে প্রহার করিলেন কেন? মণীবাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, কই, আমি কাহাকেও প্রহার করিয়াছি বলিয়া ত আমার মনে হয় না। পরে একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, হাঁ, মনে হয়েছে। কীর্ত্তনে অনেকগুলি মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বাউল বাবাজী ছিলেন। লোকটি কপটতা করিয়া ভাব দেখাইতেছিল; এজন্য বিরক্ত হইয়া তিনিই প্রহার করিয়াছেন। মহাত্মাগণ ধর্ম্মের অবমাননা সহ্য করেন না।

একদিন গোস্বামিপাদ হঠাৎ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি সংস্কৃত শিক্ষা কর। আমি বলিলাম, এত বয়সে কি সংস্কৃত শেখা

সম্ভবপর হইবে? তিনি বলিলেন, কেন হইবে না। আরম্ভ কর, হইয়া যাইবে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ কৌমুদী ও হিতোপদেশ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পরে সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণ ও রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভট্টিকাব্য, ভারবী, অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটক, উত্তররামচরিত নাটক প্রভৃতি পড়িয়া প্রভুপাদের কৃপায় সংস্কৃত ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিলাম। আমার এই সফলতায় গোস্বামিপাদ আনন্দপ্রকাশ করিয়া আমাকে অভিনন্দন করিলেন।

একদিন একজন ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, আমার পিতামহের সময় হইতে তিন প্রভুর (মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভু) একখানি প্রাচীন চিত্রপট আমাদের ঠাকুর ঘরে আছে। ছবি খানি যাট সত্তর বৎসরের পুরাতন এবং দেখিতে অতি সুন্দর। এখন নানা স্থান হইতে ইঁহাদিগের বহু ছবি বাহির হইয়াছে, কিন্তু এমন সুন্দর ও ভাবশুদ্ধ চিত্র আর এক খানিও দেখা যায় না। চিত্রখানি বহু পুরাতন হইলেও অতি সুন্দর ভাবে আছে। কোন স্থান বিবর্ণ বা কীটদষ্ট হয় নাই। এই কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বাবুটিকে বলিলেন, চিত্র খানি আমাকে একবার দেখাইবেন? আমার অত্যন্ত দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে একবার আনিবেন, দেখিব। বাবুটি বলিলেন, আপনি দেখিবেন ইহাতে কি আর আপত্তি হইতে পারে। আমি এখনই আনিতেছি। এই বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তিনি চিত্রপটখানি আনিলেন। গোস্বামিপাদ ছবি পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। অত্যন্ত আদরের সহিত তিনি ছবিখানিকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি একেবারে ডুবিয়া

গেলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় সমস্তগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা যেন তিনি সেই চিত্র খানি সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ দেখিয়া তিনি ছবিখানি কোল হইতে পার্শ্বে রাখিলেন এবং বিভোর হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ছবিখানির অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া যেন তাঁহার আশা মিটিতেছে না। তাহার মধ্যে তিনি যেন আপনাকে ঢালিয়া দিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ দর্শন করিয়া তিনি বলিলেন, তিন প্রভুর ভিতর হইতে তিনটি জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে সেদিকে চাহিবামাত্র সেই জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন।

এই বাড়ীতে প্রভুপাদের আশ্রমের পরিচারিকা অন্নদাদাসী তাঁহার নিকট দীক্ষা পায়। কলিকাতার অন্যান্য পরিচারিকাগণের ন্যায় অন্নদাও স্খলিতচরিত্রের লোক ছিল। গোস্বামিপাদ ইহাকে বিশেষ ভাবে কৃপা করিয়া পতিতপাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ইহার কিছুদিন পরে—গোস্বামিপাদের অনুগত ভক্তশিষ্য বাবু মণীন্দ্র-মোহন মজুমদার ভবানীপুরনিবাসী আশুতোষ দত্তনামক জনৈক চরিত্রবান্ যুবকের দীক্ষার জন্য গোস্বামিপাদের নিকট প্রার্থনা করেন। আশুবাবু মণীবাবুর বন্ধুলোক এবং এক সঙ্গে বিষয়কর্ম্ম করিতেন। তিনি গোস্বামিমহাশয়ের কৃপালাভের প্রত্যাশায় মণীবাবুকে ধরায় মণীবাবু প্রভুপাদকে সে কথা জানান। মণীবাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, তাঁহার দীক্ষা পাইবার সময় হয় নাই। অতএব তাঁহার দীক্ষা হইবে না। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া মণীবাবুর অত্যন্ত কষ্ট হইল। তখন তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনাদের ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কলুষিতচারিত্রা অন্নদাকে ডাকিয়া দীক্ষা দিলেন, আর একজন সচ্চরিত্র লোককে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ রহস্যভেদ করা একান্তই দুরূহ ব্যাপার। মণী বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ হাসিয়া বলিলেন, মণী, তুমি সত্যই বলিয়াছ। সংসারের বিচারবুদ্ধিদ্বারা ইহা বুঝিতে পারিবে না। ভগবানের কার্য্য ইহাদ্বারা বুঝা যায় না। সংসারের লোক যে দিক্ দিয়া বিচার করেন, মানুষ মানুষের যে দিক্ দেখে, ভগবান্ সে দিক্ দিয়া বিচার করেন না, সে দিক্ দেখেন না। আর তুমি কি জাননা যে ভগবানের এক নাম পতিতপাবন? আর আমি কি জন্য সংসারে আসিয়াছি; তাহা যদি জানিতে তাহা হইলে তোমার মুখ হইতে এইরূপ কথা বাহির হইত না। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া মনীবাবু বলিলেন, আপনি কি জন্য আসিয়াছেন? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, পাপী উদ্ধার ও দেশে ধর্ম্মস্থাপন করিবার জন্য। দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া ইহার উপর মহাত্মাদের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। যাহাতে দেশের লোক ধর্ম্মের অভিমুখী হয়, তাঁহাদের সেই চেষ্টা। গৌর, নিতাই ও সীতানাথও এই কার্য্যে বিশেষ উদ্যোগী। তাঁহারা ইহার জন্য সর্ব্বদাই আমার কাছে আসিয়া থাকেন। আর আমাদের এই সাধন সকলে পাইবে না। তোমাদের আফিসে যেমন কর্ম্মচারীদের নামের তালিকা থাকে, সেইরূপ যাহারা সাধন পাইবে তাহাদের নামেরও তালিকা আছে। কেবল তাহারাই এই সাধন পাইবে। তদ্ব্যতীত অন্য একটি লোকও ইহা পাইবে না। এখন বুঝিলে? গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া মণীবাবু বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহার মনে হইল ভগবানের রহস্যভেদ করা ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে কখনই সাধ্যায়ত্ত নহে। ক্ষুদ্র চটকপক্ষী কি অনন্ত আকাশের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারে?

একদিন কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়স্থ স্বর্গীয় জগৎচন্দ্র সেন মহাশয়ের শিষ্য বাবু গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে গোস্বামিপাদের আশ্রমস্থ সকলের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য এক লোক পাঠাইয়াছিলেন। প্রেরিত লোক গোস্বামিপাদের নিকট উপনীত হইয়া গোপীবাবুর নাম লইয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, ইহারা কেহ শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যাইবে না, তুমি গোপীবাবুকে গিয়া একথা বলিও। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া লোকটি চলিয়া গেল এবং গোপীবাবুকে সমস্ত বলিল। ইহাতে গোপীবাবু বিরক্ত হইয়া গোস্বামিমহাশয়কে এক কড়াপত্র লিখিলেন। প্রভুপাদ সে পত্রের কোন উত্তর না দিয়া শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা কখনও শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইওনা। শ্রাদ্ধের দিন শ্রাদ্ধ বাড়ীর কাঁচা পাকা সমস্ত বস্তুই প্রেতের (পরলোকবাসীর) উচ্ছিষ্ট হয়। তাহা ভোজন করিলে প্রেতের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। প্রেতের উচ্ছিষ্ট খাইলে কখনও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। যাঁহারা ভক্তিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা শ্রাদ্ধান্ন পরিহার করিতে হইবে। শ্রাদ্ধের পর কোন দিন যদি নূতন দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া কেহ খাওয়াইতে চাহেন তাহা খাওয়া যাইতে পারে। তাহাতে প্রেতের উচ্ছিষ্ট বা শ্রাদ্ধান্নভোজন হয় না। পূর্ব্ববাঙ্গলায় একবার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। চন্দ্রনাথগামী একজন সাধু ঢাকার বিক্রমপুরস্থ কোন গ্রামে এক যাজক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হন এবং ব্রাহ্মণের ঘরে অন্ন ভোজন করেন। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মণ সেই ঠাকুর ঘরেই সাধুকে শুইতে দিয়াছিলেন। সাধু শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। অধিকন্তু বিগ্রহের অঙ্গের অলংকার গুলির প্রতি তাঁহার প্রবল লোভ হইল। মনে এইরূপ কুপ্রবৃত্তির উদয় হইতে

দেখিয়া তিনি যারপরনাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। তিনি বিধিমতে নিজের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তে দেবাসুরের তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কখনও দেবভাবের জয় কখনও বা অসুরভাবের জয় হইতে লাগিল। পরে অসুরভাবই জয়লাভ করিল। সাধু বিগ্রহের অলংকার গুলি লইয়া গোপনে প্রস্থান করিলেন। মধ্যাহ্নকালে এক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া তিনি স্নান করিয়া ভজন করিতে বসিলেন। ভজনের প্রতাপে তাঁহার অন্তরস্থ অসুরভাব বিদুরিত হইয়া দেবভাব জাগিয়া উঠিল। তখন তাঁহার আর দুঃখের অবধি রহিল না। তিনি হায় হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনুতাপে তাঁহার মন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি সায়ংকালে ব্রাহ্মণগৃহে প্রত্যাগত হইয়া অলংকার গুলি প্রত্যর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, আপনার বিগ্রহের গহনা চুরি করিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এতকাল কঠিন পরিশ্রম করিয়া যে সাধনভজন করিয়াছিলাম, আমার সে সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেন যে আমার এরূপ দুর্ম্মতি হইল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কখনও ত আমার মনে এরূপ কুবুদ্ধির উদয় হয় নাই। বোধ হয় আহারের দোষে আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় কাল রাত্রিতে আমাকে কিরূপ অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, শ্রাদ্ধে আমি ভোজ্য পাইয়াছিলাম। সেই তণ্ডুল আপনাকে খাইতে দিয়াছিলাম। সাধু বলিলেন, সেই তণ্ডুলগুলি যাহার শ্রাদ্ধে পাইয়াছিলেন, জীবিত সময়ে সে কিরূপ লোক ছিল? ব্রাহ্মণ বলিলেন, সে ব্যক্তি চোর ছিল, চুরি করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করিত। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সাধু হায় হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, মহাশয় চোরের শ্রাদ্ধের ভোজ্যান্ন খাইয়া দেখুন আমার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

আমি সানুনয়ে আপনাকে বলিতেছি, কখনও কোন সাধুকে শ্রাদ্ধের বস্তু খাওয়াইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন না। আমার চন্দ্রনাথ যাওয়া হইল না। ফিরিয়া আসনে চলিলাম। এই পাপের জন্য আমাকে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। এই বলিয়া সাধু প্রস্থান করিলেন। সাধুর কথা শুনিয়া গ্রামবাসিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। আমাদ্বারা সাধুর ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণও অতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

একদিন পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত ডিপুটি কালেক্টর্‌ স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ রায় গোস্বামিপাদের নিকট আগমন করেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন। পরে তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়; তিনি সন্দেহবাদী হন। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি ইংলণ্ডে যান এবং সেখানে এক ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া সেই দেশে স্থায়ীরূপে বাস করেন। কিছু কাল পরে এক দিন রজনীযোগে তিনি তাঁহার শয়ন গৃহে অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোকের ভিতরে এক দেবীমূর্ত্তি দর্শন করেন।* আর এক দিন রাত্রিতে তাঁহার শয়নকক্ষে তিন জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষে যাইতে বলেন। ঐ তিন জনের মধ্যে গোস্বামিপাদ একজন ছিলেন। এই ঘটনায় পার্ব্বতী বাবুর মনে ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। তাঁহার নাস্তিক্যবুদ্ধি চলিয়া গেল, হিন্দু-ধর্ম্ম সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইল। অবিলম্বে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া গোস্বামিপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ইংলণ্ডে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন, আমি ত নাস্তিক ও ম্লেচ্ছ হইয়া উৎসন্নে গিয়াছিলাম কেবল আপনার দয়াতেই রক্ষা পাইলাম। আপনি দয়া করিয়া সেই দূর দেশে গিয়া আমাকে চুলে ধরিয়া মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিলেন। এ অযাচিত দয়ার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। যে তিন জন মহাপুরুষ আমার

* এই দেবীমূর্ত্তি দশমহাবিদ্যান্তর্গত বগলা মূর্ত্তি।

শয়ন ঘরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আপনি তাহার মধ্যে একজন। আর দুই জনকে আমি কখনও দেখি নাই। তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। কোথায় গেলে তাঁহাদের সহিত দেখা হইতে পারে, আপনি বলিয়া দিন। পার্ব্বতী বাবুর কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, আপনি হরিদ্বারে গেলে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আপনি গঙ্গা-তীরে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন। প্রভুপাদের কথা শুনিয়া পার্ব্বতী-বাবু হরিদ্বারে গেলেন। একদিন বিকালবেলা গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিবার সময় মহাত্মদ্বয়ের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রভুপাদের সহিত দেখা করিয়া সব কথা বলিলেন। পরে দুঃখ করিয়া বলিলেন, আপনি আমার উপর অযাচিত কৃপা করিলেন, কিন্তু আমার এই দেহে কিছুই হইবে না। আমি একে বৃদ্ধ তাহাতে মেম বিবাহ করিয়া একেবারে ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছি। এই-রূপ প্রতিকূল অবস্থায় সাধন ভজন হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই; তবে ক্ষেত্রে বীজ পতিত রহিল, পরজন্মে শস্য উৎপন্ন হইবে।

এই বলিয়া তিনি গোস্বামিপাদকে প্রথমে সাধারণভাবে প্রণাম করিলেন। কিন্তু এইরূপ প্রণাম করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তখন তিনি প্রভুপাদকে বলিলেন, আপনাকে এই ভাবে প্রণাম করিয়া আমার তৃপ্তি-বোধ হইতেছে না। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তাঁহার কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করুন। তখন পার্ব্বতী বাবু তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পরে তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, আমি সময়ে সময়ে রাজনীতি বিষয়ে প্রবন্ধাদি সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকি। আমার বন্ধুবান্ধবেরা সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং আমার

চিন্তাশীলতা ও মৌলিকত্বের ভূয়সী সুখ্যাতি করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারাই আবার আমার বর্ত্তমান ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বাতুল বলিয়া উপহাস করেন। পার্ব্বতী বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিপ্রাদ হাসিয়া বলিলেন, আপনি এজন্য দুঃখিত হইবেন না। ধার্ম্মিক লোকেরা চিরকালই সংসারের লোকের নিকট পাগল বলিয়া উপহসিত হইয়াছেন। আপনি যখন ধার্ম্মিক লোকের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন, তখন কেন না উপহসিত হইবেন? গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া পার্ব্বতীবাবু হাসিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া এই সকল বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন নাই।

পার্ব্বতীবাবু পেন্‌সন্ লইয়া যখন প্রথম বিলাত যান, সেই সময়ে তিনি গোস্বামিপাদের সহিত দেখা করিবার জন্য গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, গোসাঁই! আপনারা কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে যান, আমি তীর্থ করিতে ইংলণ্ডে চলিলাম। আমি সেই তীর্থেই বাস করিব। পার্ব্বতীবাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় হাসিলেন। পরে পার্ব্বতীবাবু বলিলেন, "ঈশ্বর কি আছেন?" প্রভুপাদ বলিলেন, "নিশ্চয় আছেন।" পার্ব্বতীবাবু বলিলেন, "দেখাতে পারেন?" গোস্বামিপাদ বলিলেন, "পারি।" পার্ব্বতীবাবু বলিলেন, "তবে দেখান।" গোস্বামিপাদ বলিলেন, "এখন নয়। এখন দেখালে আপনার বিশ্বাস হইবে না। আপনার মনে হইবে, ভেল্‌কি দেখাইতেছি। সময় না হইলে মানুষ প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনাতেও বিশ্বাস করিতে পারে না।" পরে উপযুক্ত সময়ে পার্ব্বতীবাবুকে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার মতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গোস্বামিপাদের মাতুল ৺বেণীমাধব জোয়ার্দ্দার এই বাড়ীতে আসিয়া ভাগিনেয়ের নিকট কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। জোয়ার্দ্দারমহাশয় গোস্বামিপাদকে পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন। গোস্বামিজীও মামাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। একদিন জোয়ার্দ্দার মহাশয় গোস্বামিপাদকে বলিলেন, বাবা বিজয়! মৃত্যুর দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, পরলোকের ভয়ে আমি ততই কাতর হইয়া পড়িতেছি। বাবা, আমার গতি কি হইবে? তুমি যে কি বস্তু, আমি তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তুমি দয়া করিয়া আমাকে তোমার পরিচয় দিয়াছ। তাই আজি শমনভয়ে ভীত হইয়া তোমার কাছে অভয় চাহিতেছি। মাতুলের কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, ভয় কি মামা? পরকালের জন্য আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না; আপনার পরলোকের ভার আমার উপর রহিল। আপনি নির্ভয়ে থাকুন। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া জোয়ার্দ্দার মহাশয়ের সকল চিন্তা, সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর তিনি গোস্বামিপাদকে বলিলেন, বাবা, তুমি যে আমাকে প্রণাম কর, ইহাতে আমার ভয় হয়। তুমি আর আমাকে প্রণাম করিও না। মাতুলের কথা শুনিয়া গোস্বামি-মহাশয় বলিলেন, সে কি কথা মামা!' আপনাকে আমি প্রণাম করিবনা? আপনি এ কি কথা বলেন? আপনি সর্ব্বদাই আমার প্রণম্য ও পূজ্য।

গ্রীষ্মে অতিশয় ক্লেশ দেখিয়া রাখালবাবু প্রভুপাদের আসনের উপরে এক খানি পাখা টাঙ্গাইয়া দিবার সংকল্প করেন। তিনি পাখা টাঙ্গাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলে বালক দাউজী তথায় আসিয়া বলিল, পাখা ছিঁড়িয়া পড়িবে। গোস্বামিমহাশয় দাউজীর কথা শুনিয়া রাখালবাবুকে বলিলেন, পাখা টাঙ্গাইবেন না। দাউজী মহারাজ যখন বলিতেছে, তখন পাখা নিশ্চয়ই ছিঁড়িয়া পড়িবে। রাখাল বাবু বলিলেন, ও বালক, উহার কথায় কি হয়? বালকের মনে যাহা উদয় হয়, সে তাহাই বলে।

গোস্বামিমহাশয় বলিলেন,—না, দাউজীর কথা কখনও মিথ্যা হয় না। পাখা কিছুতেই এখানে টাঙ্গান হইবে না। টাঙ্গাইতে হইলে বারান্দায় টাঙ্গাও।

গোস্বামিমহাশয় কিছুতেই তাঁহার আসনের উপরে পাখা টাঙ্গাইতে দিলেন না। রাখাল বাবু তখন অগত্যা উহা বারান্দায় টাঙ্গাইয়া দিলেন। বালক যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল। দুই এক দিন পরে পাখা ছিঁড়িয়া পড়িল। তখন গোস্বামিপাদ বলিলেন, কেমন দাউজীর কথা ঠিক হইল কি না?

ইহার কিছুদিন পরে গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তিনি এক দিন তাঁহার গর্ভবতী কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিলেন, শান্তি! তোমার ছেলে যখন এক মাসের হইবে, তখন তাহাকে লইয়া আমরা বৃন্দাবনে যাইব। তখন যদিও খুব শীত থাকিবে, সে জন্য কোন ভয় নাই। তোর খোকার কোন অসুখ করিবে না। গরম কাপড় গায়ে দিয়া লইয়া গেলেই হইবে। এবার তোর আর একটি খোকা হইবে। শান্তিসুধার এই পুত্র তাঁহার তৃতীয় সন্তান। গোস্বামিপাদ অন্নপ্রাশনের সময় ইহার শৌরীন্দ্রসুন্দর নাম রাখিয়াছিলেন। ১৩০১ সালের ২৫শে পৌষ ইহার জন্ম হয়। প্রভুপাদ বৃন্দাবনে তীর্থমণির কুঞ্জেই ইহার অন্নপ্রাশন দেন। ইহার বয়স এক মাস চৌদ্দ দিন হইলে গোস্বামিমহাশয় বৃন্দাবনে গমন করেন।

বৃন্দাবনগমনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, এমন সময়ে একজন সাধু আসিয়া প্রভুপাদকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছেন, এখন ত আর আমার কলিকাতায় থাকিবার সুবিধা হইবে না। আপনি দয়া করিয়া আমার আহার প্রদান করিতেছিলেন বলিয়া আমি এখানে ছিলাম। আপনি চলিয়া গেলে আমার এখানে থাকিবার অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। এজন্য আমি হরিদ্বারে যাইবার সংকল্প

করিয়াছি। কিন্তু আমার হাতে একটিও পয়সা নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে হরিদ্বার যাইবার পাথেয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি সেখানে যাইতে পারি। সাধুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় কিছুই বলিলেন না; স্থাণুবৎ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে স্বামী ভোলানন্দ গিরির একজন শিষ্য আসিয়া পাঁচটি টাকা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন তিনি সাধুর দিকে সহাস্যবদনে বলিলেন, ভগবান্ আপনার পাথেয় প্রেরণ করিয়াছেন, গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তিনি টাকা পাঁচটি দিলেন। সাধু টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন। সাধু চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন, সাধু টাকা চাহিলে তাঁহাকে টাকা দিবার জন্য আমার মনে প্রবল ইচ্ছা হইল। অন্য টাকা না থাকাতে আমি মনে করিলাম, পাথেয়ের টাকা হইতেই ইহাঁকে কিছু টাকা দি। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া আমি যত বার টাকায় হাত দিতে গেলাম, তত বারই গুরুদেব প্রকাশিত হইয়া উক্ত টাকা ব্যয় করিতে নিষেধ করিলেন। তখন আমি অগত্যা চুপ করিয়া রহিলাম। টাকা দিতে না পারাতে মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল। এমন সময়ে ভগবান্ টাকা প্রেরণ করিলেন। *

বৃন্দাবন যাত্রার দিন শিষ্যবৃন্দদ্বারা প্রভুপাদের আশ্রম পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই বিষন্ন। সকলেরই মুখ মলিন। আনন্দের বাজার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে ভাবিয়া সকলেই যারপরনাই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহার নিকট আসিলে তাঁহাদিগের সমস্ত জ্বালা চলিয়া

* এই সাধুটি অত্যন্ত রুগ্ন ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার কোনপ্রকার আশ্রয় ছিল না। তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আহার ও বাসস্থানের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন। তাঁহার এই প্রকার ক্লেশ ও দুরবস্থা দেখিয়া গোস্বামিপাদ্ তাঁহাকে আশ্রয় দেন। সাধু গোস্বামিমহাশয়ের আশ্রমে আহার করিয়া শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায়ের বাড়ীতে শয়ন করিতেন।

যাইত, উত্তপ্ত প্রাণ শীতল হইত, আজি তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। এই কথা মনে উঠাতে তাঁহাদিগের প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে, দুঃখে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তাঁহারা একদৃষ্টে ইষ্টদেবের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন।

যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। একে একে সকলে গোস্বামিপাদকে অভিবাদন করিলেন। তিনিও সকলকে নমস্কার করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন; এবং এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান বাড়ীর মেথর বড়ুকে দেখিয়া তাহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক করজোড়ে বলিলেন, বড়ু, আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, আশীর্ব্বাদ কর। আমার বৃন্দাবনগমন যেন সফল হয়। এই বলিয়া তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবন যাইবার পথে তিনি কয়েক দিন কাণপুরে ৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে মন্মথ বাবুর পত্নী শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবী তাঁহার নিকট সাধন পান।

কাণপুর হইতে বৃন্দাবনে যাইবার পথে তিনি আমাদিগকে গাড়িতে বলিলেন, তোমরা বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবচিহ্ন মালাতিলক ধারণ করিও। অনিবেদিত বস্তু ভোজন করিওনা। যাহা খাইবে তুলসী দিয়া নিবেদন করিয়া খাইও। ব্রজবাসী নরনারীদিগকে ভগবানের গণ মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিও। কখনও তাঁহাদিগের নিন্দা করিওনা। তাঁহাদিগের নিন্দা করিলে ব্রজে তিষ্ঠিতে পারিবেনা। আমরা যথাসাধ্য এই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছিলাম।

গোস্বামিমহাশয় মথুরা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। মথুরার পাণ্ডা লুচিপুরী চৌবে ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রভুপাদ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চৌবেজী গোস্বামিপাদকে লইয়া উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর গোস্বামিমহাশয়

তাঁহার তীর্থগুরুকে প্রণাম করিয়া শিষ্যগণকে অভিবাদন করিতে বলিলেন। তদীয় আদেশে সকলেই চৌবেজীকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর গোস্বামিপাদের আদেশে চৌবেজী কয়েকখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিলেন। গোস্বামিজী শিষ্যগণসমভিব্যাহারে গাড়িতে আরোহণ করিলেন। গাড়িগুলি বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইল। মথুরা হইতে বৃন্দাবন তিনক্রোশ। গাড়ি বৃন্দাবনের সীমানায় উপনীত হইবামাত্র গোস্বামিমহাশয় গাড়ি হইতে অবতীর্ণ হইয়া রজে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অবিরলধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে তাঁহার শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শোভা হইল। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া মত্তহস্তীর ন্যায় টলিতে টলিতে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাসের জন্য পূর্ব্ব হইতেই কালাবাবুর কুঞ্জ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি সেইখানে গিয়া উঠিলেন। এই স্থানে তাঁহার থাকিবার সুবিধা হয় নাই। কুঞ্জের অধিকারী হরিবল্লভ বসু সপরিবারে বৃন্দাবনে আসাতে তিনি উক্ত কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া উমেদ সিংহের কুঞ্জে গমন করেন। এখানেও তিনি অধিক দিন থাকেন নাই। কুঞ্জস্বামী দীর্ঘকালের জন্য কুঞ্জ ভাড়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি নাভার রাজার কুঞ্জে উঠিয়া যান। এই কুঞ্জে একরাত্রিমাত্র বাস করিয়া তাঁহাকে এইস্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কুঞ্জ ভাড়া করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া গোস্বামিপাদ জানিতে পারিলেন যে কুঞ্জের কামদার (প্রধান কর্ম্মচারী) দস্যুদলের নেতা। এই সংবাদ জানিবামাত্র তিনি সকলকে ডাকিয়া গোপনে সে কথা বলিলেন এবং সমস্ত রাত্রি সাবধানে থাকিতে আদেশ করিলেন। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত ভীত হইলেন। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ একখানি বড় সুদৃঢ় বাঁশের লাঠি লইয়া গোস্বামিমহাশয়ের পার্শ্বে সমস্ত রাত্রি

জাগিয়া বসিয়া রহিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুঠুরীর কেবলমাত্র একটি দ্বার ছিল, আমি সেই ঘরে আমার পুত্র তিনটি ও তাহাদের জননীকে শোওয়াইয়া সমস্ত রাত্রি যষ্টি লইয়া দ্বারদেশে বসিয়া রহিলাম। আর সকলেও সতর্ক হইয়া জাগিয়া রহিলেন। ভালয় ভালয় রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতঃকাল হইবামাত্র গোস্বামিমহাশয় বিধুকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলেন। আমরা সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলাম। অতঃপর গোস্বামিমহাশয় গোবিন্দবাজারে নরহরিদাস বাবাজির কুঞ্জ মাসিক ২০ টাকায় ভাড়া করিয়া সংবাদ দিলে আমরা সকলে সেখানে চলিয়া গেলাম। এই কুঞ্জে কিছুকাল বাস করিবার পর কুঞ্জস্বামীর সহিত গোলযোগ হওয়াতে গোস্বামিপাদ পার্শ্ববর্ত্তী তীর্থমণির কুঞ্জে গমন করেন। তিনি যতদিন বৃন্দাবনে ছিলেন এই কুঞ্জেই বাস করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে গরমের সময় রাত্রিকালে গৃহে থাকা যায় না। ছাদে শুইতে হয়। আমরা সকলেই গোস্বামিমহাশয়ের সহিত রাত্রিতে ছাদে থাকিতাম। তিনি মধ্যস্থলে আসন করিয়া বসিতেন। সকলে তাঁহার চারিদিকে শয়ন করিতেন। গোস্বামিমহাশয় সমস্ত রাত্রি ছাদে থাকিয়া ভোরে দ্বিতলে তাঁহার আসনে গমন করিতেন। তাঁহার গমনের পূর্ব্বে শিষ্যদিগের মধ্যে একজন গিয়া গৃহ পরিষ্কার করিয়া আসন ঝাড়িয়া রাখিতেন।

বানরীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ প্রতিদিন এই কার্য্য করিতেন। একদিন তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে দ্বিতলে গিয়া দেখিলেন, গোস্বামিমহাশয়ের বাসগৃহ ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। তিনি মনে করিলেন, সরলনাথ বুঝি চালাকি করিবার জন্য, দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরে রহিয়াছে। এই মনে করিয়া কুঞ্জ দরজায় জোরে এক ধাক্কা দিলেন। ইহাতে

গোস্বামিমহাশয় ভিতর হইতে বলিলেন, বিরক্ত কর কেন? তাঁহার কথা শুনিয়া কুঞ্জ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সরলনাথের অন্বেষণে অন্যত্র গমন করিলেন। অন্য ঘরে সরলনাথকে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঠাকুর কখন নীচে আসিয়াছেন? সরলনাথ বলিল উনি শেষ রাত্রিতে নীচে আসিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। কুঞ্জ বলিল আমি ত তাহা জানিতাম না। দ্বারে ধাক্কা দিয়া দেখিলাম দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। জোরে ধাক্কা দেওয়াতে ঠাকুর বোধ হয় বিরক্ত হইয়াছেন। গোস্বামিমহাশয় কখনও শেষ রাত্রিতে নীচে আসেন না, আজি কেন শেষ রাত্রিতে নামিয়া আসিলেন? আর দ্বার রুদ্ধ করিয়াই বা তিনি কি করিতেছেন? তিনি ত কখনও দরজা বন্ধ করিয়া থাকেন না! সকলেই ইহার কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। বেলা প্রায় ৮টার সময় গোস্বামিমহাশয় দরজা খুলিলেন। তখন সকলে তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলে, যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি শেষ রাত্রিতে নীচে আসিয়াছিলে কেন? তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন, কাল রাত্রিতে হিমালয় হইতে কয়েকজন মহাত্মা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত নির্জনে কথা বলিবার জন্য নীচে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলাম। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের সহিত তোমার কি কথা হইল? ইহার উত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন, তাঁহারা আমাকে বলিলেন, তোমার এ এখানকার কাজ একরূপ শেষ হইয়াছে, এখন হিমালয়ে চল। আমি তদুত্তরে বলিলাম, গুরুজীর আদেশ ভিন্ন আমি যাইতে পারি না। আমার এই কথা শুনিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া যোগজীবন আবার প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কার্য্য কি? গোস্বামিপাদ বলিলেন, "দেশে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। রাজা অনুকূল না হইলে

দেশে ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না। বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী ধর্ম্মের অনু-কূল নহে, ইহার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত এবং শীঘ্রই তাহা হইবে। যে ধর্ম্ম স্থাপিত হইল, ইহার স্রোত পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া আবার ম্লান হইয়া যাইবে। তখন ভগবান্ আবার অবতীর্ণ হইবেন। সেই অবতারই কল্কি অবতার।" প্রভুপাদের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানসময়ে রামদাস বাবাজী ও জগদীশ বাবাজী তাঁহার আশ্রমে প্রায়ই আসিতেন। তিনি ও ইহাঁদের আশ্রমে যাইতেন। বাউলসম্প্রদায়-ভুক্ত কমলদাস বাবাজী নামে একজন সাধু কেশীঘাটে থাকিতেন। গোস্বামিপাদ তাঁহার আশ্রমেও অনেক সময় যাইতেন। যে নারায়ণ-স্বামী বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য প্রভুপাদ একদিন তাঁহার আশ্রমেও গিয়াছিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় গোস্বামিপাদ বলিলেন, এবারে স্বামিজীকে অন্যরূপ দেখিলাম। এখন আর ইহাঁর মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ নাই। ইনি এখন মুমুক্ষু হইয়াছেন। ধামমাহাত্ম্যেই ইহাঁর এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ব্রজধামের কি তুলনা আছে? পাহাড়ী নরসিংহদাস বাবাজীও এখানে আসিয়া কিছুদিন গোস্বামিপাদের নিকট বাস করিয়াছিলেন।

গোস্বামিপাদের আসনের সম্মুখস্থ জানালায় একটি বানরী কার্নিসে বসিয়া প্রভুপাদের দিকে চাহিয়া তাহাদের ভাষায় কি বলিত। প্রভু-পাদ তাহাকে খাবার দিতেন। একদিন বলিলেন, এই বানরী পূর্ব্ব জন্মে একজন রাণী ছিল। অপরাধে বানরী হইয়াছে। পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে থাকাতে আমার কাছে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। একদিন রাত্রিতে তেতলার একটি ঘরে একটি বানরের ছানা বন্দী হইয়াছিল। মর্কটশিশু আহার অন্বেষণে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। পরিচারিকা ইহা

জানিতে না পারিয়া গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। কাজেই মর্কট-নন্দনকে সমস্ত রাত্রি বন্দী থাকিতে হইয়াছিল। ভোরের বেলা তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া বহুসংখ্যক বানর ছাদে একত্র হইয়া ছানা-টিকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহাদের সমস্ত যত্ন, সমুদায় প্রয়াস যখন ব্যর্থ হইল, তখন তাহারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দন্তে দন্তঘর্ষণ পূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন; বানরগণের ভয়ংকর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের মনেই ত্রাসের উদয় হইল। গোস্বামিমহাশয় এই ব্যাপার দেখিয়া ধীরে ধীরে ছাদে গিয়া মিষ্ট বাক্যে বানরগণকে বলি-লেন, তোমরা উপদ্রব করিও না। শান্ত হও। এখনই তোমাদের ছানা বাহির করিয়া দিতেছি। তাহাকে ইচ্ছা করিয়া কেহ বন্ধ করে নাই। সে যে ঘরে গিয়াছে, ইহা কেহ জানিতে না পারাতেই সে বন্দী হইয়াছে। গোস্বামিপাদের কথা তাহারা কি বুঝিল তাহা জানি না, কিন্তু তখনই তাহারা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহাদের এত যে ক্রোধ তাহা কোথায় চলিয়া গেল। অতঃপর গৃহের দ্বার খুলিয়া দিলে মর্কট শিশু তাহার জননীর নিকট চলিয়া গেল। শাবক পাইয়া বানরগণ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

গোস্বামিপাদ শ্রীবৃন্দাবনে প্রায় ছয়মাস বাস করিয়া কোন অনি-বার্য্য কারণে কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। এত শীঘ্র তাঁহার ব্রজধাম ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। আরও কিছু দিন থাকিয়া তাঁহার বনপর্য্যটন করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু অকস্মাৎ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি সত্বর কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে সেই ১৪।২ নং ভবনেই

বাস করিতে লাগিলেন। এই বাড়ীতে কিছু দিন থাকিয়া তিনি ঢাকায় যান। সেখানে অতি সমারোহের সহিত তিনি ধূলট্ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর এরূপ মহোৎসব আর হয় নাই। সাত আট দিন ব্যাপিয়া এই উৎসব হইয়াছিল। এই সাত আট দিন অজস্র অন্নদান হইয়াছিল। হাজার হাজার লোক প্রতিদিন প্রসাদ পাইত। ইহা ভিন্ন সকালসন্ধ্যায় মহাসংকীর্ত্তন হইত। সেই কীর্ত্তনে গোস্বামিমহাশয় যখন হরিনামে চারিদিক নিনাদিত করিতেন এবং উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন তখন চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে উদিত হইত। সেই অপূর্ব্ব নৃত্যের একমাত্র উপমাস্থল শ্রীবাসের অঙ্গন ও পুরীর রাজপথ। সে নৃত্য যিনি দেখিয়াছেন তাঁহার শ্রীবাস অঙ্গনে ও পুরীর রাজপথে গোরাচাঁদের অপূর্ব্ব নৃত্য দেখা হইয়াছে; কারণ উভয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রভেদ না থাকাতে নৃত্যের মধ্যেও পার্থক্য ছিল না। সে ধূলট্ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনও তাহা ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগের চিত্তপটে তাহার সুন্দর ছবি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। ভাষার এমন সাধ্য নাই এবং আমার এমন ক্ষমতা নাই যে সেই অপূর্ব্ব ব্যাপার পাঠককে বুঝাইতে পারি।

পূর্ব্ববর্ত্তী ধূলটের ন্যায় এবারও শেষ দিনে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারেও মধুর হরিনামে নগর টলমল করিতে লাগিল। ভাব ও প্রেমের বন্যায় নরনারীবৃন্দ হাবুডুবু খাইতে লাগিল। গোস্বামিমহাশয়ের পাচক ব্রাহ্মণ শত্রুঘ্ন ঠাকুর ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। বহু চেষ্টাতেও তাহার বাহ্যজ্ঞান হইল না। অসুস্থতার জন্য গোস্বামিপাদ গাড়িতে চড়িয়া কীর্ত্তনের পশ্চাতে আসিতে-ছিলেন। ধরাধরি করিয়া শত্রুঘ্নকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা

হইলে,* তিনি তাঁহার কানে নাম দিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশে শত্রুঘ্নকে অনেকক্ষণ নাম শুনান হইল। তাহাতেও তাহার সংজ্ঞা হইল না। তখন গোস্বামিপাদ তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। লোকে যেমন মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যায় শত্রুঘ্নকে ঠিক সেইভাবে বহন করিয়া আশ্রমে আনা হইল। আশ্রমে আনিবার অনেকক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞা হয়। যে পথে কীর্ত্তন যাইতেছিল কতকগুলি সৈন্য সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। কীর্ত্তন শুনিয়া এবং প্রভুপাদকে দেখিয়া তাহারা বন্দুক অবনত করিয়া সম্মান দেখাইল।

অদ্বৈতপ্রভুর জন্ম তিথি সপ্তমীরদিন অতি জমাট সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। গোস্বামিপাদ মহাভাবে মাতোয়ারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন। নৃত্যশেষে যখন তিনি সমাধিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মস্তকের জটা একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। জটা কিছুক্ষণ খাড়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িল। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে এবং আরও কেহ কেহ এসময়ে তাঁহার দেহের বর্ণ তুষারধবল শুভ্র দেখিয়াছিলেন।

এই বৃন্দাবনে কলিকাতা হইতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ঘোষকে আনা হইয়াছিল। তিনি দুই তিন পালা মহাজনী পদ গান করিয়া সকলকে আনন্দদান করিয়াছিলেন। একদিন দানলীলা গানের

* ব্রাহ্মসমাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাতে গোস্বামিমহাশয়ের দারুণ হৃদ্‌রোগ হয়। এই পীড়ায় তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি পদব্রজে অধিক পথ চলিতে পারিতেন না, এই জন্য তাঁহাকে গাড়ী করিয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে বাহির হইতে হইয়াছিল। ইদানীং তাঁহার শরীর অথর্ব্বপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল।

সময় গোস্বামিমহাশয় ভাবে মাতোয়ারা হইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় অনেক-ক্ষণ নৃত্য করিলেন, পরে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, লীলা সাক্ষাৎ। ভগবান্ সমস্ত পরিকরের সহিত দানলীলার প্রকটন করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি আহা, আহা, করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দেহ ভাবে ডগমগ হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছে না। উপ্ছাইয়া ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। সমস্ত দেহ হইতে অপূর্ব্ব দিব্য লাবণ্য স্ফুরিত হইতেছে। বদনমণ্ডলে অপ্রাকৃত আনন্দের লহরী খেলিতেছে। তাঁহার সেই স্বর্গীয় শোভা, সেই দিব্য লাবণ্য দর্শন করিয়া সকলের চক্ষু জুড়াইয়া গেল, মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল।

ধুলটাস্তে গোস্বামিমহাশয় পীড়িত হইয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আগমন করিলেন।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## কলিকাতায় শেষ অবস্থান

প্রভুপাদের ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিবার কিছুকাল পরে দাউজীর সাংঘাতিক পীড়া হয়। জ্বরবিকারে তাহার জীবন সংকটাপন্ন হইয়াছিল। একদিন তাহার এমন অবস্থা হইল যে জীবন্ বুঝি আর রক্ষা হয় না। সকলেই নিরানন্দ। সকলের মুখে বিষাদের ছায়া। শেষে ভগবানের কৃপায় এবং শ্রীযুক্ত নীলতরন সরকারের সুচিকিৎসায় তাহার আরোগ্য হইল।

একদিন গোবিন্দজী, রাধারাণী এবং সখা ও সখীগণসহ গোস্বামিপাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমার কাজ শেষ হইয়াছে, এখন চলিয়া আইস। তাঁহার কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, আমি গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত যাইতে পারি না। গোবিন্দজী পরমহংসজীকে (গোস্বামিমহাশয়ের গুরুদেবকে) লইয়া আসিলেন। গোস্বামিপাদ তাঁহার গুরুদেবের নিকট যাইবার অনুমতি চাহিলে পরমহংসজী বলিলেন, এখনও সময় হয় নাই। আরও কিছু কাল তোমাকে পৃথিবীতে থাকিয়া কার্য্য করিতে হইবে। পরমহংসজীর কথা শুনিয়া শ্রীগোবিন্দজী হাসিয়া প্রস্থান করিলেন। এ এক অপূর্ব্ব রহস্য! ভগবান্ তাঁহাকে পরলোকে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন, কিন্তু গুরুদেব যাইতে দিলেন না। এ গূঢ় রহস্যের মর্ম্মভেদ করা মানুষের অসাধ্য। গুরুগোবিন্দ এক। এক জনে এক সময়ে দুই মূর্ত্তিতে বিভিন্ন আদেশ প্রদান করিতেছেন, এ অতি গূঢ় রহস্য। ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য কি এ গভীর রহস্য ভেদ করে।

এই বাড়ীতে সার রমেশচন্দ্র মিত্র, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় কালিকৃষ্ণ ঠাকুর গোস্বামিপাদের নিকট আসিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গোস্বামিমহাশয় ইঁহাদিগকে অত্যন্ত আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার জন্য স্বতন্ত্র আসন প্রদান করেন। ইঁহারা প্রভুপাদের সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন। গুরুদাস বাবু সংকীর্ত্তনের সময় গোস্বামিজীর নৃত্য ও মহাভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল। নানা কথা হইবার পর ঠাকুর মহাশয় যথার্থ সাধুর লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, যিনি প্রকৃত সাধু তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা করেন না, কাহারও নিকট তাঁহার কিছুমাত্র প্রার্থনা থাকে না, তিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ

করিয়া নিষ্কাম হইয়া যান, মানঅপমান স্তুতিনিন্দা তাঁহার নিকট সমান এবং তিনি কাহারও বুদ্ধিভেদ জন্মান না, যাহাতে লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস বর্দ্ধিত হয়, তিনি সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। গমন সময়ে তিনি ইহাঁদিগকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত বিদায় দিয়াছিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে বলিলেন, ভগবান্ ইহাঁদিগকে উচ্চপদ, সম্মান ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব ইহাঁদিগকে তাহার উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদা দেওয়া উচিত। তাহা কর্ত্তব্য ; না দিলে অপরাধ হয়। তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ অমানী ও মানদ হইয়া যিনি যেরূপ সম্মান ও মর্য্যাদার পাত্র তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতেন। তাঁহার ব্যবহারে সকলেই যারপরনাই পরিতৃপ্ত হইতেন।

এই বাড়ীতেই শান্তিসুধার প্রথমা কন্যা নারায়ণী জন্মগ্রহণ করে। নারায়ণীর বয়স যখন ১৪ দিন তখন গোস্বামিপাদ এই বাড়ী পরিতাগ করিয়া ৪৫ নং হেরিসন রোডের বাড়ীতে উঠিয়া যান। এই বাড়ীর মাসিক ভাড়া একশত টাকা ছিল।

এই বাড়ীতে অবস্থান সময়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকটে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে গোস্বামিমহাশয় মাসিক একশত টাকা বাড়ী ভাড়া দিয়া ধুমধামের সহিত থাকেন। তাঁহার আশ্রমের মাসিক ব্যয় পাঁচ ছয় শত টাকার কমে নির্ব্বাহ হয় না। কিন্তু তাঁহার এক পয়সাও উপার্জ্জন বা আয় নাই।" কিভাবে তাঁহার এই ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, পুলিশ হইতে তাহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত। গোস্বামিমহাশয় অতি বিশ্বস্ত সূত্রে এই ব্যাপার অবগত হইয়াও কিছুই প্রতীকারের চেষ্টা করিলেন না। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। ভগবানে যাঁহাদের আত্মসমর্পণ হইয়া গিয়াছে; তাঁহারা ভয়ভাবনার কোন ধার ধারেন না। গোসাঁইজী

ভগবানে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়া রহিলেন। এদিকে ভগবান্ আশ্চার্য্যরূপে পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনে তাঁহার প্রতি সদ্ভাব, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আনিয়া দিলেন। তাঁহার একজন শিষ্য শ্রীভূতনাথ গোপ একদিন রাজপথে শতাধিক মুদ্রার এক খানি চেক কুড়াইয়া পায়। চেক পাইবামাত্র সে তাহা গোস্বামিমহাশয়কে দেখাইয়া বলে যে সে ইহা পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে। গোস্বামিমহাশয় চেক খানি তখনই পুলিশ কমিশনরের নিকটে পাঠাইয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় চেকপ্রাপ্তির সংবাদ প্রচার করিলেন। গোস্বামিপাদের এই কার্য্যে পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষগণের মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, সদ্ভাব ও বিশ্বাসের উদয় হইল। ভগবান্ এইরূপে দুষ্টের ষড়যন্ত্র বিফল করিয়া দিলেন।

পাইখানায় উঁচু হইয়া বসিয়া মলত্যাগ করিতে গোস্বামিপাদের কষ্ট হইত। এজন্য তিনি একখানি তক্তার মাঝখানে বড় ছিদ্র করিয়া এবং দুই পাশে খুরা লাগাইয়া তাহাতে বসিয়া মলত্যাগ করিতেন। কাঠখানিতে যে খুরা লাগান হইয়াছিল তাহা নীচু হওয়াতে তিনি আর একখানি কাঠে উঁচু খুরা লাগাইয়া সেই কাঠখানি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে পুরাতন কাঠখানি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, কি অপরাধে আপনি আমাকে আপনার সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন? পুরাতন কাঠের এই কাতরবাণী শুনিয়া প্রভুপাদ সেই কাঠের খুরাকে অন্য কাঠ লাগাইয়া উঁচু করিয়া পুরাতন কাঠখানিই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পুরী গমনকালে উহা সঙ্গে লইয়া গিয়া, সেখানেও ব্যবহার করিতেন। এখন তাহা সমাধি আশ্রমে আছে। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার অনুরূপ একটি ঘটনা আছে। হুরনবী হজরত মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় যাইয়া একটি

শুষ্ক খর্জুর বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া সাধারণকে উপদেশ দিতেন। পরে মস্জিদ্ প্রস্তুত হইলে তিনি মস্জিদে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে খর্জুরবৃক্ষ দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল, কি অপরাধে আমাকে আপনার সেবা হইতে বঞ্চিত করিলেন ?

একদিন প্রাতঃকালে গোস্বামিপাদের শৌচাগার হইতে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে ৺মোহিনীমোহন রায় তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে গোস্বামিমহাশয় বলিলেন শৌচে যাইবার পথে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও ঋষিগণ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের কথা আর শেষ হয় না। অথচ আমার শৌচে যাইবার প্রয়োজন। পরে তাঁহাদিগেকে অনেক করিয়া বলাতে তাঁহারা বিদায় হইলেন। অতঃপর আমি শৌচক্রিয়া শেষ করিলাম। ইহাই বিলম্বের কারণ।

এক দিন গোস্বামিমহাশয়ের দ্বিতীয় দৌহিত্র পুণ্টুরুর (জগদানন্দ) পরিধেয় কাপড়ে আগুন লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায়। চারিবৎসরের বালক অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া অসহ্য যাতনায় ঘরময় দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে ও কাতরভাবে রোদন করিতেছে। সে যে কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য তাহা বর্ণনাতীত। পুণ্টুরুর জননী এই আকস্মিক বিপৎপাতে অতিশয় কাতর হইয়া পিতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন। গোস্বামিপাদ কন্যার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, তোমার পুণ্যবলে আজ তোমার পুত্রের জীবনরক্ষা হইল। কোন ভয় নাই; তোমার খোকার কোন আশঙ্কা নাই। তবে কিছু দিন ক্লেশ পাইবে। প্রায় দুই মাস কষ্ট ভোগ করিয়া পুণ্টুরু আরোগ্যলাভ করিল।

ইহার কিছু দিন পরে ৺কাশীধামনিবাসী ৺কৃষ্ণানন্দ স্বামী পরদারাভিমর্ষণের অভিযোগে কারারুদ্ধ হন। তাঁহার কারাবাসের

সংবাদ অবগত হইয়া গোস্বামিমহাশয় তাঁহার বাসগৃহে স্ত্রীলোক প্রবেশ করা নিষেধ করেন। তাঁহার কন্যা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোক তাঁহার বাসগৃহে প্রবেশ করিতে পাইতেন না।

অতঃপর গোস্বামিমহাশয়ের অন্যতম শিষ্য বাবু মনোরঞ্জন গুহের পত্নী মনোরমা পরলোক গমন করেন। মনোরঞ্জন বাবু পত্নীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গোস্বামিপাদের আশ্রমে মহোৎসব করিয়া সকলকে ভোজন করান। এই উপলক্ষে তিনি যে ঘৃত আনিয়াছিলেন, তাহা তত ভাল ছিল না। মনোরঞ্জন বাবুর পরলোকগতা পত্নী গোস্বামিপাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, যে ঘৃত আসিয়াছে, তাহা তত ভাল নহে। ভাল ঘৃত আনা হউক। গোস্বামিমহাশয় মনোরঞ্জন বাবুকে এ কথা বলিলেন। মনোরঞ্জন বাবু গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া তথনই ভাল ঘৃত আনাইয়া দিলেন।

গোস্বামিমহাশয়ের আর এক জন শিষ্য বাবু কৈলাসচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণীর সাংঘাতিক পীড়া হয়। কৈলাস বাবু পত্নীর পীড়াশান্তির জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিলেন, কিন্তু পীড়া আরোগ্য না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে রোগীর আসন্নকাল উপস্থিত হইল। কৈলাসবাবুর জনৈক বন্ধু এ সংবাদ গোস্বামিমহাশয়কে জানাইলে তিনি বলিলেন, রোগীকে ব্রাহ্মণের চরণোদক পান করাও; তাহা হইলেই তাহার পীড়া আরোগ্য হইবে। যোগজীবনের পাদোদক পান করিয়া রোগী আরোগ্যলাভ করেন।

ইহার কিছু দিন পরে একজন অঘোরপন্থী সাধু গোস্বামিমহাশয়ের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। গোস্বামিপাদ তাঁহাকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি কারণ চাহিলেন। প্রভুপাদ আমাকে কারণ আনিতে আদেশ করিলে আমি এক বোতল মদ আনিয়া

দিলাম। সাধু শোধনামন্তর মত্তপান করিয়া আহার করিলেন। তাঁহাকে মদ্যপান করিতে দেখিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, ইনি সুরাপান করিলেন না। কুলকুণ্ডলিনীর মুখে ইনি কারণ আহুতি দিলেন। সাধু যে ঘরে বসিয়াছিলেন সেই ঘরে যোগজীবনের বাক্সে দুই শত টাকা ছিল। সাধু বাক্সে কি আছে দেখিতে চাহিলে তাঁহাকে টাকা দেখান হইল। তিনি প্রভুপাদের কাছে টাকাগুলি চাহিলে প্রভুপাদ সমস্ত টাকা তাঁহাকে দিলেন। সাধু সেই টাকা হইতে পঞ্চাশ কি ষাট টাকা আশ্রমের কোন কোনও লোককে দিয়া অবশিষ্ট লইয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে প্রভুপাদ তাঁহার অনেক সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

উৎকলদেশবাসী শত্রুঘ্ন ঠাকুর গোস্বামিপাদের পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে প্রভুপাদের নিকট দীক্ষাও পাইয়াছিল। কুসংসর্গে পড়িয়া তাহার স্বভাব কলুষিত হইয়া যায়। সে আশ্রমের জিনিষপত্র বড়ই অপচয় করিত। লুচি ভাজিবার পর কড়ার অবশিষ্ট ঘৃত জ্বলন্ত উনুনে ঢালিয়া দিত। অন্য প্রকারেও বহু জিনিস নষ্ট করিত। আশ্রমের অর্থাদিও তাহা দ্বারা বিস্তর অপহৃত হইত। একদিন গোস্বামিপাদ শত্রুঘ্নের এই সকল অপকার্য্যের কথা শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—দেখ, আশ্রমের ভিক্ষার বস্তু তুমি অতি অন্যায়রূপে নষ্ট কর। ইহার জন্য তোমাকে বিলক্ষণ ক্লেশভোগ করিতে হইবে। ভগবানের দানের বস্তুর এই প্রকার অপব্যবহার করিতে তোমার প্রাণে ভয় হয় না? শত্রুঘ্ন গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। পরে নীচে আসিয়া রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। অল্পক্ষণ পরেই তাহার দেহে দারুণ জ্বালা উপস্থিত হইল। সমস্ত শরীর যেন আগুনে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সে রান্নাঘরের মেজের পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া

ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সকলে তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শত্রুঘ্ন ছিন্নকণ্ঠ কুক্কুটের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছে এবং 'মলামরে গেলামরে' বলিয়া রোদন করিতেছে। দেখিয়া সকলেরই চক্ষে জল আসিল। অনেকক্ষণ যন্ত্রণাভোগের পর সে সুস্থ হইল। অতঃপর আর কোন দ্রব্য নষ্ট করিতে তাহার সাহস হইত না।

কীর্ত্তনওয়ালা গণেশদাসের সহিত বলরামদাস বাবাজী নামক একজন বৈষ্ণব কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইনি একজন ভজনানন্দী, অতি উচ্চ সাধক। গোস্বামিপাদের বৃন্দাবনে অবস্থান সময়ে বাবাজী মহাশয় কোন স্থানে কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে অচৈতন্য হন। বহু যত্নেও তাঁহার সংজ্ঞা হইল না। তিন দিন এই অবস্থায় গত হইলে প্রভুপাদ এই বিষয় জানিতে পারিলেন। তিনি তখনই বাবাজীর কাছে গমন করিলেন এবং তাঁহার উদরে কাণ লাগাইয়া "সুখময় বৃন্দাবন" এই ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সুখময় বৃন্দাবন গানের এই চরণটি শুনিতেই বাবাজী ভাবে সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহার ভিতরে এই শব্দ দুইটি অবিরাম ধ্বনিত হইতেছিল। গোস্বামিমহাশয় সেই পদটি আবার গাওয়াইতেই বাবাজী হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং কিছুকাল নৃত্য করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন।

আর একদিন প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ৺নীলকণ্ঠ প্রভুপাদকে গান শুনাইয়াছিলেন। তিনি মাথুর পালা গাইয়াছিলেন। গান শুনিয়া প্রভুপাদ অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নীলকণ্ঠের পদধূলি লইয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ প্রভুপাদের চরণে পড়িয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াছিলেন।

বোলপুরের উকীল ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস বসু একদিন ভক্তগণের কথা প্রসঙ্গে গোস্বামিপাদকে বলিলেন, "ভক্ত হনুমান্, তাঁহার ন্যায় ভক্ত দেখা যায় না। তিনি বুক চিরিয়া ইষ্টদেবতা রামসীতা দেখাইয়াছিলেন।" হরিদাস বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বুক কি আবার চিরিতে হয়।" তাঁহার কথা শুনিয়া হরিদাস বাবুর মনে হইল, এ কথার অর্থ কি? তিনি ইহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে গোস্বামিপাদের আসনে "হরেকৃষ্ণ" এই অক্ষর কয়টি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। একটু পরে আবার দেখিলেন, আসনের অন্যস্থানে রাধাকৃষ্ণের অতি সুন্দর যুগলমূর্ত্তি প্রকটিত হইল। কিছু পরে গোস্বামিমহাশয়ের উরুতে যুগল-রূপের প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি এ সকলে বিশ্বাস করিতেন না। কেহ বলিলে গাঁজাখুরি মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। এক্ষণে স্বচক্ষে এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং সবিস্ময়ে গোস্বামিপাদকে বলিলেন, এসকল কি আপনার যোগৈশ্বর্য্যের ফল? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, যোগশক্তিতে এসকল হয় বটে, কিন্তু আমি কখনও তাহা করি না। যে স্থানে ভগবানের নাম কীর্ত্তিত হয়, সেই স্থানের সমস্ত পদার্থ নামময় হইয়া যায়। যিনি সর্ব্বদা ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করেন, তাঁহার আসন, পরিধেয়বস্ত্র, দেহ, সমস্ত বস্তুতেই নাম অঙ্কিত হয়। তাহাই বাহিরে প্রকাশিত হইয়া লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। *

* হরিদাস বাবু প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন। সুতরাং সাকার উপাসনা, গুরুকরণ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কোন বিষয়ই তিনি মানিতেন না। হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার নিকট ঘোরতর কুসংস্কার বলিয়া মনে হইত। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীমত তিনি দীর্ঘকাল

গোস্বামিমহাশয়ের দেহে ও আসনে সর্ব্বদাই ভগবানের নাম এবং নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির ফুটিয়া উঠিত। শ্রীমান্ পান্নালাল ঘোষ প্রতিদিন মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহার নিকট মহাভারত পাঠ করিতেন। যে দিন যে বিষয় পঠিত হইত, সেদিন সেই বিষয়োপযোগী চিত্র তাঁহার দেহে ও আসনে প্রকাশিত হইত। সকলে এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইতেন। সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অবস্থানসময় হইতে গোস্বামিমহাশয়ের আসনে, বস্ত্রে ও দেহে নাম, দেবমূর্ত্তি ও মন্দির প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। অতঃপর সর্ব্বদাই তাঁহার আসনে, পরিধেয় বস্ত্রে ও দেহে ভগবানের বিবিধ নাম ও মূর্ত্তি প্রকটিত হইত। ইহা ভিন্ন অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং দেবমন্দির ফুটিয়া উঠিত।

রীতিমত সাধন করিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। তাঁহার আশা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস ও আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে, আত্মার নিত্যত্বে, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকল বিষয়েই তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার এই বিশ্বাস হইল যে যথেচ্ছভাবে ভোগসুখে জীবন অতিবাহিত করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। যখন ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই, পাপপুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার নাই, তখন যে কার্য্যে সুখ হয় তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া সুখভোগ করা উচিত। সুখই মানবের সমস্ত আরাম, সর্ব্ববিধ তৃপ্তির হেতু। এই মনে করিয়া তিনি ভোগসুখে আপনাকে ঢালিয়া দিলেন, কিন্তু ইহাতে সুখ পাইলেন না। ভোগে সুখ কোথায়? ইন্দ্রিয়সেবায় কি কখনও অনবচ্ছিন্ন আনন্দ হইতে পারে? ভোগের পরই বিষম অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষণভঙ্গুর। তাহার পর ত্রিতাপজ্বালা। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে মানবজাতিকে অহরহ দগ্ধ করিতেছে। তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অসাধ্য। কে কবে সহস্র চেষ্টা করিয়াও পীড়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। তবে সুখ কোথায়? অনবদ্য অবিচ্ছিন্ন সুখ সংসারে নাই। বিশ্বস্রষ্টা জগৎকে সুখে দুঃখে জড়িত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীতে সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগ অনেক অধিক। যিনি এই দুঃখপূর্ণ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখের প্রত্যাশা করেন, তিনি ভ্রান্ত ও আত্মপ্রতারিত।

ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের সময় একদিন পূর্ব্বাহ্নে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকগুলি ব্রাহ্ম কীর্ত্তন করিতে করিতে গোস্বামি-মহাশয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রভুপাদের আসনগৃহে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তনে যোগ দিলেন, এবং ভাবাবেশে অনেকক্ষণ নৃত্য করিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে ব্রাহ্মগণ গোস্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখন ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য কি? তাঁহাদের কথা শুনিয়া

মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কেহ কখনও তৃষ্ণায় বারিলাভ করিতে পারিয়াছেন কি? সংসারে সুখের প্রত্যাশা করিলে মরীচিকার নিকট বারিলাভের ন্যায় প্রতিপদেই নিরাশ হইতে হয়। হরিদাস বাবুও নিরাশ হইলেন। সুখের আশায় ছুটাছুটি করিলেন বটে, কিন্তু সুখ পাইলেন না। তাঁহার প্রাণে হতাশা ও অশান্তির আগুন জ্বলিতে লাগিল। জীবন তখন ভারবহ হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় কিছু দিন অতিবাহিত হইল। এই সময়ে তাঁহার কয়েকটি বন্ধু প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা চক্র করিয়া পরলোকবাসী আত্মা আনয়ন করিতেন।

বন্ধুদিগের মধ্যে একজনের বালিকা পত্নী তাঁহাদের মিডিয়ম্ হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহে সাধু অঘোর নাথ গুপ্তের আত্মা আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অনেক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। অঘোর বাবুর আত্মা যখন আসিত তখন মিডিয়মের শরীর দিব্য লাবণ্যযুক্ত হইত। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে প্রশান্ত ও পবিত্র সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত হইতে থাকিত। তাঁহার সেই সময়কার দৈহিক শোভা দর্শন করিয়া চক্রস্থ সকলেই মুগ্ধ হইতেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে চক্রস্থ একব্যক্তি মিডিয়মকে হরিদাস বাবুর মানসিক অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন। মিডিয়ম্ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তখনই তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং অনেক সদুপদেশ ও আশ্বাস প্রদান করিয়া গোস্বামি-মহাশয়ের নিকট যোগশিক্ষা করিতে বলিলেন। মিডিয়মের কথায় হরিদাস বাবু অনিচ্ছার সহিত গোস্বামিমহাশয়ের নিকট যাইয়া সাধন চাহিলেন। হরিদাস বাবুর প্রার্থনা শুনিয়া প্রভুপাদ তাঁহাকে সাধন দিবার সময় স্থির করিয়া দিলেন। কিন্তু হরিদাস বাবু নির্দ্দিষ্ট সময়ে না যাইয়া পর দিন গিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে না আসাতে প্রভুপাদ

গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, এখন মড়া আগুলিয়া বসিয়া না থাকিয়া যাহাতে আত্মার কল্যাণ হয় তাহার জন্ম যত্নবান্ হওয়া উচিত। যে কার্য্যের জন্ম ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন ব্রাহ্মসমাজ মৃত। মৃতদেহ কোলে লইয়া বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। গোস্বামিমহাশয়ের বাক্য ব্রাহ্মদের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা অপ্রসন্ন মনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সাধন না দিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। হরিদাস বাবু বোলপুরে চলিয়া গেলেন। মিডিয়ম্ তাঁহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে গোস্বামিমহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র গোস্বামিমহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আপনি আবার আসিয়াছেন কেন? হরিদাস বাবু বলিলেন, আমি কি আপন ইচ্ছায় আসিয়াছি। আমাকে বলপূর্ব্বক পাঠায়, কাজেই আসিতে হয়। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, কে আপনাকে বলপূর্ব্বক পাঠায়? হরিদাস বাবু বলিলেন, সাধু অঘোরনাথ। এই কথা শুনিবামাত্র প্রভুপাদ একেবারে জল হইয়া গেলেন; আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। হরিদাস বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিছু দিন পরে আপনি সাধন পাইবেন। উপযুক্ত সময়ে আমি আপনাকে সংবাদ দিব। পরে যথাসময়ে সংবাদ পাইয়া হরিদাস বাবু কলিকাতায় আসিলেন এবং সাধন পাইলেন। সাধনের সময় গোস্বামিপাদ যখন উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, ইনি কি আমাকে মন্ত্র দিবেন! গতিক দেখিয়া তাহাই ত বোধ হইতেছে। তখন তিনি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, মহাশয়, রকম দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি আমাকে দীক্ষা প্রদান করিবেন। কিন্তু আমি মানুষ গুরু মানি না। হরিদাস বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, মানুষ কি কখন গুরু হইতে পারে? গুরু ভগবান্। ভগবান্ ভিন্ন মানুষ কখনও গুরু হয় না। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া হরিদাস বাবু সন্তুষ্ট হইলেন এবং আসনে বসিয়া সাধন গ্রহণ করিলেন। সেই হরিদাস বাবু এখন গোস্বামিপাদের একজন প্রধান ভক্ত। তাঁহার সাধনের অবস্থাও বেশ উন্নত।

স্বর্গীয় মোহিনীমোহন রায় গোস্বামিমহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ছিলেন। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি সময়ে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। বিশেষতঃ ১১ই মাঘের দিন তাঁহার সমাজে যাওয়া বাদ পড়িত না। একবার ১১ই মাঘে তিনি যান নাই। ইহাতে গোস্বামিমহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে সমাজে যান নাই? মোহিনীবাবু বলিলেন, যাইবার জন্য কিছুমাত্র টান হইতেছে না। গোস্বামিমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, কি করিতে যাইবেন। ব্রাহ্মসমাজ মরিয়া পচিয়া গিয়াছে। সেখানে যাইয়া কি হইবে?

আর একদিন মোহিনীবাবু গোস্বামিমহাশয়কে বলিলেন, সাধন লইয়া এ কি হইল? যাঁহারা প্রাণের বন্ধু, অতি পবিত্রচরিত্র ব্রহ্মোপাসক, যাঁহাদের সহিত এত কাল ব্রহ্মোপাসনা করিলাম, তাঁহাদের নিকটে গেলে নাম বন্ধ হইয়া যায়। আর একটা চরিত্রহীন বারাঙ্গণার নিকটে নাম হয়। ইহার কারণ বুঝিতে পারি না।

গোস্বামিমহাশয় বলিলেন—যাহারা ভগবদ্দ্বেষী তাহাদের কাছে নাম চলিবে কেন? ভগবদ্দ্বেষী নাস্তিকের কাছে কি ভগবানের নাম হয়? মোহিনীবাবু—নিষ্ঠাবান্ সচ্চরিত্র ব্রাহ্মগণ কি ভগবদ্দ্বেষী?

তাঁহার গুরুদেব গোস্বামিপ্রভুকে তিনি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন। পূর্ব্ব জীবনের অবিশ্বাস এবং দুর্ম্মতির কথা স্মরণ করিয়া এখন তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে দুঃখপ্রকাশ করেন এবং সেইসঙ্গে গুরুদেবের অসীম দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তাঁহার মুখে তাঁহার জীবনের এই ঘটনা শ্রবণ করিলে ঘোরতর নাস্তিকের মনেও আস্তিক্যভাবের উদয় হয়। পাষাণহৃদয় গলিয়া যায়। তাঁহার জীবন গুরুকৃপার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হরিদাসবাবুর সম্বন্ধে যে সমস্ত ঘটনা লিখিত হইল তাহা তৎপ্রণীত "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" নামক গ্রন্থহইতে সংকলিত।

তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহারা নাস্তিক কেমন করিয়া? গোস্বামিমহাশয়—তাঁহারা ভগবদ্দ্বেষী না ত কি? যাঁহারা শাস্ত্র ও সদাচার মানেন না, সমস্ত সাধু, সন্ন্যাসী, ভগবদ্ভক্তগণকে বিদ্বেষ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা ভগবদ্দ্বেষী ও নাস্তিক আর কে আছে? বেশ্যারা চরিত্রহীন বটে, কিন্তু তাহারা আপনাকে অতি হীন বলিয়া জানে এবং তাহারা ভগবানে বিশ্বাসবতী, শাস্ত্রসদাচারে তাহাদের যথেষ্ট নিষ্ঠা আছে এবং সাধুসজ্জন প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণের উপর তাহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তাহাদের কাছে ত নাম বন্ধ হইবার কথা নহে। তাহারা ভক্তদ্বেষী ব্রাহ্মগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া মোহিনীবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। সেই হইতে তিনি আর ব্রাহ্মগণের নিকট যাইতেন না।

একদিন আর্য্যমিশন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার গোস্বামিপাদের অন্যতম শিষ্য আর্য্যমিশন স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রায়ের সঙ্গে গোস্বামিপাদকে দেখিতে আসেন। সে সময়ে গোস্বামিমহাশয় গুরুর মহিমা ও গুরুভক্তির কথা বলিতেছিলেন। সেই কথা শুনিয়া রামদয়ালবাবু হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, গুরু যদি মূর্খ হন, তাহা হইলেও কি তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে? রামদয়ালবাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন। তিনি রামদয়াল বাবুর দিকে চাহিবামাত্র বিরক্তিতে তাঁহার চক্ষু লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি অতিশয় রুক্ষ ভাষায় তাঁহাকে বলিলেন, কি গুরু মূর্খ হইলে ভক্তির পাত্র কি না, এই কথা তুমি বলিলে? তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও। এখনই এখান হইতে উঠিয়া যাও। তোমার মুখ দেখিতে নাই। গোস্বামিপাদের এই তিরস্কারে রামদয়াল বাবু অপমানে একেবারে

মরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখ কাল হইয়া গেল। তখনই তিনি সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই ব্যাপারে সূর্য্যবাবু অতি ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে গোস্বামিপাদকে বলিলেন, আপনি ত কখনও কাহাকেও কটু কথা বলেন না, আজি ইহাঁকে বলিলেন কেন? সূর্য্য বাবুর কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, ইহাকে বলা প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাঁর মনে অভিমানের একটি প্রকাণ্ড ব্রণ হইয়া ইহাঁর বড়ই অমঙ্গল, বড়ই ক্ষতি করিতেছিল। ইহাঁর-কল্যাণের জন্য আমি চিরিয়া দিলাম। ইহাতে ইহাঁর মঙ্গল হইবে। বস্তুতঃ হইলও তাহাই। বাসায় আসিবার পর যখন রামদয়াল বাবুর অপমানের কুয়াসা কাটিয়া গিয়া জ্ঞানের উদয় হইল, যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন তাঁহার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল। এতদিন তাঁহার যে দৃষ্টি বাহিরের দিকে ছিল, মহাপুরুষের কৃপায় এখন তাহা অন্তর্ম্মুখীন হইল। তখন তিনি তাঁহার নিজের দুরবস্থা বুঝিতে পারিলেন। সেই হইতে তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন এবং গোস্বামিপাদের কৃপাই যে তাঁহার জীবনে এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে ইহা জানিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ হইলেন। এই ঘটনার অনেকদিন পরে আর্য্যমিশনস্কুলের অন্যতম ছাত্র গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (দরবেশ) সহিত কাশীধামে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কিরণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিলে তিনি আদর করিয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিলেন। ধর্ম্মের কথাও অনেক হইল। সেই সময়ে কথা-প্রসঙ্গে কিরণ বলিলেন, তিনি গোস্বামিপাদের কৃপা লাভ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রামদয়াল বাবু অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "তুমি তাঁহার কৃপাপাত্র, তুমিই ধন্য। তিনি আমাকেও কৃপা

করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে বড়ই জ্ঞানাভিমানী ও উদ্ধত ছিলাম। সেই অবস্থায় আমি একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। তখন তিনি গুরুর মহিমা ও গুরুভক্তির কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার কেমন দুর্ম্মতি হইল, দুর্ম্মতিই বা বলি কেন, আমার জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল, আমি তাঁহার কথার উপর বলিলাম, গুরু মূর্খ হইলেও কি তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে? আমার কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তখনই তাঁহার সম্মুখ হইতে আমাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মনে বড় ক্লেশ হইল। ঘরভরা লোকের সাক্ষাতে রুক্ষভাবে তিরস্কৃত হওয়াতে আমি অপমানে যেন মরিয়া গেলাম। গোস্বামি-পাদের উপর আমার রাগও যথেষ্ট হইল। আমি তখনই চলিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া, ইনি আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন কেন, এই কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমার মন যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় হঠাৎ যেন আমার অন্তঃকরণের কুয়াসা কাটিয়া গেল। হৃদয়ের একটা আবরণ খুলিয়া গেল। আমার দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাম। আমার মনে অনুতাপ আসিল, সেই দিন হইতে আমার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। মহাপুরুষের কৃপায় নবজীবন লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।" এই বলিয়া তিনি গোস্বামিপাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। রামদয়াল বাবুর কথা শুনিয়া কিরণ বলিলেন, এ কথা আমি শুনিয়াছি। আপনি উঠিয়া আসিলে সূর্য্যবাবু প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আজ রামদয়াল বাবুকে আপনি ধমক দিলেন কেন? আপনি ত কাহাকেও কখন কিছু বলেন না। ইহার উত্তর গোস্বামিমহাশয়

বলিলেন, আমিত তাঁহাকে ধমক দেই নাই বা তিরস্কার করি নাই। আমি তাঁহার ফোঁড়া কাটিয়া দিয়াছি। অভিমানের একটা প্রকাণ্ড ফোঁড়া তাঁহার ভিতরে ছিল, তাহাদ্বারা তাঁহার দারুণ অনিষ্ট হইবে দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, চিরিয়া দিলাম।' আমি জানি যে ইহাতে প্রথমে একটু ক্লেশ হইলেও পরিণামে মঙ্গল হইবে। কিরণের কথা শুনিয়া রামদয়ালবাবু কাঁদিতে লাগিলেন এবং ভূমিতে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ গোস্বামিপাদকে প্রণাম করিয়া কিরণকে বলিলেন, "তিনি এই কথা বলিয়াছেন! তাঁহার কথা অতি সত্য। তিনি যথার্থই আমার ফোঁড়া কাটিয়া দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। একথা আমি পূর্ব্বে শুনি নাই। আজ তোমার কাছে শুনিয়া আমার বড় উপকার হইল।"

গোস্বামিপাদ বিকাল বেলায় তেতলার ছাদে যাইয়া বসিতেন। সে সময়ে কিছুক্ষণ কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হওয়ার পর নানাবিধ সদালাপ হইত। একদিন শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী প্রভুপাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের সহিত গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ প্রণীত শাস্ত্রের বিরোধ হইলে কোন্ শাস্ত্র প্রামাণ্য হইবে? বোধ হয়, গোস্বামিদের প্রণীত শাস্ত্র। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, না; ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য হইবে। গোস্বামিদের প্রণীত শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে। দিব্যদর্শী ঋষিরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই অভ্রান্ত। ঋষিদের অনুগত হইয়াই গোস্বামিগণ তাঁহাদের সমস্ত শাস্ত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের কথার পোষকতার জন্য তাঁহারা ঋষিবাক্য প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঋষিবাক্যের সহিত না মিলিলে তাহা লোকে মানিবে কেন?

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## পুরীধামে গমন ও লীলাসংবরণ

১৩০৪ সালের ২৩শে ফাল্গুন গোস্বামিপাদ পুরী যাত্রা করেন। উক্ত সালের পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগ্‌ছি এবং স্বর্গীয় শ্রীধর ঘোষ গঙ্গাসাগর হইয়া শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখান হইতে যেদিন কলিকাতায় আসিলেন, সেই দিনই শান্তিসুধার একটি কন্যা হয়। নবকুমার বাবু ও শ্রীধর পুরী হইতে গোস্বামিমহাশয়ের জন্য মহাপ্রসাদ আনিয়াছিলেন। গোস্বামিমহাশয় শিষ্যগণের সহিত আনন্দ পূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর তিনি পুরীপ্রত্যাগত শিষ্য দ্বয়কে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গুরুকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শিষ্যদ্বয় পুরী ও জগন্নাথ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও ক্ষেত্রধামের মহিমা শুনিয়া তাঁহার পুরী যাইবার বলবতী ইচ্ছা হইল। তিনি বলিলেন, শান্তিসুধার একটি কন্যা হইয়াছে, তাহার বয়স একমাস হইলেই আমরা পুরী যাইব।

তখন কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত রেল হয় নাই। বারং হইতে পুরী পর্য্যন্ত রেল হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে যাইবার দুই পথ ছিল। এক সমুদ্র দিয়া, দ্বিতীয় ক্যানাল দিয়া। গোস্বামিপাদ সমুদ্র দিয়া যাইবার সংকল্প করিয়া আমাকে ও মণি বাবুকে সমুদ্রগামী জাহাজ দেখিতে পাঠাইলেন। আমরা জাহাজ দেখিয়া আসিয়া বলিলাম, সমুদ্র দিয়া যাইতে সব বিষয়েই সুবিধা, কেবল একটি অসুবিধা আছে। নৌকা হইতে রজ্জুর সিঁড়ি দিয়া জাহাজে উঠিতে হইবে। এইটিই

আমাদের কাছে অসুবিধা বলিয়া বোধ হইল। আমাদের কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, আমি 'রজ্জুর সিঁড়ি' দিয়া জাহাজে উঠিতে পারিব না, তোমরা ক্যানালের জাহাজ ঠিক কর। তখন পাঁচ শত টাকা ভাড়ায় একখানি ষ্টিমার ও দুই খানি বজরা ভাড়া করা হইল। একখানি বজরায় সশিষ্য গোস্বামিপাদ আরোহণ করিলেন, অন্য খানিতে শান্তিসুধা তাঁহার পুত্রকন্যা লইয়া চড়িলেন। শান্তিসুধার সহিত প্রভুপাদের শাশুড়ী এবং আরও কয়েক জন রমণী গিয়াছিলেন। তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ও আমি সেই নৌকায় রহিলাম। উমেশ বাবুর ও মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী এই বজরাতে ছিলেন। ইহা ভিন্ন অনেকগুলি শিষ্য সমুদ্র পথে জাহাজে গমন করিয়া কটকে প্রভুপাদের সহিত মিলিত হন এবং সকলে একত্রে রেলযোগে পুরীযাত্রা করেন।

২৪ শে ফাল্গুন যাইবার দিন স্থির হইল। অপরাহ্ন ২টার সময় গোস্বামিপাদ ষ্টিমার ঘাটে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতা ও মফঃসলের বহুশিষ্য ঘাটে আসিয়া জুটিলেন। তাঁহাদের সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, নয়ন জলপূর্ণ। যিনি তাঁহাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব আরাধ্য দেবতা, আজি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে চলিয়া যাইতেছেন কতদিনে আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন, জীবনে পুনরায় দেখা হইবে কিনা তাহা তাঁহারা কিছুই জানেন না। এই সকল মর্ম্মান্তিক চিন্তায় তাঁহারা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন।

জাহাজ ছাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে গোস্বামিমহাশয় সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপনারা সকলে আমাকে প্রসন্নমনে পুরীগমনে অনুমতি প্রদান করুন ; আমি যেন নির্ব্বিঘ্নে তথায় উপনীত হইয়া নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করিতে পারি। আমার যেন ধামপ্রাপ্তি

ঘটে। তাঁহার মুখে ধামপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া শিষ্যগণ শিহরিয়া উঠিলেন। এ কি নিদারুণ কথা! তবে কি ইনি পুরী হইতে ফিরিয়া আসিবেন না? আর কি ইহাঁকে দেখিতে পাইব না? সকলে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। অনেকে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। গোস্বামিমহাশয় শোকসন্তপ্ত শিষ্যগণকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া জাহাজে চড়িতে উদ্যত হইলে, শিষ্যগণ তাড়াতাড়ি পথে তাঁহাদের গাত্রবস্ত্র পাতিয়া দিলেন। তাহার উপর দিয়া ষ্টিমারে উঠিয়া তিনি জাহাজ ছাড়িবার আদেশ প্রদান করিলেন। জগন্নাথ দেবের জয়ধ্বনি করিয়া ষ্টিমার ছাড়া হইল। শিষ্যগণ চিত্রপুত্তলিবৎ অশ্রুপূর্ণনেত্রে জাহাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ ষ্টিমার দেখা গেল ততক্ষণ তাঁহারা অনিমেষনেত্রে জাহাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ষ্টিমার অদৃশ্য হইলে তাঁহারা শূন্য মনে গৃহে গমন করিলেন। বিজয়ান্তে ভক্তের যেরূপ মনের অবস্থা হয়, শিষ্যদিগের চিত্তের অবস্থা আজি তদপেক্ষাও অধিক বিষাদময়।

অপরাহ্ণে ষ্টিমার গেঁওখালি উপস্থিত হইল। এই স্থান হইতে ক্যানাল আরম্ভ। জাহাজ ক্যানালে প্রবেশ করিলে সেই স্থানেই রাত্রিযাপন করা হইল। পরদিন ক্যানালের কর্ম্মচারিগণ ভাড়া লইয়া ষ্টিমার চালাইবার আদেশ দিলে তাহা ছাড়া হইল। ক্যানালের পথে পুরী যাইতে বড়ই আরাম বোধ হয়। এই পথের নৈসর্গিক শোভার তুলনা নাই। সে শোভা দেখিলে প্রাণ পুলকিত হয়। অপ্রশস্ত খাল সরলরেখাক্রমে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, বন ও পল্লিগ্রাম ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। খালের ধারে ঝাউ এবং অন্যান্য বৃক্ষসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পথের শোভা সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। ইহা ভিন্ন লক্ (Lock) গুলিও একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। জাহাজ কোন গ্রামের

নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মুণ্ডিতমস্তক শিখাধারী কৌপীনমাত্রপরিহিত কৃষ্ণকায় উড়িয়া বালকগণ পয়সাপ্রাপ্তির আশায় উৎসুকনয়নে জাহাজের দিকে চাহিয়া ছুটিত। বালকগণকে এই ভাবে ষ্টিমারের সঙ্গে দৌড়াইতে দেখিয়া প্রভুপাদ পয়সা ছুঁড়িয়া দিতে বলিতেন। তাঁহার আদেশে পয়সা ছুঁড়িয়া দেওয়া হইত। তাহার কতক জলে পড়িয়া যাইত। যাহা তীরে গিয়া পড়িত তাহা লইবার জন্য বালকদের মধ্যে হুড়াহুড়ি ও মারামারি আরম্ভ হইত। অধিকবয়স্ক বলিষ্ঠ বালকগণই পয়সাগুলি পাইত। অল্পবয়স্ক বালকগণ পয়সা না পাইয়া আবার ষ্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইত। তাহাদিগকে দৌড়াইতে দেখিয়া প্রভুপাদের মনে বড়ই ক্লেশ হইত। তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন, আহা! এই বালকগুলি পয়সা পাইল না। একদিন তিনি এইরূপ ঘটনা দেখিয়া বিধুবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেহ যদি উপরে যাইয়া ইহাদিগকে পয়সা দিয়া আসিতে পারে, তবে ইহারা পাইবে, নতুবা পাইবে না। বড় ছেলেরাই পয়সা পাইতেছে, ইহারা একবারও পাইতেছে না। তাঁহার কথা শুনিয়া বিধুবাবু কিছু পয়সা লইয়া ষ্টিমার হইতে জলে পড়িলেন এবং সন্তরণ দ্বারা তীরে গিয়া বালকদিগকে পয়সা দিয়া আবার ষ্টিমারে আসিলেন। এই হইতে বিধুবাবু প্রতিদিনই সাঁতার দিয়া যাইয়া বালকগণকে পয়সা দিয়া আসিতেন। পয়সা পাইয়া বালকগণ আনন্দে নৃত্য করিত, ইহা দেখিয়া প্রভুপাদ হাস্য করিতেন।

চার্টার করা ষ্টিমার গোস্বামিপাদের ইচ্ছামত পরিচালিত হইত। সকাল বেলা বিধু ও আমি পয়সা ও পাত্র লইয়া দুগ্ধের জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লিগ্রামে যাইতাম। সে সময়ে ষ্টিমার ধীরে ধীরে যাইত। আমরা দুধ লইয়া আসিলে লঞ্চ তীরে লাগিত। সেই স্থানে খালের ধারে উনন করিয়া লুচি [মোহনভোগ ও চা] প্রস্তুত এবং দুধ জ্বাল দেওয়া

হইত। অতঃপর গোস্বামিমহাশয় মোহনভোগের সহিত চা পান করিতেন। আমরাও লুচি মোহনভোগের দ্বারা প্রাতরাশ সম্পন্ন করিতাম। খাওয়া শেষ হইলে আবার ষ্টিমার চলিত। খালের ধারে কিছু দূরে দূরে অনেক ডাকবাঙ্গালা আছে। মধ্যাহ্ন সময়ে কোন ডাকবাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া স্নানাহার করা হইত। সেই সময়েই রাত্রিকালের খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইত। আহার শেষ হইলে ষ্টিমার আবার চলিত। কোন বাধা না হইলে ষ্টিমার প্রায় সমস্ত রাত্রি চালান হইত।

গোস্বামিমহাশয় দোলযাত্রার পূর্ব্বদিন পুরী রওনা হইয়াছিলেন। দোলের দিন গুরুদেবের পাদপদ্মে আবির দিবার জন্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ ঘোষ অনেক ফাগ্ সঙ্গে লইয়াছিলেন। দোলের দিন মধ্যাহ্ন সময়ে এক ডাকবাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া সকলে পরমানন্দে গুরুপদে আবির দিলেন। গোস্বামিমহাশয়ও সকলের সহিত আনন্দ করিয়া আবির খেলিলেন। এইরূপে দোলযাত্রার আনন্দ সম্ভোগ হইল। সেই দিনের আনন্দস্মৃতি মনে উদিত হইয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে। আমাদিগের সেই আনন্দের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না। সে আনন্দবাজার চিরকালের জন্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই সুখস্মৃতি মনে করিয়া শোকক্লিষ্ট মনে অশ্রুপাত করা ভিন্ন আমাদের আর কি উপায় আছে?

মেদিনীপুর জেলায় হল্‌দে নামে একটি নদী আছে। এই নদীতে বহু কুম্ভীরের বাস। এই নদী দিয়া যখন ষ্টিমার যাইতেছিল, তখন অকস্মাৎ রমণীদিগের বজরার হাল ভাঙ্গিয়া নৌকা অত্যন্ত বিপন্ন হইল। তীরস্থ সকলে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। গোস্বামিমহাশয় অন্য বজরায় ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি

নৌকার সম্মুখভাগে আসিয়া সকলকে অভয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার অভয়বাণী শুনিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। এদিকে মাঝিগণ তাড়াতাড়ি একটি দাঁড় খুলিয়া হালে লাগাইয়া নৌকা ঠিক করিয়া লইল। ষ্টিমার পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। আর একদিন একখানি বজরা দড়ি ছিঁড়িয়া ষ্টিমার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে দিনও নৌকা খানি ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া যায়। ষ্টিমার মহানদীতে প্রবেশ করিবার সময়েও দড়ি ছিঁড়িয়া যাওয়াতে বজরা দুইখানি বিপন্ন হইয়াছিল। সে দিনও গোস্বামিপাদ ক্ষিপ্র আসিয়া সকলকে অভয় দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এই সময়ে প্রভুপাদকে ভিন্নমূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, এক তুষার-ধবল জটাজূটধারী বিরাট পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে অভয় দান করিতেছেন।

২৯ শে ফাল্গুন অপরাহ্নে গোস্বামিমহাশয়ের ষ্টিমার কটকে উপনীত হইল। যাঁহারা সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন তাঁহারা প্রভুপাদের জন্য কটকে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদের ষ্টিমার আসিতেই তাঁহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেদিন ষ্টিমারেই অবস্থিতি করা হইল। পরদিন সূর্য্যোদয়ের সময় গোস্বামি-মহাশয় দুই হাতে দুইখানি দশ টাকার নোট লইয়া এক পাদ নৌকায় এবং অপর পাদ তীরে সংলগ্ন করিয়া ষ্টিমারের নাবিকগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "নাবিকগণ ও মাঝিমাল্লারা! তোমরা এই পথে কত রাজা, জমিদার, সাধু মহাজনকে লইয়া আসিয়া আশাতীত পুরস্কার পাইয়াছ, আমার আকাশবৃত্তি। শ্রীভগবান্ তোমা-দিগকে ইহাই দিতেছেন।" ইহা গ্রহণ করিয়া তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।" প্রভুপাদ যখন এই কথা কয়টী উচ্চারণ করিতে-

ছিলেন, তখন উদীয়মান সূর্য্যের অরুণ কিরণছটা তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রতিফলিত হওয়াতে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার সেই সময়কার সকরুণ ভাব, অমিয়বর্ষী মূর্ত্তি এবং মধুময় ভাষা সকলের চিত্তকে অভিভূত করিল। নাবিকগণ পুরস্কার পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

অতঃপর প্রভুপাদ অশ্বশকটে বারং ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে কেহ ঘোড়ার গাড়িতে, কেহ গোযানে চলিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে সকলে বারং ষ্টেসনে উপনীত হইয়া ট্রেণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বারং একটি ক্ষুদ্র ষ্টেসন। সে স্থানে খাদ্যবস্তু কিছুই পাওয়া গেল না। সকলেই অভুক্ত অবস্থায় রেলে উঠিলেন। আমার সঙ্গে চারিটি শিশু অভুক্ত। গাড়িতে উঠিয়া তাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল। গাড়ি খুরদা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে শান্তি দেবী আমাকে বলিলেন, ছেলেরা ত আর বাঁচে না। দেখত খাবার পাওয়া যায় কি না?

দুইটি টাকা লইয়া আমি খাবারের অনুসন্ধানে যাইব এমন সময় গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, দু টাকার খাবারে হইবে না, তুমি বেশী করিয়া খাবার কেন। আমারও অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি আরও তিন টাকা দিলেন। আমি, পাঁচ টাকার মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনিলাম। গোস্বামিমহাশয় বালকদিগকে দিয়া নিজে কিছু আহার করিলেন, আমরাও প্রসাদ পাইলাম।

এই স্থানে শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী 'বিমলা দেবী গোস্বামিমহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করেন। গোস্বামিমহাশয় বিমলা দেবীর আগমন বৃত্তান্ত সকলকে বলিয়া শান্তিসুধার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমার মেয়ের নাম বিমলা রহিল।

অপরাহ্নে গাড়ি পুরী ষ্টেসনে উপনীত হইল। পুরী ষ্টেসন এখন সমুদ্রতীরে অবস্থিত; তখন অন্য স্থানে ছিল। গাড়ি হইতে নামিয়া প্রভুপাদ আমাকে বলিলেন, তুমি একখানি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া শান্তি ও ছেলেদিগকে লইয়া যাও। আমি তাহাই করিলাম। পাণ্ডারা পূর্ব্বেই তাঁহার জন্য একখানি বাড়ী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বাড়ী বড়ডাণ্ড নামক রাস্তার উপরে এবং ইহার নাম নরসিংহ কোঠা। আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া প্রভুপাদ পদব্রজে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর যাইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য তিনি এক স্থানে উপবেশন করিলেন। এই স্থানে তাঁহার পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। পরে তাঁহার সহিত রওনা হইলেন। আঠারনালায় উপস্থিত হইলে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির তাঁহার নয়নগোচর হইল। মন্দির দর্শনমাত্র তাঁহার অন্তরে প্রেমের তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া ফেলিল। তিনি ভাবে মাতোয়ারা ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। লোচনযুগল হইতে প্রেমবারি বিগলিত হইতে লাগিল। শরীরে স্বেদ কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। রুগ্ন, অথর্ব্ব শরীরে মত্তহস্তীর বল আগমন করিল। যে চরণদ্বয় অবশপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে বিপুল বলের সঞ্চার হইল। তিনি শিষ্যগণকে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। সঙ্গেই মৃদঙ্গ ও করতাল ছিল। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। হরিনামের উচ্চধ্বনিতে পুরীর আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। গোস্বামিপাদের উচ্চ হরিধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুরীবাসিগণ অবাক্ হইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল। ক্ষেত্রবাসিদিগের ভাগ্যে এই প্রকার নৃত্যদর্শন একবার ঘটিয়াছিল। চারিশত

বর্ষ পূর্ব্বে ক্ষেত্রবাসিগণ গৌরাঙ্গসুন্দরের মধুর নৃত্য দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সে নৃত্যের কথা তাঁহাদের নিকট প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। প্রভুপাদ যতই শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রেমের স্রোত, ভাবের বেগ প্রবল হইতে লাগিল। সিংহবিক্রমে তিনি নাচিয়া চলিলেন। কোথায় গেল তাঁহার শারীরিক দুর্ব্বলতা, কোথায় গেল দেহের স্থবিরতা। তিনি আজ অযুত মত্তহস্তীর বলে বলীয়ান্। এইরূপে নৃত্য করিতে করিতে পাণ্ডানির্দ্দিষ্ট ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কীর্ত্তন থামিল। তিনি বাসস্থানে উপনীত হইয়া উপবেশন করিলেন। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াই তিনি ধূলিপায়ে ঠাকুরদর্শনে যাইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার এই প্রকার উদ্যম দেখিয়া পাণ্ডাগণ বলিলেন, আগে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুণ, পরে দর্শনে যাইবেন। প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই ঠাকুর দর্শনের নিয়ম। প্রসাদের ব্যবস্থা তাঁহারা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবিধ উপাদেয় প্রসাদ আনীত হইলে গোস্বামিপাদ সকলের সহিত বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। খাইতে খাইতে তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন, এস আমার পাতে এক সঙ্গে প্রসাদ পাও। তাঁহার কথা শুনিয়া শিষ্যগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং তাঁহার পাত্র হইতে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি অনিমেষনয়নে জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রভৃঙ্গ নীলাচলনাথের মুখপদ্মে গাঢ়-ভাবে সংলগ্ন হইল। সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি লোচনদ্বয়ে আনিয়া যেন তিনি নীলাদ্রিনাথের বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। ভগবানের মুখকমল দেখিয়া যেন কিছুতেই তাঁহার পিপাসা মিটিতেছে না। তিনি

কিছুতেই চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। এইরূপে অনেকক্ষণ দর্শন করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। পরে বিমলা, লক্ষ্মী, সত্যভামা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলেন।

পাণ্ডাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে তিনি কেবল এক রাত্রি বাস করিয়াছিলেন। এই বাড়ী মনোনীত না হওয়ায় তিনি পরদিন ভূত-পূর্ব্ব ডিপুটি কালেক্টর ৺নীলমণি বর্ম্মণের বাড়ী বার্ষিক সাড়ে পাঁচ শত টাকায় ভাড়া করিয়া সেই খানে উঠিয়া গেলেন। এই বাড়ীতে তিনি পনর মাস বাস করিয়াছিলেন। তিনি একদিন বলিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাকে পুরীধামে তৈলধারার ন্যায় একবৎসর বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহারই আদেশে আমি এখানে আসিয়াছি। তোমরাও অবিচ্ছেদে একবৎসর ক্ষেত্রবাস কর। তাহা হইলে চারিধাম করিবার ফল পাইবে। এক বৎসরের মধ্যে তিনি আমাদিগকে পুরীর বাহিরে রাত্রিবাস করিতে দেন নাই। আমরা একবার সাক্ষীগোপাল দেখিতে গিয়াছিলাম। যাইবার সময়ে তিনি আমাদিগকে সাক্ষীগোপালে রাত্রিবাস করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। ভুবনেশ্বরে গেলে সেই দিন পুরীতে ফিরিয়া আসা যায় না। সেখানে রাত্রিবাস করিতে হয়, এইজন্য তিনি আমাদিগকে ভুবনেশ্বরে যাইতে দেন নাই। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত উৎকলখণ্ডস্থ পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ও একাম্রকাননের (ভুবনেশ্বরের) বৃত্তান্ত এই স্থানে অতি সংক্ষেপে সংকলিত হইল।

শ্বেতবরাহ কল্পের স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রথম সত্যযুগে অবন্তিদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক নরপতি বাস করিতেন। তিনি ব্রহ্মার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। নানা দেশের অদ্ভুত ঘটনাবলি শুনিতে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। একদিন একজন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমণ করিতে

করিতে অবন্তিদেশে উপস্থিত হইয়া রাজার অতিথি হন। রাজা অতিথির যথোচিত পূজা করিয়া বিনয়বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি তীর্থপর্য্যটনোপলক্ষে নানাদেশে গমন করিয়াছেন। সেই সকল দেশে আপনি যাহা কিছু বিস্ময়কর বস্তু বা ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বলিলে আমি আপ্যায়িত হইব। আপনার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবরণ শুনিবার জন্য আমার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে। নৃপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন :—মহারাজ! দেশপর্য্যটন সময়ে আমি যে সকল আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখিয়াছি, তন্মধ্যে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী উৎকল দেশের বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। দক্ষিণবাহিনী ঋষিকুল্যা নদী এবং সুবর্ণরেখা ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ পুরুষোত্তমক্ষেত্র নামে অভিহিত। তাহার পরিমাণ দশ যোজন। তথায় নীলগিরি নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত নিবিড় কাননে আবৃত। তথায় অক্ষয়বট নামে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ও রোহিণীকুণ্ড নামে এক সরোবর আছে। ঐ কুণ্ডের পূর্ব্বতটে নীলকান্তমণিনির্ম্মিত নীলমাধব নামে ভগবান্ বাসুদেবের এক মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। যে মানব রোহিণীকুণ্ডে স্নান করিয়া নীলমাধব দর্শন করে, তাহার এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। নীলমাধবের অনতিদূরে এক শবরপল্লী আছে; বিশ্বাবসু নামক একজন বর্ষীয়ান্ শবর নীলমাধবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। একদিন দেখিলাম একটি কাক তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া রোহিণীকুণ্ডের জল পান করিল। কুণ্ডের জলের এমনই অপূর্ব্ব মহিমা যে জলস্পর্শমাত্র সেই কাক বায়সদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের পার্ষদদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি ব্রাহ্মণের নিকট এই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া

তাঁহার পুরোহিতকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি পরিব্রাজকের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিলেন। এক্ষণে আপনাকে উৎকল দেশে যাইয়া ভগবান্ নীলমাধবের সমস্ত সংবাদ জানিয়া আসিতে হইবে। রাজার কথা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন, মহারাজ! আমি দেশভ্রমণে তাদৃশ পটু নহি। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতি সর্ব্বদা নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া থাকে। আপনি তাহাকে উৎকল দেশে প্রেরণ করুন। সে নীলমাধবের সমস্ত সংবাদ আনিয়া আপনার আকাঙ্খা পূর্ণ করিবে। পুরোহিতের কথা শুনিয়া রাজা বিদ্যাপতিকে উৎকল দেশে প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাপতি তথায় যাইয়া বিশ্বাবসু শবরের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিলেন। বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির যথাবিহিত আতিথ্যসৎকার করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যাপতি বলিলেন, অবন্তিদেশের অধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই নীলাচলে সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ ভগবান্ নীলমাধব বিরাজিত আছেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব এবং তাঁহার সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া নরপতির নিকটে গিয়া বলিব। আমি ফিরিয়া গেলে রাজা নীলমাধবকে দেখিবার জন্য নীলাচলে আসিবেন। নীলমাধবকে দেখিবার জন্য তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, হায়! এত দিনে নীলমাধব আমার প্রতি বিমুখ হইলেন।

বিদ্যাপতি। নীলমাধব তোমার প্রতি বিমুখ হইবেন কেন? এ কথা বলিতেছ কেন? ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নীলমাধব দর্শন করিলে তোমার কি কিছু ক্ষতি হইবে?

বিশ্বাবসু। মহাশয়! আমার সর্ব্বনাশের দিন উপস্থিত। এই

প্রকার কিম্বদন্তী আছে যে অবন্তিদেশের অধিপতি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধব দর্শন করিবার জন্য আসিবেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না। নীলমাধব রাজাকে দর্শন দিবেন না। নরপতির উৎকলদেশে আগমনের পূর্ব্বেই ভগবান নীলমাধব স্বর্ণ-বালুকার ভিতরে বিলীন হইবেন। (১) ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের দর্শন না পাইয়া যারপরনাই কাতর হইয়া অনেক বিলাপ করিবেন। সেই সময়ে এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য তাঁহার প্রতি দৈববাণী হইবে। দেবাদেশে তিনি এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ভগবান্ দারুব্রহ্মরূপে প্রকটিত হইবেন। ভগবান্ নীলমাধব এত দিন আমাকে যে কৃপা করিতেছিলেন, অতঃপর আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। সকলই প্রভুর ইচ্ছা।

অনন্তর যে পর্ব্বতগহ্বরে নীলমাধব বিরাজিত ছিলেন, তথায় বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে লইয়া গেলেন। বিদ্যাপতি নীলমাধবকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বিশ্বাবসু তাঁহাকে ভগবানের প্রসাদ ও নির্ম্মাল্য প্রদান করিলেন। বিদ্যাপতি প্রসাদভক্ষণ ও মস্তকে নির্ম্মাল্যধারণ করিয়া পবিত্র হইলেন। অতঃপর তিনি অবন্তিদেশে প্রত্যাগত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নীলমাধবের সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ ও নির্ম্মাল্য প্রদান করিলেন। রাজা ভগবৎ নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তির সহিত মস্তকে নির্ম্মাল্য ধারণ ও প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন। পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ নীলমাধবের মহিমা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন,

(১) শ্রীক্ষেত্রের বালুকা স্বর্ণ বালুকা।

বিদ্যাপতির নিকট রাজা সেইরূপই শুনিলেন। বিদ্যাপতি বিশ্বাবসুর নিকট ভগবান্ নীলমাধবের অন্তর্ধান হইবার কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা নরপতির নিকট প্রকাশ করিলেন না। রাজা নীলমাধবকে দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক ভগবান্ দারুব্রহ্মরূপে প্রকটিত হইবেন, ইহা অবগত হইয়া ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। দেবর্ষি অবন্তিদেশে উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা রাজধানী নীলাচল স্থানান্তরিত করিলেন। নীলাচলে আসিবার পথে তিনি শুনিলেন যে নীলমাধব অপ্রকটিত হইয়াছেন। ভগবানের অন্তর্ধান সংবাদে রাজা যারপরনাই কাতর হইলেন। মনের কষ্টে তিনি প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিলেন। তাঁহাকে প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প জানিয়া দেবর্ষি বলিলেন, মহারাজ! আপনি প্রায়োপবেশন করিবেন না। ভগবান্ যমের প্রার্থনায় নীলমাধব স্বর্ণবালুকাতে বিলীন হইয়াছেন। এ মূর্ত্তিতে তিনি আর প্রকটিত হইবেন না। দারুব্রহ্মরূপে তিনি প্রকাশিত হইয়া পাতকী উদ্ধার করিবেন। আপনি নৃসিংহদেবের এক মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। যজ্ঞ শেষ হইলেই ভগবান্ দারুব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইবেন। দেবর্ষির কথা শুনিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন। এবং নৃসিংহমূর্ত্তি স্থাপন ও এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। (১) যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা অবভৃথস্নানের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে সমুদ্রে এক অপূর্ব্ব দারু ভাসিয়া আসিয়াছে। সেই কাষ্ঠের সর্ব্বাঙ্গ শংখচক্রগদাপদ্ম চিহ্নে চিহ্নিত। রাজা এই অদ্ভুত

(১) ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের পার্শ্ববর্ত্তী নৃসিংহ মূর্ত্তিই এই নৃসিংহমূর্ত্তি।

কাষ্ঠের কথা শুনিয়া তখনই সমুদ্রতীরে যাইলেন এবং অতি সমারোহের সহিত পূজা করিয়া সেই অপূর্ব্ব দারু আনিয়া এক বেদীর উপর স্থাপন করিলেন।

অনন্তর রাজা ও দেবর্ষি ভগবানের বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইবার জন্য কারিগর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আকাশবাণী হইল, হে রাজন্! ভগবানের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। যে বেদীতে কাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছে, আবরণ দিয়া তাহা ঢাকিয়া দাও। মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য একজন বৃদ্ধ কারিগর উপস্থিত হইবে। তাহাকেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ভার দিও। এই কার্য্য শেষ হইতে পনর দিন লাগিবে। এই পনর দিন বেদীর আবরণের মধ্যে সেই বৃদ্ধ কারিগর ভিন্ন অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। ভগবদ্বিগ্রহ গোপনে নির্ম্মিত হইবে। যে কেহ তাহা দেখিবে, তাহার সমূহ অকল্যাণ হইবে।

অতঃপর সেই কারিগর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পঞ্চদশ দিনে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় নির্ম্মাণ করিয়া দিল। মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। তখন রাজা ও দেবর্ষি দেবতা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মাকে আনিতে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মার সভায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় সামগান হইতেছে। গান সমাপ্ত হইলে তাঁহারা ব্রহ্মাকে মর্ত্তে আসিয়া জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করিবার অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা ব্রহ্মলোকে আসিয়া যে সময়টুকু সামগান শ্রবণে অতিবাহিত করিয়াছ, তাহাতে ভূমণ্ডলে এক মন্বন্তর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তোমরা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এখানে আসিয়াছ। এক্ষণে স্বারোচিষ মন্বন্তরের প্রথম সত্যযুগ আরম্ভ হইয়াছে। অতঃপর তিনি

ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, এখন তোমার বংশের কেহ পৃথিবীতে বর্ত্তমান নাই। অনেক ভূপতি রাজত্ব করিয়া কালকবলে পতিত হইয়াছে। অতএব তোমরা অগ্রে যাইয়া দেখ মন্দির ও বিগ্রহ কি অবস্থায় আছে। আমি পরে যাইতেছি। ব্রহ্মার কথা শুনিয়া রাজা ও দেবর্ষি পৃথিবীতে আসিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মার কথাই ঠিক। তাঁহার বংশের কেহই নাই। গাল নামে এক রাজা উৎকল দেশে রাজত্ব করিতেছেন। গাল মন্দির হইতে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের মূর্ত্তি সরাইয়া দিয়া নীলমাধবের দারুময় বিগ্রহস্থাপন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া গাল রাজার নিকট দারুব্রহ্মের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে গাল যে স্থানে বিগ্রহচতুষ্টয় রাখিয়া দিয়াছিলেন অবন্তীপতিকে তথায় লইয়া গেলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত মন্দিরে জগন্নাথ প্রভৃতি বিগ্রহচতুষ্টয় স্থাপন করিয়া নীলমাধবকে ভিন্ন মন্দিরে রাখিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা মর্ত্তে আসিয়া দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিষ্ঠান্তে জগন্নাথ ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতিকে বরপ্রদান করিয়া বলিলেন, আমি তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ব্রহ্মার পঞ্চাশ বৎসর এই নীলাচলে বাস করিব। এই ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ অর্থাৎ ইহাঁর পরমায়ুর পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছে, আর এক পরার্দ্ধ (পঞ্চাশ বৎসর) অবশিষ্ট আছে। এই পরার্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর আমি নীলাদ্রিতে অবস্থান করিব। এই ব্রহ্মা কলেবর পরিত্যাগ করিলে আমি এই স্থান ছাড়িয়া যাইব। এখানে মন্দির না থাকিলেও আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিব না।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রের আর এক বিখ্যাত তীর্থ ভুবনেশ্বর। শাস্ত্রে এই স্থানকে একাম্রকানন বলা হইয়াছে।

এই তীর্থ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ শূলপাণি

হিমালয়কুমারী উমাদেবীকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে হিমালয়পত্নী মেনকাদেবী অতিশয় বিরক্ত হইয়া দুহিতাকে অপ্রিয় কথা বলেন। উমাদেবী মাতার অপ্রিয় বাক্যে অপমান বোধ করিয়া পতিকে স্থানান্তরে গমন করিতে অনুরোধ করেন। ভগবান্ বিশ্বনাথ জগজ্জননীর বাক্যে কাশীধাম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে মহাদেবের প্রিয়ভক্ত কাশীরাজের সহিত বিষ্ণুর বিবাদ উপস্থিত হয়। ভগবান্ অচ্যুত কাশীরাজের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া চক্রাগ্নিতে বারাণসী ভস্মীভূত করেন। তখন মহাদেব নিরাশ্রয় ও অতিশয় বিপন্ন হইয়া কমলাকান্তের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার কাছে বাসস্থান প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু শংকরের প্রার্থনায় ক্ষেত্রধামের অন্তর্গত একাম্রকানন তাঁহাকে প্রদান করেন। মহাদেব তথায় পুরী নির্ম্মাণ করিয়া ভবানীর সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই দুই তীর্থ ভিন্ন সাক্ষী-গোপাল ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে আর দুই দেবতা আছেন।*

এক দিন গোস্বামিমহাশয় বলিলেন যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আমাকে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া তৈলধারার ন্যায় এক বৎসর বাস করিতে বলিয়া-ছেন। তাঁহার আদেশেই আমি এখানে আসিয়াছি। আমি একবৎসর এখানে বাস করিব।

প্রভুপাদ একে একে পুরীর দ্রষ্টব্য স্থান মার্কণ্ডেয় সরোবর, শ্বেতগঙ্গা, সমুদ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, মহাপ্রভুর গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল বা

* সাক্ষীগোপাল সত্যবাদীনামক গ্রামে এবং ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রেমুণাতে বিরাজিত আছেন। ইহাঁদিগের বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এজন্য এখানে বিবৃত হইল না।

হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান, টোটার গোপীনাথ; চটক পর্ব্বত, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শঙ্করাচার্য্যপ্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন মঠ, লোকনাথ নামক প্রসিদ্ধ মহাদেব, চক্রতীর্থ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, গুণ্ডিচা মন্দির প্রভৃতি দর্শন করিলেন।

পুরীধামে যতগুলি ক্ষেত্রপাল মহাদেব আছেন, লোকনাথ মহাদেব তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাধিক প্রভাবশালী। সকলেই লোকনাথকে অতিশয় ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রভুপাদ পুরী যাইবার কয়েক দিন পরে সশিষ্যে লোকনাথের মন্দিরে গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করেন এবং তাঁহার সেবার জন্য পাণ্ডাদের হাতে অনেক অর্থ প্রদান করেন। শিবরাত্রির দিনও তিনি শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া লোকনাথে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেদিনও তিনি লোকনাথের পাণ্ডাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈশাখমাসে নরেন্দ্র সরোবর নামক পুষ্করিণীতে জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা হয়। প্রতিবৎসর অক্ষয়তৃতীয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া একুশ দিন ৺মদনমোহন ৺জগন্নাথদেবের প্রতিনিধিরূপে নৌকা বিহার করিয়া থাকেন। ইহাই চন্দনযাত্রা নামে অভিহিত (১)। প্রভুপাদ প্রতিদিন অপরাহ্নে শিষ্যগণের সহিত নরেন্দ্রের তীরে যাইয়া চন্দনযাত্রা দেখিতেন। এই যাত্রা উপলক্ষে তিনি পাণ্ডাদিগকে অনেক অর্থ দিয়াছিলেন।

চন্দনযাত্রা দর্শন সময়ে এক দিন তিনি নরেন্দ্রের উত্তর তীরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে আমি ঐ স্থানে একটি সুন্দর মন্দির

(১) নরেন্দ্র সরোবরের অন্য নাম চন্দনতালাও। পুরীর রাজার মন্ত্রী নরেন্দ্রদেব এই সরোবর খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম নরেন্দ্রসরোবর হইয়াছে। চন্দনযাত্রা হয় বলিয়া লোকে ইহাকে চন্দনতালাও বলিয়া থাকে।

দেখিতে পাইতেছি। দেহত্যাগের পর তাঁহার সমাধির উপর যে মন্দির নির্ম্মিত হইবে দিব্যদৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিয়া তিনি পূর্ব্বেই তাহার... প্রদান করিলেন। কিন্তু তখন কেহই তাঁহার এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আর একদিন বলিলেন যে জগন্নাথ চন্দনযাত্রার সময়ে নরেন্দ্রের জলে বিহার করেন, এজন্য সমস্ত তীর্থ এখানে আগমন করিয়াছেন।

চন্দনযাত্রার পর স্নানযাত্রা হয়। চান্দ্র জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হইয়া থাকে। স্নানযাত্রার সময় জগন্নাথ ও বলরাম পদব্রজে স্নানবেদীতে আগমন করেন। দয়িতা নামধারী শবর পাণ্ডাগণ তাঁহাদিগের দুইজনকে ধরাধরি করিয়া বিজয় করায়। জগন্নাথ ও বলরামের এই বিজয়কে উড়িষ্যাবাসিগণ "পহণ্ডি" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। গোস্বামিমহাশয় সাঙ্গোপাঙ্গে ভগবানের শুভ বিজয় দর্শন করিয়া স্নান দেখিবার জন্য স্নানবেদীর সমীপস্থ হইলেন। কিন্তু দয়িতা পাণ্ডাগণ টাকা না পাইলে তাঁহাকে স্নান বেদিতে যাইতে দিতে সম্মত হইল না। তাহারা তাঁহার নিকট অনেক বেশী টাকা চাহিল। গোস্বামিপাদ তাহাদের প্রার্থিত অর্থ দিতে সম্মত না হওয়ায় তাহারা তাঁহাকে স্নানবেদীতে যাইতে দিল না। দয়িতাদিগের এই দুর্ব্যবহারে প্রভুপাদ সাতিশয় বিরক্ত হইয়া স্নানের স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন এবং জগন্নাথের মন্দিরে যাইয়া বসিলেন। কিছু কাল পরে তিনি সকলকে বলিলেন যে দয়িতারা ত আমাকে স্নান করিতে যাইতে দিল না, কিন্তু জগন্নাথদেব দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার স্নানযাত্রা দেখাইলেন। সমস্ত দেবতা অন্তরীক্ষে সমবেত হইয়া রত্নময় সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া মন্দাকিনীর পবিত্র জলে তাঁহার স্নানক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। আমি অপ্রাকৃত স্নানযাত্রা দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

পাণ্ডাদিগের অনুষ্ঠিত স্নানযাত্রা না দেখাতে আমার কি ক্ষতি হইল ? এদিকে দয়িতাগণ গোস্বামিপাদকে স্নানের স্থান হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নরম হইল এবং তাঁহার নিকট আসিয়া অনুনয়পূর্ব্বক তাঁহাকে স্নানবেদীতে লইয়া গিয়া স্নানযাত্রা দেখাইল। গোস্বামিমহাশয় দয়িতাদিগের দুর্ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া পরে তাহাদের আশাতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিলেন।

পুরীতে যাইয়াই তিনি আমাকে পঞ্চতীর্থে শ্রাদ্ধাদি করিবার আদেশ দিয়া বলেন যে পঞ্চতীর্থ করিবার সময়ে দাউজীকে সঙ্গে লইয়া যাইও। শ্রাদ্ধস্থানে দাউজী উপস্থিত থাকে, তোমার পিতৃপুরুষগণ ইহা ইচ্ছা করেন। প্রভুপাদের আদেশে আমি দাউজীকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চতীর্থের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করি। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে দাউজী আমাকে বলিল, বাবা, আমি তোমার বাবাকে হাত পাতিয়া তোমার প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি।

গোস্বামিমহাশয় প্রতিদিন সমুদ্রে স্নান করিতেন। রথযাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্বে স্নান করিবার সময়ে সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে তাঁহার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। তাঁহার পায়ে দারুণ ব্যথা হওয়াতে তিনি চলিতে পারিতেন না। অতি কষ্টে লাঠি ভর দিয়া তাঁহাকে শৌচাগারে যাইতে হইত।

জগন্নাথদেবের প্রধান পর্ব্ব রথযাত্রার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। পুষ্যাসংযুক্ত দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথদেবকে রথে দর্শন করিলে মানুষের আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এই দর্শনকে বামন-দর্শন বলে। গোস্বামিপাদ দ্বিতীয়া তিথিতে রথস্থ বামন দর্শন করিবার জন্য একখানি তামদান (খোলা পাল্‌কি) ও কয়েক জন বেহারা আনাইয়া আশ্রমে রাখিলেন। এবং জনৈক শিষ্যকে বলিলেন,

দ্বিতীয়ার মধ্যে ঠাকুর রথস্থ হইলে তুমি আমাকে সংবাদ দিও। পাণ্ডারা ঠাকুরকে দ্বিতীয়াতে রথে তুলিল না। দ্বিতীয়া অতীত হইয়া গেলে তাহারা জগন্নাথদেবকে রথস্থ করিল। দ্বিতীয়াতে ঠাকুর রথস্থ না হওয়াতে গোস্বামিপাদ জগন্নাথদর্শনে গেলেন না। বলিলেন, এখন দর্শন করিলে বামনদর্শন হইবে না। মন্দিরে দর্শন করিলে যাহা হয়, তাহাই হইবে।

প্রভুপাদের ৺পুরীধামে যাইবার পূর্ব্ব হইতে পুরীর মিউনিসিপালিটি বানর হত্যা করিতেছিল। বানরগণ লোকের উপরে অত্যাচার করে, তাহাদের দ্বারা লোকের বহু ক্ষতি হয়, এই কারণে মিউনিসিপালিটি কতকগুলি শীকারী নিযুক্ত করিয়াছিল। শীকারীরা বানর দেখিলেই বন্দুকের গুলিতে তাহাদিগকে বধ করিত। প্রতিদিন এইরূপে নিরপরাধ বানরগণের শোণিতে বিষ্ণুক্ষেত্র ক্ষেত্রধামের পবিত্র ভূমি কলঙ্কিত হইত। তীর্থস্থানে এই ভাবে নিরীহ প্রাণীর হিংসা দেখিয়া তীর্থগামী ধর্ম্মপ্রাণ সহৃদয় মানবমাত্রেরই যারপরনাই ক্লেশ হইত। এই পাপকার্য্য দর্শন করিয়া তাঁহারা নীরবে অশ্রুপাত করিয়া নিরস্ত হইতেন। কেননা এই পাপানুষ্ঠান নিবারণ করিবার তাঁহাদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না। গোস্বামিমহাশয় পুরীতে উপনীত হইয়া এই বীভৎস ব্যাপার দর্শন করিয়া যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। অপরের ক্লেশানুভূতি যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেন ; অন্য কেহ শীতে কষ্ট পাইলে যাঁহার শরীরে কম্প উপস্থিত হয়, অপরে কোন প্রকার আঘাত পাইলে যিনি আপন শরীরে সেই ক্লেশ ভোগ করেন ; অপরের ক্ষুৎপিপাসা যাঁহার নিকট নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণার ন্যায় অনুভূত হয় ; সেই দয়ার অবতার মহাপুরুষের কুসুমকোমল হৃদয় যে বানর-নিক্ষেপ মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুরকাণ্ডে অতিশয় ক্লিষ্ট হইবে, বানরগণের মর্ম্মভেদ

মরণযন্ত্রণা যে তিনি নিজের মৃত্যুযন্ত্রণার ন্যায় অনুভব করিবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

নিষ্ঠুর শীকারীগণ দুই দিন তাঁহার আশ্রমের ছাদে বন্দুকের গুলিতে অতি নির্ম্মমভাবে কয়েকটী বানর বধ করিল। ইহাতে তাঁহার কোমল প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিল। সমুদ্রস্নান হইতে প্রত্যাগমন সময়ে শীকারীগণকর্ত্তৃক নিহত পথপার্শ্বে স্থাপিত রক্তমাখা কয়েকটি মৃত বানর দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ উপস্থিত হইল। এই হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন, এই নিষ্ঠুর কার্য্য দূর করিতেই হইবে। যেমন করিয়া পারি আমি বানরবধ বন্ধ করিব। প্রথমে ইংরেজ রাজের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিব, সেখানে সিদ্ধকাম হই ভালই; নচেৎ সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া সমুদায় রাজা মহারাজা ও হিন্দু নরনারীর নিকটই আমি এই সকরুণ মর্ম্মান্তিক দুঃখসংবাদ প্রচার করিয়া তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিব। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত পদব্রজে পর্য্যটনপূর্ব্বক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুদিগের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিব, ভাই সকল, পবিত্র তীর্থস্থানের শোচনীয় দুর্দ্দশা একবার চাহিয়া দেখ, বিষ্ণুক্ষেত্র পুরীধাম বানর-শোণিতে প্রতিদিন কিরূপ অপবিত্র ও কলুষিত হইতেছে, তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তোমরা সকলে একত্র হইয়া এই বীভৎস ব্যাপার, এই নিষ্ঠুর পাপকার্য্য নিবারণ কর। সমগ্র হিন্দুসমাজ এই কার্য্যের প্রতিকারকল্পে যত্ন করিলে ইহা উঠিয়া যাইতে কতক্ষণ লাগিবে? তখন রাজাকে বাধ্য হইয়া এই বীভৎস কাণ্ড বন্ধ করিতে হইবে। সেই দিন হইতেই তিনি ইহা নিবারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর

হইলেন। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বানরবধের অনৌচিত্য ও অশাস্ত্রীয়তা প্রদর্শন করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরার, বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদপত্রে সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও তাঁহার পত্র পাইয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে ওজস্বিনী ভাষায় যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধসকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোস্বামিপাদ সংবাদপত্রে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি বানরবধের অনৌচিত্য ও অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া এই অবৈধ নিষ্ঠুর কার্য্য বন্ধ করিবার প্রার্থনা করিয়া এক আবেদনপত্র স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আবেদনপত্রের কোন ফল হইল না। মিউনিসিপালিটী বানরহত্যা বন্ধ করিলেন না। মিউনিসিপালিটী আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিলেও তিনি নিরুৎসাহ অথবা আরব্ধকার্য্যে বিরত হইলেন না। তিনি সমস্ত বঙ্গদেশ এবং কাশীর পণ্ডিতদের বানরবধের অনৌচিত্য বিষয়ে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিয়া মিউনিসিপালিটীর কাছে আর এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন।

নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বানরবধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন ;—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর।

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান্।

শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার এম, এ।

কটক কলেজের অধ্যক্ষ।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ।

সেই সময়ে সদাশয় ডেল্‌ভিঞ্জ্‌ সাহেব পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ছিলেন। তিনি বানরবধের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাকেও বানরবধ নিবারণ

---

শ্রীযুক্ত আশুতোষ শর্ম্মা।
" বামনদাস বিদ্যারত্ন।
" অম্বিকাচরণ স্মৃতিতীর্থ।
" রামগোপাল স্মৃতিভূষণ।
" সর্ব্বেশ্বর বিদ্যানিধি।
" যদুনাথ সার্ব্বভৌম।
" তারানাথ বিদ্যারত্ন।
" বিষ্ণুচন্দ্র শর্ম্মা।
" ঠাকুরদাস দেবশর্ম্মা।
" প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
" গোবিন্দ শাস্ত্রী।
" মহেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা।
" বৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মা।
" ভগবানচন্দ্র দেবশর্ম্মা।
" কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
" কৈলাশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
" কালীবর বেদান্তবাগীশ।
" কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ।
" দুর্গাচরণ শর্ম্মা।
" গোকুলচন্দ্র গোস্বামী।
" রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন।
" গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন।
" সুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।
" হরনাথ শাস্ত্রী।

শ্রীযুক্ত কালীকুমার শর্ম্মা।
" নৃসিংহচন্দ্র শর্ম্মা।
" শ্রীপতি শর্ম্মা।
" সীতানাথ শর্ম্মা।
" অভয়ানন্দ স্মৃতিতীর্থ।
" মথুরানাথ স্মৃতিতীর্থ।
" কালীকুমার তর্কতীর্থ।
" গুরুচরণ দেবশর্ম্মা।
" চণ্ডীচরণ স্মৃতিতীর্থ।
" ভূতনাথ বিদ্যারত্ন।
" ধর্ম্মদাস স্মৃতিরত্ন।
" শ্রীনাথ শর্ম্মা।
" লক্ষ্মীনাথ তর্কপঞ্চানন।
" হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন।
" উমাচরণ শর্ম্মা।
" কাশীনাথ শর্ম্মা।
" সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা।
" গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা।
" শ্যামানাথ শর্ম্মা।
" চন্দ্রশেখর শর্ম্মা।
" রামদয়াল শর্ম্মা।
" আনন্দরাম শর্ম্মা।
" বেণীমাধব শর্ম্মা।

করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। তাহাতে তিনি বলিলেন, ডাক্তার সাহেব মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্। এ বিষয়ে তাঁহারা কি করিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে আমি তাঁহাদিগকে বানরবধ নিবারণের জন্য অনুরোধ করিব। তিনি তাঁহার কথা রক্ষা করিয়াছিলেন। চেয়ারম্যান্ ও কমিশনরগণকে বানরবধ বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন আমি এ বিষয় শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টে লিখিব। গবর্ণমেণ্টের আদেশ না আসা পর্য্যন্ত আপনারা বানরমারা বন্ধ রাখুন। পরে গবর্ণমেণ্টের আদেশমত কার্য্য হইবে। ডেল্‌ভিঞ্জ্ সাহেবের এই সুসঙ্গত অনুরোধ মিউনিসিপালিটি মানিলেন না। তাঁহারা বানরবধ বন্ধ করিলেন না। তখন ডেল্‌ভিঞ্জ্ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে হুকুম দিলেন যে, যে কেহ বানর বধ করিবে, তাহাকে প্রতি বানরবধের জন্য পাঁচ টাকা দণ্ড দিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ আদেশ দেওয়াতে বানরবধ স্থগিত হইয়া গেল।

মিউনিসিপালিটী যে দিন বানরবধ নিবারণের আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করেন, সেই দিন বহুসংখ্যক বানর গোস্বামিপাদের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার আসনের নিকট বসিয়া বিষন্নবদনে নীরব-ভাষায় তাহাদিগের উপস্থিত বিপদবার্ত্তা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে সময়ে তাহাদের স্বভাবজাত

পণ্ডিতদিগের নামের তালিকায় উৎকলবাসী একটি পণ্ডিতেরও নাম নাই। বঙ্গ ও বারাণসীর সমস্ত পণ্ডিতই বানরবধের অবৈধতা প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কেবল উড়িষ্যার পণ্ডিতগণ মিউনিসিপালিটিকে লিখিয়াছিলেন যে বানরবধে কিছুমাত্র পাপ নাই।

চপলতা একেবারে দূর হইয়া গেল। যেন উপস্থিত বিপদ স্মরণ করিয়া তাহারা ভয়ে অবসন্ন ও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে, প্রভুপাদের দিকে চাহিয়া এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এই প্রকার হৃদয়বিদারক সকরুণ দৃশ্য দর্শন করিয়া প্রভুপাদের কুসুমকোমল হৃদয় দুঃখে একেবারে গলিয়া গেল। তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে প্রফুল্ল করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যবস্তু দিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা স্পর্শও করিল না। তখন তিনি অভয় বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া তাহারা যেন নির্ভয় ও আশ্বস্ত হইল এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

অনন্তর গোস্বামিমহাশয় বহু লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র মহামান্য ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। ছোটলাট সহৃদয় মহামতি সার জন্ উড্‌বারণ্ সাহেব আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইয়া তারযোগে পুরী মিউনিসিপালিটীর সভাপতিকে আদেশ করিলেন, আমার পুরী না যাওয়া পর্য্যন্ত বানরমারা বন্ধ থাকুক। আমি শীঘ্রই পুরী যাইব। ইহার কিছুদিন পরে তিনি পুরী যাইয়া বানরমারা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি লক্ষ্ণৌতে যখন ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলাম, সেই সময়ে আমার বাগানে একটি হনুমান্‌কে আমি গুলি করিয়া মারিয়াছিলাম। মৃত্যুসময়ে তাহার নিদারুণ ক্লেশ দেখিয়া আমায় একবৎসর কাল, মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আর কখনও প্রাণিহত্যা করিবনা। এইরূপে পবিত্র তীর্থস্থান হইতে চিরকালের জন্য একটি নিষ্ঠুর পাপকার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। পুরীর উকিল শ্রীযুক্ত

বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাহাতে বানরবধ বন্ধ হয়, সেজন্য বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন। এ কার্য্যে তিনি গোস্বামিমহাশয়ের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গোস্বামিমহাশয় বানরগণকে এইরূপে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া যত দিন জীবিত ছিলেন, তাহাদিগকে প্রতিদিন নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রদান করিতেন। বানরমারা বন্ধ হইলে গোস্বামিপাদ অনেক টাকা ব্যয় করিয়া জগন্নাথবল্লভ মঠের মহাবীরকে পূজা দিয়াছিলেন।

গোস্বামিপাদ কর্ত্তৃক মিউনিসিপালিটীর আর একটি অপকার্য্য নিবারিত হয়। জগন্নাথদেবের পাকশালার দক্ষিণদিকস্থ প্রাচীরগাত্রে মিউনিসিপালিটী একটি পায়খানা নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। মিউনিসিপালিটীর এই অন্যায়কার্য্যে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মনে নিদারুণ ক্লেশ উৎপন্ন হইয়াছিল। গোস্বামিমহাশয় পায়খানা উঠাইয়া দিবার জন্য বহু লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র মিউনিসিপালিটীর নিকট প্রেরণ করিয়া সভ্যদিগকে এই কার্য্যের অবৈধতা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। মিউনিসিপালিটী কিন্তু আপনাদিগের কার্য্যের ভ্রম স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা পায়খানানির্ম্মাণ কার্য্যে বিরত হইলেন না। পরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডেল্‌ভিঙ্গ্ সাহেবের নিকট আবেদন প্রেরিত হইলে তিনি পায়খানা হওয়া বন্ধ করিলেন এবং যতটা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেন।

গোস্বামিমহাশয়ের বাসভবনের সম্মুখে ফুটপাথের উপর তাঁহার আদেশে একটী বড় মাটীর গামলা স্থাপিত হয়। গরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশ্বাদির জন্য প্রত্যহ পানীয় জল তাহাতে ধরিয়া রাখা হইত। একদিন মিউনিসিপালিটীর ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ জগবন্ধু পট্টনায়ক মহাশয় ভ্রমণে আসিয়া উহা দেখিতে পাইয়া চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত গিল্‌ম্যান্

সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে রিপোর্ট করেন যে সাধারণ রাস্তার উপর এই গাম্‌লা রাখা অতিশয় অন্যায়, ইহা পথের আবর্জ্জনা স্বরূপ (It is a nuisance); এবং ঐ গাম্‌লা যাহাতে অবিলম্বে উঠাইয়া লওয়া হয়—তজ্জন্য আদেশ দিতে সাহেবকে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত গিল্‌ম্যান্ সাহেব উত্তরে তাঁহাকে বলেন যে ঘটনাস্থলে গিয়া স্বয়ং অনুসন্ধান না করা পর্য্যন্ত তিনি এ বিষয়ে কিছুই করিবেন না। অতঃপর সাহেব একদিন আসিয়া গাম্‌লা দর্শন করিয়া উহা যে মহৎ-উদ্দেশ্যে রক্ষিত হইয়াছে তাহা অবগত হইয়া বলিলেন "আমাদের দেশে বড় বড় সহরে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুদিগের পানের জন্য দানশীল লোকেরা স্থানে স্থানে লৌহনির্ম্মিত বড় বড় চৌবাচ্ছা স্থাপন করিয়া তাহাতে উৎকৃষ্ট পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন এবং ইহা গৌরবসূচক অনুষ্ঠান বলিয়া সমাজে গৃহীত হয়; আর ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে উড়িষ্যাবাসী একজন শিক্ষিত লোক এই সদনুষ্ঠানটী উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহা হউক আপনারা যেমন করিতেছেন নিশ্চিন্তমনে করিতে থাকুন। ইচ্ছা হইলে ইহা অপেক্ষা বড় পাত্রও স্থাপন করিতে পারেন।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং পট্টনায়ক মহাশয়ের নিবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিলেন।

প্রভুপাদ যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়াও ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ বড় একটা করিতেন না। কিন্তু ৺পুরীধামে তিনি একেবারে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অনন্ত ঐশ্বর্য্যের যে কণামাত্র তিনি কোনও কোনও অনুগত শিষ্যের নিকট কৃপা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও নানা কারণে সাধারণে প্রকাশযোগ্য নহে। তবে নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটী একদিকে যেমন উড়িয়া পণ্ডিতগণ বানরবধ নিবারণের

কিরূপ বিরোধী ছিলেন তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে, অপরদিকে তেমনি প্রভুপাদের মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া এস্থলে প্রদত্ত হইল। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে তখনও বঙ্গীয় ও ৺কাশীধামস্থ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত হইয়া আসে নাই। ঘটনাদ্বয় শ্রীমান্ পান্নালাল্ ঘোষ যেরূপ বলিয়াছেন তদ্রূপই লিখিত হইল :—

"বানরমারা যে অশাস্ত্রীয় এবং পাপ ইহা উড়িয়া পণ্ডিতগণ মানিতেন না। একদিন শ্রীযুক্ত দিব্যসিংহ মিশ্রকে বানরবধের অযৌক্তিকতা বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রভুপাদ আমাকে আদেশ করিলেন। মিশ্রমহাশয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে উপাধিলাভ করিয়াছিলেন এবং সমাজে উঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি তখন পুরী এন্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিতেন এবং মিউনিসিপালিটীর একজন কমিশনর ছিলেন। আমাকে মিশ্রমহাশয়ের নিকট যাইতে উদ্যত দেখিয়া প্রভুপাদ বলিলেন—"পান্না, মিশ্রমহাশয় তোমাকে প্রথমেই বলিবেন 'আমি প্রত্যক্ষপ্রমাণ ব্যতীত অনুমান মানি না।' তাহাতে তুমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে 'আপনার পিতা বর্ত্তমান কি না?' তিনি বলিবেন 'না, তিনি বর্ত্তমান নাই।' তুমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবে 'আপনি তাঁকে দেখেছেন কি?' তিনি 'হাঁ' বলিলে পুনরায় তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, 'আপনার পিতামহকে আপনি দেখিয়াছেন কি?" তিনি 'না' বলিলে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে 'আপনার পিতামহ ছিলেন ইহা আপনি বিশ্বাস করেন কি না?' এইরূপ যুক্তিপরম্পরায় তিনি বাধ্য হইয়া অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিবেন।"

অতঃপর আমি মিশ্রমহাশয়ের নিকট যাইলে তাঁহার সহিত দুটি একটি কথা হইতেই তিনি বলিলেন 'মহাশয়, আমি প্রত্যক্ষপ্রমাণ

ব্যতীত অনুমান মানি না।' তাহার পর প্রভুপাদ যেরূপ বলিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ আমাদের পরস্পরের উত্তরপ্রত্যুত্তর হইল। পিতামহ ছিলেন একথা তিনি বিশ্বাস করেন বলায় আমি বলিলাম, 'মহাশয়, আপনি পিতামহকে দেখেন নাই, অথচ তিনি ছিলেন স্বীকার করিতেছেন—ইহা কিরূপ?' তিনি বলিলেন 'পিতামহ না থাকিলে পিতা হইলেন কোথা হইতে?' আমি বলিলাম, 'তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানও আপনি স্বীকার করিলেন?' তখন তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। ইহার পর পাপপুণ্য, ইহকালপরকাল সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইল। বাস্তবিক এই সকল বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু জানা না থাকিলেও তিনি তৎকালে মৎপ্রদত্ত যুক্তিসকল শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পরিশেষে বানরবধের অনৌচিত্য স্বীকার করিয়াও তিনি বলিলেন 'দেখুন, বানরেরা বড় অত্যাচার করে, এজন্য বানরবধের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে চাহি না।"

"অপর একদিন প্রভুপাদ বলিলেন 'পান্না, তুমি পণ্ডিত সদাশিব মিশ্রের সহিত তর্ক করিয়া এস।' উড়িয়া পণ্ডিত এক্ষণে মহামহোপাধ্যায় উপাধি পাইয়াছেন। তৎকালেও একজন দেশীয় পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। সে সময়ে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান আমার অতি সামান্যই ছিল, সংস্কৃত কোন শাস্ত্রগ্রন্থই তখন আমার পড়া ছিল না। অথচ কিরূপে তর্ক করিব সে বিষয়ে প্রভুপাদও কিছু বলিয়া দিলেন না। ইহা সত্ত্বেও আমার কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ হইল না। প্রভুজীর আদেশ পাইয়াই আমি অবিচারিতচিত্তে পণ্ডিতজীর নিকট গমন করিলাম। বানরবধের কথা উঠিতে পণ্ডিতজী কোনও এক পুরাণ হইতে একটী দুটী শ্লোক উচ্চারণ

করিয়া দেখাইলেন যে ভগবান্ দ্বিবিদ নামক বানরকে বধ করিয়াছিলেন। তখন আমি বলিলাম "বায়ুপুরাণের অমুক অধ্যায়ের অমুক শ্লোকে বানরবধ করা পাপ ইহা উক্ত হইয়াছে।" তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলেন বাস্তবিক ঐরূপই লিখিত আছে। এইরূপ চারিখানি শাস্ত্রগ্রন্থের যে অধ্যায়ের যে শ্লোকে বানরবধের বিরুদ্ধে নির্দ্দেশ আছে তাহার উল্লেখ করিলাম, আর তিনি ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ খুলিয়া ঠিক ঠিক মিলাইয়া লইলেন এবং আমার পাণ্ডিত্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। ঐ সকল বিভিন্ন শাস্ত্রের অন্তর্গত, সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত শ্লোক সকলের উল্লেখ,—আমার চিন্তা, যুক্তি, ইচ্ছা ও বুদ্ধির সহিত কোনওরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া—কিরূপে যে করিতে সমর্থ হইলাম ইহা ভাবিয়া আমিও যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বানরবধ যে নিতান্ত অশাস্ত্রীয় তাহা পণ্ডিতজী বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু শেষে বলিলেন, 'দেখুন, বানরেরা বড় অত্যাচারী, এজন্য মিউনিসিপালিটী যাহা করিতেছেন তাহার বিরুদ্ধে কোনও মত দিতে চাহি না।' পণ্ডিতজীর এখনও ধারণা এই যে আমি একজন বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।"

পুরী যাইবার কিছুদিন পরেই গোস্বামিপাদ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুময়মূর্ত্তি তাঁহার আসনগৃহে স্থাপন করিয়া প্রতিদিন স্বহস্তে চন্দন, তুলসী ও পুষ্পদ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতেন। তিনি যাহা আহার করিতেন, তাহা সেই মূর্ত্তির নিকট নিবেদন করিয়া খাইতেন। সেই দারুময় মূর্ত্তি জীবন্ত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিতেন। যে দিন এই প্রকার ঘটিত সে দিন তিনি সেই মহাপ্রসাদ সকলকে ডাকিয়া দিতেন এবং বলিতেন, 'আজ জগন্নাথ আমার সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন,

তোমরা তাঁহার অধরামৃত ভোজন করিয়া পবিত্র ও ধন্য হও। জগন্নাথের পাণ্ডাগণ তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন; সে মূর্ত্তিও তিনি প্রতিদিন চন্দন তুলসী ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিতেন। অদ্যাপি উপরোক্ত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এবং শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ তাঁহার সমাধিস্থানে অর্চ্চিত হইতেছেন।

গোস্বামিমহাশয় যে কার্য্যের জন্য উড়িষ্যাবাসিগণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত, তাহা তাঁহার অপরিমিত দান। পুরীবাসিগণ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া আদর করিতে পারে নাই। অন্যান্য স্থানের লোক যেমন ধর্ম্মার্থী হইয়া প্রাণের টানে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছে, তাঁহার উপদেশ শুনিয়া ধন্য হইয়াছে, উড়িষ্যার লোক তাহা করে নাই। উড়িষ্যাবাসিগণ অর্থ যেমন ভালবাসে ধর্ম্ম তেমন ভালবাসে না। উড়িয়াদের মধ্যে ধর্ম্মপিপাসু মুমুক্ষু লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাহারা ঐহিকই বুঝে, অর্থই চায়। ধর্ম্ম তাহারা বুঝে না, চায় না। জগন্নাথকে তাহারা অর্থ উপার্জ্জনের যন্ত্র বলিয়া জানে। ভগবান্ বলিয়া জানে না। উৎকল-বাসিগণ সকলেই প্রভুপাদের নিকট অর্থ এবং বস্ত্রাদি প্রাপ্তির আশায় উপস্থিত হইয়া সেই সকল বস্তুই প্রার্থনা করিয়াছে। তিনিও কল্পতরুর ন্যায় তাহাদিগকে প্রার্থিতবস্তু প্রদান করিয়া তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন। * তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া কেহ কখনও

* গোস্বামিপাদ এক বৎসরের অধিক কাল পুরীতে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে একটি উড়িয়াও ধর্ম্মার্থী হইয়া গোস্বামিপাদের নিকট আইসে নাই। বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মার্থী হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার কৃপাও লাভ করিয়াছে। উড়িয়ারা সকলেই টাকার জন্য, কাপড়ের জন্য আসিয়াছে।

নিরাশ হন নাই। পুরী হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থ। অনেক রাজা মহারাজা, অনেক ধনাঢ্য লোক তীর্থ করিতে এখানে আসিয়া বহু অর্থ বিতরণ করিয়াছেন; কিন্তু গোস্বামিমহাশয়ের ন্যায় তাঁহারা কেহই মুক্তহস্তে দান করিতে পারেন নাই। তাঁহার দানের প্রশংসা সকলেই করিয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখে এই কথা যে কত রাজামহারাজা, কত ধনীমহাজন শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অনেক দান করিয়াছেন; কিন্তু জটিয়াবাবার ন্যায় কেহই মুক্তহস্তে এত দান করিতে পারেন নাই। এ প্রকার অদ্ভুত দান আমরা কখনও দেখি নাই। সূর্য্যদেব যেমন সর্ব্ব সাধারণকে কিরণ দেন, শশধর যেমন পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সমস্ত প্রাণীকে স্নিগ্ধ করেন, পর্জ্জন্যদেব বারিবর্ষণ করিবার সময় যেমন কোন ইতরবিশেষ করেন না, গোস্বামিপাদের দানও ঠিক সেইরূপ। তিনি পাপীপুণ্যবান্, যোগ্য-অযোগ্য বিচার না করিয়া অর্থীমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার দানব্যাপার দেখিলে ঘোরতর বিষয়ীরও বিষয়াসক্তি দূর হয়। কৃপণের কার্পণ্যদোষ নষ্ট হয়। তাঁহার এই দানসাগরব্যাপার তুলনারহিত। মহারাজ রন্তিদেবের আত্মদান, দাতাকর্ণের পুত্রদান, যেমন প্রবাদবাক্য হইয়া রহিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে গোস্বামিপাদের এই দানসাগরব্যাপারও উড়িষ্যাবাসিগণের নিকট প্রবাদবাক্য হইয়া রহিয়াছে। বাস্তবিকই তাঁহার এই দানব্যাপার বর্ত্তমান সময়ে এক অলৌকিক কাণ্ড। যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষ ব্যতীত এপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যাঁহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী, যাঁহাদিগের প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, তাঁহাদিগের দ্বারা এই প্রকার কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া কিছুই বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। কিন্তু কপর্দ্দক-শূন্য কৌপীনধারী একজন সন্ন্যাসী, যাঁহার কিছুমাত্র আয় অথবা সংস্থান

নাই, কল্য কি আহার করিবেন তাহার স্থিরতা নাই, এরূপ লোকের মুক্তহস্তে কল্পতরুর ন্যায় দানকরা বস্তুতঃই অলৌকিক ব্যাপার।

৺জগন্নাথদেব গোস্বামিমহাশয়কে মুক্তহস্তে দান করিবার আদেশ করেন। তিনিও ভগবৎ আদেশে কল্পতরুর ন্যায় অর্থীদিগকে টাকা-পয়সা, কাপড়, ঘটি ইত্যাদি বিতরণ করেন। তাঁহার নিকট যিনি যাহা প্রার্থনা করিতেন তিনি তাঁহার সে প্রার্থনা কদাচ অপূর্ণ রাখিতেন না। তাঁহার অলোকসামান্য দানসাগর অনুষ্ঠান বর্ণনাদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। যিনি স্বচক্ষে দেখেন নাই, তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

পূজ্যপাদ অদ্বৈতপ্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে গোস্বামিপাদ অনেক গুলি ব্রাহ্মণকে কাপড় বিতরণ করেন। জগন্নাথের সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ মঙ্গমঠে এই দানকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন হইতেই তাঁহার দানব্যাপার বিশেষভাবে আরম্ভহয়। একটি লোক ব্রাহ্মণ সাজিয়া কাপড় লইতে আসিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ নহে, ভিন্ন জাতি; ইহা ধরা পড়াতে তাহাকে কাপড় দেওয়া হইল না। ইহাতে সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বধ করিবার জন্য উপর হইতে আমার মাথায় একখানি ইষ্টক ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি হাতে করিয়া সকলকে কাপড় দিতেছিলাম, তাহাকে দিলাম না, ইহাই আমার উপর তাহার ক্রোধের কারণ। শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার মিত্র তাহার এইরূপ চেষ্টা দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। তখন সকলে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে গোস্বামিপাদ তাহাকে তিরস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কাপড় বিতরণস্থলে প্রভুপাদের শেষপর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবারই কথা ছিল; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। গুরুতর কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে শীঘ্রই আসনে

যাইতে হইল। তাঁহার শিষ্য ৺রাখাল চন্দ্র রায় সেই দিন সকাল বেলা কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। শরীর হইতে বাহির হইয়া তিনি গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য ধ্যান শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রভুপাদকে আসনে যাইতে হইল। সদ্‌গুরু শিষ্যের ইহ ও পরকালের একমাত্র বিধাতা। তিনি শিষ্যের ইহ ও পরলোক সম্বন্ধে যেরূপ বিধান করেন শিষ্যকে সেইভাবেই চলিতে হয়। পূর্ব্বাহ্নে এই ঘটনা ঘটিল; অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে তারযোগে সংবাদ আসিল যে সকালবেলা রাখাল বাবু কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন।

ধ্যানের সময় অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিত। নিম্নে একটি ঘটনা বিবৃত হইল।

গোস্বামিপাদ পথে বাহির হইলে বহুলোক তাঁহার কাছে টাকা, কাপড়, জলপাত্র ইত্যাদি চাহিত। তিনি মুক্তহস্তে তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। একদিন গোস্বামিমহাশয় ভ্রমণে বাহির হইলে একটি ব্রাহ্মণবালক তাঁহার কাছে আসিয়া একখানি কাপড় চাহিল। তিনি প্রথমে তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। পরে কিছুদূর গিয়া হঠাৎ চমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গে আইস আশ্রমে গিয়া তোমাকে কাপড় দিব। বালক গোস্বামিপাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তখন সায়ংকাল অতীত হইয়াছে। কিছু দূর গিয়া যোগজীবন গোস্বামিপাদের অজ্ঞাতসারে বালককে বলিলেন, আজ রাত্রি হইয়াছে, তুমি আজ যাও, কাল আসিয়া কাপড় লইয়া যাইও। যোগজীবনের কথায় বালক ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল। গোস্বামিপাদ আশ্রমের নিকটে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ দাঁড়াইলেন এবং পশ্চাতে ফিরিয়া বালকের খোঁজ লইলেন। তখন যোগজীবন বলিলেন,

আজ রাত্রি হইয়া গিয়াছে, এজন্য আমি তাহাকে কাল আসিতে বলিয়া দিয়াছি। যোগজীবনের এই কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি তাঁহাকে আসিতে বলিলাম, আর তুমি তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলে? যতক্ষণ তাঁহাকে পাওয়া না যাইবে ততক্ষণ আমি আসনে যাইব না; এখানেই থাকিব। প্রভুপাদের কথা শুনিয়া সকলে সেই বালকের সন্ধানে ছুটিলেন। কিছুকাল পরে কিশোরী বাবু তাহাকে লইয়া আসিলেন। গোস্বামিপাদ বালককে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সঙ্গে করিয়া আসনে গেলেন। তিনি আসনে বসিয়া মিষ্ট বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন এবং স্বহস্তে তাহাকে কাপড় দিয়া তাহার গা পা টিপিয়া দিলেন। কাপড় পাইয়া বালক প্রফুল্লমনে চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে গোস্বামিপাদ বলিলেন, বালকটি যখন প্রথমে কাপড় চাহিল, তখন তাহাকে কাপড় দিবার আমার ইচ্ছা হয় নাই। পরে জগন্নাথদেব উহাকে কাপড় দিতে বলিলেন। তাঁহার কথায় আমি উহাকে সঙ্গে আসিতে বলি। তোমরা উহাকে বিদায় করিয়া দিলে জগন্নাথদেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমাকে ঘুসি তুলিয়া মারিতে আসেন। পরে বালক কাপড় পাইলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। জগন্নাথের হাতের ঘুঁসি খাইলে আমার মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত।

এস্থলে জগন্নাথ দেবের মহিমাব্যঞ্জক একটী ঘটনা উল্লেখ করিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রভুপাদের পুরীবাসকালে পূর্ব্ব বাঙ্গলার এক জন চণ্ডাল সাধুর বেশ করিয়া পুরীধামে গিয়া উপনীত হয়। চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নবর্ণের জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। সাধুবেশী চণ্ডাল এই নিষেধাজ্ঞা* অগ্রাহ্য করিয়া

* মন্দিরের বাহিরে প্রবেশপথের নিকট প্রস্তরে এই নিষেধাজ্ঞা খোদিত আছে। এই

জগন্নাথ দেখিবার জন্ত প্রতিদিন মণিকোঠায় যাইত। এইরূপে সে মাসাধিককাল প্রত্যহ মণিকোঠায় যাইয়া ঠাকুর দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এক দিনও সে ঠাকুর দেখিতে পায় নাই। ভগবান্ সেই দর্পোদ্ধত পাতকীকে এক দিনও দেখা দেন নাই। এই রূপে দেবদর্শনে বঞ্চিত হইয়া সে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে মণিকোঠায় কোন দেবমূর্ত্তি নাই। লোকে মিথ্যা করিয়া বলে যে মণিকোঠায় ঠাকুর আছে।* গোস্বামিপাদ এই কথা শুনিয়া তাহার যে মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, ইহা বুঝাইয়া দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে তাহাকে নিষেধ করেন। ইহাতেও সে মণিকোঠায় যাইতে নিরস্ত হয় নাই। পরে পাণ্ডাগণ এই বিষয় অবগত হইয়া প্রহার করিয়া তাহাকে পুরী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

গোস্বামিমহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন, তোমরা যাহা দেখিলে, মহাপ্রভুর সময়ে ইহা হইতে অধিক কিছু হয় নাই। আর তোমাদের মধ্যে যেরূপ বিবিধ অবস্থা এবং নানা প্রকার দর্শন হয়, মহাপ্রভুর ভক্তদের মধ্যে সেরূপ হইত না। তাঁহাদের কেহ কেহ সারা জীবনে দুই একটী স্বপ্ন দেখিয়াছেন, অথবা মহাপ্রভু কৃপা করিয়া কোনরূপে তাঁহাদিগকে দুই এক বার দর্শন দিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে আজীবন চলিতে হইয়াছে। আর একদিন গোস্বামিপাদের ঘরে যাইতেই তিনি বলিলেন, এই কথাটি মনে রাখিবে যে, যে কথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা ভগবান্ নিজে বলিলেও বিশ্বাস করিবে না। ভগবান্ স্বতন্ত্র পুরুষ; তিনি সবই করিতে পারেন। অসুরগণকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার জন্ত বুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বেদ-বিরুদ্ধ উপদেশ দিয়াছিলেন।

* নিষেধাজ্ঞা খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্মদিগের প্রতিও দেওয়া আছে। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম এই নিষেধ না মানিয়া গোপনে মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্য্য করা কি তাঁহাদের বিবেকবিরুদ্ধ হয় না?

গোস্বামিমহাশয়ের দৈনিক প্রত্যেক কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কোন কারণে ইহার নড়চড় হইত না। কোন লোকের অনুরোধে তিনি ইহার ব্যতিক্রম করিতেন না। পুরীর সিভিল সার্জন ও মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ গিল্ম্যান্ সাহেব প্রভুপাদের কোনও কোনও কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সূত্রে তাঁহার সহিত সাহেবের জানাশুনা হয়। সাহেব তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। প্রভুপাদও তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। একদিন সাহেব বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি একবার প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। এই সংবাদ পাইয়া গোস্বামিপাদ দেখা করিবার সময় স্থির করিয়া সাহেবকে সেই সময়ে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি সাহেবের আগমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। যথাসময়ে সাহেব আসিলেন না; নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলে গোস্বামিপাদ ভজনে বসিলেন। ভজনে বসিবার কিছুকাল পরে সাহেব আসিয়া প্রভুপাদকে সংবাদ দিলেন। তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়া গোস্বামিপাদ বলিয়া পাঠাইলেন, এখন আর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। যে সময় তাঁহার আসিবার কথা ছিল, তাহা অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়াছি। এ কার্য্যের ক্ষতি করিয়া আমি দেখা করিতে পারিব না। প্রভুপাদের কথা শুনিয়া সাহেব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন, আমারই ত্রুটি হইয়াছে। আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসি নাই। এই বলিয়া তিনি প্রভুপাদকে সেলাম জানাইয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন গোস্বামিমহাশয় সমুদ্র স্নান করিয়া আশ্রমে যাইতেছিলেন। পথে পুরীর অন্যতম ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু শশীভূষণ দত্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দত্ত মহাশয় উত্তপ্ত বালুকাময় পথে গোস্বামিমহাশয়কে

শূন্যপদে হাঁটিতে দেখিয়া বলিলেন, তপ্ত বালুকার উপর দিয়া চলিতে আপনার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে; পাদুকা ব্যবহার করিলে হয় না? শশীবাবুর এই কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, এ বৈকুণ্ঠ ধাম, ইহার প্রতি রেণুকণা অপ্রাকৃত। দেবতারা এই পবিত্র স্বর্ণরেণুর স্পর্শ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই পবিত্র ধামে কি পাদুকা ব্যবহার করিতে আছে? এই বিশুদ্ধ স্বর্ণরেণুর সহিত শরীরটাকে মিশাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়।

আর একদিন সমুদ্রস্নান করিয়া ফিরিবার সময় একটি সাধুকে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। সাধু নিকটে আসিলে নিজের গায়ের একখানি মূল্যবান্ বস্ত্র তাঁহাকে দিয়া সতীশকে বলিলেন, ইহাঁকে এক আনা পয়সা দাও। সাধু কাপড়খানি লইলেন, কিন্তু পয়সা লইলেন না। পয়সা দিতে গেলে তিনি ছুটিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া "নীলচক্র জগন্নাথ মন ভজনা, চৈতন্য মন ভজনা। আমি গিয়াছিলাম বৃন্দাবনে, সে স্থান খালি দেখিলাম। তুমি এখানে দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া বিরাজ করিতেছ।" কিছুক্ষণ এই গান গাইয়া সাধু চলিয়া গেলেন। তখন গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, ইনি একজন বড়লোকের ছেলে; একদিন পড়িতে পড়িতে ধ্যানস্থ হইয়া অচৈতন্য হন। সেই হইতে ইনি সন্ন্যাসী। ইহাঁর পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ হইয়াছে। অনেক যোনি ভ্রমণ করিয়া মানবদেহ লাভ হয়। পরে আমি কে, কি করিতেছি, এই চিন্তা আসিলে গুরুলাভ। তারপর তিন জন্ম গণেশ, তিন জন্ম সূর্য্য, তিন জন্ম শিব, তিন জন্ম বিষ্ণু ও শত জন্ম শক্তি উপাসনা। ইহা চতুর্ব্বর্গের সাধন,—বেদের অধীন। ইহার পর পঞ্চম পুরুষার্থ।

একদিন প্রত্যূষে গোস্বামিপাদের কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন, আজ সমুদ্র স্নানে যাবে না? আমি বলিলাম, বড় ঠাণ্ডা, অল্প অল্প বৃষ্টি

হচ্ছে, তাই যাব কিনা ভাবছি। আবার শুনছি আজ নাকি কি যোগ আছে। অনেকেই স্নানে যাচ্ছে, তাই এক একবার যেতেও ইচ্ছা হচ্ছে। যোগের কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, আর যোগাযোগ কেন? গুরুদেব তোমাদিগকে কোন যোগাযোগের মধ্যে রাখেন নাই। ধর্ম্মাধর্ম্মের উপরে তুলে দিয়েছেন। ও সকল খুটিনাটি ছেড়ে দাও। তাঁহার মধ্যে নাইতে রেছে ইচ্ছা না হইলে যেও না। তাঁহার আদেশ শুনিয়া আর আমি সমুদ্রস্নানে গেলাম না।

গোস্বামিপাদের দুই জন শিষ্যের ধামপ্রাপ্তি হয়। তাহার এক জনের নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী; ফরাসডাঙ্গায় ইঁহার বাড়ী ছিল। ইনি জাতিতে বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ উপাধিধারী ছিলেন। সংসার ছাড়িয়া ইনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী হইলে প্রভুপাদ ইঁহার নাম দেবপ্রসাদ রাখিয়াছিলেন। ১৩০৫ সালের ২১শে ভাদ্র সোমবার সমুদ্রে ডুবিয়া ইনি দেহত্যাগ করেন।

গোস্বামিপাদ পুরীতে যাইয়াই বলিয়াছিলেন যে তোমরা সমুদ্রে সাবধান হইয়া স্নান করিও। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে সমুদ্র গ্রহণ করিতে পারে। দিব্যদৃষ্টিতে ভাবী ঘটনা দেখিয়া পূর্ব্বেই তিনি সকলকে সাবধান করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, তোমরা সকলে এক ঘাটে স্নান করিও। আর কয়েক জন ধীবর নিযুক্ত কর, তাহারা প্রতিদিন তোমাদিগের স্নানের সময় সমুদ্রতীরে উপস্থিত থাকিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারা সাহায্য করিবে। নিয়তির অবশ্যম্ভাবিত্ববশতঃ তাঁহার কথায় কেহ মনোযোগ প্রদান করিলেন না।

স্বামী দেবপ্রসাদ যেদিন মারা যান, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে গোস্বামিমহাশয় সকলকে বলিয়া দিলেন যে কাল তোমরা সকলে স্বর্গদ্বারঘাটে স্নান করিতে যাইও। কাছারির ঘাটে যাইওনা। তাঁহার এই কথা শুনিবার

তাৎপর্য্য এই যে দেবপ্রসাদ স্বর্গদ্বারঘাটে স্নান করিতেন। গোস্বামি-মহাশয় এইরূপে ভাবী বিপৎপাতের ইঙ্গিত করিলেও কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আরও বলিলেন, আজি সমুদ্রের কি আনন্দ! পর দিন সকলেই স্বর্গদ্বারঘাটে স্নান করিতে গেলেন, দেবপ্রসাদও সেইসঙ্গে ছিলেন। তিনি সমুদ্রতীরে গিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্র তাঁহার কাছে যাইয়া বলিলেন, স্বামিজি! কাল রাত্রে গোসাঁই আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। অশ্বিনীর কথায় দেবপ্রসাদের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, আমি চক্ষু বুজিয়া অপূর্ব্ব বাদ্য শুনিতেছিলাম। অন্তরীক্ষে যেন বহুসংখ্যক বাদ্যযন্ত্র এক সঙ্গে বাদিত হইতেছিল। সে বাদ্য কি মধুর! এই কথা বলিবার পর তিনি অশ্বিনীকে, রাত্রিতে প্রভুপাদ তাঁহার কথা কি বলিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে অশ্বিনী বলিল, সে অনেক কথা; স্নানের পর বলিব। এখন স্নানে চলুন। এই বলিয়া অশ্বিনী স্বামিজীকে লইয়া সমুদ্রে নামিল। দেবপ্রসাদ তীরের দিকে মুখ করিয়া স্নান করিতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ জোয়ার আসায় গভীর জলে গিয়া পড়িলেন। তিনি সাঁতার জানিতেন না, জলে পড়িয়া কাজেই হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। এবং সাহায্যের জন্য বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া ও চীৎকার শুনিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যোগজীবন ধীবর আনাইয়া জলে নামাইয়া দিলেন। কিন্তু "নিয়তি কেন বাধ্যতে?" ধীবরগণ যখন তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া আনিল, তখন তাঁহার প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে প্রস্থান করিয়াছে। গোস্বামিমহাশয় স্বামিজীর এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত কাতর হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বামিজী ভিন্ন আর কাহারও মৃত্যুতে তাঁহাকে কখনও কাতরতা প্রকাশ বা অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে দেখি নাই। দেবপ্রসাদ সন্ন্যাসী, এ জন্য তাঁহার দেহ

সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে গোস্বামিপাদ বলিলেন যে দেবপ্রসাদের অতি ক্লেশকর মৃত্যু হইলেও দুঃখ করিবার কিছু নাই, তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শাস্ত্রে লেখা আছে পুরীধামের অন্তর্গত সমুদ্র যাঁহাকে গ্রহণ করেন, শ্রীক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে মগ্ন হইয়া যাঁহার মৃত্যু হয়, তিনি মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। স্বামী দেবপ্রসাদকে সমুদ্র গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তিনি জগন্নাথের সারূপ্যলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-বাসের অধিকার লাভ করিয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরে বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মারা যান। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে ইহাঁর বাড়ী ছিল। এক দিনের জ্বরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর সম্বন্ধে গোস্বামিমহাশয় বলিয়াছিলেন, সতীশ দেহ হইতে বাহির হইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে রাধাকুণ্ডের রজঃ দিয়া তিলক করিয়া দিন। আমি তাহাকে আমার পাশের ঘর হইতে তিলকের ঝোলা আনিতে বলিলাম। সে তাহা লইয়া আসিল। তখন আমি তাহাকে তিলক করিয়া দিলাম। তারপর আমার আদেশে সে গোলোকধামে গমন করিয়া রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত নিত্যলীলা দর্শন ও সম্ভোগ করিবার অধিকার লাভ করিল।

স্বামী দেবপ্রসাদের তিরোভাবের পর একদিন প্রভুপাদের কাছে বাঙ্গলা মহাভারত পাঠের সময়ে একজন লোক স্বামিজীর বসিবার স্থানে বসিতে গিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, "কর কি? স্বামিজী যে ওখানে বসিয়া আছেন।" প্রভুপাদের কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া স্থানান্তরে যাইয়া বসিল। এক দিন রাত্রিকালে গোস্বামিপাদ সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ তাঁহার নিকট আসিয়া দেখা

দিয়াছিলেন।* আর একদিন সকালবেলা তিনি বলিলেন যে কাল রাত্রিতে অনন্তদেব আমাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। আরও একদিন বলরাম সর্পদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ভগবান্ মানুষের নিকট প্রকটিত হইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন, আমোদপ্রমোদ, হাস্যপরিহাস, ক্রীড়া-কৌতুক ও পানভোজন করেন; বর্ত্তমান সময়ে এ কথা কেবল গোস্বামি-মহাশয়ের নিকটই শ্রবণ করা গিয়াছে। বস্তুতঃ ভগবান্ সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিতেন। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের সহিত একত্র বাস করিতেন। তাঁহার উপবেশন, ভ্রমণ, ভোজন, প্রভৃতি কোন সময়েই ভগবান্ তাঁহার সঙ্গছাড়া হইতেন না। জগন্নাথ তাঁহার সহিত এক পাত্রে পানভোজন করিতেন। এক দিন শান্তিসুধা আলু ও কপির ডালনা রাঁধিয়া পিতার ভোজনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। আহারান্তে গোস্বামিপাদ কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, শান্তিসুধা! জগন্নাথ তোমার আলুকপির ডালনা খাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি আর কখনও ত আলুকপি খান নাই! আলুকপি তাঁহার ভোগে দেওয়া হয় না। আজই তিনি প্রথম আলুকপি খাইলেন। আলুকপির ডালনা তাঁহার বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। গোস্বামি-পাদের কথা শুনিয়া একজন শিষ্য পরিহাস করিয়া বলিলেন, এমন উৎকৃষ্ট রান্না ত জগন্নাথ বাপের বয়সে খান নাই। ভোগমন্দিরে লক্ষ্মীদেবীর রান্নায় যা শ্রী, খুসী হবেন না কেন? এই কথা শুনিয়া প্রভুপাদ হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলেছ। এমন রান্না পাবেন কোথায়? তাঁরা বড়ই ভুল করেছেন। উড়িষ্যায় না আসিয়া যদি বাঙ্গলা দেশে থাকিতেন ত ভাল খাইয়া বাঁচিতেন। তৈল ঘি ছাড়া মসলাশূন্য তরকারী খাইতে হইত না।"

* এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।

গোস্বামিমহাশয়ের শাশুড়ীও মধ্যে মধ্যে সুক্তার ঝোল রাঁধিয়া দিতেন। এক এক দিন গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিতেন, আপনি আমাকে যে সুক্তা দিয়াছিলেন জগন্নাথ তাহা আমাকে খাইতে দেন নাই। ভাল হইয়াছে বলিয়া প্রায় তিনি কাড়িয়া খাইয়াছেন। ভাল পাক হইলে তিনি কাড়িয়া খান। আমাকে দেন না। যে দিন এইরূপে জগন্নাথ প্রভুপাদের সহিত ভোজন করিতেন, সে দিন আহারান্তে তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন আজ জগন্নাথদেব আহার করিয়াছেন; তোমরা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হও।

একদিন গোস্বামিপাদ ডাবের জল খাইতে খাইতে হঠাৎ থামিয়া গেলেন। পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্য কুলদা মনে করিলেন যে তাঁহার খাওয়া শেষ হইয়াছে; তিনি ডাবের জল আর খাইবেন না। এই মনে করিয়া সে যেমন তাঁহার হস্ত হইতে ডাব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল অমনি তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন, কর কি? জগন্নাথ ডাবের জল পান করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া কুলদা হাত সরাইয়া লইল। জগন্নাথের খাওয়া শেষ হইলে প্রভুপাদ আবার খাইলেন।

একদিন ক্ষেত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিমলাদেবী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি এত লোককে এত দান করিতেছ, কই আমাকে ত কিছু দিলে না? বিমলাদেবীর কথা শুনিয়া প্রভুপাদ শিষ্যদিগকে বলিলেন, বিমলা আমার কাছে দান চাহিতে আসিয়াছিলেন। তোমরা উৎকৃষ্ট কাপড়, শাঁখা, সিন্দুর ও খাদ্যদ্রব্য দিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া আইস। তাঁহার আদেশে শিষ্যগণ তাঁহার মন্দিরে যাইয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রভৃতিদ্বারা তাঁহার পূজা দিয়া আসিলেন।

জগন্নাথদেবের রন্ধনস্থালীর খাপরা ভাঙ্গিয়া পুরীর বড় রাস্তায় দেওয়া হইত। এই ভগ্নখর্পরময় রাজপথে মুক্তপদে যাতায়াত করিতে

লোকের বড়ই ক্লেশ হইত। খাপরার আঘাতে পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইত। গোস্বামিমহাশয় খর্পরময় পথে একেবারেই চলিতে পারিতেন না। এজন্য তাঁহার মন্দিরে যাওয়া একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে দুঃখিত হইয়া একদিন জগন্নাথ গোস্বামিপাদকে মন্দিরে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জগন্নাথের কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, খর্পরময় রাজপথে যাতায়াত করিতে আমার বড়ই কষ্ট হয়। খাপরার আঘাতে আমার পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। সে যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিনা। এই কথা শুনিয়া জগন্নাথ বলিলেন, তুমি মন্দিরে যাইও; আর তোমার পায়ে খাপরা ফুটিবেনা।

সমুদ্রের তরঙ্গে পায়ে আঘাত লাগিবার পর কিছুদিন গোস্বামিপ্রভু সমুদ্রস্নানে যান নাই। সমুদ্রে না গেলেও তাঁহার সমুদ্রস্নান বন্ধ হয় নাই। এক এক দিন সকালবেলা দেখা যাইত যে তাঁহার জটা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, আমি সমুদ্রে স্নান করিয়াছি; সেই জন্য আমার জটা হইতে জল পড়িতেছে। যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া সেবা করিতেন, তাঁহারা তাঁহার এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেন। কেন না তাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বদাই আসনে দেখিয়াছেন।

এই সময়ে (১৩০৫ সাল, ১৩ই বৈশাখ) ছয়বৎসরবয়স্ক দৌহিত্র জগদানন্দকে (পুণ্টুককে) এবং পুরীর মুন্সেফ্ কিশোরী বাবুকে ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রভুপাদ একত্রে সাধনপ্রদান করেন।

গোস্বামিমহাশয়ের পুরীঅবস্থান সময়ে ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত রূপলাল দাসের পুত্রবধূ প্রসববেদনায় অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে-

ছিলেন। কিছুতেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতেছিল না। তিনি গোস্বামিপাদের একজন শিষ্য। রূপবাবুর পুত্র রাধাবল্লভ বাবু এ সংবাদ প্রভুপাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাধাবল্লভের তার পাইয়া গোস্বামিমহাশয় তারের সংবাদ দিলেন যে প্রসূতিকে এক সহস্র ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করাইলে গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। তাঁহার এই কথা শুনিয়া কুলদা বলিলেন এক সহস্র শুদ্ধ ব্রাহ্মণ কোথায় পাওয়া যাইবে? তদুত্তরে গোস্বামিপাদ বলিলেন ঢাকায় একসহস্র ব্রাহ্মণ পাওয়া কঠিন নহে। ব্রাহ্মণের আবার শুদ্ধাশুদ্ধ কি? জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈঃ দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণং। (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)। উপবীতধারী যিনি তিনিই ব্রাহ্মণ। এই সংবাদ যথাভাবে রাধাবল্লভ বাবু পান নাই। তারপ্রেরক foot water স্থানে hot water বলিয়া সংবাদ দেয়। এইরূপ গোল হওয়াতে রোগীকে ব্রাহ্মণের পাদোদক খাওয়ান হইল না। প্রসূতি বহু কষ্টে এক মৃত পুত্র প্রসব করিলেন এবং অনেকদিন ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করিলেন।

১৩০৫ সালের শীত কালে জগন্নাথদেবের পদ্মবেশ হয়। এই পদ্মবেশের দিন হইতে গোস্বামিমহাশয়ের দানসাগরব্যাপার মুক্তভাবে অতি সমারোহের সহিত আরম্ভ হইল। জগন্নাথের পদ্মবেশ করিতে যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা প্রভুপাদই দিয়াছিলেন। পদ্মবেশ দেখিবার জন্য শ্রীমন্দিরে যাইয়া প্রভুপাদ পাণ্ডাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করেন। জগন্নাথ দেবের অপ্রাকৃত রূপ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তরাম নামক মন্দিরের জনৈক প্রতিহারী বেত্রহস্তে তথায় দণ্ডায়মান ছিল,

তাহার দিকে চাহিয়া ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন, দেখেছি, দেখেছি, তোমাকে দেখেছি। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের দ্বারে তোমাকে দেখেছি। তুমি সেখানে সুবর্ণবেত্র হস্তে লইয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছ। এই কথা শুনিয়া অনন্তরাম কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে পতিত হইল। তখন আবার বলিতে লাগিলেন, জগন্নাথ আজ গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন। রাধাকুণ্ডের বেণী ব্রজবাসী সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, ব্রজবাসীকে অত্যন্ত ভালবাসে তাই আজ তাহাকে দেখিয়া, ব্রজের কথা মনে হয়েছে। সেই জন্যই পুরীকে ব্রজধামে পরিণত করিয়া গোপ সাজিয়া বসিয়া আছে। এইরূপে ভাবাবেশে অনেকক্ষণ গত হইল। অতঃপর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইলে বলিলেন, জগন্নাথদেব আমাকে রাজার ন্যায় মুক্তহস্তে দান করিতে বলিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি মন্দিরের বাহিরে আসিলেন এবং একস্থানে উপবেশন করিয়া পাণ্ডাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিলেন।

গোস্বামিমহাশয়ের আসনগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে শাস্ত্রগ্রন্থসকল থাকিত। একদিন তিনি শৌচাগার হইতে আসিয়াই ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখত, রামায়ণ গ্রন্থখানি বোধহয় বিপরীত ভাবে রাখা হইয়াছে। গ্রন্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এখনই আমার নিকট যাইয়া বলিলেন, আমাকে বিপরীতভাবে রাখাতে আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। গোস্বামিমহাশয়ের কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী গ্রন্থ রাখিবার ঘরে গিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই কথিত গ্রন্থখানি বিপরীত ভাবে রহিয়াছে। তখন তিনি উহা ঠিক করিয়া রাখিলেন।

একদিন একটি সুন্দর পুরুষ ডমরু বাজাইতে বাজাইতে কীর্ত্তনে আসিয়া ভাবাবেশে নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্য বড়ই সুন্দর

বড়ই মিষ্ট। তিনি যে দিকে চাহিতে লাগিলেন, সেই দিকে যেন অমৃতবর্ষণ হইতে লাগিল। কীর্ত্তনে ভাবের বন্যা বহিতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তন শেষ হইলে তিনি প্রভুপাদকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে সকলেই তাঁহার কথা বলিতে লাগিলেন। গোস্বামিপাদ কিছুকাল চুপ করিয়া সকলের কথা শুনিয়া পরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, যাঁহার কথা বলিতেছ, তিনি কে জান ? তিনি লোকনাথ। দয়া করিয়া পদধূলি দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়া গেলেন। আর একদিন, বরুণদেবও নরদেহে কীর্ত্তনে আসিয়া গোস্বামিপাদের সহিত নাচিয়াছিলেন। পরে প্রভুপাদের হস্তপদাদি টিপিয়া দিয়া যেন কৃতার্থ হইয়াছেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে গোস্বামিপাদ সকলকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

একদিন একজন লোক গোস্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপ্রভু কি জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? তিনি কি দিয়া গিয়াছেন ? ইহার উত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন, মহাপ্রভু আচণ্ডালে হরিনাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব এবং তাঁহাদের উপাসনাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা, ইহা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। তিনি তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। একমাত্র ভক্তিতেই কেবল ভগবানকে লাভ করা যায়।—জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তিযজ্ঞাদি পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধনসাহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥ সে সময়কার লোক শাস্ত্রের এই অমূল্য শিক্ষা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। মহাপ্রভু ভক্তির প্রাধান্য দেখাইয়া এই শাস্ত্রোক্ত অমূল্য উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঋষিদের সময়ে দেশে ভক্তির প্রাধান্যই প্রচারিত ছিল।

গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে ভক্তির ঔৎকর্ষ্যই বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে। শংকরের মায়াবাদ প্রচার হইবার পর ভারতবর্ষ হইতে ভক্তি একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। গোস্বামিপাদের কথা শুনিয়া প্রশ্নকারী বলিলেন; গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে বলেন, ঋষিদের সময়ে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের চর্চ্চাই অধিক ছিল; আর মহাপ্রভু যে ভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ঋষিদের সময়ে তাহা ছিলনা, একথা কি সত্য? ইহার উত্তরে গোস্বামিপাদ বলিলেন, এ কথা সত্য নহে। কে বলিল ঋষিদের সময়ে এ ভক্তি ছিল না। মহাপ্রভু যে পরাভক্তির কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার কথা ভূরি ভূরি রহিয়াছে। গীতা, ভাগবত, নারদকৃত ভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পরাভক্তির কথা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। মহাপ্রভু ত শাস্ত্র-ছাড়া কিছুই করেন নাই, কিছুই শিক্ষা দেন নাই। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, রাধাকৃষ্ণ উপাসনা কি শাস্ত্রে নাই? গোস্বামি-পাদ বলিলেন, কেন থাকিবেনা? পুরাণে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার কথা আছে। নারদপঞ্চরাত্র, সনৎকুমার সংহিতা, বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র, যামল, রাধাতন্ত্র, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বই যে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব এবং রাধাকৃষ্ণ উপাসনাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা একথা অতি পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্র পড়েন নাই, তাঁহারাই এইরূপ অযথা কথা বলিয়া থাকেন। রূপগোস্বামী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রণীত শ্লোকদ্বয়ে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, কালে যে ভক্তি-যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, মহাপ্রভু তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। রূপগোস্বামিপাদোক্তশ্লোক—অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ। সমর্পয়িতুং উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং॥ হরিঃপুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-

সন্দীপিতঃ। সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥' সার্ব্বভৌমকৃত শ্লোক—কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতং তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ। রূপ-গোস্বামী 'চিরাৎ' শব্দ এবং সার্ব্বভৌম 'কালান্নষ্টং' শব্দ ব্যবহার করিয়া দেখাইয়াছেন, যে ভক্তিযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, মহাপ্রভু তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর দোলযাত্রা উপস্থিত হইল। ৺মদনমোহন জগন্নাথ-দেবের প্রতিনিধি হইয়া দোলমঞ্চে আগমন করিলেন। ভক্তগণ মদনমোহনের শ্রীবিগ্রহ সুবাসিত আবির ও কুংকুমরাগে লালেলাল করিয়া দিলেন। দোলমঞ্চ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান লোকে লোকারণ্য। 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতেছে। গোস্বামিমহাশয় শিষ্যবৃন্দপরিবেষ্টিত হইয়া কীর্ত্তনের সহিত নৃত্য করিতে করিতে দোল-বেদী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তিনি আজি মহাভাবে মাতোয়ারা; দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য। অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবাবলী তাঁহার পরমসুন্দর শ্রীবিগ্রহে প্রকটিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যরাশি অধিকতর বৰ্দ্ধিত করিতেছে। লোচনদ্বয় স্থির, তাহা হইতে অপূর্ব্ব ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। আজ মহাভাব মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। সে স্বর্গীয় শোভা, দিব্য লাবণ্য, অপার্থিব সৌন্দর্য্য, যে দর্শন করিতেছে, সেই ধন্য হইয়া যাইতেছে, সেই ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া তাঁহার পবিত্র চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে। মদনমোহনের ছত্রধারী প্রভুপাদের সেই অপ্রাকৃত ব্রাহ্মী শোভা দর্শন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং ভক্তিগদগদ-বাক্যে "এই ত জগন্নাথ" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মস্তকে জগন্নাথের ছত্র ধারণ করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। তাহার

নয়নে হইতে ধারা বহিয়া প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। গোস্বামি-মহাশয় কীর্তনে নৃত্য ও দোলমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। পরে আশ্রমে আসিয়া শিষ্যদিগের সহিত ফাগ খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহাদের দেহে আবির বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে লোহিতরাগে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। তাঁহারাও তাঁহার পবিত্র চরণে আবির প্রদান করিয়া ধন্য হইলেন। এইরূপ আনন্দোৎসবের মধ্যে দোলপর্ব্ব নির্ব্বাহ হইল। এই হোরি উৎসবে দেড় মণ আবির ব্যয়িত হইয়াছিল।

১৩০৫ সালের ২৯শে ফাল্গুন এমারমঠে গোস্বামিপাদ প্রায় দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে কাপড় দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে টিকিট করা হইয়াছিল। টিকিটে "হ্রীঁ" অক্ষর লেখা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাঁহার আশ্রমেও প্রতিদিন বহুলোককে নগদটাকা, কাপড়, ঘটি ইত্যাদি দেওয়া হইত। রাস্তায় বাহির হইলে বহুলোক তাঁহার কাছে অর্থাদি চাহিত এবং পাইত। একদিন তিনি বড়ডাণ্ড নামক রাস্তা দিয়া জগন্নাথের মন্দিরে যাইবার সময়ে দেখিলেন যে পশ্চিমদেশীয় একটি বৃদ্ধা নারী, রামবিহনে অযোধ্যার ঘোর দুর্দ্দশা হইয়াছে, এই মর্ম্মে একটি ভজন গাইতে গাইতে মন্দিরে যাইতেছে। গান শুনিয়া প্রভুপাদ একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। তিনি রমণীকে ডাকিয়া ভজনটি আগাগোড়া শুনিয়া তাহাকে একখানি ভালরেশমের কাপড় দিলেন।

একদিন জগন্নাথের মন্দিরে গোস্বামিপাদ পাণ্ডাদিগকে টাকা দিতেছিলেন। সকলেই আগে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া গোলযোগ ও তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছিল। ইহাতে কিশোরী বাবু লোকগুলির উপর যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন। লোকে এইরূপ গোলমাল ও

বিরক্ত করিলেও গোস্বামিমহাশয় কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্থিরভাবে তাহাদের সহিত অতি মিষ্ট ব্যবহার করিতেছিলেন। গোস্বামি-পাদের এইরূপ অবিচলিত ভাব ও নিজের অন্তরের দুরবস্থা দেখিয়া কিশোরীবাবুর মনে অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হইল। দান শেষ করিয়া প্রভুপাদ মন্দির হইতে বাহির হইলে পথে তিনি তাঁহার পায়ে পড়িয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নিজের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া কাতরভাবে বার বার ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া প্রভুপাদ প্রেমবাহু বিস্তার করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং সস্নেহে তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, কিসের জন্য ক্ষমা চাহিতেছ বাবা? গোস্বামি-পাদের এই ব্যবহারে কিশোরীবাবুর প্রাণ একেবারে গলিয়া গেল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আপনি স্থিরভাবে লোকগুলির উপদ্রব সহ্য করিয়া দান করিতেছিলেন, আর আমি তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া অপরাধ সঞ্চয় করিতেছিলাম। কিশোরী বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন, কিসের অপরাধ, বাবা। অপরাধ আবার কি! তোমার কোন অপরাধ হয় নাই। আমার কাছে কি তোমাদের অপরাধ আছে? পিতার কাছে কি সন্তানের অপরাধ হয়, না পিতা সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করেন? তোমাদের কোন ভয় নাই। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সেই আলিঙ্গনে কিশোরীবাবুর মন একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি অপূর্ব্ব শান্তিলাভ করিয়া স্নিগ্ধ হইলেন।

শ্রীশ্রীগোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরস্থ বিভিন্ন দেবদেবী-গণকে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভুজীর আদেশমত শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ মহাশয় যে দিন বস্ত্রাদি লইয়া প্রত্যেক মন্দিরে গিয়া উহা প্রদান করিয়া আসিলেন, সেইদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে

শীতলাদেবী আসিয়া অনুনয়সহকারে তাঁহাকে বলিতেছেন—"গোসাঁই সকলকে কাপড় দিলেন, কিন্তু আমার কি অপরাধ যে আমি তাঁহার হাতের একখানা কাপড় পেলাম না?" পরদিন প্রভুপাদকে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি বলিলেন "বড় ভুল হইয়াছে; শীতলাদেবীকে বস্ত্রাদি দিয়া আইস।" তদনুসারে উপযুক্ত বস্ত্রাদি দেবীকে দেওয়া হইল।

গোস্বামিমহাশয় তাঁহার তৃতীয় দৌহিত্র শৌরীন্দ্রসুন্দরকে গোপাল বলিয়া ডাকিতেন। একদিন শৌরীন্দ্র তাহার জননীর সহিত গোস্বামিপাদের আসনগৃহে উপস্থিত হইলে প্রভুপাদ আদর করিয়া তাঁহাকে কিছু খাদ্যবস্তু দিলেন। সেই সময়ে একটি বানরী শাবক সঙ্গে লইয়া আসনগৃহে আসিল। তখন গোস্বামিমহাশয় শৌরীন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তুমিও যেমন গোপাল, এও (বানর ছানা) সেইরূপ গোপাল। এই বলিয়া আদরের সহিত বানরী ও তাহার শাবককে খাবার দিলেন।

একদিন কুঞ্জ * (কুঞ্জ বিহারী গুহ) গোস্বামিপাদকে বলিলেন, আমাদিগের ত কিছুই হ'ল না। প্রবৃত্তিগণ এখন আমাদিগের উপর প্রবলভাবে প্রভুত্ব করিতেছে। কত কাল আর এই দুরবস্থা ভোগ করিব? এই বলিয়া তিনি দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, দেখ, এক মুহূর্ত্তে তোমাদিগের কাম-ক্রোধাদি দূর করিয়া দিব্য অবস্থা খুলিয়া দিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা করিতে নাই। তাহাতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা থাকে না। ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মলাভ না করিলে তাহার আদর হয় না। কষ্টলব্ধ বস্তুর প্রতিই লোকের অধিক যত্ন হইয়া থাকে। সহজে যাহা পাওয়া যায়, তাহার

* ৺ কুঞ্জবিহারী গুহ গোস্বামিমহাশয়ের একজন অনুগত শিষ্য। বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া গ্রামে ইহাঁর বাস। ইনি অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত ও বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রতি তাদৃশ যত্ন হয় না। আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক ধর্ম্মলাভ কর, তাহাতে ধর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবে। কৃপাদ্বারা সহজে ধর্ম্ম পাইলে তাহার গুরুত্ব বোধ করিতে পারিবে না।

একদিন জগন্নাথদর্শনে যাইয়া প্রভুপাদ হঠাৎ অক্ষয়বটের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন এবং এক দৃষ্টে বৃক্ষটিকে দর্শন করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্যদিগকে বলিলেন, এই যে বৃক্ষটি দেখিতেছ, ইহা সাধারণ বৃক্ষ নহে। ব্রহ্মজ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া এই বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে। এ তরু অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

আর একদিন জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে বলিলেন, এই যে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা দেখিতেছ, ইহারা দারুব্রহ্ম। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম দারুরূপে পরিণত হইয়া জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রারূপে প্রকটিত হইয়াছেন। ইহাদিগকে দেখিলে ব্রহ্মদর্শন হয়। এই বলিয়া ভাবাবেশে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বার বার বলিতে লাগিলেন, জয় দারুব্রহ্ম, জয় দারুব্রহ্ম। সেই সময়ে তাঁহার শরীরে অপূর্ব্ব ব্রাহ্মী শোভা প্রকটিত হইল। সমস্ত দেহ হইতে এক অপ্রাকৃত ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া সর্ব্বস্থান জ্যোতিষ্মান্ করিয়া তুলিল। দিব্য লাবণ্যে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আর একদিন দর্শনে যাইয়া দেখিলেন যে মণিকোঠায় যথেষ্ট আলো নাই। যে অল্প আলো আছে তাহাতে ভাল করিয়া ঠাকুর দেখা যায় না। আলোর এই অবস্থা দেখিয়া তিনি প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে পাণ্ডাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা আলো দাও বা না দাও তাহাতে কি যায় আসে। জগন্নাথ-দেবের শ্রীবিগ্রহ হইতে যে দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, তাহাতেই মণিকোঠা আলোকিত হইয়া গিয়াছে। সেই ব্রহ্মজ্যোতির কাছে

প্রদীপের আলো অতি ছায়া। সূর্য্য এই জ্যোতির এককণা পাইয়া জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে।

একদিন আসনে বসিয়া রাস্তার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, বিমলামাই জগন্নাথের রূপ ধরিয়া মাথায় পাগড়ী দিয়া যাইতেছেন, আর আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। এই হাসিদ্বারা তিনি ইঙ্গিতে আমাকে বলিতেছেন, দেখ, জগন্নাথ ও আমি এক। আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই। মূর্খ লোকে দেবতায় দেবতায় ভেদ দেখে। বাস্তবিক সকলই একেরই বিভিন্ন প্রকাশ, ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, একে পাঁচ পাঁচে এক, মন ক'র না রেষারেষি।

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা প্রসঙ্গে গোস্বামিমহাশয় একদিন বলিলেন, তপঃশক্তি দ্বারা লোকের পীড়া আরোগ্য করাতে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া একদিন আমাকে বলিলেন, "তুইই ত আমার সর্ব্বনাশ কল্লি। আমি লুকিয়ে ছিলুম, তুই আমাকে প্রকাশ করে দিলি। দেখ্ ত আমার কত ক্ষতি হয়ে গেছে।" ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, আমি কি তোমাকে লোকের রোগ সারাতে বলেছিলুম? পীড়া আরাম কর্‌তে গেলে কেন? এ কথার উত্তরে ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, "যে ক'রে ধরে, যেরূপ কাতর হয়ে এসে পড়ে, তাতে আমি স্থির থাক্‌তে পারিনা, কষ্ট দেখে আমার দয়া হয়। তখন ভাল না করে পারি না।" ইহার উত্তরে আমি বলিলাম, এরূপ দয়া কর্ত্তে নাই। দেশে, ডাক্তার কবিরাজ কি জন্য রয়েছে? রোগ হয়েছে, তাদের কাছে যাক্। তপস্যা কি রোগ সারাবার জন্য? আমার এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী

মহাশয় চুপ্ করিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গোস্বামিমহাশয় আরও বলিলেন যে ব্রহ্মচারী মহাশয় লোককে পরীক্ষা করিতে গিয়া যে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করিয়া দিতেন ইহাতেও তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।*

অতঃপর প্রভুপাদ ২০ শে চৈত্র বড়আখড়া নামক শ্রীসম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবদিগের বড়ডাণ্ডস্থ আশ্রমে বিবিধ উপাদেয় মহাপ্রসাদদ্বারা সাত আট সহস্র সাধুর সেবা করেন। ভোজনান্তে প্রত্যেক সাধুকে বস্ত্র ও ঘটি দিয়াছিলেন। সাধুসেবা শেষ হইয়া গেলে দেখা গেল যে বিস্তর কাপড় ও ঘটি উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। কেহ কেহ সেগুলি লইয়া আসিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আনা হইল না। গোস্বামিপাদ সে সমস্ত বড় আখ্ড়ার মোহান্তকে দিয়া আসিলেন।

এই সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় শিশির-কুমার ঘোষ মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে শূদ্ররূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গবাসী পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোস্বামিমহাশয় অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিমহাশয়ের এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখেন। পত্রখানি এ স্থানে উদ্ধৃত হইল।

* ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথায় অনেকের গুরুনিষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। গোস্বামিপাদের কয়েক জন শিষ্যও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথায় গুরুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

## পত্র।

নমস্ত নিত্যানন্দবংশধরচরণসরোজেষু।

অদ্য বঙ্গবাসীতে "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক প্রবন্ধটী শুনিয়া যে কত দূর সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। যখন আমি কলিকাতায় ছিলাম, প্রায়ই দেখিতাম যে, লোকেরা আসিয়া বলিতেছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতে মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র ছিলেন তাহাই লেখা হইতেছে। সেই পর্য্যন্ত আমার মনে সর্ব্বদা হইত যে আমাদের কোন গোস্বামী বংশে কি এমন কেহই নাই যে এই মিথ্যা এবং ভয়ানক মতের প্রতিবাদ করে? অদ্য আপনার প্রতিবাদ শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে ও সমুদ্র শুখাইয়া যায়, তথাপি ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র ছিলেন, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না। আপনি যেরূপ যুক্তিযুক্ত ভাবে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা খুব সুন্দরই হইয়াছে। যুক্তিগুলি খুবই অকাট্য হইয়াছে। তথাপি আমিও দুই একটি কথা বলি। আপনি যাহা প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, তবে সব দিকেই ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

৺মহাপ্রভু যখন গয়াধামে গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার প্রকটাবস্থা নয়। আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে থাকিয়া তিনি যে শূদ্রের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবেন, এ মোটেই সম্ভব হইতে পারে না। গয়াধামে গিয়া শ্রীঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ না হইলে তাঁহার কাছে দীক্ষাগ্রহণ করিবেনই বা কেন? তা ছাড়া গুরুপরম্পরায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী বলিয়া লেখা আছে। ঈশ্বরপুরী শূদ্র হইলে মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহাকে শিষ্য করিবেন কেন?

আপনি যে সব যুক্তি দেখাইয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সব অসার ও অন্যায় মত খুব খণ্ডন করা হইয়াছে। এইরূপ ভয়ানক মত যাহাতে প্রশ্রয় না পাইতে পারে, তাহার জন্য আপনারা সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে; আপনারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্য না চেষ্টা করিলে আর কারা করিবে? এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম না দাঁড়ালে, সর্ব্বসাধারণের কখনই মঙ্গল হবে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা হইলে যথার্থ সকলের কল্যাণ হইবে। শেষে ৺মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন ও যেন তাঁর সত্য ধর্ম্ম এইরূপ রক্ষা করিতে ও লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন।

৺শ্রীক্ষেত্রধাম। শাস্ত্র ও সদাচার-রক্ষাকারী
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। সর্ব্বসজ্জনগণের দাসানুদাস
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

এই পত্রখানি প্রভুপাদ যেরূপ বলিয়াছিলেন শ্রীমান্ পান্নালাল ঘোষ তাহাই লিখিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পান্নার হস্তাক্ষর প্রভুপাদের হস্তাক্ষরের মত হইয়াছিল।

গোস্বামিমহাশয় এই পত্রে দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া বলিতেছেন যে "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হইলে, দেশের কল্যাণ হইবে না।" ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসও তাঁহার এই কথার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কলি ব্যতীত অন্য যুগত্রয়ে ভারত যখন জ্ঞানে, ধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, সভ্যতায়, পৃথিবীর শীর্ষস্থানে থাকিয়া গুরুরূপে জগতে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নষ্ট হওয়াতেই এ দেশের শোচনীয় অধোগতি হইয়াছে। যত

দিন দেশে শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন ইহার উন্নতি ও কল্যাণের আশা নাই। যাঁহারা দেশ হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তুলিয়া দিয়া ভারতের উন্নতি ও মঙ্গলবিধান করিতে চাহেন, জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া ইহাকে ম্লেচ্ছভূমিতে পরিণত করিতে চাহেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহারা ভারতের ধাতু, ভারতের প্রকৃতি কিছুই বুঝেন না। গোস্বামিপাদ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার কাছে অন্য জাতি ব্রাহ্মণগণের সহিত এক আসনে বসিতে পাইতেন না। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে স্বতন্ত্র আসন দিতেন। অন্য জাতি ব্রাহ্মণদিগের সহিত একাসনে বসিলে প্রভুপাদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া ভিন্ন আসনে বসাইতেন।

গোস্বামিমহাশয়ের পুরীবাস ও তথাকার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইলে তাঁহার কলিকাতা আসিবার কথা হইল। সে সময়ে কলিকাতায় অতিশয় প্লেগ ও তদুপলক্ষে বিবিধ গোলযোগের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জন্য গোস্বামিপাদ আরও কিছু কাল পুরীতে বাস করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি বলিলেন প্লেগ চলিয়া গেলে আমরা কলিকাতায় যাইব। আর তখনও দোকানে তাঁহার কিছু ঋণ ছিল। কলিকাতা না আসিবার তাহাও অন্যতর কারণ। কিন্তু হায়, তখন কেহই জানিতে পারে নাই যে তাঁহার এই অবস্থান চিরঅবস্থানে পরিণত হইবে, তিনি আর বঙ্গদেশে ফিরিবেন না। হরিনামের মধুর ধ্বনিতে বঙ্গের আকাশ আর প্রতিধ্বনিত হইবে না। ধর্ম্মপিপাসু বঙ্গবাসিগণ আর তাঁহার মুখ-কমলনিঃসৃত ধর্ম্মকথা, হরিকথা শ্রবণ করিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিবেন না। সেই অকলঙ্ক বঙ্গসুধাকর নীলাচলের অন্তরালে চিরদিনের মত অদৃশ্য হইবেন। হরিনামের বাষ্পীয় পোত বঙ্গসাগরে নিমজ্জিত হইবে।

তাঁহার সেই হৃদয়বিদারক লীলাসংবরণরূপ দুঃখকাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

পুরীর কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোক তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছিল। তিনি সেই বিষপানরূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া লীলা সংবরণ করেন। ভগবান্ রামচন্দ্র যেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক সরযূতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বেচ্ছায় ব্যাধের বাণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শাক্যকুলরবি বুদ্ধদেব যেরূপ শূকরমাংস ভোজনচ্ছলে শিষ্যমণ্ডলীকে অনাথ করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, নবদ্বীপচন্দ্রমা গৌরাঙ্গসুন্দর যেমন স্বইচ্ছায় গোপীনাথে * আত্মগোপন করিয়াছিলেন, মহাত্মা যিশু যেমন জানিয়া-শুনিয়া ফিরুসীদিগের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া ক্রুশে প্রাণ দিয়াছিলেন, বঙ্গের সর্ব্বস্বধন গোস্বামিপাদও সেইরূপ বিষপানব্যপদেশে সকলকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে গমন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু ছিল। তিনি সর্ব্বদাই সূক্ষ্মদেহে লোকলোকান্তরে পর্য্যটন করিতেন। তিনি ভগবান্ বিরূপাক্ষের ন্যায় মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবেরও তাঁহার শরীরের ক্ষতি করিবার ক্ষমতা ছিল না। সামান্য বিষে সে অপ্রাকৃত দেহের কি করিবে? তিনি ইচ্ছা না করিলে কখনই তাঁহার তিরোভাব হইত না। বস্তুতঃ বিষপান কেবল একটা উপলক্ষমাত্র। তিনি এই সূত্র অবলম্বন করিয়া নরলীলা শেষ করিলেন।

পুরীর কোন মঠে শ্রীসম্প্রদায়স্থ এক জন বৈষ্ণব মোহান্ত সেই সময়ে বাস করিতেন। পুরীতে তাঁহার প্রভূত প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব

* মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতপ্রতিষ্ঠিত টোটার গোপীনাথের শরীরে লীন হইয়াছিলেন

ছিল। ক্ষেত্রবাসিগণ, বিশেষতঃ উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন। গোস্বামিমহাশয় পুরীধামে উপস্থিত হইলে মোহান্তজীর সেই প্রতিষ্ঠার ও প্রতিপত্তির বিলক্ষণ হ্রাস হইল। জটিয়াবাবার দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের নিকট তাঁহার খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমস্তই হীনপ্রভ হইয়া গেল। বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য ভদ্রলোক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গোস্বামিপাদের নিকটে আসিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত হিংসা হইল। গোস্বামিমহাশয়ই এই অনিষ্টের কারণ মনে করিয়া তিনি তাঁহার উপর জাতক্রোধ হইলেন। মোহান্তজীর হৃদয়ে বিষম বৈরানল জ্বলিয়া উঠিল। এতদ্ব্যতীত তিনি গোস্বামিপাদের নিকট একটি আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য কয়েক সহস্র টাকা চাহিয়া নিরাশ হইয়াছিলেন, ইহাও মোহান্ত মহারাজের ক্রোধ-বিদ্বেষের অন্যতর কারণ। এই কারণে তিনি গোস্বামিপাদের উপর বদ্ধবৈর হইয়া তাঁহাকে তীব্র হলাহল পান করান। এই কার্য্যে তাঁহার কয়েক জন সাহায্যকারী ছিল। গঙ্গাধর খুটিয়াপ্রমুখ জগন্নাথের কয়েক জন পাণ্ডাও গোস্বামিমহাশয়ের নিকট ইচ্ছামত স্বার্থসাধন করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। ইহারা তাঁহার অনিষ্টসাধনের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা সুযোগ বুঝিয়া মোহান্ত বাবাজীর সহিত মিলিত হইয়া বিষপ্রয়োগব্যাপারে তাঁহার সাহায্যকারী হইল। ইহারা সকলে পরামর্শ করিয়া সাধুর বেশধারী একটি লোকদ্বারা তীক্ষ্ণ গরলমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রভুপাদের নিকট প্রেরণ করে। পাপীষ্ঠদিগের উপদেশমতে সেই দুরাত্মা গোস্বামিমহাশয়ের নিকট উপনীত হইয়া বলে, মহারাজ! আপনার জন্য এই

মহাপ্রসাদ আনিয়াছি। ভক্ষণ করুন। সর্ব্বদর্শী গোস্বামিমহাশয় জানিতে পারিয়াছিলেন যে এই মিষ্টান্ন বিষমিশ্রিত। এজন্য তিনি ইহা ভোজন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া দুরাত্মা বলিল,মহাপ্রসাদ প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করিতে হয়; এই বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিল—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্রকালবিচারণা॥

এই শ্লোকটি শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় ভগবান্‌কে স্মরণপূর্ব্বক তীব্রহলাহলমিশ্রিত মিষ্টান্ন ভোজন করিলেন। তাঁহার আহার হইবা মাত্র মিষ্টান্ন আনায়নকারী প্রস্থান করিল। তিনি যে কেন জানিয়া শুনিয়া তীক্ষ্ণ বিষ ভক্ষণ করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইয়াছে, নরলীলাসম্বরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্যই কি তিনি জানিয়াশুনিয়াও তীব্র হলাহল পান করিলেন?

বিষভক্ষণের পর তাঁহার এক জন শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি না জানিয়া বিষ খাইয়াছিলেন? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, না। বিষ আনয়নকারী বাড়ীতে উপস্থিত না হইতেই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে এক ব্যক্তি আমার জন্য গরলপূর্ণ মিষ্টান্ন আনয়ন করিতেছে। এই কথা শুনিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, তবে আপনি খাইলেন কেন? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, প্রসাদ কি অগ্রাহ্য করিতে পারা যায়?

১৩০৬ সালের ২৪শে বৈশাখ দ্বাদশী তিথিতে গোস্বামিমহাশয় বিষপান করেন। ইহার পর তিনি এক মাস দেহে ছিলেন।

বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া জলপান করিবার পর তাঁহার জিহ্বা ও পাকস্থলিতে ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল; তিনি সংজ্ঞাহীন

হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বাহ্ন নয়দশটার সময় এই ঘটনা হয়। সমস্ত দিন সংজ্ঞাহীন থাকিয়া রাত্রি সাত কি সাড়েসাতটার সময় তাঁহার চৈতন্য হইল। চৈতন্যলাভের পর তিনি আহারাদি সমাপন করিয়া বিষপ্রয়োগের কথা প্রকাশ করিলেন। সকলে মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল। বিষের কথা শুনিয়া সকলেই যারপরনাই ভীত ও চিন্তিত হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—সাধুর বেশধারী একজন লোক কয়েকটী মগজ লাড়ু লইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল, মহারাজ! আপনার জন্য জগন্নাথের প্রসাদ আনিয়াছি ভক্ষণ করুন। উহা যে বিষমিশ্রিত তাহা আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। ঐ বিষ এত তীব্র ছিল যে উহা ভক্ষণমাত্রই একটী হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। এজন্য লাড়ু খাইব কি না ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। সে ব্যক্তি আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিল, প্রসাদ প্রাপ্তমাত্রই খাইতে হয়। এই বলিয়া একটী শ্লোকও পড়িল। তখন আমি জগন্নাথদেবকে স্মরণ করিয়া খাইয়া ফেলিলাম। একটু পরেই আমার পেটে ভয়ানক বেদনা আরম্ভ হইল। পরে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। ইহার পরই আমার আত্মা দেহ হইতে বাহির হইল, যাহাকে মৃত্যু বলে আমার তাহাই হইল। আমার মৃত্যু হইলে জগন্নাথ লোকনাথকে বলিলেন, পাপাত্মারা গোসাঁইকে বধ করিয়াছে।* তুমি সত্বর যাইয়া তাহাকে রক্ষা কর। জগন্নাথের কথায় লোকনাথ আমার কাছে আসিয়া, সমুদ্রমন্থনোত্থিত তীব্র হলাহল তিনি যে বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া পান করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আমার দেহস্থ প্রায় সমস্ত বিষ পান করিলেন। কিন্তু একেবারে

* লোকনাথ, পুরীর প্রসিদ্ধ লোকনাথনামক মহাদেব।

নিঃশেষ করিলেন না। অনন্তর চতুর্ভুজা মনসাদেবী আসিয়া তাঁহার কক্ষস্থিত কুম্ভ হইতে শান্তিবারি লইয়া আমার অঙ্গে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহাতে আমার শারীরিক যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল। অতঃপর আমি আবার দৈহস্থ হইলাম।

ইহার পর জগন্নাথ আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি বিষ মিশ্রিত মিষ্টান্ন খাইলে কেন? আমি বলিলাম, তোমার প্রসাদ কি অগ্রাহ্য করিতে পারি?

জগন্নাথ। প্রসাদ বলিয়া যাহা কিছু উপস্থিত হইবে, তাহাই যে অবিচারে খাইতে হইবে, ইহা তোমাকে কে বলিল? পাপীষ্ঠেরা তোমার প্রাণনাশ করিবার জন্য তোমাকে তীক্ষ্ণ বিষ খাওয়াইয়াছে। তোমার পুত্র ও দৌহিত্রদিগের উপরও তাহাদের আক্রোশ আছে। তাহাদিগকে সাবধানে রাখিও। দুর্বৃত্তদিগের একান্ত ইচ্ছা যে তাহারা তোমার বংশ নির্ম্মূল করে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে পুরীর কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী গোস্বামিপাদকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। তথাকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সেন তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিষপ্রয়োগের কথা শুনিয়া দুরাত্মাদিগের নামে অভিযোগ আনিবার সংকল্প করিয়া প্রভুপাদের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ কানে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন যে আপনারা কদাচ এ কার্য্য করিবেন না। তাহাদিগের উপর আমি বিন্দুমাত্রও বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হই নাই। ভগবান্ তাহাদিগের মঙ্গল করুন। তিনি নিষেধ করাতে সকলেরই অভিযোগ আনয়নের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল।

লোকনাথ শরীরস্থ সমস্ত বিষ নিঃশেষ করিয়া পান করেন নাই,

এই কথা শুনিয়া জনৈক শিষ্য গোস্বামিপাদকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, লোকনাথ কেন যে সমস্ত পান করিলেন না, তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার অভিপ্রায় আমি কিরূপে জানিব? কিন্তু অল্পদিন পরেই সে কারণ বুঝিতে পারা গেল। ভক্ষিত বিষের যে অংশ দেহে রহিয়া গেল, তাহাতেই তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিল। দিন দিনই তিনি দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বিষের তীব্র যন্ত্রণায় তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর সর্ব্বদা জ্বলিয়া যাইত। শীতল দ্রব্য সর্ব্বদাই খাইতে চাহিতেন। সর্ব্বদাই বেদানা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও বেদানা পাওয়া গেল না। ইহাতে নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন, বেদানা ত পাওয়া গেল না। উইল্‌সন্‌ হোটেলে বোতলেকরা বেদানার রস পাওয়া যায়, তাহা আনাইলে হয় না? বিশ্বাস মহাশয়ের কথা শুনিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, আমি সকলকে শাস্ত্র ও সদাচারের অনুগত হইয়া চলিতে বলি, আর আমি তাহা মানিব না, এ কেমন কথা। অন্যকে মানিয়া চলিতে বলিয়া যদি আমি না চলি, তাহা হইলে ত আমার প্রতারণা করা হয়। নবকুমার বাবু আর একদিন বলিলেন, জ্বালা নিবারণের জন্য অড়িকলোন মাখিলে হয় না? ইহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ মদ খাইনা, কিন্তু গায়ে মাখি।

এইরূপে তাঁহার শরীর যখন দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতেছিল, সেই সময় তাঁহার শরীররক্ষা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া সরলনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি ইচ্ছা না করিলে বিষের দ্বারা আপনার শরীর নষ্ট হইতে পারে কি? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ইচ্ছা না করিলে বিষ ত দূরের কথা, ব্রহ্মা-

বিষ্ণুশিবও আমার দেহের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন না। তাঁহার এই কথা শুনিয়া সরলনাথ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে তাহা হইলে আর ভয় নাই, গোস্বামিমহাশয় দেহত্যাগ করিবেন না। সত্বরই তিনি নিরাময় হইবেন। অনুগত শিষ্য-মণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি কি চলিয়া যাইতে পারেন? কিন্তু তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া সকলের হৃদয়ে শোকের আগুন জ্বালাইয়া ভবলীলা শেষ করিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গোস্বামিমহাশয়ের ঘরে সংকীর্ত্তন হইত। বহুদিন হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা কীর্ত্তন করিতে পারিতেন, উপস্থিত থাকিলে তাঁহারাই সংকীর্ত্তন করিতেন। তাঁহারা কেহ না থাকিলে প্রভুপাদ নিজেই করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতেন। এই সময় গোস্বামিমহাশয়ের অন্যতম শিষ্য মধুরকণ্ঠ সুগায়ক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন পুরীতে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন সায়ংকালে তিনি কীর্ত্তন করিতেন। একদিন সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তনের সময়ে গোস্বামিমহাশয় ভাবে মাতোয়ারা হইয়া অনেকক্ষণ নৃত্য করিলেন, পরে ভাবাবেশে গৃহের এক কোণে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ঐযে, ঐযে, জগন্নাথদেব রেবতীর গান শুনিতেছেন। পরে আবার রেবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, নিবি নে, নিবি নে, এই বলিয়া নিজের পরিধেয় বহির্ব্বাস ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। টানাটানিতে বহির্ব্বাস খুলিয়া গেল। তিনি তাহা রেবতীবাবুকে দিলেন। একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা মস্তকের জটা বাঁধা ছিল, তাহাও খুলিয়া দিলেন। পরে বলিলেন, যিনি কীর্ত্তন গাইতেছেন, জগন্নাথদেব তাঁহাকে একজোড়া লুই দিতে বলিতেছেন। প্রভু-পাদের এই কথা শুনিয়া সরলনাথ তখনই লুই আনিতে গেলেন।

কীর্ত্তন শেষ হইলে প্রভুপাদ যোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন, যোগজীবন, রেবতী আমাকে অনেক ভাল গান ও কীর্ত্তন শুনাইয়াছেন, কীর্ত্তনীয়া বিদায় করিতে হয়। তাঁহাকে একখানি ভাল পশমী কাপড় আনিয়া দাও। ইহার পর সরলনাথ লুই আনিলে গোস্বামিমহাশয় নিজের হাতে তাহা রেবতী বাবুকে দিলেন।

কীর্ত্তনীয়া বিদায় করিবার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইল। মনে হইল ইহাঁর পৃথিবীর কার্য্য কি শেষ হইল? সংকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞের কি আজ পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন? অদ্য কীর্ত্তনীয়া বিদায় করিয়া কি কীর্ত্তনরূপ মহাব্রত উদ্‌যাপন করিলেন? আর কি কীর্ত্তন হইবে না?

এই সময়ে একদিন রজনীযোগে দুইটি পরলোকবাসী আত্মা গোঁস্বামিপাদের কাছে আসে। ইহারা পিতাপুত্র। পিতা আস্তিক, হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী। তিনি কুলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্র নাস্তিক, কোন ধর্ম্মেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। জীবিত সময়ে তিনি গোস্বামিমহাশয়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। ইহাঁরা বৈদ্য, নৈহাটির নিকটবর্ত্তী গৌরিভা গ্রামে ইহাঁদের বাড়ী ছিল। গোস্বামিমহাশয়ের নিকট উপনীত হইয়া পুত্র বলিলেন; আমরা পরলোকে আসিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে বর্ত্তমান সময়ে জীবউদ্ধারের ভার আপনার উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। আপনি ভিন্ন আর কাহারও উপর সে ভার নাই। অতএব আপনি আমাদিগকে কৃপা করুন; যাহাতে আমরা উদ্ধার হইতে পারি, আপনি তাহা করুন। প্রেতের কথা শুনিয়া গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, তোমরা জীবিত থাকিলে দীক্ষা দিয়া তোমাদের উদ্ধারের উপায় করিতে পারিতাম। এক্ষণে তাহা হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তবে আমি জীবিত থাকিতে যদি তোমরা

জন্মগ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে সাধন দিয়া তোমাদিগের পরিত্রাণের উপায় করিতে পারি। এ অবস্থায় কিছুই হইবে না। তাঁহার কথা শুনিয়া পিতা বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন কথাই বলিলেন না। পুত্র স্থির না থাকিয়া প্রভুপাদের সহিত বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য দেখিয়া প্রভুপাদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি যদি বাড়াবাড়ি কর তাহা হইলে আমি তোমার অনন্ত নরক ভোগের ব্যবস্থা করিব। তাঁহার এই কথায় ভয় পাইয়া আত্মাদ্বয় পলাইয়া গেল। পর দিন সকালবেলা তিনি এই ঘটনা প্রকাশ করিয়া পিতার সম্বন্ধে বলিলেন, যে পিতা বিশ্বাসী এবং কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ইহাঁর মঙ্গল হইবে। সকলেরই কুলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করা উচিত। সকলে সদ্‌গুরুলাভের অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। যাহারা সদ্‌গুরুর কৃপা পায় না, তাহাদিগের কুলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য। অদীক্ষিত লোকের কোন ধর্ম্মেই অধিকার নাই।

আর এক দিন অন্য একটি প্রেত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিল। পূর্ব্ব বাঙ্গলার কোন পল্লীগ্রামে ইহার বাড়ী ছিল। এক জন ব্রাহ্মণ কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া ইহার গৃহে অতিথি হন। এই ব্যক্তি অর্থলোভে ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া তাঁহার সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে। হত্যাকারী এই পাপে প্রেত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতেছে। ইহার শরীর পোড়া কাঠের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। গোস্বামিমহাশয় এই মহাপাপীকে 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সকলের নিকট ঘটনাটি বিবৃত করিলেন।

আর এক রজনীতে তাঁহার পরলোকগত এক জন শিষ্য যন্ত্রণায়

ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিয়া কৃপাভিক্ষা করিলেন। তাঁহাকে তিনি কিছুমাত্র কৃপা না করিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিলেন। প্রতারণা করিয়া প্রতিবাসীর বাড়ীটি আত্মসাৎ করাতে পরলোকে ইহাঁকে এই কঠিন শাস্তিভোগ করিতে হইতেছে। তাঁহার আর্ত্তনাদে গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহারা গোস্বামিমহাশয়কে চীৎকার ও আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন।

গোস্বামিমহাশয় যে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, তাহা তিনি ইঙ্গিতে অনেক বার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন বলিলেন, বিষ আমার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে; এইবারেই সব শেষ হইবে। তাঁহার বলিবার অভিপ্রায়, এই বার আমার জীবন শেষ হইবে, সকলেই বুঝিলেন যে বিষের ক্রিয়া শেষ হইয়া তাঁহার শরীর সুস্থ হইবে।

দানের জন্য ঋণ হইয়াছিল; সেই কথাপ্রসঙ্গে এক দিন বলিলেন, ঋণ শোধ হইয়া গেলে আমি এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিব না। এ কথার ভিতরেও তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলে তিনি এক মুহূর্ত্তও দেহে থাকিবেন না; কিন্তু সকলে বুঝিলেন তিনি পুরীত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইবেন।

এক দিন নরেন্দ্র সরোবরের তীরবর্ত্তী এক সাধুর আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তথায় টবে একটি তুলসীবৃক্ষ দেখিয়া তাহা লইয়া আইসেন। আনিবার সময়ে বলিলেন যে এই বৃক্ষ আমার সঙ্গে যাইবে। সকলে মনে করিলেন যে তিনি বৃক্ষটি সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাইবেন। কিন্তু সেই বৃক্ষ তাঁহার মৃতদেহের সহগামী হইয়াছিল।

তিনি সকলকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যাইবেন, আনন্দের বাজার, চাঁদের হাট, সুখের মেলা চিরকালের জন্য ভাঙ্গিয়া যাইবে, অনুগত শিষ্যগণের সুখের স্বপ্ন জন্মের মত ফুরাইবে,—বোধ হয় ইহাই মনে করিয়া কথা বলিবার সময় তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না। শিষ্যগণের সহিত কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। যে কথাতে রোদন করিবার কোন কারণ নাই, তাহাতেও তিনি রোদন করিতেন।

তাঁহার সাধনপ্রদানকার্য্য যে শেষ হইল, ইহা তিনি এক দিন এইরূপে প্রকাশ করিলেন :—তোমরা যে সাধন পাইয়াছ, ইহা দেবদুর্ল্লভ বস্তু। ভগবানের বিশেষ কৃপা ব্যতীত ইহা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভুর সময়ে বহু লোক ইহা পাইবার প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু অন্তরঙ্গ চারি জন ব্যতীত তিনি সকলকে ইহা দেন নাই। সে সময়ে প্রার্থী হইয়াও যাঁহারা ইহা পান নাই, এবারে কেবল তাঁহারাই পাইলেন। এবার যাঁহারা এ সাধন পাইলেন, তাঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন ; তাঁহার সংকীর্ত্তনে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদিগের নাম সেই সময়েই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার পর মাথা খুঁড়িলেও লোকে এ বস্তু পাইবে না। (১)

(১) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনগুপ্ত তাঁহার লিখিত গোস্বামিপাদের জীবনী পুস্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যলোককে এই সাধন না দিবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া এইরূপ লিখিয়াছেন:—"মহাপ্রভু মাত্র সাড়ে তিন জনকে এই শক্তি দিয়াছিলেন। যাঁহারা এই সাধন পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর সময়ের লোক। সকলেই এই শক্তির প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে দেন নাই। তাহার কারণ এই যে, এই শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইলে সংসারের লোক প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কিন্তু মহাপ্রভুর তখন

আর একদিন তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ কথা বলিলে কেন? তাঁহাতে তিনি বলিলেন আমার অন্তর্জলী হইল। দেবতারা আমার অন্তর্জলী

সাধারণ ধর্ম্ম প্রচার, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, ভক্তি শাস্ত্র প্রণয়ন প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য ছিল। সেই সময়ে তাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করাইয়াছেন।" অমৃত বাবুর এই কথা যে সম্পূর্ণ ভুল, নিম্নলিখিত গোস্বামিপাদবাক্য তাহা প্রমাণ করিতেছে।

প্রঃ। যোগপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ প্রায়ই ভাবপ্রিয় ও কার্য্যবিমুখ, একথা সত্য কি না?

উঃ। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। যোগীদের সংবাদপত্র নাই, বাহ্য কোন চিহ্নদ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের সংবাদ প্রকাশিত হয় না, তাঁহারা প্রায়ই গোপনে, নির্জ্জনকাননে বা গিরিকন্দরে বাস করেন, যখন লোকালয়ে আসেন, তখনও সচরাচর সাধারণ লোকের সহিত দুচারিটা কথা বলিয়া চলিয়া যান, এই সকল কারণে যদি কেহ মনে করেন যে তাঁহারা অলসপ্রকৃতি, ধ্যানপরায়ণ, সংসার-বিমুখ ভিক্ষুক মাত্র, তাহা হইলে তাহার ঘোর অপরাধ হয় মনে করি। যদি একটি সপ্তাহ কোন প্রকৃত যোগীর সহবাসে কাটান যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে তাঁহারা কিরূপ পরোপকারী, সংসারের কল্যাণের জন্য কত চিন্তা করেন ও কিরূপ ভয়ানক ত্যাগস্বীকার করিয়া জন-সমাজের দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান এবং কেমন অদ্ভুত নিয়মবলে ঈশ্বরের কৃপায় ও নিজেদের শক্তিবলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হন। যাঁহারা জীবনে কখনও কোন যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখন কোন মহাত্মার সঙ্গলাভে জীবন সার্থক করেন নাই, কেবল কতকগুলা ভণ্ড, অলস ও ব্যবসায়ী সন্ন্যাসীমাত্র দেখিয়া যোগদর্শনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা যোগিচরিত্রের অদ্ভুত রহস্য কি বুঝিবেন? তাহাদের এসম্বন্ধে কোন কথা বলারই অধিকার নাই। যে দেশের ঋষিরা কবি, ঋষিরা দার্শনিক, ঋষিরা সাহিত্যলেখক, ঋষিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা, ঋষিরা জ্যোতির্ব্বিদ ও গণিতশাস্ত্রের উদ্ভাবক, ঋষিরা দৈহিকযন্ত্রবিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঋষিরা ব্যবস্থাপক ও রাজ-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক, যে দেশের ঋষিরাই

করিলেন। তাঁহারা আমাকে রত্নের খাটে করিয়া মন্দাকিনীর তীরে লইয়া গেলেন। আমি সেই দেবনদীতে অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম। পরে তাঁহারা আবার আমাকে খাটে শোওয়াইয়া লইয়া আসিলেন।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় বিষয়ের আদি, মধ্য ও অন্ত—সেই দেশে যে অজ্ঞ যোগ, তপস্যা ও আলস্য এক কথা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যে দেশে জনক, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাযোগিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার ও ধর্ম্ম যে একই বস্তু এই মহাসত্যের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, যে দেশের তাপসাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য সকলেই জনসমাজের পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্য আপন আপন সুখ-স্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও সমাধি, সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপিও যে দেশের আধ্যাত্মিক অবনতি ও নৈতিক পাশবাচার দূর করিবার জন্য কত কত সিদ্ধমহাপুরুষগণ অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহার নির্জ্জনসাধন পরিত্যাগ করিয়া অনাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি শতসহস্র ক্লেশ উপেক্ষা করতঃ দূরদূরান্তর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এবং বিধিমতে ধর্ম্ম-পিপাসু জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকাশে প্রেম, পবিত্রতা ও সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃ সমুদিত করিয়া, জলকষ্টপীড়িত লোকদিগের ক্লেশ বিদূরিত করিয়া, অন্নকষ্টে মৃতপ্রায় সহস্র সহস্র দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পর্য্যন্ত সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া, এবং রুগ্নকে ঔষধ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান, ও হতাশকে আশা দিয়া প্রতিদিন এই হতভাগ্য দেশে পুনরায় সৌভাগ্যলক্ষ্মী আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছেন, হায়, সেই দেশের লোক হইয়া চক্ষু থাকিতেও আমরা অন্ধের ন্যায় চীৎকার করিতেছি—যোগে আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা আনিয়া দেয়! লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা, অজ্ঞতার কথা। যাঁহাদের ষড়ৈশ্বর্য্যশালিত্ব, যাঁহাদের মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বীরত্বের কিছুমাত্র আভাস পাইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে স্তব্ধ, যাঁহাদের দুই চারিটা কথার প্রতিধ্বনি এমার্সন-কারলাইল প্রমুখ পাশ্চাত্য যোগিগণের নিকটে পাইয়া ঊনবিংশ শতাব্দি তাঁহাদের উপাসনা করিতেছে এবং যে মহাত্মাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিশুখ্রীষ্ট এবং মহম্মদ এই দুই সহস্র

গোস্বামিমহাশয়ের শরীর দিন দিন দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইতে দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। সকলেই মনে করিলেন, তাঁহাকে কলিকাতায় আনিতে পারিলে তাঁহার শরীর সুস্থ হইবে। কিন্তু দোকানের ঋণ তখনও সমস্ত পরিশোধ হয় নাই। ঋণপরিশোধ না করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিতে পারেন না। তখন জগৎ বাবু ও

বৎসর পৃথিবীর অধিকাংশ মানবমণ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই সন্তান হইয়া আজ যে আমরা ইংরাজদিগের যৌবনসুলভ চপলতা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি ও যোগকে আলস্য মনে করিতেছি ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে?

বস্তুতঃ যোগে আলস্য আনে না; বরং ঠিক তার বিপরীত। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম এই তিনের এককালীন সামঞ্জস্যীভূত উন্নতিই যোগের ফল। পরমেশ্বর রসস্বরূপ। রস যেমন উদ্ভিদের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এককালে তাহার মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ও পত্র সর্ব্বত্র সমভাবে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করে, মানবাত্মায় পরমাত্মার আবির্ভাব হইলেও সেইরূপ তাহার সমস্ত ভাব একসঙ্গে সমভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আংশিক উন্নতি ইহার বিরুদ্ধ। তিনি পূর্ণ; সেই পূর্ণ আদর্শ প্রাণে অবতীর্ণ হইলে অপূর্ণতা কি সঙ্কীর্ণতা তথায় স্থান পায় না। প্রকৃত উন্নতি লাভ করিলে কার্য্য করিতেই হইবে। তবে কার্য্য সকলের একরূপ কখনই হইতে পারে না। সকলেই প্রচার কি বক্তৃতা বা সংবাদ পত্রপ্রকাশ ও পুস্তকপ্রণয়ন করিবে, নতুবা তাহাদিগকে ক্রিয়াশীল বলিব না, ইহা অজ্ঞের কথা। সকলকেই ধর্ম্মপরায়ণ যোগী হওয়া চাই, অথচ সাংসারিক নানা কর্ম্মে বিভক্ত হইতে হইবে। বক্তৃতা করা কাহারও কার্য্য, পুস্তকলেখা অপরের কার্য্য, কেহ বা কৃষিকার্য্য করিবে, কেহ বিচারপতি হইবে; কাহাকে জমিদারী দেখিতে হইবে, কাহাকেও স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে; আর কেহ কেহ বা কেবল নির্জ্জনে বসিয়া সাধন করিবেন ও অপর সকলকে আপনার ধর্ম্মজীবনের অমূল্য সত্যসমূহ বিরলে শিক্ষা দিবেন। সুতরাং দেখা গেল যে যোগ সকলের সাধারণ ভিত্তিভূমি। তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া যাঁহার যেরূপ সুবিধা তিনি সেইরূপ উপায়ে মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবন নির্ব্বাহ করিবেন। (যোগ-সাধন)।

কিশোরী বাবু সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহারা দোকানদারদিগের প্রাপ্য টাকার জামিন হইবেন। গোস্বামিমহাশয় কলিকাতায় গিয়া টাকা পাঠাইলে তাঁহারা দোকানের ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। যোগজীবন গোস্বামিমহাশয়কে এই কথা জানাইয়া তাঁহাকে কলিকাতা আসিবার জন্য অনেক করিয়া বলিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। বলিলেন একটি পয়সা ঋণ থাকিতে আমি এ স্থান ত্যাগ করিব না। আর এখানে জগন্নাথদেবের আশ্রয়ে রহিয়াছি, তিনি প্রত্যহ আমাকে তিন বার দেখিয়া যান। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? আর যাইবার জন্য ত তাঁহার আদেশ পাই নাই। তাঁহার আদেশ ব্যতীত কিরূপে যাওয়া হইতে পারে? ইচ্ছা হয় তোমরা যাও, আমি এখানে থাকিব।

তিনি কৌশলে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন তিনি আমার কাছে যে ভাবে বিদায় লইয়াছিলেন তাহা মনে হইলে এখনও আমার প্রাণ আকুল করিয়া তোলে। সেই জন্য আত্মপ্রশংসামিশ্রিত হইলেও তাহা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। পুরীর ইঞ্জিনিয়ার ৺সুরেন্দ্রনাথ বরাটের স্ত্রী শান্তিসুধার সহিত মহাপ্রসাদ পাতাইয়া তাঁহাকে ও আশ্রমের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। সুরেন্দ্র বাবু শান্তির জন্য পাল্‌কি পাঠাইয়াছিলেন। পাল্‌কি আসিলে শান্তি আমাকে তাঁহার যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলায় আমি তাঁহার সঙ্গে নীচে আসিতেছিলাম এমন সময়ে গোস্বামিপাদ আমাদিগকে ডাকিলেন। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি শান্তিকে বলিলেন, তুই কি সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ী যাইতেছিস্? শান্তি বলিল, হাঁ। গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, কিসে যাবি? পাল্‌কিতে যা; হেঁটে যাস্ নে। শান্তি বলিল, না, হাঁটিয়া যাইব না। সুরেন্দ্র বাবু

পাল্কি পাঠাইয়াছেন, আমি তাহাতে যাইব। তখন গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, তোর সঙ্গে কে যাইবে? পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি যাইবে কি? আমি বলিলাম, না আমি যাইব না, অনন্ত যাইবে। আমার কথা শুনিয়া তিনি যেন অপ্রস্তুত হইয়াছেন এই ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তোমাকে কি আমি পাল্কির সঙ্গে যাইতে বলিতে পারি? তুমি আমার মাথার মণি, আমি পূজা করিয়া তোমাকে আনিয়াছি। তুমি শান্তির দেবতা। প্রতিদিন আমি যাঁহাদিগকে স্মরণমনন করি, তাঁহাদের মধ্যে তুমি একজন।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলাম, আপনি আমাকে স্তব করিতেছেন কেন? আপনি আমাকে সবই বলিতে পারেন। আপনার সমস্ত আদেশই আমার পালনীয়, আপনার আদেশ পালন করিলে ত আমার অপমান হয় না। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে স্তব করিতেছি না। তোমার যথার্থ স্বরূপ যাহা তাহাই বলিলাম। ইহার ভিতরে অত্যুক্তি কিছুই নাই। সমস্তই যথার্থ কথা। তুমি লজ্জিত হইতেছ কেন?" এই বলিয়া তিনি আমার কাছে বিদায় লইলেন। মূর্খ আমি তাহা বুঝিলাম না।

সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্রের সহিত একটা সামান্য ঘটনা লইয়া আমার একটু কলহ হইয়াছিল। এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ প্রভুপাদকে বলেন যে জগদ্বন্ধু অশ্বিনীকে প্রহার করিয়াছে। সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ী হইতে আহার করিয়া আসিয়া আমি গোস্বামিমহাশয়ের কাছে গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি নাকি অশ্বিনীকে মারিয়াছ? আমি বলিলাম, এ কথা আপনাকে কে বলিল? গোস্বামিমহাশয় বলিলেন, ব্রহ্মচারী।

বলিয়াছে। আমি বলিলাম, মারের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তবে অশ্বিনীর সহিত আমার একটু কলহ হইয়াছে। আমার কথা শুনিয়া গোস্বামিপাদ বলিলেন। তুমি তাহাকে ক্ষমা কর। আমি বলিলাম আপনি বলিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছি। কলহের পরক্ষণেই আমার মনে গ্লানি উপস্থিত হইয়া, কেন ক্রোধের বশীভূত হইয়া অশ্বিনীকে রুক্ষ কথা বলিয়া তাহার মনে কষ্ট দিলাম, এই কথা মনে করিয়া বড়ই কষ্ট পাইয়াছি। আমার কথা শুনিয়া তিনি অশ্বিনীকে ডাকিয়া আমার কাছে মাপ চাহিতে বলিলেন। সে মাপ চাহিলে প্রভুপাদ বলিলেন, তোমরা দুই জনে কোলাকুলি কর। আমরা তাঁহার আদেশমত কোলাকুলি করিলাম। অতঃপর তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে তোমরা সকলে শান্তিলাভ করিবে। তবে কিছু সময় সাপেক্ষ। তোমরা যতদিন তিনগুণের ভিতরে থাকিবে, ততদিন তোমাদের মধ্যে কাম ক্রোধাদির ক্রিয়া হইবে। কাহারও সহিত বিবাদ হইবার সম্ভাবনা হইলে তোমরা সেস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া যাইও। এই কথা ভগবান্ তোমাদিগকে বলিতে বলিতেছেন। তিনি এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তোমরা এই কথা তাঁহার আদেশ মনে করিয়া প্রতিপালন করিবে। তিনি তোমাদিগকে আরও জানাইতেছেন যে তোমরা তাঁহার বুকের জিনিস। তিনি তোমাদিগকে কত ভালবাসেন, তাহা তোমরা জান না। এইরূপে তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়া সকলের নিকট বিদায় লইলেন। হায়! তখন কে জানিত যে এই তাঁহার শেষ উপদেশ।

সেই দিন তাঁহার সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া প্রায় তিন সহস্র টাকা উদ্বৃত্ত হইল। কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতা যাইবার জন্য তিনি শ্রীযুক্ত

মণীন্দ্রমোহন মজুমদারকে একখানি ষ্টিমার ভাড়া করিবার জন্য এক পত্র লিখিয়াছিলেন। মণীবাবু ষোলশত টাকায় 'হোরমিলার' কোম্পানির একখানি ষ্টিমার ভাড়া করিয়া সংবাদ দেন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ তারযোগে মণীবাবুর নিকট উক্ত টাকা প্রেরিত হইল। কলিকাতায় টাকা পাঠাইয়া তিনি নিজের জন্য ষ্টিমার ভাড়া করিলেন না, যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাঁহাদিগের স্বদেশে গমন করিতে যাহাতে কষ্ট না হয়, এ ষ্টিমার ভাড়া তাঁহাদের জন্য। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তিনি পুরী পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে যাইবেন না; জগন্নাথের নিকটেই থাকিবেন।

কলিকাতায় টাকা প্রেরণ করিয়া তিনি শৌচাগারে গেলেন। সেই স্থানেই তাঁহার সমাধি হয়। শিষ্যগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে আসনে আনিলেন। সমস্ত দিন তিনি সমাধিস্থ রহিলেন। সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারা গেল না। পরে রাত্রি আটটার পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন। কাছে গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, আমাকে ধরিয়া তোল। আমি প্রস্রাব করিব। আমি ও সরলনাথ তাঁহাকে তুলিয়া ধরিলাম। তীব্র বিষে তাঁহার শরীর এমনই শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল এবং শারীরিক যন্ত্র সমুদায় এমনই শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে তিনি অতিকষ্টে আমাদের স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিবার চেষ্টা করিলে প্রস্রাব হইবার পূর্ব্বেই মল নির্গত হইল। ইহাতে তাঁহার শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। কলকল করিয়া শরীর হইতে ঘাম বাহির হইতে লাগিল। তিনি অবসন্ন হইয়া বলিলেন, আমার শরীর অত্যন্ত অস্থির করিতেছে। আর দাঁড়াইতে

পারিতেছি না। শীঘ্র এস্থান পরিষ্কার করিয়া এখানেই আমার বসিবার জায়গা করিয়া দাও। আমার অত্র আসনে যাইবার সামর্থ্য নাই। তাড়াতাড়ি সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া অন্য আসন পাতিয়া বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। তিনি বসিলেন। এইরূপে তিনি তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যখন দেহ ছাড়িব তখন আসনে থাকিব না। সেই কথা পূর্ণ হইল। পরে তিনি আমাকে বলিলেন, আজ আমার শরীর বড়ই মন্দ। তুমি আমার কাছে থাকিও, উপরে যাইও না। আমি বলিলাম, আপনার নিকটেই থাকিব, আপনাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।

অনন্তর আমি বলিলাম, সমস্ত দিন ত আপনার কিছুই খাওয়া হয় নাই; এক্ষণে কিছু আহার করুন। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, কি খাইব? কিছু ঠাণ্ডা জিনিস দিতে পার? আমি বলিলাম, পাঁকালের জল, মিছরির সরবত আর ডাবের জল আছে। ইহার মধ্যে কি দিব? আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি ইহার কিছুই খাইব না।

আমি। চা খাইবেন?

গোস্বামিপাদ। খাইব।

আমি তাড়াতাড়ি চা করিতে চলিলাম। কিশোরীবাবু তখন আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, আমি চা করিয়া দিব। এই বলিয়া তিনি চা প্রস্তুত করিলেন।

আমি খাওয়াতে গেলাম। তিনি স্বহস্তে বাটী ধরিয়া চা খাইতে লাগিলেন। কয়েক চুমুক খাইয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বারত্রয় কাহারও উদ্দেশে প্রণাম করিয়া যেমন তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন;

অমনি তাঁহার নয়নযুগল স্থির ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণের সর্ব্বস্বধন এমন দেশে চলিয়া গেলেন, যেখান হইতে কেহ কখনও ফিরিয়া আসে নাই।

বঙ্গদেশের উজ্জ্বল ভাস্কর চিরকালের জন্য নীলাচলে অস্তমিত হইলেন। ১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাত্রি নয়টা বিশ মিনিটের সময় ভক্তহৃদাকাশের অকলঙ্ক পূর্ণ সুধাকর নীলাদ্রির অন্তরালে চিরদিনের তরে অদৃশ্য হইলেন। জননীর ভবিষ্যদ্বাণী এতদিনে পূর্ণ হইল।* হায় হায়! একি হইল! অকস্মাৎ বিনামেঘে একি নিদারুণ বজ্রাঘাত হইল!

পর দিন এই মর্ম্মভেদী শোকসংবাদ তারযোগে নানা স্থানে প্রেরিত হইল। এই হৃদয়বিদারক দুঃখের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন, এবং গভীর শোকসূচক তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ের দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

পরদিন শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সেন যোগজীবনকে বলিলেন, গোস্বামিমহাশয় কি তাঁহার দেহের সৎকার সম্বন্ধে কখনও কিছু বলিয়াছিলেন? যোগজীবন বলিলেন, আমি সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আপনি বলাতে মনে হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় যখন ইঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সেই সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি, অতএব আমার দেহত্যাগ হইলে আমার শরীর দাহ করিও না। সমাধি দিও।

* তাঁহার মাতাঠাকুরাণী বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি সমস্ত তীর্থে যাও কিন্তু পুরীতে যাইও না। তথায় গেলে তুমি আর ফিরিয়া আসিবে না। সেইখানেই থাকিবে।

তখন তাঁহার কলেবর সমাধিস্থ করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। একটি স্থান ক্রয় করিয়া তথায় সমাধি দিবার কথা স্থির হইল। তখন জায়গার চেষ্টা হইতে লাগিল। অনেকে অনেক স্থানের কথা বলিলেন, কিন্তু কোনটিই মনঃপূত হইল না। এমন সময়ে ভিঙ্গার-পুরের জমিদার কুড়মন চৌধুরীর নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর তীরবর্ত্তী স্থান বিক্রয় হইবে। তখনই জমির সত্ত্বাধিকারীকে আনাইয়া খায়নাপত্র লেখাপড়া করা হইল। একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া সমাধি খনন করা হইল। আমি গোস্বামিপাদের পবিত্র দেহ পুষ্পচন্দনের দ্বারা পূজা করিলাম এবং রেশমী বস্ত্রের উপর চন্দনদ্বারা তাঁহার পায়ের ছাপ তুলিয়া লইলাম। পরে ফটো লওয়া হইল। অতঃপর সেই পবিত্র দেহ বিমানে আরোপিত করিয়া বাহির করা হইল। রাজপথ লোকে লোকাকীর্ণ হইয়া গেল। সহস্র সহস্র লোক হায় হায় করিতে করিতে গোস্বামিপাদের অনুগমন করিতে লাগিল। সকলেরই মুখ বিষাদে মাখা এবং চক্ষু জলে ভরা। কেহ কেহ চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। এইরূপে গোস্বামিপাদের দেহ সমাধিস্থানে আনীত হইলে যোগজীবন জাহ্নবী ও অন্যান্য তীর্থবারি দ্বারা তাহা স্নান করাইয়া নূতন বহির্ব্বাস পরাইয়া দিলেন। পরে একটি নূতন কমণ্ডলু সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল।

প্রথমে সমাধির উপর একখানি কাঁচা ঘর প্রস্তুত হয়। পরে স্বর্গীয়া বদনসুন্দরী দাসী একটী পাকা ঘর করিয়া দেন। তাহার কিছুদিন পরে সারদা ও নগেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

গোস্বামিপাদের দেহত্যাগের পর দিন সকাল বেলা (তখনও তাঁহার দেহ আসনেই ছিল) বানরগণ আহারের জন্য আসন গৃহে

উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে খাবার দেওয়া হইল কিন্তু তাহারা তাহ স্পর্শও করিল না। তাহারা একদৃষ্টে প্রভুপাদের দিকে চাহিয়া স্থির-ভাবে বসিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

এই মর্ম্মান্তিক শোক কাহিনী আর বর্ণনা করিতে পারি না। প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। হাত অবশ; আর লেখনী চলে না। তাই এই বিষাদ কাহিনীর এই স্থানেই শেষ করিলাম।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ
হরিঃ ওঁ।
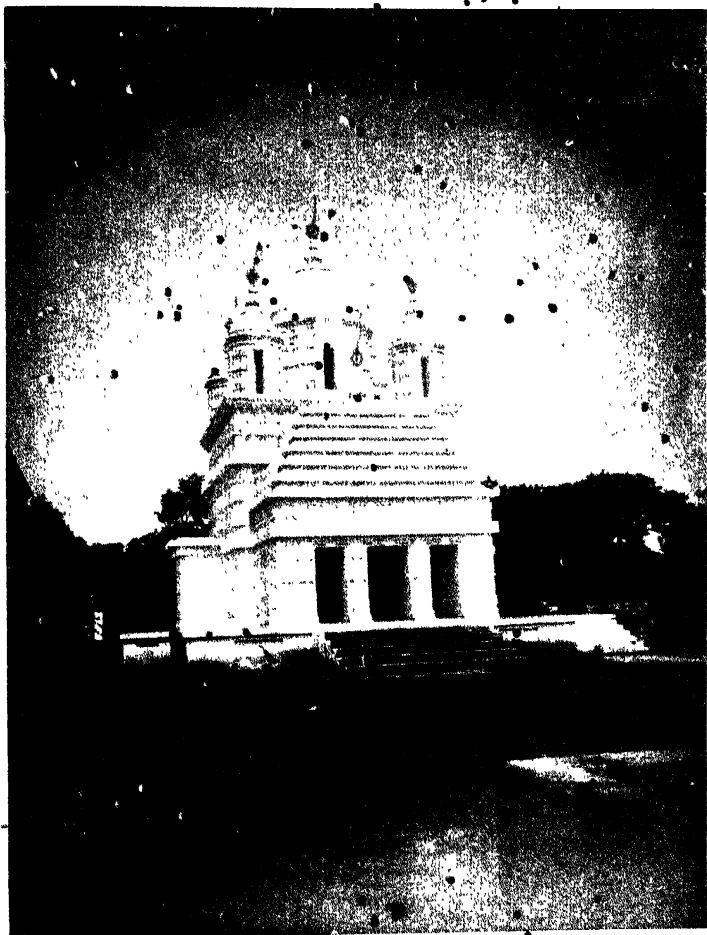
জটিয়াবাবার সমাধি-মন্দির, পুরী

# পরিশিষ্ট

## তিরোভাবে

বদনে না সরে বাণী কি বলিব হায় ;
ডুবিয়াছে সে মূরতি নীলাদ্রির গায়।
জ্ঞানের উজ্জল রবি, প্রেমের মোহন ছবি,
করুণার স্থকুমার পূর্ণ শশধর,
নীলাদ্রির অন্তরালে হয়েছে অন্তর।

যাঁহার রসনা হতে অমৃতের ধার,
শীতল করিত প্রাণ, বহি অনিবার,
বসিলে নিকটে যাঁর, ঘুচিত দুঃখের ভার ;
শোকদগ্ধ হৃদয়েতে দিত শান্তিজল,
হরণ করেছে তাহা ঐ নীলাচল।

প্রেমের মধুর ছবি গৌরাঙ্গ সুন্দর,
নিরমল অকলঙ্ক পূর্ণ সুধাকর,
অকালে তোমার গায়, অন্তর্হিত হায় হায়,
সে শোকে এখন বঙ্গ করে হাহাকার,
নিদারুণ বজ্রাঘাত হানিলে আবার।

বঙ্গের সহিত তব কেন এত বাদ,
তোমার নিকটে তার এত অপরাধ!
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, করিলে উদরসাৎ,
নিমাই বিজয় ধনে বঙ্গ-শিরোমণি,
উঠিয়াছে সারা বঙ্গে হাহাকার ধ্বনি।

যে রত্ন হরিলে আজি ওহে নীলাচল,
যে ক্ষতি করিলে তুমি নিঠুর উৎকল,
কি বলিব হায়, আর করিলে যে অপকার,
শত বৎসরেও তাহা পূরণ নহিবে,
বঙ্গমাতা এ শোকাগ্নি মরমে বহিবে।

বঙ্গজননীর হৃদে যে শেল হানিলে,
গৌড়দেশবাসিজনে যে আঘাত দিলে,
এ ক্ষত কখন হায় হইবে না নিরাময়
যত দিন বঙ্গমাতা জগতে রহিবে,
এ জ্বালা হৃদয়ে তার সতত জ্বলিবে।

কিছুতে উদর তব পূর্ণ নাহি হয়,
কিছুতে রসনা তব পরিতৃপ্ত নয়,
অন্নভার শত শত করিছ উদরগত,
তবু কি জঠরজ্বালা নিদারুণ তব
অপনীত নাহি হয় হে নীলাদ্রিধব?

ভারত সমর ক্ষেত্রে বিশাল প্রান্তরে,
ভীষ্ম আদি কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিকরে,
করিলে উদরসাৎ ওহে নীলাচলনাথ,
তুমিই জনক যার সেই যদুকুল,
তব দংষ্ট্রাগত হয়ে হয়েছে নির্ম্মূল।

এতেও জঠর জ্বালা নহে নিবারিত,
বিরাট রসনা তব সদা লালায়িত,
রুধিরের তরে হায়; তাই নিঠুরের প্রায়
কাঁদাইয়া বঙ্গজনে করিলে হরণ,
স্বর্ণময়ী শচীমার অঞ্চলের ধন।

এ দারুণ মর্ম্মব্যথা তপ্ত অশ্রুজল,
শোকের হৃদয়ভেদী যাতনা প্রবল,
ঘুচিবে না উষ্ণশ্বাস, মর্ম্মচ্ছেদী হা হুতাশ,
বঙ্গভূমি তব পদে করেছে কি দোষ,
তাহার উপরে তব কেন এত রোষ?

প্রবল দুর্ব্বলে পরে করে অত্যাচার,
শক্তির অভাবে তার নাহি প্রতিকার।
থাকিত শকতি যদি তা'হলে কি নিরবধি
প্রবলের অত্যাচার অবনত শিরে,
সহিত মানব ভাসি নয়নের নীরে।

—:—

# বংশাবলী
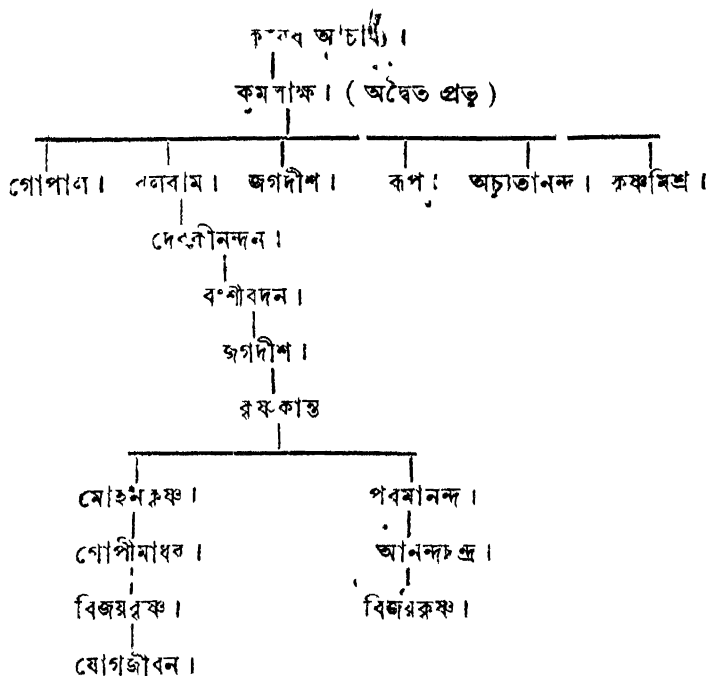
অদ্বৈত প্রভুর দুই পত্নী, সীতাদেবী ও শ্রীদেবী। সীতাদেবীর পাঁচ পুত্র, অচ্যুতানন্দ, রূপ, জগদীশ, বলরাম ও গোপাল। শ্রীদেবীর এক পুত্র, কৃষ্ণমিশ্র। বলরামমিশ্রের তিন পত্নী। প্রথমা পত্নীর পাঁচ পুত্র, দ্বিতীয়া পত্নীর তিন পুত্র এবং তৃতীয়া পত্নীর দুই পুত্র। তৃতীয়া পত্নীর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবকীনন্দনের বংশে গোস্বামিমহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

# বিষয়-সূচী

অনুক্রমণিকা

## পূর্ব্বভাগ

### প্রথমপরিচ্ছেদ



### দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ



### তৃতীয়পরিচ্ছেদ



### চতুর্থপরিচ্ছেদ

## পঞ্চমপরিচ্ছেদ



## ষষ্ঠপরিচ্ছেদ



## সপ্তমপরিচ্ছেদ



# মধ্যভাগ

## প্রথমপরিচ্ছেদ



## দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ

## তৃতীয়পরিচ্ছেদ



## চতুর্থপরিচ্ছেদ

## পঞ্চমপরিচ্ছেদ



## ষষ্ঠপরিচ্ছেদ

## সপ্তমপরিচ্ছেদ



## অষ্টমপরিচ্ছেদ

## নবমপরিচ্ছেদ



## দশমপরিচ্ছেদ



## একাদশপরিচ্ছেদ



## দ্বাদশপরিচ্ছেদ

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ



## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ



## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ



## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ



# উত্তর ভাগ

## প্রথম পরিচ্ছেদ



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ



## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## অষ্টম পরিচ্ছেদ



## নবম পরিচ্ছেদ

## দশম পরিচ্ছেদ



## একাদশ পরিচ্ছেদ

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

# পরিশিষ্ট

# স্থান ও কালপঞ্জী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

জন্ম সময়—১২৪৮ সাল, ১৯শে শ্রাবণ, ঝুলন পূর্ণিমা।

জন্মস্থান—শিকারপুর (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী

জন্মসময়—১২৫৯ সাল, ভাদ্রমাস, কৃষ্ণাদ্বাদশী।

জন্মস্থান—শিকারপুর (নদীয়া)।

প্রভুপাদের বিবাহ—(অনুমান) ১২৬৫ সাল।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন—১২৬৫।৬৬ সাল

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন, মহর্ষির নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ও উপবীত ত্যাগ—১২৬৭-৬৯ সাল।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদ গ্রহণ এবং বাগআঁচড়া, সাঁতরাগাছি, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার—১৭৮৫ শকাব্দ (১২৭০ সাল)।

বর্দ্ধমান, পাবনা শিলাইদহ, কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার পূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাগমন—১৭৮৬ শক (১২৭১ সাল) ১লা বৈশাখ।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পদে বরণ—১২৭১ সাল, ৭ই ভাদ্র।

১২৭১ সালের বিখ্যাত ঝড়—২০শে আশ্বিন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সূত্রপাত (স্বতন্ত্র প্রচার বিভাগ স্থাপন) ১২৭১ সাল, কার্ত্তিক; এবং ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকার মাসিকাকারে প্রকাশ।

পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা কেন্দ্র করিয়া তাহা হইতে যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, নোয়াখালি, বরিশাল, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার —১২৭১।৭২ সাল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন—১৮৬৬ খৃঃ অঃ (১২৭৩ সাল, ২৬শে কার্ত্তিক)।

প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজে

সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন—১২৭৪ সাল, ২৩শে আশ্বিন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার—১২৭৫ সাল।

ঢাকায় অবস্থান ও ধর্ম্মপ্রচার— ১২৭৬ সাল।

ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা—১২৭৭ সাল, ফাল্গুন।

সিভিল বিবাহবিধি প্রবর্ত্তন— ১৮৭২ খৃঃ অঃ (১২৭৯ সাল)

কাকিনা (রংপুর), কুচবেহার ইত্যাদি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার পূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাগমন—১২৭৯ সাল, শ্রাবণ।

উত্তরপশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশে লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, দেরাদুন, সাজেহানপুর, লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, কাণপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার ১২৮০ সাল।

ভক্তিসাধনব্রত গ্রহণ—১২৮২ সাল, ১৩ ফাল্গুন।

বাগ্‌আঁচড়ায় নির্জ্জন অবস্থান—(অনুমান) ১২৮৩।৮৪ সাল।

কোচবিহার বিবাহের আন্দোলন—১২৮৪ সাল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনোদ্দেশে কলিকাতা টাউন হলে সভা—১২৮৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনানন্তর ঢাকায় গমন—১২৮৫ সাল, জ্যৈষ্ঠের শেষ।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা, রাঁগং

আঁচড়া, মহেশপুর (নবদ্বীপ), সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি বহুস্থানে ধর্ম্ম প্রচার ১২৮৫ আষাঢ় হইতে ১২৮৭ মাঘ পর্য্যন্ত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও আচার্য্যরূপে কোন্নগর, হরিনাভি প্রভৃতি স্থানে এবং বেহারের অন্তর্গত হাজারিবাগ, গয়া, বাঁকিপুর, মজঃফরপুর, মতিহারী, গাজিপুর প্রভৃতিস্থানে প্রচারার্থ গমন—১২৮৭ ৮৮ সাল।

প্রচারার্থ মুর্শিদাবাদ, আজিমগঞ্জ, সেদপুর, শান্তিপুর, তেলেনিপাড়া, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতিস্থানে গমন এবং মুঙ্গের, গয়া, গাজিপুর, হিমালয়, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কাশী, গোয়ালিয়র, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গুরু অন্বেষণে ভ্রমণ—১২৮৯ সাল।

প্রভুপাদের গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দীক্ষাপ্রাপ্তি—১২৯০ সাল, আষাঢ়।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে সাধন এবং গুরুআদেশে কাশীতে স্বামী শ্রীশ্রী-হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট যথাশাস্ত্র সন্ন্যাসগ্রহণ—১২৯০ সাল।

কলিকাতায় এবং ঢাকায় অবস্থান; কলিকাতা হইতে পুনরায় বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে—গয়া, বাঁকিপুর, গাজিপুর, কাশী, অযোধ্যা, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বৃন্দাবন, জ্বালামুখী, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে গমন—১২৯০-৯১ সাল (অনুমান)।

ঢাকায় অবস্থান ও ধর্ম্মপ্রচার—১২৯১ সাল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পরলোক গমন—১৮৮৪ খৃঃ অঃ, জানুয়ারি।

বামাবোধিনী পত্রিকায় "আশাবতীর উপাখ্যান" প্রকাশ ১২৯২ সাল।

ঢাকায় অবস্থান এবং বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান—১২৯২ সাল, অগ্রহায়ণ-পৌষ।

কলিকাতা হইতে দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, মতিহারী, মুঙ্গের, জামালপুর,

খৈপাড়া, কোন্নগর, শান্তিপুর, বাগেরহাট, বরিশাল, মাদারিপুর, মাণিকদহ, কাকিনা প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার ও সাধন প্রদান—১২৯২।৯৩ সাল।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদত্যাগ—১২৯৩সাল ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের দেহত্যাগ—১২৯৩ সাল, ৩১শে শ্রাবণ।

ঢাকায় অবস্থান পূর্ব্বক বক্তৃতা উপদেশ ও সাধন প্রদান—১২৯৩ জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র এবং অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত।

কাকিনায় বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান—১২৯৩ সাল, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ।

দ্বারভাঙ্গায় প্রভুপাদের পীড়া - ১৮৮৭ খৃঃ অঃ (১২৯৪ সাল)।

গ্রন্থকারের দীক্ষা প্রাপ্তি—১২৯৪ সাল, ৩রা অগ্রহায়ণ।

প্রভুপাদের নৌকাবাস শেষ—১২৯৪ সাল, আশ্বিন মাস।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ—১২৯৪ সাল, অগ্রহায়ণ মাস।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পত্র—১২৯৪ সাল, ১৭ই পৌষ।

প্রভুপাদের উত্তর—১২৯৪ সাল, ২০শে পৌষ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পত্র—১২৯৪ সাল, ২৬শে পৌষ।

ঢাকায় প্রথম ধূলট—১২৯৪ সাল, মাঘ।

গেণ্ডারিয়া আশ্রম স্থাপন—১২৯৫ সাল, ভাদ্র।

কাকিনায় রাজা মহিমারঞ্জন ও অন্যান্য প্রার্থীকে দীক্ষাপ্রদান এবং কামাখ্যা গমন—১২৯৫ সাল।

প্রভুপাদ শ্রীমদ্ যোগজীবন গোস্বামী ও শ্রীমতী শান্তিসুধার বিবাহ—১২৯৫ সাল, ২৬শে ফাল্গুন।

প্রভুপাদের রামপুরহাটে গমন—১২৯৫ সাল, চৈত্র।

শ্রীবৃন্দাবনের পথে কাশী, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে গমন—১২৯৬ সাল।

## স্থান ও কালপঞ্জী

শ্রীবৃন্দাবন বাস—১২৯৬।৯৭ সাল।

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের দেহত্যাগ ১২৯৭ সাল।

শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি—১২৯৭ সাল, ১০ই ফাল্গুন।

প্রভুপাদ কর্তৃক গেণ্ডারিয়া আশ্রমে শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবীর সমাধি প্রতিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম স্থাপন—১২৯৮ সাল, আশ্বিন, মহাষ্টমী।

জননীদর্শনে প্রভুপাদের শান্তিপুরে গমন ও কলিকাতায় স্থিতি—১২৯৮ সাল, অগ্রহায়ণ।

ঢাকায় প্রভুপাদের প্রত্যাগমনের পর পুত্রবধূ বসন্ত কুমারীর দেহত্যাগ—১২৯৮ সাল, ২৫ পোষ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহত্যাগ—১২৯৮ সাল, ১৩ই শ্রাবণ, রাত্রি ২টা ১৮ মিনিট।

প্রভুপাদের মাতাঠাকুরাণীর ঢাকায় পুত্রের নিকট গমন—১২৯৯ সাল, ও দেহত্যাগ—১২৯৯ সাল, চৈত্র।

কলিকাতায় অবস্থান—১৩০০ সাল, অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।

প্রভুপাদের প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গমন—১৩০০ সাল, অগ্রহায়ণ।

প্রয়াগে প্রেমসখীর বিবাহ—১৩০০ সাল, ফাল্গুন।

প্রেমসখীর দেহত্যাগ—১৩০১ সাল, বৈশাখ।

কলিকাতায় অবস্থান—১৩০১ ফাল্গুন পর্য্যন্ত।

প্রভুপাদের শ্রীবৃন্দাবন বাস—১৩০১ ফাল্গুন হইতে ১৩০২ শ্রাবণ পর্য্যন্ত।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে প্রভুপাদের শেষ ঝুলট্—১৩০২ সাল, মাঘ।

কলিকাতায় প্রভুপাদের শেষ অবস্থান—১৩০২ সাল মাঘের শেষ হইতে ১৩০৪ সাল ২৪শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত।

প্রভুপাদের ৺পুরীধাম যাত্রা—১৩০৫ সাল, ২৪শে ফাল্গুন।

দৌহিত্র জগদানন্দ প্রভৃতির দীক্ষা—১৩০৫ সাল, ১৩ই বৈশাখ।

স্বামী দেবপ্রসাদের শ্রীধাম প্রাপ্তি—১৩০৫ সাল ২১শে ভাদ্র।

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শ্রীধাম প্রাপ্তি—১৩০৫ সাল, অগ্রহায়ণ

প্রভুপাদ কর্তৃক পুরীর এমারমঠে বস্ত্রদান—১৩০৫ সাল, ২৯শে ফাল্গুন।

প্রভুপাদ কর্তৃক পুরীর বড় আখড়ায় সাধুসেবা—১৩০৫ ২৭শে চৈত্র।

প্রভুপাদকে বিষপ্রয়োগ—১৩০৬ সাল, ২৪শে বৈশাখ।

প্রভুপাদের তিরোভাব—১৩০৬ সাল, ২২শে জ্যৈষ্ঠ; রবিবার, ৯টা ২০ মিনিট।

প্রভুপাদ শ্রীমদ্‌ যোগজীবন গোস্বামীর জন্ম—১৮৭০ খৃঃ অঃ দেহত্যাগ—১৩১২ সাল, ১৮ই আশ্বিন।

দৌহিত্র দাউজীর জন্ম—১২৯। সাল, ২২শে পৌষ।

দেহত্যাগ—১৩১৭ সাল, ২৬শে পৌষ।